তাজউদ্দীন আহমদ

আলোকের অন্তর্ধারা

তাজউদ্দীন আহমদ
আলোকের অনন্তধারা

প্রথম খণ্ড

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
সিমিন হোসেন রিমি

উৎসর্গ

সেই মানুষদের উদ্দেশ্যে

যাঁরা সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য করতে দ্বিধা করেন না,

ন্যায়-অন্যায় বোধ যাঁদের কখনও মরে যায় না,

সাধারণ মানুষকে ভালোবাসায় যাঁদের মধ্যে কৃত্রিমতা কাজ করে না,

দেশপ্রেমের প্রকৃত সুর যাঁরা অনুধাবন করতে পারেন,

এবং নতুন প্রজন্মকে,

যাঁরা এই দেশকে ভালোবেসে আলোকিত মানুষ হবে।

সূচি

আতাউর রহমান খান ১৭

আরহাম সিদ্দিকী ২৩

আমীর-উল ইসলাম ৩৭

আবুল মাল আব্দুল মুহিত ৯৯

আবু ওসমান চৌধুরী ১১৯

আলী তারেক ১২৫

আবু সাইদ চৌধুরী ১৩৩

এ. কে. খন্দকার ১৬৯

কফিল উদ্দিন মাহমুদ ১৭৯

কে. এফ. রুস্তামজী ২০১

খান সারওয়ার মুরশিদ ২০৫

গোলোক মজুমদার ২৩৩

বাহাউদ্দিন চৌধুরী ২৪৩

নূরুল ইসলাম ২৫৩

মতিউল ইসলাম ২৬৯

মতিউর রহমান ২৯৩

মোহাম্মদ নূরুল কাদের ৩০৫

ম. ওয়াহিদুজ্জামান ৩২৭

মীর শওকত আলী ৩৩৯

মুজাফ্ফর আলী ৩৪১

রফিকউদ্দিন ভূঞা ৩৪৯

শামসুর রহমান খান ৩৫৩

সম্পাদক ও প্রকাশকের কথা

তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের ইতিহাসে অনন্য ভূমিকা পালনকারী আলোকিত একজন মানুষ । তাঁর নিজ দক্ষতা, যোগ্যতা, সততা, নিষ্ঠা, সমাজ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্টতা এনে দেয়। আদর্শবাদ তাঁর চরিত্রের অসাধারণ একটি দিক। জাতি তথা মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ সেবা ছিল তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে দেশভক্ত সম্পূর্ণ নির্লোভ এক চরিত্র। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় ও গৌরবদীপ্ত সফল ভূমিকা এবং অবদান ।

তাজউদ্দীন আহমদ আরো অনেকের মত আমার কাছেও বরাবরই অপার এক বিস্ময়। বিস্ময় সৃষ্টিকারী এই মানুষটিকে জানার অদম্য আগ্রহের ফলে আমি যা জেনেছি তা আমাকে বিস্মিত করেছে আরও বহু গুণে। আমি অনুভব করেছি যেখানে যখনই তাঁর প্রসঙ্গ উঠেছে-কী গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় তিনি উচ্চারিত হন বারবার। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করেছি আন্তরিক, সহজাত এক প্রবণতা ছিল তাঁর নিজেকে আড়াল করে রাখার । আমি ইতিহাস সষ্টিকারী আত্মপ্রচারবিমুখ আড়ালের এই কর্মবীর মানুষটিকে জানতে চেষ্টা করেছি। খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছি তাঁকে ।

এই প্রচেষ্টারই অংশ হিসাবে আমি তাঁর বন্ধু, সহকর্মী সহপাঠী, পরিচিত এবং তাঁকে সামান্য জানেন, এমন নানা জনের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করি। তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ছাত্র জীবন থেকে নিয়মিত প্রতিদিন ডায়েরি লিখতেন। যদিও এই ডায়েরির বড় একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধের সময়

পাকিস্তান বাহিনীর হাতে তাঁর বাড়ির অন্যান্য জিনিস এবং বইপত্রের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়। শুধু কিছু অংশ, যেটুকু ১৯৬৬ সালে জনাব বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনের উপর বই লেখার কাজে নিজের কাছে নিয়ে রেখেছিলেন সেটুকুই রক্ষা পায়। এই ডায়েরিগুলি তাজউদ্দীন আহমদকে জানা এবং বোঝার ক্ষেত্রকে অনেকখানি প্রসারিত করে। শুধু তাই নয়, ১৯৪৭ পরবর্তী এই অঞ্চলের মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান, গতি- প্রকৃতি, নিজ ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম থেকে শুরু করে তাজউদ্দীন আহমদের ব্যক্তিগত দৈনন্দিন ঘটনার খুঁটিনাটি বিষয়ের এক বিশ্বস্ত দলিল এই ডায়েরি। এই ডায়েরিগুলি থেকেও বেশ কিছু নাম আমি সংগ্রহ করি এবং সন্ধান পেয়ে যাই কয়েকজনের।

এরপর আমি তাঁদের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করি। এই পর্যায়ে এসে মনে হয় আমি যাঁকে খুঁজছি, সেই মানুষটি তো তিলে তিলে হয়ে উঠেছিলেন ইতিহাসের অনিবার্য চরিত্র। আমি যা জানছি তা ইতিহাসের অংশ এবং এই দেশের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ। এই ভাবনা থেকে আমি অডিও ক্যাসেটে ধারণ করতে থাকি এই কথোপকথন। এই আলাপচারিতায় আমি প্রায় সবার কাছ থেকেই পেয়েছি অকুণ্ঠ সহযোগিতা। দীর্ঘ সময় দিয়েছেন প্রত্যেকেই । একদিনে শেষ না হলে, আরো সময় দিয়েছেন, নতুন কারো নাম ঠিকানা দিয়েছেন কেউ। আবার কিছু বিপরীত চিত্রও আছে। যেমন, বছরের পর বছর চেষ্টা করে আমি আজও অনেকের সাথেই কথা বলতে পারিনি। কেউ কথা বলেছেন, কিন্তু লিখে নিতে দেননি, টেপে ধারণ করা তো অসম্ভব ব্যাপার। কেউ বলেছেন, মৃত্যুর সাথে সব কথার শেষ হবে কিন্তু তিনি বলে যাবেন না কিছু ! কেউ সময় উল্লেখ করে বলেছেন, ওমুক সালের আগে প্রকাশ করা যাবে না। কেউ বলেছেন, কথা দিতে হবে তাঁর মৃত্যুর আগে এই বক্তব্য প্রকাশ করবো না ।

যে মানুষ ইতিহাস নির্মাণ করেন তাঁকে খুঁজতে গেলে অবধারিতভাবে নানা ঘটনা, চাওয়া না চাওয়া নানা বিষয় সামনে এসে যাবেই এবং তা যদি হয় সমসাময়িক সেখানে ব্যক্তি পর্যায়ে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়া অসম্ভব নয়। আমরা জানি ইতিহাস বহু অবাস্তবকে বর্জন করে তবে সত্য ইতিহাস হয়। রঙ, রস, আবেগ দিয়ে যত সাজানোই হোক, যা মিথ্যা, আগামীতে তা নিশ্চিতভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবেই । ইতিহাসের কালি এমনই নির্মোহ।

এ প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি ১৯২৩ সালের ১৩ মার্চ এক চিঠিতে শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্রকে লিখছেন, 'আপনি ঐতিহাসিক, আপনাকে এ কথা বলাবাহূল্য যে, ইতিহাস দেশের গৌরব ঘোষণার জন্য নহে, সত্য প্রকাশের জন্য । আপনার ইতিহাসে আমাদের দেশের পাঠকেরা সত্য সন্ধানের কঠিন সাধনা উপলব্ধি করিতে পারিবে ইহাই আমি আশা করি। (সূত্র : যশোর- খুলনার ইতিহাস, প্রথম খন্ড)

১৯৭১ থেকে ২০০৬-বাংলাদেশ অতিক্রম করেছে অনেকটা সময়। যদিও সময়ের এই পথ চলা কখনই খুব মসৃণ ছিল না। ছিল সততই অস্থির, সংঘাত প্রবণ এবং সহিংস। এবং এই সহিংসতা আজ নানা রূপে সমাজের সর্বত্র। তারপরও বাংলাদেশ থেমে থাকেনি। কিন্তু যে আশায় বুক বেধে ১৯৭১-এ পৌঁছেছিল মানুষ, ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল মানুষ তার সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ এবং বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, তা যেন থমকে থেমে আছে। তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, শোষণমুক্ত, ন্যায় বিচারভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আগামী দিনের সেই সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে যৌক্তিক, পরমত সহিষ্ণু উদার, গণতান্ত্রিক চিন্তাশীল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মী মানুষের প্রয়োজন। তাজউদ্দীন আহমদ আমাদের সামনে তেমনই একজন মানুষ, যিনি একটি কল্যাণমূলক আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে আলোর পথে এগিয়ে যেতে প্রেরণার আলোকবর্তিকা হয়ে পথ নির্দেশ করেন ।

আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে বলেছিলেন, তাজউদ্দীনের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁর সময়ের আগেই এবং তাঁকে বুঝে উঠতে আমাদের এখনও বাকি ।

আমি প্রায়ই ভাবি, কথাটি কত সত্য !

শুরতেই বলেছি, আমার চেষ্টা ছিল একজন সম্পূর্ণ মানুষকে আবিষ্কার করা, তাঁকে জানা । তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা, প্রথম খন্ড সেই চেষ্টারই একটি অংশ। ২২ জনের স্মৃতিচারণ নিয়ে প্রকাশিত হলো এই বইটি। যেখান থেকে জানা যাবে স্কুলের ছাত্র তাজউদ্দীন কীভাবে তৈরি হচ্ছেন ভবিষ্যতের জন্য । হয়ে উঠছেন সমাজ কর্মী থেকে দেশভক্ত রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধের নেতা, প্রধানমন্ত্রী। যুদ্ধদিনের সুবিশাল কর্মযজ্ঞকে ধ্যানীর মত সাধনায় সাফল্যের চূড়ান্তে নিয়ে যাওয়া তাজউদ্দীন । সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একজন সৎ মানুষের স্বচ্ছ ছবি ভেসে ওঠে এখানে।

এই বইটিতে নামের সূচি করা হয়েছে বাংলা বর্ণানুক্রম অনুযায়ী । সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই লেখাগুলির অনুলিখনে ছিলাম হারুন, রুপা এবং আমি। হারুন এবং রূপাকে এ জন্য ধন্যবাদ। তারা রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তিনি শুরু থেকেই এই প্রকাশনার সাথে যুক্ত ছিলেন। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, তাঁর প্রতি রইল শ্রদ্ধা। এ ছাড়াও এই বইটির প্রুফ দেখে দেয়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পেরেছে যাঁদের নিবিড় সহযোগিতায় তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা । বইটিতে ত্রুটি যা রইল; সে দায় আমারই।

সিমিন হোসেন রিমি

ঢাকা

আতাউর রহমান খান

১৯০৫ সনের ৬ মার্চ আমার জন্ম। জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, আমার অতি আপনজন, স্নেহের তাজউদ্দীনকে স্মরণ করছি।

তাজউদ্দীন মানুষ হিসেবে ছিল অনেক বেশি ধীরস্থির এবং স্বাধীনচেতা । সবার সাথে তার সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল ছিল । শুধু ভালই না, সত্যিকার শ্রদ্ধার সম্পর্ক বলা যায়। তাজউদ্দীন মানুষকে অন্তরাত্মা দিয়ে ভালবাসত। ওর ধর্মই ছিল মানুষকে ভালবাসা। ওর বিশ্বাস ছিল, জনগণই হচ্ছে দেশের মালিক, এই জনগণকে যদি ভাল না বাসা যায় তাহলে দেশকে ভালবাসা যায় না—দেশকে ভালবাসার অর্থই জনগণকে ভালবাসা। কাজেই প্রত্যেকটি মানুষের সাথে তার সদ্ভাব ছিল । ১৯৭৩-৭৪-এর দিকে একবার এক বাড়িতে আমার দাওয়াত ছিল, তাজউদ্দীনও ছিল সেখানে। এক দুই কথা বলতে গিয়ে তাজউদ্দীন দুঃখ করে বলল, ‘এই যে এত বড় একটা যুদ্ধ করলাম, নয়টা মাস এতগুলো মানুষ কষ্ট করলাম, দেশকে স্বাধীন করার জন্য সত্যি বলতে গেলে একহাতেই সব কিছু করতে হল; কিন্তু মুজিব ভাই একদিনও একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না কীভাবে কী করলাম, কেমন করে করলাম! একটা মানুষের তো কৌতূহল অন্তত হয় ? তাঁর ভেতরে এই বিষয়ে আগ্রহ, কৌতূহল কিছুই ছিল না।' অনেকটা আত্মগতভাবে আপনমনে কথাগুলো বলে গেল তাজউদ্দীন। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ‘দুঃখ করে আর কী করবে!'

তাজউদ্দীন মনেপ্রাণে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল । বাকশাল প্রসঙ্গে মুজিবকে বলেছিল, ‘জনগণ আমাদেরকে ভোট দিয়েছে। আমরা জনগণের ভোটেই দাঁড়িয়ে আছি।

এটাই গণতন্ত্র । আর আপনি এই গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে চাইছেন বাকশাল করতে ? বাকশাল করার জন্য জনগণ আমাদেরকে ভোট দেয়নি। জনগণ ভোট দিয়েছিল সংবিধান তৈরি করার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য। জনগণের ভোটেই গণতন্ত্র স্থাপিত হবে। আমরা চাই সেই গণতন্ত্র। একনায়কতন্ত্র চাই না ।'

তাজউদ্দীন বলেছিল, 'আমরা ১০৬ জন সদস্য বাকশালের বিপক্ষে মতামত দেব । প্রয়োজনে সংসদ থেকে বের হয়ে আসব।' আমি বললাম, ‘পারবে

না বের হয়ে যেতে। শেষ পর্যন্ত দেখবে যে তুমি ছাড়া আর কেউ বের হয়নি।' তারপর যখন বাকশালের প্রস্তাব করা হল তখন কেউ বের হল না, তাজউদ্দীনও না । পরে তাজউদ্দীনকে বললাম, 'মিয়া, তোমার তো উচিত ছিল বের হয়ে আসা, তুমি বলেছিলে ১০৬ জন প্রতিবাদ করবে, প্রয়োজনে বের হয়ে আসবে, কিন্তু কিছু করলে না কেন ?'

উত্তরে তাজউদ্দীন বলে, 'ভাইসাহেব, একটা গল্প বলি, শোনেন। আমাদের গ্রামে একজন মৌলভী সাহেব ছিলেন। খুব ভাল মওলানা। একদিন গ্রামে একজন ফকির এল। এই ফকির মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব বলতে আরম্ভ করলে অনেক মানুষ তার চারপাশে ভিড় করল নিজেদের ভাগ্যের কথা জানতে । কিন্তু একমাত্র মওলানা সাহেব ওই ফকিরের কাছে যান নাই দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মওলানা সাহেব, আপনি গেলেন না ? মওলানা বলেন, না ভাই, আমি যাবো না । আমি বললাম, কেন যাবেন না ? মওলানা বলেন, জীবনে অনেক সময় আমি অনেক অন্যায় করেছি। এমনকি রাতের বেলায় চুরি-ছ্যাচড়ামিও কিছু করেছি। যেমন, মানুষের গাছের আম, বিশেষ করে কাঁচা-মিঠা আম না বলে চুরি করেছি। খেত থেকে মরিচ তুলে নিয়ে এসেছি। এই সমস্ত কাজ তো করেছি, এখন যদি ওই ফকির সব বলে দেয় তাহলে তো আমার আর চাকরি থাকবে না । কাজেই আমি ভয়ে ফকিরের কাছে যাই নাই।' এখানেই গল্পের ইতি টেনে তাজউদ্দীন বলল, ‘গল্পটা বললাম এই জন্য যে, বাকশালের বিপক্ষে যে ১০৬ জনের প্রতিবাদ করার কথা ছিল তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু দোষক্রটি রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। যদি ওরা আমার সাথে এসে বাকশালের বিরোধিতা করে কথা বলত তাহলে মুজিব ভাই প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই সেই তালিকা ধরে একটা বিচারের ব্যবস্থা করাতেন। এই ভয়েই কেউ কোন প্রতিবাদ করল না । সবাই নিজের মধ্যেই পালিয়ে রইল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওরা কি করবে। জবাব হল, ভয় করি। আমাদের মাথার ওপর তলোয়ার ঝুলছে, বলা যায় না কোন সময় মাথায় ফেলে দেয়, কাজেই নিশ্চুপ থাকা ভাল ।'

পরে আমি নিজে যখন বাকশালে যোগ দেই তার আগে তাজউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তুমি এ ব্যাপারে কী বল ? দেশে তো রাজনীতির সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে, রাজনীতি বলতে আর কিছু থাকবে না । ভাবছি এখন যদি বাকশালে যোগ না দেই তাহলে আমি আউট অব পলিটিকস্ হয়ে যাই। আমার আর রাজনীতি বলতে কিছু থাকবে না ।'

তাজউদ্দীন বলে, 'আপনি যাবেন না। কেন যাবেন আপনি ? এখন পথ বন্ধ হল তাতে কী, ভয়ের তো কোন কারণ নেই। নাই বা করলেন এমন রাজনীতি, আপনি যাবেন না ।'

তাজউদ্দীনের নিষেধ সত্ত্বেও আমি বাকশালে যোগ দিলাম । পরে একদিন হাসতে হাসতে তাকে বললাম, 'তাজউদ্দিন, তুমিও তো এখানেই আছ ?'

সে বলে, 'আমি দল করি। আমার এই দল ছেড়ে আমি যেতে পারি না, তাই আছি। কিন্তু আপনি গেলেন কেন ? আপনারা তো অন্য দলের মানুষ, আমাদের দলের না।' তাজউদ্দীন বলে, 'বাকশাল সামান্য কয়দিনের জন্য, এটা থাকবে না। মুজিব ভাই ঝোঁকে চলছেন। রাশিয়া এবং বিভিন্ন লোকের বুদ্ধিতে বাকশালটা করানো হয়েছে। কিন্তু এটা বেশি দিন থাকবে না। টিকবে না। দেখবেন ক'দিন পরেই। এইভাবে দেশ চললে দেখবেন সামনে কী হয়। আমরাও থাকব কিনা জানি না!' আলাপকালে তাজউদ্দীন প্রায়ই দুঃখ করে বলত, ''আমি যে রকম করতে চাই মুজিব ভাই সেভাবে কাজ করতে দেয় না। বাধা দেয়।' তাজউদ্দীনের মনে অনেক দুঃখ ছিল।

মনে আছে, ওআইসি সম্মেলনে লাহোর যাবার আগে শেখ মুজিবুর রহমান বলল, 'ভারত হয়ে যাই, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে একটু দেখা করে তারপর যাব।' তাজউদ্দীন বলে, 'কেন, আপনি কেন ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে যাবেন ? আপনি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী, আপনি কেন কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন ? আপনি কেন অন্যের কাছে মাথা নিচু করবেন ?'

তখন মুজিবুর বলে, ''ঠিক আছে, আমি সরাসরিই চলে যাব।'

তাজউদ্দীন বলে, 'মুজিব ভাই, আপনি তাই করেন, এতে আপনার মানসম্মান থাকবে ।'

অর্থাৎ সে যেটা মনে করত এতে ভাল হবে, বুঝত যে এই কাজে মঙ্গল আছে, তা সে সামনাসামনি বলে ফেলত। ভয় করত না। ভয় করার কথা চিন্তাও করত না । তার মনে অত্যন্ত সাহস ছিল—সাংঘাতিক স্বাধীনচেতা মানুষ। কিন্তু বেচারা পেরে ওঠে নাই । সত্যের পথে তাকে কেউ সাহায্য করে নাই । মুজিবুরকে সবাই ভয় পেত, তাই ভয়ে কেউ তাজউদ্দীনকে সমর্থন করে নাই। করলে তাজউদ্দীনের অবস্থা অন্য রকম হত। তাজউদ্দীনের ওপর হস্তক্ষেপ করা, স্বৈরাচারী ভাব, এগুলো তাজউদ্দীন মানত না বলেই শেষ পর্যন্ত

তাকে সরিয়ে দিল। তাকে রাখলই না, বাদ দিয়ে দিল ।

মন্ত্রিসভা থেকে চলে আসার পর তাজউদ্দীন বলে, ‘ভালই হয়েছে, আমি রক্ষা পেয়েছি। মানুষটা আমাকে দিয়ে যা খুশি তাই করাতে চায়। আমি মন্ত্রিসভায় থাকি বা না থাকি তাতে আর কিছু এসে যায় না। আমি তাজউদ্দীন, তাজউদ্দীন হয়েই বেঁচে থাকব, আমি মন্ত্রী হয়ে বাঁচতে চাই না।' এই-ই ছিল তার স্বভাব। অন্তঃকরণটা খুব বড় ছিল। সাহসী আর স্বাধীন ছিল মন ।

মনে আছে, যখন সে আর মন্ত্রী নেই, একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “বল তো ঘটনাটা কী ?

সে বলে, 'আমার বিরুদ্ধে তো অভিযোগ আছে। মুজিব ভাই চায় আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ বেশি করতে। আর আমি চাই না ।'

আমি তাজউদ্দীনকে বললাম, ‘যাই বল না কেন, তুমি একটা কাজ ভুল করেছ। তুমি শুরুতেই বলে দিলে, আমেরিকার কোন সাহায্য আমরা নেব না। এটা ঠিক হয়নি।'

তাজউদ্দীন বলে, ‘দেখেন, এই অগ্রিম বলে দেয়ায় ভাল হয়েছে। তা না হলে ওরা আমাদের উপর জাঁকিয়ে বসত। আমরা বিদেশী সাহায্য ততটাই নেব যতটা আমাদের প্রয়োজন এবং সত্যিকার অর্থে যেটা আমরা কাজে লাগাতে পারব । আমাদের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ প্রকল্পের ওপর যদি সাহায্য করে এবং শর্তহীন সাহায্য দেয় তবে আমরা সাহায্য নিতে রাজি আছি । এই হল আমার নীতি । দান, ঋণ এমনি এমনি ওদের ইচ্ছায় দেবে আর আমরা নেব, তা হবে না । আমাদের প্রয়োজনে শর্তহীন সাহায্য নেব, এছাড়া সাহায্য নেব না। মুজিব ভাই বসে আছেন, আমেরিকা সাহায্য দেবে, তা দিয়ে আমরা দেশ উন্নত করব! কিন্তু তা কেন ? আমরা স্বনির্ভর হতে চাই। স্বনির্ভর হতে গেলে নিজেরা কষ্ট করে যে প্রকারেই হোক ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশকে উন্নত করব, আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হব। সেই চেষ্টা না করেই কেন আমরা সাহায্য নেব!' তাজউদ্দীন স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ ও সত্যিকার শুদ্ধ, সৎ সমাজের কথা চিন্তা করত। বলত, দেশ কোন কারণেই পরনির্ভরশীল হবে না। সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাসসহ মৌলিক সব বিষয়েই স্বাধীন, স্বচ্ছ ও মুক্ত হবে সমাজ ।

অনেকে মনে করত তাজউদ্দীনের বোধ হয় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ

আছে। কিন্তু এই কথাটি ঘোরতর মিথ্যা। আমার সাথে তার পরিচয় সে যখন স্কুলছাত্র সেই সময় থেকে। আসলে সে সবার সাথে মিশতে পারত।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় মওলানা ভাসানীর সাথে হাতির পিঠে চড়ে আমি কাপাসিয়াতে গিয়েছিলাম । হাতি যখন আমাদেরকে নিয়ে গজারির জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল তখন আমি ভাসানী সাহেবকে বলেছিলাম, 'জঙ্গলের রাজা বাঘ আসতে পারে যে কোন সময়, কারণ আমরা ওদের রাজ্যেই ঢুকেছি।' ভাসানী সাহেব বললেন, "চলেন দেখা যাক কী হয়।' সেই নির্বাচনে তরুণ তাজউদ্দীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদককে পরাজিত করে বিজয়ী হয় । এক কথায় তাজউদ্দীনের মত রাজনীতিবিদ আমি আমার এই জীবনে দেখিনি । সত্যিকার অর্থে একজন রাজনীতিবিদ বলতে যা বোঝায় সে তাই ছিল। তাজউদ্দীন ছিল সর্বগুণে গুণান্বিত একজন মানুষ ।

মনে আছে '৭৫ সালের নভেম্বর মাসে আমি যখন তাকে শেষবারের মত দেখতে গেলাম, বুকফাটা কান্নায় মৃতদেহের দিকে তাকাতে পারিনি। সেই দৃশ্য দেখা আমার সহ্যক্ষমতার বাইরে ছিল। জেল হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। বিশ্বের কোথাও এমন ঘটনা ঘটেনি। শুনতে পাই, তাজউদ্দীনসহ চারজনকে হত্যা করার জন্য প্রেসিডেন্ট মোশতাকের নির্দেশে কয়েকটা সেপাই জেলখানায় গিয়েছিল।

[১৪.৮.১৯৯০]

আতাউর রহমান খান : রাজনীতিক । তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। পরে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আরহাম সিদ্দিকী

আমি সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে পড়তাম। তাজউদ্দীন সাহেবও সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে পড়তেন। সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে সেই সময় প্রায় ৯৫ ভাগ হিন্দু ছাত্র ছিল। যেমন আমাদের ক্লাসে ১২৩জন ছাত্রের মধ্যে আমরা ৪জন মাত্র ছিলাম মুসলমান ছাত্র । মুসলমান ছাত্ররা সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে বেশি একটা পড়ত না। তাজউদ্দীন সাহেব খুব ভাল ছাত্র ছিলেন । আমিও খুব ভাল ছাত্র ছিলাম । তিনি ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পাস করে বেরিয়ে যান। আমি ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করি। সেই হিসেবে তাঁর সাথে আমার ব্যবধান তিন বছরের। স্কুলে থাকার সময়ে তিনি আমাকে প্রায়ই ডেকে নিতেন এবং লেখাপড়ায় উৎসাহ দিতেন। তখন আমাদের সম্পর্কটা দু'জনের পরিচয় জানা এবং কুশল বিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । তবে আমি জানতাম, তিনি তখন থেকেই রাজনীতি করেন। হিন্দু ছেলেরা ওই সময়টাতে খুব রাজনীতি করত। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তিনি ম্যাট্রিক পাস করার আগে থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িত, সে জন্য আমি তাঁকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতাম। তাঁর সম্পর্কে আরও শুনতাম যে, তিনি উচ্চ পর্যায়ের ছাত্রদের সঙ্গে রাজনীতি করেন।

তারপর কয়েক বছর তাঁর সাথে হঠাৎ দু-একবার দেখা হওয়া ছাড়া আর কোন যোগাযোগ হয়নি। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পড়ছি তখন তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। রাজনীতির জন্য তাঁর ধারাবাহিক লেখাপড়ায় সাময়িক ছেদের কারণে আমরা দু'জন তখন সহপাঠী। এইভাবে আবার কিছু জানাশোনা এবং যোগাযোগ। অনার্স ফাইনালের পর আবার কয়েক বছর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

এরপর লেখাপড়া শেষ করে আমি আইন ব্যবসা শুরু করলাম। সেখানে আব্দুল মোমিন সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয়। এটা ১৯৫৮ সালের কথা। মোমিন সাহেবই আমাকে তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে আবার নিয়ে গেলেন । তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে দেখে বললেন, 'আরহামকে নিয়ে এসেছেন, সে জমিদারের ছেলে, এত কষ্ট করে রাজনীতি করতে পারবে নাকি ?' আমি বললাম, 'আমি তো এই পথের কিছু জানি না, তবে সঙ্গে থেকে দেখতে পারি পারব কিনা।' তখন তিনি বললেন, "ঠিক আছে।'

এই আমার তাঁর সাথে থেকে চলার শুরু। মোমিন সাহেবের সঙ্গেও যেতাম,

আবার মাঝে মাঝে আমি একাই চলে যেতাম। তাঁর কাছে বসতাম, জিজ্ঞাসা করতাম । এইভাবে মোটামুটি সবার সাথেই পরিচয় হয়ে গেল । বঙ্গবন্ধুর সাথেও ভাল পরিচয় হয়ে গেল। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি যদি রাজনীতি কর, তবে তাজউদ্দীনের সাথে থেকে দেখেশুনে কাজ করবে।' তারপর তো রাজনীতির সাথে জড়িয়ে গেলাম। থানা কমিটির সভাপতি হলাম। পরবর্তীতে সেন্ট্রাল কমিটিরও সদস্য করে নেয়া হয় আমাকে । এইভাবে রাজনীতির মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে আমার সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল।

তাজউদ্দীন সাহেবকে আমি দেখেছি অত্যন্ত সৎ এবং আন্তরিক মানুষ হিসেবে। তিনি যে জিনিসটাকে বিশ্বাস করতেন সেটাকে খুব গভীরভাবেই বিশ্বাস করতেন । তিনি আমাদেরকে তাঁর মতের বিপক্ষে বলার জন্য আহ্বান জানাতেন । বলতেন, আমার বক্তব্যে একমত না হলে আপনাদের যা বলার আছে বলেন । যুক্তি দিয়ে যদি আমাকে বোঝাতে পারেন তা হলে মেনে নেব। আর যদি যুক্তিতর্কের পর বোঝা যায় আমার সিদ্ধান্তই ঠিক তাহলে যে পদ্ধতিতে আমি কাজটা করছি সেভাবেই আপনাদের মেনে নিতে হবে। তিনি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা বলতেন, যেটা আমাদের পক্ষে না মানা ছিল কঠিন। আমাদের চিন্তাধারাগুলোও প্রকাশ করার যথেষ্ট সুযোগ তিনি দিতেন। তবে রাজনীতিক হিসেবে তো তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং পরিষ্কার ধারণার মানুষ ছিলেন । কাজেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর কাছ থেকে আমি শিখতে চেষ্টা করতাম। তাঁকে উপদেশ বা পরামর্শ আমার খুব একটা দেয়া হয়নি। অবশ্য পরবর্তীতে আমি যখন মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আমার যুক্তি তুলে ধরতাম তখন তিনি ছোটখাট ত্রুটি শুধরে দিয়ে সেসব মেনে নিতেন।

তাজউদ্দীন সাহেব ইংরেজিতে খুব সুন্দর লেখালেখি এবং খসড়া করতেন। আমারও ইংরেজিতে খুব ভাল দখল ছিল । তিনি সেটা জানতেন। সে কারণেই হয়ত অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট শব্দের কয়টি প্রতিশব্দ আমি বলতে পারি তা জিজ্ঞাসা করতেন । বলতেন, 'এই শব্দের ৩/৪টি প্রতিশব্দ বলুন, যেটা একেবারে সঠিক বলে মনে হবে সেটাই আমি বক্তব্যে লিখব।' সবসময়ই লক্ষ্য করতাম যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর নামে যেসব বক্তব্য ও বাণী লিখতেন তা অবশ্যই তাঁর নিজের জন্য লেখা বক্তব্যের চাইতে আরো ভাল এবং সুন্দর করে লিখে দিতেন। শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনখানে সামান্যতম ভুল হল কিনা অথবা কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ আছে কিনা, সেসব ব্যাপারে তিনি

সবসময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। সে কারণেই কিছু লিখতে গেলে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শব্দ বাছাই করে তবে তিনি লিখতেন । তাজউদ্দীন সাহেবের এই দিকটা নিঃসন্দেহে অন্যের চেয়ে খুব আলাদা এবং এটা আর কারো ভেতরে দেখেছি বলে মনে হয় না । নিখুঁতভাবে কাজ করার জন্য তাঁর যে প্রবণতা সেটা সত্যি বিস্ময়ের ব্যাপার ।

স্বাধীনতার আগে তাজউদ্দীন সাহেব স্পষ্ট করে বলতেন, আমাদের যা প্রাপ্য সেসব পশ্চিম পাকিস্তানিরা এমনি এমনি আমাদের হাতে তুলে দেবে তা অসম্ভব এবং কোন সমঝোতার মাধ্যমেও এই দাবি আদায় করা সম্ভব নয়। একমাত্র সম্পূর্ণ আন্দোলন এবং যুক্তির ভেতর দিয়েই আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। এতে কে বাঁচবে, কে মরবে, কে কী করবে, সেসবও তিনি বলতেন ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে যখন আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে বিজয়ী হল, তখন তাজউদ্দীন সাহেব বললেন যে, এখন ওদের ওপর একটা প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু তারা আমাদের হাতে কোন কিছু তুলে দেবে না। তিনি আরও বললেন, '৪৭ সালের পর থেকে পাকিস্তানে একে একে যে পটপরিবর্তন হয়েছে সেখানে কিন্তু কোন অবস্থাতেই তারা কোন রকম সমঝোতা করেনি। আমাদের ব্যাপারে পশ্চিমের মনোভাব কোনদিনই সুখের ছিল না। এই অবস্থায় ওদের সাথে যদি স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আমাদের একটি সমঝোতা হয়, তবু তারা আমাদের হাতে সম্পূর্ণ শাসনভার তুলে দেবে না। এখানকার অর্থনৈতিক যে অবস্থা তাতে করে যতটুকু পর্যন্ত দেয়া সম্ভব, সেটাই তারা দেয়ার চেষ্টা করবে। সমতার কথা মুখে যতই বলুক, কার্যক্ষেত্রে সেটা তারা মানবে না ।

কিন্তু সেই সময়ে আমিসহ প্রায় সবারই ধারণা ছিল, নির্বাচন হয়েছে, এত বড় বিজয়, নিশ্চয় তারা আমাদের হাতে এখন ক্ষমতা দিয়ে দেবে। তারপর যখন এখানে কথাবার্তা হতে থাকল তখন আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে, তাজউদ্দীন সাহেবের কথা বোধ হয় ততখানি সঠিক নয়। হয়ত কিছু ফলাফল হলেও হতে পারে। কিন্তু পরে গিয়ে দেখলাম তাঁর কথাটাই ঠিক। আমার মনে একটা প্রশ্ন হত যে, এত জোর দিয়ে তিনি বলেন কীভাবে ? তখনও তো আমরা দুই দিক মিলে একই দেশ । সেই সময় স্বাধীন বাংলাদেশ হবে এরকম চিন্তা কোন অবস্থাতেই কোনভাবেই আমরা করিনি । অবশ্য তাজউদ্দীন সাহেবও দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে এইভাবে সরাসরি আমার কাছে

খুব একটা খুলে বলেননি। তিনি এইভাবে বলতেন যে, স্বায়ত্তশাসন কতটুকু দেবে, আদৌ শাসনক্ষমতা দেবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। তাঁর ভেতরের ধারণা যে, ওরা কি এত সহজেই দিয়ে দেবে ? এই জায়গা থেকে এতকিছু খাচ্ছে, এতকিছু নিচ্ছে, সেটা কি মুখের কথাতেই দিয়ে দেবে ? এর পিছনে কিছু একটা ব্যাপার থাকতে পারে বলে আমার ধারণা । এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের আন্দোলন যখন চলছে তখন কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব এর পাশাপাশি দেশটার অর্থনীতি নিয়ে অনবরত চিন্তাভাবনা করছেন। পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির লক্ষ্যে এর সম্ভাবনা, সমস্যা এবং সাফল্য নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা এবং বিশ্লেষণ করতেন।

তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন । সমস্ত দেশের বিভিন্ন ধরনের লোকজনের আসা-যাওয়া ছিল তাঁর কাছে। তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা করতেন তিনি। বিশেষভাবে আমাদেরকে বলতেন, শুধু স্বায়ত্তশাসন পেলেই বাঁচা যাবে না। স্বায়ত্তশাসন পেয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে। কিভাবে তা হবে, কিভাবে আমরা বেঁচে থাকবার মত গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিজেদেরকে নিয়ে যেতে পারব সেই বিষয়ে তিনি তাঁর মতামত দিতেন ।

তাজউদ্দীন সাহেব বলতেন, আমাদের দেশটা হল কৃষিভিত্তিক দেশ। আমাদের কৃষি থেকে যে জিনিসগুলো হয় তা থেকেই যদি আয় এবং লাভটা না আসে তাহলে পূর্ব পাকিস্তান কোনক্রমেই আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না। পাটকে কৃষি খাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বলে উল্লেখ করে তিনি বলতেন যে, পাটের পরিবর্তে যে সমস্ত সিনথেটিক এবং অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করা যায় সেগুলোর দিকে মানুষ যাতে আকৃষ্ট না হয় সে জন্য পাট খাতটার দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে একে পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা যদি না করতে পারি তা হলে ভারতে পাট উৎপাদন বাড়বে, আমাদের বাজার ছোট হয়ে যাবে; সাথে অন্যান্য দেশও যদি পাট উৎপাদন শুরু করে তাহলে আমাদের যে মনোপলি আছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। মনোপলি না থাকলে, রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে আয়ের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে অর্থনৈতিক উন্নতিটা কীভাবে হবে ? আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা না করতে পারলে ঘাটতি পোষাতে বাড়তি টাকা কোথায় পাব ? শুধু ধারদেনা করলে তো চলবে না, কারণ এক সময় তো সেই ধারও মিটিয়ে ফেলতে হবে । না হলে তো দেশের নীতি-আদর্শই থাকে না ।

তিনি বলতেন, অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আমাদের চারপাশে যে দেশগুলো আছে সেইসব দেশের সাথে যদি আমাদের বাণিজ্যটা বেশি হয় তাহলে আমাদের সুবিধাটা বেশি হবে । এই ক্ষেত্রে জিনিস আনা-নেয়ার খরচটা কম হলে পণ্যের দাম কম পড়বে, মানুষের টিকে থাকাটা সহজ হবে। যেমন কয়লা— আমি ভারতের উপর রাগ করে বললাম যে, ভারতের কয়লা নেব না। রাগটা আমি হয়ত রাজনৈতিক কারণে করলাম, কিন্তু অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে আমাদের রাগ করাটা চলে না। আমি অস্ট্রেলিয়া বা অন্য কোন দেশ থেকে যদি কয়লা আনতে চাই তবে সে ক্ষেত্রে দূরত্বের কারণে যে পরিবহন খরচটা প্রয়োজন শুধুমাত্র সেই পরিবহন খরচ দিয়েই তো আশপাশের দেশ থেকে সম্পূর্ণ জিনিসটা নিয়ে আসতে পারি। যেখানে সুস্থভাবে খেয়েপরে বেঁচে থাকার অবস্থায় আমরা নেই, সেখানে তো আমাদের সব সময় চিন্তা করতে হবে কীভাবে আমরা এই অবস্থার উন্নতি ঘটাব, কীভাবে আমরা কম দামে জিনিস এনে তা মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে পারব। এভাবেই আস্তে আস্তে আমাদের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হবে।

তিনি বলতেন, জমি সীমাবদ্ধ । জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে স্বায়ত্তশাসনই আসুক বা যাই আসুক, অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। আরও বলতেন, আমরা আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের একটা বাজার। ওরা যে জিনিসগুলো তাদের শিল্প কারখানায় তৈরি করছে তা এখানে বিক্রি করছে। আমাদের এই দিকে শিল্প গড়বে মনে হয় না । ক্লাজেই আমাদের হাতে যদি ক্ষমতা আসে তখন আমরা কী কী করব এবং অর্থনীতিকে সম্ভাবনাময় করতে যে সমস্ত জিনিস দরকার তারও একটা হিসাব রাখতে হবে। আমাদের এইদিকে প্রপার মানি-মার্কেট নেই। সেটাও থাকতে হবে। অর্থাৎ, তিনি অর্থনীতির প্রতিটি পয়েন্ট নিয়ে আলাপ করতেন। সব সময় বলতেন, অর্থনীতির দিকটা চিন্তা না করলে একটা দেশ বাঁচতে পারে না। তাজউদ্দীন সাহেব নিয়মিত অর্থনৈতিক জার্নাল, বই-পুস্তক পড়তেন। মাঝে মাঝে কোন জার্নাল পড়ে লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে বলতেন, 'এটা পড়ে আসবেন। এই বিষয়ের উপর আলোচনা করব।' আবার হয়ত কখনও কোন আলাপ করছি, মুহূর্তেই টান দিয়ে কোন বই বা পত্রিকা নিয়ে এসে তা থেকে পড়ে শুনিয়ে বলতেন, 'শুধু মুখে বললে হবে না, নিয়মের মধ্যে আছে কিনা তা জানতে হবে।' বলতেন, 'এখানে পড়েন, দেখেন কী আছে।' যাঁরা একটু পড়াশোনায় আগ্রহী ছিলেন তাঁদেরকে তিনি

পছন্দ করতেন। তাজউদ্দীন সাহেবের একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই ছিল দেশটা কিভাবে চলতে পারে। আর স্বাভাবিকভাবেই তাঁর যে লেখাপড়া, গভীরতা, চিন্তাধারা তা আমাকে ভীষণ আকৃষ্ট করত। আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত আর এমন মানুষ দেখব বলে মনে হয় না ।

'৭১ সালের মার্চে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল তখন একটা সেল করা হল। কোন্ কোন্ সেক্টর কীভাবে কাজ করবে, কতটুকু করবে এই যে নির্দেশনাগুলো সেই সেল থেকেই দেয়া হত। তাজউদ্দীন সাহেব এই সমস্ত নির্দেশনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমি ওই সময় দেখেছি দিনরাত পরিশ্রম করে তিনি কীভাবে কাজগুলো এগিয়ে নিচ্ছিলেন ।

আর এদিকে যখন রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা চলছে, বাইরে থেকে আমরা মনে করছি অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে যখন আলাপ করেছি তিনি তখন বললেন, 'আলাপ-আলোচনা চলছে, তবে আমার যেন মনে হচ্ছে তারা আন্তরিক নয়। মনে হয় না যে শুধু বললাম আর দিয়ে দিল, এমনটা করবে। আমার কেন জানি ধারণা যে ওরা আমাদেরকে ক্ষমতা দেবে না ।'

মার্চের ২০ তারিখের দিকে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে বলেছিলেন, ঘটনা যদি অন্য দিকে মোড় নেয় তবে তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাবেন। আমি তখন তাঁকে বলেছিলাম, 'আমি কি সে রকম কোন জায়গার ব্যবস্থা করব ?' তিনি এতে সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন, 'ব্যবস্থা করতে পারেন।' ২৫ তারিখ রাতে আমি যখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তখনও তিনি বললেন চলে যাবেন। এই কথা শুনে বঙ্গবন্ধুকে আমি জানালাম যে, তাঁর কথামত আমি একটি জায়গার ব্যবস্থা করেছি। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'মোমিন সাহেব বাইরে গেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলে নেন ।'

একটু পরেই মোমিন সাহেবের সঙ্গে কথা হল । তাঁকে বললাম, 'বঙ্গবন্ধু আপনার সাথে আমাকে আলাপ করতে বলেছেন।' মোমিন সাহেব আমাকে বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নাই। আপনার গাড়িতে আমাকে এক্ষুণি বাসায় পৌছে দিয়ে আপনি নিজের বাসায় চলে যান।' মোমিন সাহেব আমাকে জিগাতলায় তাঁর বোনের বাসায় যেতে বললেন। তাঁর বোনের বাসায় গাড়ি থেকে তাঁকে নামতে দেখে আমি বললাম, 'এখানে নামছেন কেন?' তিনি

আমাকে বললেন, “আলাপের সময় নাই। আপনি তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যান এবং গুলশানে আপনার নিজের বাড়িতে না থেকে শ্বশুরবাড়িতে চলে যান ।' তখন আমি তাড়াতাড়ি গুলশান গিয়ে আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে পুরনো ঢাকায় শ্বশুরবাড়িতে চলে গেলাম ।

সেই রাতেই পাকিস্তানি আর্মির ক্র্যাকডাউন শুরু হল। পাকিস্তানি আর্মি ঢাকার অন্যান্য স্থানের মত নয়াবাজারেও আগুন লাগাল। বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে সব দেখলাম। পাকিস্তান আর্মির হাত থেকে পালিয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি করছি, এরই মধ্যে শুনলাম, তাজউদ্দীন সাহেব সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেছেন। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার কোন উপায় ছিল না। ভাবলাম, এইভাবে না থেকে চেষ্টা করে দেখি কোথাও যাওয়া যায় কিনা। এরই মধ্যে আমি ১৭ এপ্রিল তাজউদ্দীন সাহেবের বক্তৃতা রেডিওতে শুনলাম। ঠিক করলাম কুষ্টিয়া যাব । পথঘাট ঠিকমত জানা নেই, এক পর্যায়ে বগুড়া গেলাম। সেখান থেকে হিলি যাবার পথে দু-তিনজন এমপি-র সঙ্গে দেখা হল। সিরাজগঞ্জের এমপি আব্দুল মমিন তালুকদার, মানিকগঞ্জের সিদ্দিক আহমদ এবং আবুল খায়ের। আমরা একসাথে সীমান্ত অতিক্রম করি এবং কলকাতা যাই। সেখানে বেশ কয়েকদিন এখানে ওখানে থাকার পর তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হল । তিনি আমাকে কিছু কাজের দায়িত্ব দিলেন। ৮ থিয়েটার রোডে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। কিছুদিন পর আমাকে অন্য কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। ওই দায়িত্ব নিয়ে আমি, গাজী গোলাম মোস্তফা এবং ময়েজউদ্দীন সাহেব আগরতলায় গেলাম । সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া করে ঢাকার আশপাশের কিছু লোকের থাকার ব্যবস্থা করলাম। এরা নিয়মিত খবর নিয়ে দেশের ভেতরে, বিশেষ করে ঢাকায় যেত । তাজউদ্দীন সাহেব যেভাবে নির্দেশ পাঠাতেন সেভাবেই কাজ হত । তিনি সবসময় আমাদেরকে একে অপরের সাথে সমন্বয় রেখে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে বলতেন। আগরতলার দায়িত্ব শেষ হলে আমি আবার সম্ভবত অক্টোবর- নভেম্বরের দিকে কলকাতা ফিরে যাই ।

তাজউদ্দীন সাহেবকে আমি বিভিন্ন সময়ে দেখেছি। কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাঁকে এবং তাঁর কাজের ধরন দেখা ছিল আমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। সে সময় তিনি এত বেশি একনিষ্ঠভাবে কাজ করতেন যে নিজের চোখে দেখার পরও তা ছিল আমার চিন্তার অতীত। আমি তাঁকে এমনও দেখেছি যে, পরদিন খুব ভোরে কারো সঙ্গে তিনি দেখা করবেন

অথবা দেখা করতে যাবেন, তাই একমাত্র শার্টটি রাতে নিজে ধুয়ে বাথরুমে শুকাতে দিয়েছেন। আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাথরুমে ওটা কী ঝুলছে?' তিনি বললেন, 'এটা ধুয়ে না শুকালে কাল কী পরে বাইরে যাব!' তিনি প্রধানমন্ত্রী, অথচ তাঁর একটিমাত্র কাপড়—এ কথাটি আগে তো চিন্তা করিনি। আমার নিজের দুটি প্যান্ট ছিল, খুব ভাল না, তবুও তো দুটো। আমি পরদিনই কাপড় কিনে তাঁর জন্য শার্ট-প্যান্ট বানিয়ে দিলাম ।

তাজউদ্দীন সাহেব কলকাতায় সরকারি কার্যক্রম চালাবার জন্য একটি পুরোপুরি সচিবালয়-ব্যবস্থা স্থাপন করে ফেলেছিলেন। ক্যাবিনেট, সংস্থাপন, অর্থ, ত্রাণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি আলাদা আলাদা বিভাগ। নিয়মমাফিকভাবে একটা দেশ চালাবার জন্য যা প্রয়োজন তা হয়ত সেখানে ছিল না, কিন্তু যেটকুই ছিল সেটাকেই তিনি সর্বোচ্চ ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন ।

আর একটি ব্যাপার না বললেই নয়, সেটা হল, মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস তিনি পরিবারের সাথে বসবাস করেননি। এমনকি ছেলের কঠিন অসুখের সময় বাসায় যেতে অনুরোধ করলে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আপনারা যদি এইসব আলাপ করতে আসেন তাহলে তো দেশ স্বাধীন করে ফিরে যাওয়ার দরকার নাই । সোহেলকে নিয়েই আমি থাকি, আমার জন্য এইখানে একটা বাড়িঘর করে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করেন। ভারত যদি আপনাদেরকে রাখার জন্য রাজি থাকে তাহলে সেই সংস্থান করে এখানেই থাকেন। সোহেলের মত তো কত ছেলে আমার চারদিকে । তাই এটা নিয়ে আমার সঙ্গে আলাদাভাবে আলাপ করার প্রয়োজন নাই।' এই কথাটা তিনি যখন আমাকে বলছেন, তখন ওই মুহূর্তে আমার শ্রদ্ধা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলতে পারি না। তাঁর একনিষ্ঠতা আমি তো দেখেছি। নিজের চোখে দেখেছি, কত রকমের প্রতিকূল অবস্থার ভেতরে থেকে তিনি সমস্ত বিষয়ের সমাধান করে যুদ্ধটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেলেন যে, আমরা স্বাধীনতা পেলাম, দেশে ফিরে আসবার সুযোগ পেলাম। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, হয়ত তাজউদ্দীন সাহেবের একনিষ্ঠতার কারণেই আমাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ভারত মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছে। না হয় আমাদের মধ্যে যে গোলমাল-কোন্দল ছিল তা যদি তুঙ্গে নিয়ে তোলা হত তাহলে ভারতই বা কী করত সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

দেশ স্বাধীন হবার দুই বছর দশ মাসের মাথায় হঠাৎ একদিন তাজউদ্দীন

সাহেবকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করা হল । আমি এ খবর শোনার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বাসায় গেলাম। অনেক লোকজন বাসায় ভর্তি। আমরা কয়েকজন তাঁকে উপরতলায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার, হঠাৎ এই ঘটনা ?' তিনি বললেন, 'এটা তো প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা। তিনি যখন খুশি তখন যে কাউকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে পারেন এবং নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন। আপনারা কেন আমাকে এই প্রশ্ন করছেন ? এটা প্রশ্ন করার মত কোন বিষয় না । মন্ত্রিসভার উপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার আছে।'

তাজউদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে এই কথা শুনে আমি এবং ময়েজউদ্দীন সাহেব সোজা বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলাম। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কী খবর ?' আমি বললাম, 'তাজউদ্দীন সাহেবকে তো আপনি আজকে পদত্যাগ করতে বলেছেন।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'হ্যাঁ, ওকে সরিয়ে দিয়েছি, কী হয়েছে তাতে! চট্টগ্রামের নূরুল ইসলাম (সেই সময় মন্ত্রী) আমাকে বলেছে, তাজউদ্দীন নাকি একটা দূতাবাসে গিয়ে নানা ধরনের উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলেছে।' আমি সাথে সাথে বললাম, 'বঙ্গবন্ধু, আপনি কি এটা যাচাই করেছেন ?' উনি বললেন, 'না, তা তো করিনি।' তারপর উনি আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন, কাঁদলেন কিছুক্ষণ। বললেন, 'তাজউদ্দীনের সাথে আমার সম্পর্ক কী তোমরা তো জান। নূরুল ইসলামের কাছ থেকে ওই কথা শোনার পর আমার একটা প্রতিক্রিয়া হল। যাই হোক, এটা তো অল্প কয়দিনের ব্যাপার, আমি অন্যভাবে চিন্তা করছি।' জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাজউদ্দীনের সাথে দেখা হয়েছে তোমার ?' বললাম, 'পদত্যাগের পর আমি তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, এটা তো প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, তিনি যে কোন সময় তার মন্ত্রিসভা বদলাতে পারেন, এখানে জিজ্ঞাসা করার তো কিছু নাই।' এটা শুনে বঙ্গবন্ধু মনে খুব কষ্ট পেলেন বলে মনে হল ।

এরপর আমি তাজউদ্দীন সাহেবের কাছেও যেতাম, বঙ্গবন্ধুর কাছেও যেতাম। আমি দুই জায়গায় আসা-যাওয়া করতাম । একদিন বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলাম, তখন তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর নিজের বাড়িতে চলে এসেছেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তাজউদ্দীনের কাছে গিয়েছ ?' বললাম, 'না, গতকাল যাইনি।' তখন তিনি আমাকে বললেন, "আমি তাজউদ্দীনকে এখানে আসবার জন্য গাড়ি পাঠাতে চাচ্ছি। সে যেন আসে। তুই গিয়ে বলবি এই কথা।' আমি তাজউদ্দীন সাহেবের বাসায় ঢুকতেই তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, "কী ব্যাপার, বঙ্গবন্ধুর ওখান থেকে আসলেন নাকি ?' আমি বললাম, 'আপনাকে কি টেলিফোন করেছিল ?'

বললেন, “না, আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে।' আমি হেসে বলেছি, “হ্যাঁ, আমি বঙ্গবন্ধুর ওখান থেকে এসেছি।' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, ‘আমার সাথে কমপ্রোমাইজ করতে চাচ্ছেন । কিন্তু আমার তো মুজিব ভাইয়ের সাথে কোন ঝগড়া নাই, তবে কমপ্রোমাইজটা কিসের ? আপনারা এইসব কী করছেন ? তাঁর সাথে আমার যথেষ্ট ভাল সম্পর্ক আছে। লোকজন গিয়ে মিথ্যা কথা বলে এইসব অবস্থা সৃষ্টি করেছে।' আমি বললাম, 'আমি কিছু বুঝি না, আমাকে বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে, কালকে গাড়ি পাঠাবেন । তো আপনি যাবেন।' তিনি বললেন, ‘গাড়ি পাঠালে যাব না কেন, নিশ্চয়ই যাব।' একদিন বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন যে, ‘তাজউদ্দীনকে আমি আমার প্রধান উপদেষ্টা বানাব এবং ওর মর্যাদা কোন অংশেই প্রধানমন্ত্রীর চাইতে কম হবে না । '

আমি আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ার পর থেকে সবসময় দেখেছি বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন সাহেবকে যথেষ্ট ভালবাসতেন এবং তাজউদ্দীন সাহেবও পাল্টা তাঁর ভাবমূর্তি কত গুণ বড় করা যায় এটা সবসময় চিন্তার মধ্যে রাখতেন। কোন্ জিনিসটা করলে বঙ্গবন্ধুর ভাল হবে কোটা করলে ভাল হবে না এই চিন্তাটা তাঁর মধ্যে সবসময় থাকত । বঙ্গবন্ধুর দিক থেকে কোন কিছু ভুল হলে তাজউদ্দীন সাহেব কিন্তু চুপ করে থাকতেন না, বলতেন এটা ভুল হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে তিনি নির্ভুল, নির্মল রাখতে চাইতেন। বঙ্গবন্ধুকে ফোকাস করে যত উপরে দেয়া যায় এই চেষ্টাই ছিল তাজউদ্দীন সাহেবের সবসময়। কাজেই তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে বঙ্গবন্ধুর যে একটা দূরত্ব হবে বা হতে পারে এটা আমি কোন সময়ই চোখের সামনে ভাসাতে পারি না। আমার দু'জনের কাছেই আসা-যাওয়া ছিল। স্বাধীনতার পর থেকেই একটু একটু করে এই দূরত্বটাকে অনুভব করতে পারতাম। যতদূর মনে হয়, এই দু'জনের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কেউ তৈরি করেছে। এমন সূক্ষ্মভাবে তৈরি করেছে যে, যেন সন্দেহ না হয়। আর তাজউদ্দীন সাহেব তো মন্ত্রিসভা থেকে চলে যাবার পর কিছু বলতেনই না। শুধু বলতেন, 'না, ঠিক আছে, আমি তো এমপি আছিই।'

‘৭৫-এর জানুয়ারি মাসে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতির বিষয়ে দলে যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু একটা কথা বললে দলের আমরা সবাই সেই কথাটি ঠিক আছে বলে মেনে নিতাম । আমাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে বড়ভাবে সামনে রেখে কাজ করবার প্রবণতা ছিল। সেই জন্য আমরা সংসদীয় পদ্ধতি করি বা যাই করি, বঙ্গবন্ধু সর্বশেষ যা বলতেন আমরা তা মেনে নিতাম । এটাই ছিল আমাদের সবার কাছে গণতন্ত্র।

তেমন তো কেউ ছিল না যে তাঁকে সামনাসামনি কিছু বলতে পারে। দলের মধ্যে থেকে দু-চারজন সরাসরি না বলে ঘুরিয়েটুরিয়ে একটু-আধটু যা বলত।

যদি এই সময়টাতে তাজউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুর কাছে থাকতেন তাহলে হয়ত বলতেন । কারণ তাঁকে বঙ্গবন্ধু অ্যালাউ করতেন এই ধরনের কথা বলতে । তবে অন্যরা এই বিষয়ে কিছু বলেছে কিনা আমি জানি না ।

তারপর তো বাকশাল হল ।

তাজউদ্দীন সাহেবের ধারণা ছিল, পরিকল্পিত অর্থনীতি বাকশালের মধ্য দিয়ে সম্ভব, কিন্তু প্রিম্যাচিউর জিনিস দিয়ে কিছু করা যাবে না। মানুষ তো শিক্ষিত বা তৈরিই হয়নি ওই কাজের জন্য। সেই প্রস্তুতি বা শিক্ষাটাই যদি ভিত্তিতে না থাকে, তাহলে হঠাৎ করে কিছু করা যাবে না, চাপিয়ে দিয়ে কোন জিনিস হবে না, হতে পারে না। যেমন, মোহাম্মদ তুঘলক তামার নোট প্রচলন করেছিল। দ্যাট ওয়াজ টু আরলি, তামার নোট ওই সময়ে চলেনি । এটাও একই অবস্থা বলে আমি পরিষ্কার মনে করি। তিনি বলতেন, যারা এটা করবে তারা যদি কঠোর রাজনৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী না হয় তবে এই পদ্ধতির ভুল ব্যবহার করবে । এর ফলে আপনি যা যা করবেন ব্যুরোক্রেটরা দেখিয়ে দেবে কোনটাই কৃতকার্য হয়নি। আর বর্তমান বাংলাদেশে আমরা যে অবস্থায় আছি এটা কিছুতেই সেই কাজের জন্য উপযুক্ত সময় নয় । আমাদের দেশে তো চতুর লোকের অভাব নেই, কাজেই যারা সমস্ত জীবন ত্যাগস্বীকার করেছে তাদেরকে পেছনে ঠেলে ওইসব লোক সামনে আসছে। এরা শুধু বাহবাই দেয় এবং এরাই সবচাইতে বেশি স্যাবোটাজ করে । এর মধ্যে টিকে থাকা যাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে । আমরা কর্মীদেরকে আন্দোলন করা শিখিয়েছি, দেশ গড়ার কাজ কীভাবে করতে হবে তা শেখাইনি। তার মধ্যে সামনে চলে আসছে নতুন পদ্ধতি, কাজেই মনে একটা আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ।

তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা আমার হয়েছে তাতে কিন্তু তিনি কোনদিনই পাল্টা কোন দল করা সঠিক বলেই মনে করতেন না । তিনি সিস্টেমে বিশ্বাস করতেন। আওয়ামী লীগের জন্য তিনি একদম গোড়া থেকে কাজ করে এসেছেন। এর প্রতি তাঁর যে দরদ ছিল, সেটা তিনি কোন সময়ই নষ্ট করতে চাননি। আর বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে যা বলেছেন সেটা হল যে, বঙ্গবন্ধু একটা বিপদসঙ্কুল অর্থনীতির উপর এসে বসেছেন। আমি নেই বলে কি হয়েছে, তাঁকে একটা কাজ করার সুযোগ তো

দেবেন আপনারা! আগেই যদি এত কথা বলা শুরু করেন তাহলে একটা মানুষ কাজ করবে কীভাবে ? আমি আছি, আমি নেই। আবার এক সময় আসতে পারি বা নাও আসতে পারি। জিনিসটা তো ব্যক্তিবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় ।

বঙ্গবন্ধুকে অন্তত হাত খুলে কাজ করার সুযোগটা তো আপনারা দিন—এই কথাগুলো তাজউদ্দীন সাহেব সবসময় সবার কাছেই বেশ জোরে জোরেই বলেছেন। তা সত্ত্বেও তাজউদ্দীন সাহেব নতুন দল করবেন এরকম রটনা কেউ কেউ করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুও সে রটনা হয়ত বিশ্বাস করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কাছে আমি নিজেও বলেছি যে, 'আপনার কাছে যে যাই বলুক, তিনি নতুন দল করবেন না। তিনি কিন্তু কখনই আপনার বিরুদ্ধে কোন দল করা বা এমন চিন্তা কোন দিনও করেননি এবং কোন সময়ই করবেন না ।'

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি কেন বঙ্গবন্ধুকে বাকশাল সম্পর্কে কিছু বলেন না ?' তখন তিনি বললেন, 'বঙ্গবন্ধু যেহেতু এটা করে ফেলেছেন, তাই এই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে গেলে আমাকে ভুল বুঝবেন । আর যারা বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়েছে তাজউদ্দীন আপনার বিরুদ্ধে, তারা তখন আমার কথাকে প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে বলবে যে, এই দেখেন আপনাকে না করছে। তাই এই সময়ে চুপ থাকাটাই ভাল। মুজিব ভাই যদি আমার প্রয়োজন অনুভব করেন, যদি আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমি আমার ধারণার কথা বলব। আমি যা বিশ্বাস করি তাই সবসময় বলি । চাটুকারিতা অথবা মিথ্যা আমি বলি না, এটা মুজিব ভাই নিজে খুব ভাল করে জানেন । এখন তো সবকিছু একটা তুঙ্গে আছে । বাকশাল নিয়ে একটা হৈচৈ । তাই বাকশাল নিয়ে এই মুহূর্তে কিছু বলা যাবে না । তবে বাকশাল করার জন্য যে অবস্থার দরকার সে অবস্থা এখন আমি সামনে দেখছি না। এবং এর ওপর অনস্লট হয়ত কোন না কোন সময় আসতে পারে। কারণ বর্তমান অবস্থায় এই পদ্ধতিটা অনেকেই পছন্দ করবে না ।'

আমার বন্ধু সাভারের আনোয়ার জং তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে ১৫ অগাস্টের পর জেলে এক রুমে ছিল। আনোয়ার জং আমাকে বলেছিল, তাজউদ্দীন সাহেব জেলখানায় দুঃখ করে বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধুকে এইসব লোক হত্যা করল, কিন্তু তিনি কোনদিনই জানতে পারলেন না যে তাজউদ্দীন এর মধ্যে নেই । তাঁর প্ল্যাটফর্মের ওপরে দাঁড়িয়ে আমাকেও হয়ত একসময় জীবনটাও দিতে

হবে । কিন্তু তিনি সেই জিনিসটা জেনে যেতে পারলেন না । নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, বিশ্বাসঘাতকতা করল খন্দকার মোশতাক!'

জেল হত্যাকাণ্ডের পর আমি অনেককে বলেছি, এত ভাল কাজ করবার পর ফলাফল কেন এমন হয়, এত কষ্ট এত ত্যাগ স্বীকারের পর তাজউদ্দীন সাহেবের কেন এই পরিণতি ? এই মানুষটিকে আমি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছি । তাঁর মত সৎ, বিশ্বস্ত, উঁচুমনের মানুষ এই জগতে বিরল ।

[৬.১০.১৯৯০]

আরহাম সিদ্দিকী : রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী ।

আমীর-উল ইসলাম

‘৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর আমি যখন ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হই, তখন বিভিন্ন আন্দোলন এবং সাংগঠনিক তৎপরতার মাঝে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার দেখা হয়। সে সময় ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিচ্ছে এবং সেখানে পেছন থেকে জিনিসটাকে সংগঠিত করবার ব্যাপারে তাজউদ্দীন সাহেবের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল । আমার মনে পড়ে, ‘৫৪ সালে নির্বাচন করবার পর তিনি যখন নির্বাচিত হয়ে এলেন তখন কোন এক সংবর্ধনা সভায় এবং তারপর কারকুন বাড়ি লেনে এক বাড়িতে তাঁর সাথে পরিচয় হয় এবং আমি তাঁর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হই। তখন তিনি খুবই তরুণ, বিয়ে করেননি, সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত এবং সংসদ সদস্য হয়ে এসেছেন। সেই সময় আমি ছাত্র লীগের কর্মী আর তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। কাজেই আমাদের কিছু দূরত্ব হয়ত ছিল ।

তারপর '৫৪-র নির্বাচনের পর ৯২-ক ধারা জারি হলে আমাদের অনেককে বন্দি করা হয়। জেল থেকে বের হবার পর সংবর্ধনা সভা হয় ফজলুল হক হলে । সেখানে কয়েকজন রাজবন্দি যাঁরা সদ্য ছাড়া পেয়েছেন তাঁদের সংবর্ধনা হয়। সেখানে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার পুনরায় দেখা। এইভাবে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর সাথে আমার দেখাসাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। তারপর আমি '৫৬ সালে বিদেশে চলে গেলাম পড়াশোনা করতে, '৬৬ সালে ফিরে এলাম। দেশে ফিরে এসে আমি ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কে যে বাসা ভাড়া নেই সেখান থেকে তাজউদ্দীন সাহেবের বাসা খুবই কাছে ছিল ।

সেই সময় সকালবেলা হাঁটতে বের হলে কখনো কখনো তাঁর সাথে দেখা হত, কথা হত। দু'জনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হত। কিন্তু তখনও সম্পর্ক খুব একটা ঘনিষ্ঠতার রূপ নেয়নি। ঘনিষ্ঠতায় রূপ নিল তখন, যখন আমি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর একজন কৌসুলি হিসেবে কাজ করতাম।

আইয়ুব খান '৬৮-র শেষের দিকে অথবা '৬৯-এর প্রথমদিকে একটা গোল টেবিল বৈঠক করবার প্রস্তাব পাঠালেন—মাধ্যম নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ সাহেব। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ সাহেব ঢাকাতে এসে এই প্রস্তাব নিয়ে সবার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত ছিল তাঁরা কনফারেন্সে

যাবেন না ।

এই ব্যাপারে একদিন মামলার বিরতির সময় বঙ্গবন্ধুকে সালাম খান সাহেব বললেন যে, ‘তোমরা যদি গোল টেবিল বৈঠকে না যাও, জেলখানায় তোমাকে সারা জীবন পচতে হবে।' তাতে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত রেগে যান এবং বললেন, ‘আপনার মামলা করার দরকার নাই।' আমি পাশেই ছিলাম, আমাকে ডেকে তিনি বললেন যে, ‘তোমরা যেটা পার সেটা কর, আমার দরকার নেই এত বড় উকিল দিয়ে মামলা করানোর।' তখন আমি বললাম, 'মুজিব ভাই, তাঁরা চাচ্ছেন যে আপনি রেগে যান এবং গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত আপনি করে বসেন, যাতে করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব তাঁরাই করতে পারেন।'

সেই দিনের মত মামলার কার্যক্রম শেষ হবার পর আমি সেলে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে আবার দেখা করি। সেলের পেছনের দিকে রেডিও ছেড়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করতাম যাতে আইবি-র লোকরা শুনতে না পায়। বঙ্গবন্ধুকে আমি বললাম, ‘এই বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হওয়া দরকার পূর্ব বাংলার ছয় দফা, স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং তার সাথে সাথে এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং আপনার মুক্তি। এইগুলো গোল টেবিলের সামনে আনা কর্তব্য । এখনই যদি বলে দেন যে যাবেন না, তাহলে এই কথাটি উত্থাপন করার সুযোগ পাওয়া যাবে না । অতএব যাবেন না, এই কথাটি বৈঠক যেদিন হবে এর আগের দিনও বলতে পারেন। তাই এই মুহূর্তে না বলবেন না ।

তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এখন কী করা যায় ? তুমি কী করতে পার, কী করতে বল ?’ আমি বললাম, ‘আপনার সেইরকম কোন লোক আমি দেখছি না ।

এর চাইতে বেশি কিছু বললাম না। কারণ আমি জানি মোশতাক সাহেব তখন কপ (সম্মিলিত বিরোধী দল)-এর সেক্রেটারি হিসেবে নিজেকে সামনে নিয়ে আসার ব্যাপারে চেষ্টা করছেন, এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বা আমাদের ছয় দফার ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমি লক্ষ্য করিনি। অপর সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব তখন ময়মনসিংহে থাকেন। ঠিক জাতীয় ক্ষেত্রে ওই রকম একটা ভূমিকা পালন করবার মত অবস্থা, পরিস্থিতি, সময়, সুযোগ কোনটাই তাঁর সে সময় ছিল না। তখন অনেক ভেবে বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘তাজউদ্দীনকে মুক্ত করাতে পারলে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজি

হতে পার। একটি দলের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক দু'জনই যেখানে বন্দি আছে, সেখান কী করে আমরা গোল টেবিল বৈঠকে যাব ? তাঁকে ছাড়তে হবে— এই শর্তে গোল টেবিল বৈঠকে যাবার কথা তুমি আলোচনা করতে পার । বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলে আমি সোজা তৎকালীন শাহবাগ হোটেলে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) নসরুল্লাহ সাহেবের কাছে গেলাম । গিয়ে দেখি যে তিনি খুব ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁর জিনিসপত্র সব প্যাক হয়ে গেছে, তিনি এয়ারপোর্টে যাবেন । যেহেতু আওয়ামী লীগ গোল টেবিল বৈঠকে যেতে রাজি হয়নি সে কারণে এটা খুব ফলপ্রসূ হবে না—এ রকম একটা ধারণা নিয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছেন। আমি রুমে ঢোকার সাথে সাথে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কোন খবর আছে কিনা। আমি তাঁকে বললাম, ‘আমি আপনার সাথে একা কথা বলতে চাই।'

তখন তাঁর রুম থেকে সবাই আগেই এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। রুমে তিনি থাকলেন, তাঁর হুক্কা থাকল, আর সাথে আমি। কিছু কথা আমি হোটেলের রুমে বললাম, আর কিছু কথা একটি ভাড়া করা ট্যাক্সিতে বসে এয়ারপোর্ট যাবার পথে। আমি বললাম, ‘যদি তাজউদ্দীন সাহেবকে বের করে আনা যায় তাহলে গোল টেবিল বৈঠকে যাবার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত দিতে পারে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি দু'জনই যেখানে জেলে তখন সিদ্ধান্ত হতে পারে না।'

তিনি বললেন, “ঠিক হ্যায়।' এয়ারপোর্টে গিয়ে আমাকে বললেন, “বসো, আমি আসছি।' তিনি ফোন করতে গেলেন। টেলিফোন করে এসে আমাকে বললেন, ‘কাল সন্ধ্যার আগেই তাঁকে (তাজউদ্দীন) বাসায় পাওয়া যাবে।' পরদিন ঠিকই সন্ধ্যার পরে আমি এসে দেখি যে তাজউদ্দীন সাহেব জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসেছেন ।

কর্নেল নাসের তাজউদ্দীন সাহেব আর আমাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু যেখানে বন্দি ছিলেন সেখানে পৌছে দিলেন। তারপর আমরা তিনজন মিলে আলাপ করি আমাদের কৌশল কী হবে, গোল টেবিল বৈঠকে কীভাবে আমরা আমাদের দাবিগুলো নিয়ে ধাপে ধাপে এগুতে থাকব। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার দাবিটা সামনে আসবে, তারপরে আমরা গোল টেবিল বৈঠকে যাব । এইভাবে তিনি ব্রিফ করলেন, সেই ব্রিফ নিয়ে তাজউদ্দীন ভাই এবং আমি ফিরে এলাম ।

আমাদের লাহোর হয়ে পিন্ডিতে যাবার কথা, আমি আগেই লাহোর চলে গেলাম। ওখানে গিয়ে লাহোর বার এসোসিয়েশন এবং আজগর খান এদের সাথে লবি করলাম। আজগর খান একটা বিবৃতিও দিলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা দরকার। কাসুরি সাহেব ও অন্যান্য নেতারা এতখানি উৎসাহিত ছিলেন না আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে ।

তারপর তাজউদ্দীন সাহেব পিন্ডিতে এলেন। এর আগেই ড. কামাল হোসেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উকিল নিযুক্ত হয়েছেন। এখন ড. কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন সাহেব, আমি—আমরা তিনজন মিলে এই লবির মূল কাজটা করছি। ইতোমধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব, মান্নান সাহেব, ময়েজউদ্দিন সাহেব, সামসুল হক সাহেব, মোস্তফা সারোয়ার এঁরা এসে গেছেন। লাহোর এবং পিন্ডিতে আমরা কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত। আইয়ুব খানের আইন মন্ত্রী এস. এ. জব্বারের সাথে আমরা লিয়াজোঁ রক্ষা করতাম ।

জব্বার সাহেব আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি চেষ্টা করছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে এনে গোল টেবিল বৈঠক করা যায় কিনা । তিনি এক গভীর রাতে এসে বললেন, 'আমার হাত ঠাণ্ডা কারণ আমি এটা করাতে পারছি না এবং ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে।' তিনি বললেন, ‘এই পর্যন্ত রাজি করানো গেছে যে শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া যেতে পারে।'

সে সময় গোল টেবিল বৈঠকের বিষয়ে আওয়ামী লীগের একটা অনমনীয় মনোভাব ছিল । আবার এদিকে পত্রপত্রিকায় এটাই আসছে যে, আওয়ামী লীগের অনমনীয় মনোভাবের জন্য বোধ হয় গোল টেবিল বৈঠক ভেঙে যাচ্ছে, বা সাংবিধানিক যে সঙ্কট, এই সঙ্কট থেকে উত্তরণ করে ওয়ান ম্যান, ওয়ান ভোট- এর ভিত্তিতে পাকিস্তানের একটা সংবিধান রচনা করা বা গণতন্ত্রায়ন করার যে সম্ভাবনা সেটা আওয়ামী লীগ ভেঙে দিচ্ছে—এই রকমভাবে প্রচার হচ্ছে। তখন বোধ হয় কোরবানির ঈদও আসন্ন । করাচীর কাগজ এবং পথেঘাটে এ রকম কথা হচ্ছে, এবার আওয়ামী লীগ এত কোটি লোককে কোরবানি দেবে—এই রকম মিথ্যা প্রচার চলছে।

আবার এদিকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, আইয়ুব খানের সরকার আস্তে আস্তে ক্ষমতাচ্যুতির দিকে এগুচ্ছে—ইসলামাবাদে, করাচীতে, লাহোরে আইয়ুবের বিরুদ্ধে শ্লোগান, মিছিল চলছে। পূর্ব বাংলাতেও এই রকম আন্দোলন হচ্ছে।

আন্দোলন দারুণভাবে দানা বেঁধে উঠেছে।

ইতোমধ্যে সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। ক্যান্টনমেন্টে অত্যন্ত টেনশান হচ্ছে বাঙালিদের ভেতরে। সেই রকম পরিস্থিতিতে দুটো ভাগে বিভক্ত আর্মিকেও একটা মীমাংসার দিকে আনা হচ্ছে এবং তারা আরো হার্ডলাইন-এর দিকে চলে যেতে পারে। এবং সেখানে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগীদের জীবননাশ করবার একটা ষড়যন্ত্র বা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাতে তাঁদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র, বা এটা ছাড়াও ক্যান্টনমেন্টে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সৃষ্টি করে হত্যার গুজব অর্থাৎ নানা প্রকারের একটা গুজবে গোলযোগ সৃষ্টি করতে চাওয়া হচ্ছে। সেই সময় আমাদেরকে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় ।

এদের কাছ থেকে প্যারোলের প্রস্তাব পেয়ে তাজউদ্দীন সাহেব, ড. কামাল হোসেন, আমি—আমরা তিনজন ঠিক করলাম তাঁদের প্যারোলের প্রস্তাবে আমরা যদি হ্যাঁ বা না কোনটাই না বলি, বলি যে, ঠিক আছে, আমরা ঢাকাতে যোগাযোগ করি, তাহলে আমরা একটা রিজনেনেস্ দেখালাম এবং একই সাথে সময় পেলাম ।

আলোচনা যখন প্রায় ভেঙে যাচ্ছে, তখন তাজউদ্দীন সাহেব সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে বললেন যে, আমরা এই প্যারোলের প্রস্তাব নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের কাছে যাচ্ছি, তিনি কী বলেন শুনতে হয়। কিন্তু এতে তাঁর সহকর্মী মোশতাক সাহেব, নজরুল ইসলাম সাহেব কিছুটা অসন্তুষ্টই হলেন। কারণ তাঁদের কাছে একটা ব্রিফ-ই ছিল যে, হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে হবে, আর না হলে আমরা এখনই বাড়িতে ফিরে যাব। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব খুব ঝুঁকি নিয়ে বললেন যে, আমরা ঢাকাতে যাব, গিয়ে এই প্রস্তাব শেখ সাহেবকে বলব, তিনি কী সিদ্ধান্ত দেন সেটা আমি এসে আপনাদেরকে জানাব ।

এই যে একটা অত্যন্ত জটিল অবস্থায় সেই অবস্থার সম্পূর্ণ ডায়মেনশনটা বুঝে একটা যে ডিপ্লোম্যাটিক মুভ তিনি নিলেন, এতে তাঁকে অনেক অপ্রীতিকর কথার সম্মুখীন হতে হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে। এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়েছে যে, তিনি বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে নিয়ে আসবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধেও এই কথা প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব, কামাল সাহেব, আমি—পরিষ্কার ছিলাম আমাদের বিবেকের কাছে। আমাদের

যে চিন্তা বঙ্গবন্ধুর সাথে হয়েছিল, বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলের বিষয়ে যে কৌশলের কথা বলেছিলেন, সেইভাবেই আমরা এগিয়েছিলাম। ঢাকায় ফিরে আসার পর আমরা তিনজন মানিক মিয়াকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে যাই। মানিক মিয়া এবং তাজউদ্দীন সাহেব সেলের ভেতরে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বললেন আর আমরা দু'জন বাইরে অপেক্ষা করলাম এবং সেদিন ওই কথাই নিয়ে আসা হল যে, তিনি প্যারোলে যেতে রাজি নন ।

অর্থাৎ এই যে সময়টা আমরা পেলাম তার ফলে আমরা যে আলোচনা ভেঙে দিচ্ছি এই রকম একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা হলাম না। আবার এদিকে সরকারও সময় পেল তারা কতটুকু নতি স্বীকার করবে বা না করবে সেই বিষয়ে ভাববার। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, স্বৈরাচারদের একটা মজার ব্যাপার আছে, তারা যখন একবার ছাড় দিতে শুরু করে তখন তাদের সম্পূর্ণটাই মেনে নিতে হয়, বিকল্প থাকে না। এটাও তখন আমরা আলাপ করেছিলাম । তাজউদ্দীন সাহেব এবং আমরা একমত হয়েছিলাম যে, পাকিস্তানিরা একবার যখন ছাড় দিতে শুরু করেছে তখন এটা যদি আমরা একটু ধরে রাখতে পারি তবে সম্পূর্ণটাই অর্জন করতে পারব। কিন্তু আমাদেরকে এখন এমনভাবে চলতে হবে যেন ঘটনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা নিয়ে যেতে পারি ।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন দেখি পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে বেইল পিটিশন মুভ করবার চেষ্টা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু অথবা আমরা কেউ জানি না এই সম্বন্ধে, অথচ রেডিওতে প্রচার হয়ে গেছে, শেখ মুজিবুর রহমান বেইল নিয়ে গোল টেবিল বৈঠকে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে ঢাকা শহরে বিরাট মিছিল শুরু হয়ে গেছে। লোকজন আসছে ক্যান্টনমেন্টের দিকে ধাওয়া করে। ওদের অপপ্রচার এবং দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাজউদ্দীন ভাই এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে বঙ্গবন্ধু তখন খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন যে, না, আমি যাব না । কারণ এই যে প্রচার হচ্ছে, এটা আমাকে শেষ করবার জন্যে হচ্ছে। এরপর বেইল পিটিশনের উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গেল। তার পরদিন সম্পূর্ণভাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হল। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পর ঠিক হল আমরা বড় আকারের জনসভা করে তারপর লাহোরে, ইসলামাবাদে যাব । সেই জনসভা হল বোধ হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে । ওখানেই তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি লাভ করেন। তোফায়েল আহমদ তখন ডাকসু-র ভিপি । তিনি এই উপাধিটা দেন ছাত্রসমাজ, জনগণ এবং

আন্দোলনের পক্ষ থেকে। তারপর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা ইসলামাবাদে গেলাম ।

ইসলামাবাদে যাওয়ার আগে যে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি, সম্পূর্ণ ব্রিফিং, এটা তাজউদ্দীন সাহেবই বঙ্গবন্ধুকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললেন । ইসলামাবাদে পাওয়ার স্ট্রাকচার তখন কীভাবে বিন্যস্ত হয়ে আছে সে সম্পর্কেও তিনি বঙ্গবন্ধুকে বললেন। ড. কামাল হোসেন এবং আমি যদিও দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কোন সদস্য বা কর্মকর্তা নই, কিন্তু তখন তাজউদ্দীন সাহেবই মূলত আমাদেরকে দলের সহযোগী হিসেবে কাজ করানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। এবং আমাদের যত কথা, আলাপ-আলোচনা, চিন্তা-ভাবনা, এটা আমরা তাজউদ্দীন সাহেবকে নিয়েই করতাম। তারপর বঙ্গবন্ধুকে সম্পূর্ণ ব্রিফিংটা তাজউদ্দীন সাহেব দিতেন। কারণ তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, পার্টির অবস্থান এবং সমস্ত ব্যাপারে তাঁর নিজের যে অভিজ্ঞতা এবং সামগ্রিক অর্থে পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল।

ইসলামাবাদে গিয়ে আমরা একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যে, ক্ষমতার দ্বন্দ্বটা এত ব্যাপক রূপ নিয়েছে যে আইয়ুবের টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এদিকে আর্মি চীফ ইয়াহিয়া খান খবর পাঠালেন যে তিনি ড. কামাল হোসেন, বঙ্গবন্ধুর প্রাইভেট সেক্রেটারি মওদুদ আহমদ এবং আমার সাথে দেখা করতে চান (বঙ্গবন্ধু মুক্তি পাবার পর মওদুদ আহমদ তাঁর পিএস হয়েছেন)। পরবর্তীতে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথেও দেখা করবেন এই রকম একটা ধারণা দিয়ে খবর পাঠালেন। আমরা তিনজন তাজউদ্দীন ভাইয়ের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'যান, গিয়ে শুনে আসুন কী বলে।'

আমরা যাবার পর অনেক কথার মধ্যে ইয়াহিয়া খান যে কথাটা বললেন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁর সাথে আইয়ুব খানের কথাবার্তা হয়ে গেছে। সে সময় এমন একটা অবস্থা ছিল যে আইয়ুব খানও ইয়াহিয়া খানকে দেখে ভয় পাচ্ছিলেন এবং ইয়াহিয়া খানও আইয়ুব খানকে ওয়াচ করছিলেন—অর্থাৎ কামান দু'দিকেই তাক করা ছিল এবং একটা বোঝাপড়াও হয়ে গেছে। এখন হয় আইয়ুব খান এই সমস্যার সমাধান করবেন, আর না হলে তাঁকে টেক ওভার করতে হবে। এটা তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব ।

আমি তখন বয়সে তরুণ। আমি বলে ফেললাম, 'সংবিধান তো আমি পড়েছি, কিন্তু সংবিধানে চীফ অফ স্টাফের কোন দায়িত্ব আছে বলে আমি জানি না।

' তখন তিনি আমাকে বললেন 'আই সী । আই অ্যাম লাইক আ ব্রুডিং হেন—যখন বিপদ আসে তখন মুরগির সব ছানাকে আমার পাখার তলে নিতে হবে। আমরা এখন সেইরকম একটা বিপদের সম্মুখীন। সংবিধানে লেখা না থাকলেও এটা আমার একটা দায়িত্ব ।' তিনি যা বলতে চাইলেন তা হচ্ছে, দু'জন লোকই এখানে রাজনীতি করছেন, একজন হচ্ছেন দৌলত আনা আর একজন হচ্ছেন আইয়ুব খান । এখন দৌলত আনা এবং আইয়ুব খানের সাথে যদি বঙ্গবন্ধু বোঝাপড়া করে নিতে পারেন, তাহলে ঠিক আছে; আর না হলে তাঁকে আবার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অতএব মার্শাল ল' বা মিলিটারি যে আসছে এই রকম একটা ইঙ্গিত তাঁর কাছে ছিল। আমরা ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন সাহেবকে সবিস্তারে জানাই যে, এই রকম একটা অবস্থা চলছে ।

আমরা তখন চেষ্টা করছিলাম চোখ-কান সব চতুর্দিকে খোলা রাখতে এবং তাজউদ্দীন সাহেব আমাদেরকে ঠিক সেইভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন যাতে আমাদের জানা থাকে যে মিলিটারির ভেতরে-বাইরে কী হচ্ছে, এখানে মুসলিম লীগের লবিতে কী হচ্ছে, অন্যান্য দল কীভাবে চিন্তাভাবনা করছে। আর ভুট্টোর পিপলস্ পার্টির কৌশলটা কী। কারণ ভুট্টো খুব হার্ডলাইন প্লে করার চেষ্টাতে ছিলো—আইয়ুবকে সরিয়ে দিতেই হবে এবং তাঁর সাথে কোন বোঝাপড়া করে কোনরকম সমঝোতা হোক এটা তিনি চাচ্ছিলেন না ।

আর একদিকে আমরা কোন ফাঁদে না পড়ে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থটা কীভাবে সংরক্ষিত হয় এই বিষয়টিতেই অবস্থান করছিলাম । এই ব্যাপারে নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু, কিন্তু বিষয়টি পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালন করেন তাজউদ্দীন সাহেব । আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম যে, বঙ্গবন্ধু জেলখানাতে বসেও তাঁর বিশ্বস্ত এবং যোগ্য লোক হিসেবে যাঁর কথা মনে করেছেন তিনি তাজউদ্দীন। সে জন্য তাজউদ্দীনকে বের করা তাঁর প্রথম দায়িত্ব—তাঁকে দিয়েই এই কাজগুলো করানো যাবে। পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বের হবার পরও তাজউদ্দীনের উপরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে নির্ভর করতেন, তাঁর সাথে সমস্ত পরামর্শ করতেন। এই যে পরামর্শ এবং আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া, এটা স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে ছিল। কিন্তু আমাদের দেশের জন্য এটা বড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে, বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পর (জানুয়ারি '৭২) তাজউদ্দীনের সাথে আলাপ-

আলোচনা করে সমস্ত কাজগুলো করবার যে পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটা, এই প্রক্রিয়াটা আর কার্যকর থাকেনি। এটাও দুঃখজনক, আমাদের যে সহযোগিতা ছিল দুই নেতার সম্মিলিত চেষ্টার ব্যাপারে, তিনি ফিরে আসার পর সেটাও আর অব্যাহত থাকেনি ।

এদিকে সেই সময় (১৯৬৯) একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যে, তাজউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড প্রচারণা শুরু হয়েছে, তিনি বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে নিয়ে যেতে চাইছিলেন এবং এভাবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব নষ্ট করার প্রচেষ্টা তাঁর ছিল । আমরা তখনও লক্ষ্য করেছিলাম যে, বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজউদ্দীন সাহেবের যে এত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক, এত বিশ্বাসের সম্পর্ক, এটা কোন না কোন কারণে তাঁর কিছু বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন এবং কিছু লোক ভাল চোখে দেখত না । অথচ তাজউদ্দীন সাহেব সেই ঘোলাটে পরিস্থিতির সর্বদিক বিবেচনায় রেখে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিপক্ক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পুরো পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করছিলেন। এমনকি মাথায় এই চিন্তাও ছিল, হয়ত বঙ্গবন্ধুকে খুন করে ফেলবে—পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র চলছে।

যাহোক, প্রথম গোল টেবিল বৈঠক যেটা হল তাতে একটা আশার উদ্রেক হল। তারপর ঈদের জন্য আমরা ফিরে এলাম । ঈদের পর আবার গোল টেবিল বৈঠক হল । সেখানে বলা হল, ছয় দফার ভিত্তিতে এমন একটা সাংবিধানিক রূপরেখা পাওয়া যায়, যেখানে রাষ্ট্রকে এক রেখেও পূর্ব পাকিস্তানে যদি আলাদা মিলিশিয়া এবং আলাদা মুদ্রা থাকে, কোন অসুবিধা নেই। এই যুক্তিগুলো দাঁড় করানোর ব্যাপারে, এইগুলোকে প্রস্তাব আকারে নিয়ে আসার ব্যাপারে তাজউদ্দীন সাহেবের খুব অনন্য ভূমিকা ছিল । এর প্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বলা হল যে, ঠিক আছে, আপনারা ঢাকায় গিয়ে সংশোধনী প্রস্তাব পাঠান যে ১৯৬৩-র সংবিধানের কী কী সংশোধন আনলে এটাকে আপনারা আপনাদের ছয় দফা বলে মনে করবেন।

ঢাকায় এসে তাজউদ্দীন ভাইয়ের বাড়িতে আমরা বৈঠকে বসি এবং কামাল হোসেনের বাড়িতেও অনেকগুলো বৈঠক হয় । প্রতিটি বৈঠকে তাজউদ্দীন সাহেব সার্বক্ষণিকভাবে থাকতেন। আর বঙ্গবন্ধুও কখনো কখনো আসতেন। এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা তিনি থাকতেন, আবার চলে যেতেন। আমাদের অগ্রগতিটা দেখেশুনে তাঁর মতামত দিয়ে যেতেন। সেখানে সার্বক্ষণিকভাবে ড. কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন সাহেব, অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, ড. নূরুল

ইসলাম, রেহমান সোবহান, শামসুর রহমান খান জনসন, রুহুল কুদ্দুস সাহেব উপস্থিত থাকতেন । এভাবে একটা খসড়া তৈরি করা হয়, যে খসড়াটা মিজানুর রহমান চৌধুরীকে দেয়া হয় ইসলামাবাদে নিয়ে যেতে ।

ইতোমধ্যে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। চারিদিকে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে কিছুদিন পর ইয়াহিয়া খান বললেন, এক ব্যক্তি এক ভোট- এর ভিত্তিতে একটা নির্বাচন দেবেন। তার ভিত্তিতে যে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হল তাতে একটা বিরাট বিতর্ক হল যে, এই মার্শাল ল'-এর অধীনে আমরা নির্বাচনে যাব কি যাব না ।

তখন তাজউদ্দীন সাহেবের যুক্তিটি ছিল যে, আইয়ুব খানের কাছে যখন আমরা চাচ্ছিলাম এক ব্যক্তি এক ভোট, সেটাও তো প্রকৃতপক্ষে একটা সামরিক সরকার ছিল। সেটা ছিল প্রচ্ছন্ন মিলিটারি সরকার, একটা সংবিধানের আবরণে। আর এখন যেটা এসেছে এটা প্রত্যক্ষ মিলিটারি সরকার। কিন্তু পার্থক্য এই দুইয়ের মধ্যে খুব কম। তবে নির্বাচন যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়, এই নিশ্চয়তা যদি থাকে, তাহলে নির্বাচনে আমাদের যেতেই হবে। এই কারণে যে, এতে একটা বৈধতার সৃষ্টি হবে। আর আমরা যে বৈধ জনপ্রতিনিধি সেটা প্রতিষ্ঠা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্বাচন । কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলার বৈধতা অর্জন করার যুক্তিটা সবচাইতে প্রবল ছিল সেই সময়ে নির্বাচনে যাবার ব্যাপারে ।

এলএফও যেভাবে তৈরি হয়েছিল তাতে নির্বাচনের পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠরাই একটা নির্বাচিত সংসদ হিসেবে একটা শাসনতন্ত্র গ্রহণ করতে পারবেন। এই ক্ষমতাটা যেহেতু একটি নির্বাচিত সংসদকে দেয়া হচ্ছে সে জন্য বলা যায়, এটা সত্যি একটা বড় বিজয় ছিল জনগণের এবং এই আন্দোলনের। নির্বাচন পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল এটা বলতে হবে। যদিও তাদের ভিতরে বিভিন্ন রকমের শক্তি ক্রিয়াকর্ম করছিল ।

'৭০-এর নির্বাচনের আগে যে সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হল, ওই সময় আমি দেখলাম আওয়ামী লীগের কী রকম শক্তিশালী সাংগঠনিক গাঁথুনি এবং এর নেতৃত্বের বিন্যাস। এটা আমাকে খুব অভিভূত করেছিল এইদিক থেকে যে, আওয়ামী লীগের নেতা বলতে বঙ্গবন্ধু যদিও ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথে যে নেতৃত্বটা গড়ে উঠেছিল তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটা জেলার সংগঠক হিসাবেই

প্রাথমিকভাবে পরিচিত। যেমন, তাজউদ্দীন সাহেব যদিও জাতীয়ভাবে দলের সেক্রেটারি, কিন্তু তাঁর মূল ভিত্তি ছিল এই যে তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের একজন বড় সংগঠক। তিনি প্রকৃতপক্ষে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট, আবার ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট । চট্টগ্রামের আজিজ সাহেব ছিলেন তখন চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট, তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যেও ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর জহুর আহমদ চৌধুরী নেতৃত্বে এলেন। কামরুজ্জামান সাহেব রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, তিনিও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলেন ।

যশোরের মশিউর রহমান সাহেব যশোর জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেও ছিলেন। খুলনার শেখ আবুদল আজিজ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলেন। কাজ বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই নেতা হয়ে গেলাম এমন ছিল না। নেতৃত্বের একটা সুশৃঙ্খল বিন্যাস ছিল । প্রত্যেকে জানতেন তাঁদের অবস্থানটা কোথায় এবং এটা স্বীকার করেই সবাই নিজ কাজটি করতেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় বঙ্গবন্ধুর সাথে ক্যান্টনমেন্টের সেলে যখন আলাপ করতাম তখন তাঁকে বলতাম যে, ‘সংগঠনের কী হবে ?' বঙ্গবন্ধু বলতেন, ‘কিছু চিন্তা করিস না, আমি বের হলে পরেই সংগঠন দেখবি দারুণভাবে চাঙা হয়ে উঠবে। আমার সমস্ত জায়গায় খুঁটি পোঁতা আছে, তারগুলো টেনে দিলেই সমস্ত কিছু ইলেকট্রিকে পরিণত হবে।' এই কথাটা আমি ঠিক সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বের হবার পর তাঁর কথামতোই ঘটনা ঘটল। তিনি শুধু তারগুলো টেনে দিলেন আর সেটা একটা বিরাট বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত হল, অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার হয়ে গেল ।

আমার মনে হয় যে, সংগঠন যে ব্যাপকতা লাভ করেছিল সেটাই পরবর্তীকালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কনটেইন করতে পেরেছিল। সংগঠনের দুর্বলতাও ছিল, আবার সফলতাও ছিল। সফলতা ছিল যে, বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে আসবার পরে যে ধরনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় বিশাল মাপের নেতা হিসেবে ইমার্জ করলেন সেটা ছিল একটা প্রবল বড় শক্তি। সাথে সাথে তাঁকে যখন আটক করে ফেলল, তিনি যখন দৃশ্যত বর্তমান নন, সেই সময় একটা বিরাট দুর্বলতা যে, এখন পাওয়ার স্ট্রাকচারটা কী হবে,

কার্যপদ্ধতি কী হবে।

অতএব আওয়ামী লীগের ভেতরে যে প্রবণতাটা সবসময় ছিল—দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুর সাথে সম্পর্ক, সেটার ভিত্তিতেই বাকি সম্পর্কগুলো গড়ে উঠছিল। সবাই চেষ্টা করছে বঙ্গবন্ধুর নিকটে কীভাবে যাওয়া যায়, তাঁর ঘনিষ্ঠ কীভাবে হওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু যতটুকু ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস করতেন, যতটুকু সিস্টেম করতেন বা করাতেন, ততখানিই হত। আর যতখানি তিনি করতে চাইতেন না ততখানি সংগঠনে হত না। সেটা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। আমার কাছে ভাল লাগে যে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় এখানে হাইকমান্ড নামে একটা পাওয়ার স্ট্রাকচার গড়ে উঠে। হাইকমান্ড দলের একজন প্রেসিডেন্ট, তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং দু'জন জেনারেল সেক্রেটারি (একজন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সম্পাদক, একজন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক)-কে নিয়ে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগই ছিল মূলধারা। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট; সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোশতাক আহমেদ, মনসুর আলি তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট; তাজউদ্দীন আহমদ এবং কামরুজ্জামান দু'জন সাধারণ সম্পাদক— এই পাঁচজনকে নিয়ে আমাদের হাইকমান্ড গঠিত ছিল এবং এঁরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আমার কাছে যেটা সবচেয়ে ভাল লাগে, বঙ্গবন্ধু কিন্তু ওই সময় এক দৃষ্টান্তমূলক পার্টির কর্মপদ্ধতি চালু করেছিলেন । সেটা আওয়ামী লীগের জন্যে চিরকালের একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকা উচিত ছিল—দল পরিচালনা করার জন্য কী ধরনের সাংগঠনিক যোগাযোগ থাকা দরকার সেটা তিনি করেছিলেন। ওই হাইকমান্ডের সাথে আলোচনা না করে বঙ্গবন্ধু কোন সিদ্ধান্ত সেই সময় নেননি। প্রত্যেকটি ঘটনাতে এবং দিনে বোধ হয় একবার তো বটেই দুই-তিনবারও তাঁদের বৈঠক হত ।

কামাল হোসেন ও আমি ছিলাম টাস্কফোর্সে । তাজউদ্দীন সাহেব আমাদের নেতৃত্ব দিতেন। এবং প্রয়োজন হলে হাইকমান্ড আমাদের দু'জনকে ডাকতেন, আর প্রয়োজন না হলে ডাকতেন না। আর যখন নিগোশিয়েশন শুরু হয় তখন কামাল হোসেন সাহেব নিগোশিয়েশন টিমে ছিলেন, তখন তাঁকে হাইকমান্ডে ডাকা হত । এই ছিল তখনকার হাইকমান্ডের গঠন। অর্থাৎ হাইকমান্ড একটা ছায়া ক্যাবিনেট হিসেবেই কাজ করেছিল। আর একটা ছিল ইয়ুথদের সাথে লিয়াজোঁ করার বিষয়, সেটা বঙ্গবন্ধু করতেন। সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ, শেখ মণি, আব্দুর রাজ্জাক এঁরা ছিলেন সেই ইয়ুথ কমান্ডে।

‘৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়লাভের পর ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের টালবাহানা চলতে থাকে। তারপর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ এবং অসহযোগের পর্ব। অসহযোগের সময় দুটো ব্যাপার ছিল—এক, আমাদের প্রতিদিনের কর্মসূচি ও প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া। কারণ তখন দেশ পরিচালনার ভার এসে পড়ল কার্যত আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের উপর। দ্বিতীয়ত, আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা কী তা নির্ধারণ করা। সে সময়ে তাজউদ্দীন সাহেবের উপর মূল যে দায়িত্ব ছিল সেটা হচ্ছে, প্রতিদিন কী নির্দেশ যাবে জনগণের কাছে, কী করবে, কী করবে না, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কতটুকু খোলা থাকবে, কতটুক থাকবে না—এইগুলো পরিকল্পনা করা, নির্দেশ দেয়া ইত্যাদি । এই কাজে আমরা টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছি। আমাদেরকে বিভিন্ন সেক্টরের সাথে বৈঠক করতে হত। ব্যাঙ্কার যেমন ছিলেন, টেলিফোন-টেলিগ্রাফের কর্মকর্তা ছিলেন, ওয়াসা, হাসপাতাল কর্মীরা ছিলেন— এমন সমস্ত সেক্টর ।

তারপর বিভিন্ন জায়গার সমস্যা, যেমন চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা — সেখানে আবার দায়িত্ব দিতে হত বিভিন্ন লোকজনদেরকে। প্রত্যেক জায়গায় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে, তিনজনকে কনভেনার করে। এই সংগ্রাম পরিষদ স্থানীয়ভাবে যে সমস্ত সমস্যা হচ্ছে তার সমাধান করত। তারপর যেখানে ক্যান্টনমেন্ট ছিল সেখানে আর্মির সাথে যে সমস্ত দ্বন্দ্বগুলো তৈরি হচ্ছে চট্টগ্রাম, জয়দেবপুরসহ বিভিন্ন জায়গায়—সেগুলোকে সংগ্রহ করতে হত । এই সমস্ত নিয়ে সন্ধ্যার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে আমাদের একটা আলোচনা করতে হত। ওই আলোচনায় বঙ্গবন্ধুকে সমস্ত কিছু ব্রিফ করতে হত যে, কী হল এবং আমরা কী প্রেসে দিচ্ছি ইত্যাদি। সারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ৩২ নম্বরে ২৪ ঘণ্টা টাস্ক ফোর্স থাকত । ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত এই ২৪/২৫টি দিন আসলে ৩২ নম্বর থেকেই এই অঞ্চলের সমস্ত কিছু পরিচালিত হত ।

ইতোমধ্যে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে, একটা সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তাজউদ্দীন সাহেব এই জিনিসটা খুবই সঠিকভাবে নির্ণয় করেছিলেন এবং যে কারণে তিনি কিছু ছোট অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং নিজে নিয়ে নিলেন। পিস্তল চালানো অভ্যাস করলেন, একটা পিস্তল তিনি সংগ্রহ করলেন; এটা নিয়েই বোধ হয় আমরা কলকাতা গিয়েছিলাম। আর একটা রাইফেলও যোগাড় করলেন। তিনি আমাদেরও বললেন যে, ‘আপনারা এই

সব আর্মসের ট্রেনিং নেন, এগুলোর দরকার আছে।' তিনি খুব পরিষ্কার করে বলেছিলেন যে, 'আমাদের সকলেরই একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার। আমরা যেভাবে অতীতে রাজনীতি করেছি, একটা যে রাজনৈতিক ধারা, এবার কিন্তু এটা ভিন্ন প্রকৃতির হতে যাচ্ছে এবং আমরা একটা সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি দ্রুত।'

সে সময় প্রতি রাতেই বিপদের আশঙ্কা ছিল, তাই আমরা রাত্রিতে বাড়িতে থাকতাম না। কামাল হোসেন তখন অপেক্ষাকৃত নবাগত, কাজেই তাঁর যাতে প্র্যাকটিস হয় সে জন্য তাঁকে নিয়ে আমি সাত মসজিদ রোডের একটা বাড়িতে রাত্রিবেলা থাকতাম। কারণ যে কোন সময় আঘাত আসতে পারে। বঙ্গবন্ধুকেও এ ব্যাপারে বলা হলে তিনি এতে উৎসাহিত বোধ করেননি। তিনি বললেন যে, 'আমি খোলাখুলি রাজনীতি বুঝি, আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে পারব না। আমাকে কোথায় তোমরা নিয়ে যাবে, আমার কি বাংলাদেশের বাইরে যাওয়া সম্ভব ?'

বঙ্গবন্ধুর বাসার উপরতলার শোবার ঘরে নিয়মিত হাইকমান্ডের মিটিং হত। এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে মোড়ার উপর একটা ছায়া সরকার বসত। যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে যে ক্যাবিনেট হয়েছিল সেই ক্যাবিনেট থেকে এই ক্যাবিনেট অনেক বেশি ইফেকটিভ, রেসপনসিবল, কালেকটিভ ছিল। হাইকমান্ডের সভাতে বলা হল যে, আপনাকে ধরা না দিয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে। এটা ২২/২৩ তারিখের কথা। তো তিনি খুব অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাবে ? যেখানে যাবে সেখানে সেই গ্রামকে গ্রাম তারা নষ্ট করে দেবে, গুঁড়িয়ে দেবে। আমাকে তোমরা কোথায় লুকাবে ?'

তারপর কথা হল বঙ্গবন্ধু তাঁর একটা বক্তৃতা রেকর্ড করবেন। স্বাধীনতা ঘোষণা সংবলিত সেই বক্তৃতাটা বাজানো হবে কোন একটা জায়গা থেকে। সে জন্য আমরা অয়্যারলেস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের সাথে একটা আলোচনা করি। এই আলোচনাতেই অয়্যারলেস ডিপার্টমেন্টের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কুষ্টিয়ার খোকা ভাই বললেন যে, 'এই কাজে যদি আমার জীবনও চলে যায় তবু আমি এটা করব। খুলনাতে একটা ট্র্যান্সমিটার আছে, আমি ওটা আনতে পাঠিয়েছি। ওটা এসে যাবে।' কিন্তু তাঁকে ২৫ তারিখ রাতেই পাকিস্তানিরা গুলি করে মেরে ফেলে। ২৫ তারিখ সকালেও তিনি এসে আমাকে বলে গেছেন যে,

“তুমি তো চলে যাবে, আমার কী দায়িত্ব থাকল বল ।'

আমি বঙ্গবন্ধুর দু'চারটে কথায় তাঁর মনের অবস্থা যতটা বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি নিজ জীবনকে নিয়ে ঝুঁকি নিচ্ছেন। ঝুঁকি নিচ্ছেন এভাবে যে, আমাকে যদি ধরে নিয়ে যায় তাহলে এটা নিয়ে আন্দোলন হবে এবং সারা দেশে এমন আগুন জ্বলে উঠবে যে, তাতে স্বাধীনতা আসবে। বা, আমাকে যদি ওরা হত্যা করে ফেলে তাতেও এমন আগুন জ্বলবে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। সো আইদার ওয়ে দি অবজেক্ট উইল বি ফুলফিল্ড্। এটা হয়ত তাঁর মনে ছিল যে অনিশ্চিত যেটা সেটা আমি কীভাবে করতে পারব জানি না, সশস্ত্র বিপ্লব করার আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, কাজেই আমি আনসার্টেন অবজেক্টের মধ্যে নিজেকে কেন ফেলছি ? আমি যদি আমার জীবনটাকে নিয়ে বাজি খেলি তাহলে স্বাধীনতা তো অটোম্যাটিক্যালি হবেই—তো তিনি হয়ত সেটা বাজি রেখেছিলেন। এর একটা লজিকও আছে। যুক্তিটা হচ্ছে এই, যে কাজটা তাজউদ্দীন সাহেব বা আমরা করলাম, এই কাজটার ফলাফল কিন্তু অনিশ্চিত ছিল । কিন্তু তিনি যে কাজটা করেছেন এর ফলাফল কিন্তু খুব নিশ্চিত, কারণ হচ্ছে যে তাঁকে জেলে বন্দি রেখে বা হত্যা করে পাকিস্তান এক থাকবে এটা সম্ভব না । কিন্তু আমরা যে কাজটি করতে গিয়েছিলাম এতে অনিশ্চয়তা ছিল ।

বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার শেষ দেখা হয় ২৫ তারিখে রাত ১২টার আগে, কিন্তু এর আগে একবার আমি রাত ৯টার দিকে প্রেস বিজ্ঞপ্তির কপি সাইক্লোস্টাইল করে প্রেসে পাঠিয়ে তাঁকে কপিটা দেখালাম। তখন তিনি দেখে হঠাৎ বললেন, “কে বলে আমি ঘোষণা দেইনি, আমি সব কথাই বলে দিয়েছি। ৭ মার্চে বলেছি, আজকেও বলেছি, সব কথাই বলে দিয়েছি, বাকি কিন্তু আমি কিছু রাখিনি।' বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে যাবার সময় আমি অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ সাহেব এবং তোফায়েলকে ঢুকতে দেখলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আমি তাজউদ্দীন ভাইয়ের বাড়িতে গেলাম। তিনি উত্তেজিত হয়ে আছেন, বললেন, ‘দেশের এই অবস্থায় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আর এই সমস্ত মহিলারা এসেছেন তদবির করতে সংরক্ষিত আসনের জন্য।' তার মধ্যে তিনি তাঁর একটা ব্যাগ খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি আবার তখন ওখান থেকে বেরিয়ে পাশের এক বাসায় গেলাম। ক্ষুধাও লেগেছিল, সেখানে কিছু খেয়ে আবার তাজউদ্দীন ভাইয়ের নূরজাহান মুরশিদ সেখানে এসেছেন। তখন মুরশিদ সাহেবকে বললাম, “শহরের অবস্থা খুব ভাল মনে হচ্ছে না, চলুন,

আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেই, তারপর দেখি কিছু ভাবা যায় কিনা ।'

তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আমি আমার বাসাতে যাব, তখন দেখি যে পাকিস্তান আর্মি রেডিও স্টেশন টেক ওভার করছে অ্যাট গানপয়েন্ট, আর্মি শহরে নেমে পড়েছে। তখন আমি কামাল হোসেনের বাসায় গেলাম। কামাল হোসেন তাঁর ৩ নম্বর সার্কিট হাউসের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আহমদুল কবির আর লায়লা কবিরকে বিদায় জানাচ্ছেন। আমি বললাম, "বিদায় পুনশ্চ বেশি না করে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান, অবস্থা খুব ভাল মনে হচ্ছে না।' তাঁরা তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠলেন। তারপর কামাল হোসেনকে বললাম, 'আপনার তো বাসায় থাকা ঠিক হবে না।' তিনি বললেন, "ঠিক আছে, আমি তৈরি হয়ে নেই।' এবার আমি আমার বাসায় গেলাম। আমার স্ত্রীকে বললাম, 'আজকে অবস্থা খুব ভাল না, বাইরে চলে যাচ্ছি।' আরো দু'চারটে কথা বলে আমি কামাল সাহেবকে নিয়ে বের হলাম । কিন্তু রাস্তা দিয়ে আর যেতে পারি না, কর্মীরা গাছ ফেলে শাহবাগের ওখানে ব্যারিকেড দিয়ে ফেলেছে। কর্মীরা আমাদের চিনল । তারা কিছু কিছু জায়গা খালি করে আমার গাড়ি পার করার ব্যবস্থা করেছিল।

তারপর আমরা গেলাম বঙ্গবন্ধুর বাসায় । তখন সেখানে কেউ নেই । তাঁকে আগে গেঞ্জি পরা অবস্থায় দেখেছি, তখনও গেঞ্জি পরা অবস্থায় দেখলাম। আমি বললাম, 'আর্মি সমস্ত শহর টেকওভার করে নিচ্ছে।' তিনি বললেন,— আমি খবর পেয়েছি, ইয়াহিয়া খান যাবার পর পরই এখানে ধরপাকড়-গোলাগুলি শুরু হবে। তোমরা এখনই আমার বাড়ি থেকে চলে যাও।' আমি বললাম, 'আমরা তো আপনাকে এখান থেকে না নিয়ে যাব না ।' তিনি বললেন, 'আমি যা বলব, আমার নির্দেশ তোমরা মানতে বাধ্য। আমি তোমাদেরকে কোনদিন কোন আদেশ করি নাই । আমি এই মুহূর্তে তোমাদেরকে আদেশ করছি, তোমরা আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।'

আমরা তখন তাঁর বাসা ত্যাগ করে চলে এলাম সাত মসজিদ রোডে । তাজউদ্দীন ভাই তখন গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরে বাগানে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। তাঁকে বললাম, 'পরিস্থিতি তো বেশি ভাল না, বেরোতে হবে।' তিনি বললেন, 'বেরিয়ে কী হবে!' জিজ্ঞেস করলেন, 'বঙ্গবন্ধু কী বললেন ?' বললাম, "বঙ্গবন্ধু তো বেরুবেন না, বললেন যে ইয়াহিয়া খান চলে গেলেই গোলাগুলি শুরু হবে।' তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে,

আপনারা দাঁড়ান।' তারপর তিনি ভেতরে গেলেন। লুঙ্গি পরাই থাকল, উপরে একটা পাঞ্জাবি পরেছিলেন । হাতে একটা পিস্তল, রাইফেল, একটা কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ ।

আমরা গাড়িতে উঠলাম, কোথায় যাব এই নিয়ে আমরা যখন নানা রকম চিন্তা করছি তখন কামাল হোসেন খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। এর আগে যখন তাজউদ্দীন ভাই আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে গিয়েছিলেন তখনই তিনি বলেছিলেন, 'তাঁর তো বের হতে দেরি হচ্ছে, আমাকে একটু পৌঁছে দিয়ে আসুন।' আমি তখন বলেছিলাম, 'সেটা হতে পারে না।' তারপর যখন তাজউদ্দীন সাহেব বেরোলেন তখনও দেখলাম যে উনি আমাদের সাথে একত্রিত থাকতে চাচ্ছেন না। যখন বঙ্গবন্ধু বাড়ি ছেড়ে যেতে চাননি তখনই কামাল হোসেনের মনে নানা রকমের দোদুল্যমানতা দেখা দিয়েছিল । তিনি নেমে গেলেন ১৩ নম্বরে, তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সে বাড়ির দরজা খোলে না, গেট খোলে না। আমি বললাম, 'যদি আপনি যেতেই চান, গেট টপকে চলে যান ।' কথাটি আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম। তার মানে আমি পছন্দ করিনি যে তিনি আমাদের ছেড়ে এভাবে চলে যান ।

তারপর আমি আর তাজউদ্দীন ভাই লালমাটিয়াতে ইঞ্জিনিয়ার গফুর সাহেবের বাড়ি গেলাম । গফুর সাহেব আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন । একটা ঘরে শুধু একটা চৌকি ছিল, আমরা সেই চৌকির উপরে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই চৌকিটা ভেঙে গেল এবং প্রায় সেই একই সময়ে বিকট একটা বোমা বিস্ফোরণের শব্দ এল, মনে হল ক্যান্টনমেন্টের দিক থেকে। এই শব্দের সাথে সাথে শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আর্মিরা তখন স্থান নিয়েছিল, তারা গোলাগুলি শুরু করল । ওই গোলাগুলি যখন হচ্ছে চারদিকে তখন আমরা ছাদের উপর গিয়ে দেখার এবং বোঝার চেষ্টা করি কোথায় গোলাগুলি হচ্ছে। গোলাগুলিতে সমস্ত আকাশ দিনের আলোর মত আলোকিত হয়ে যাচ্ছে। কখনো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, কখনো মনে হয়েছে পুরনো ঢাকায়, কখনো মনে হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কাছে—অজস্র গোলাগুলি চারদিকে। প্রথমদিকে কিছুটা 'জয় বাংলা' শব্দ পাওয়া গেল। আর মোহাম্মদপুরে বিহারিরা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে স্লোগান দিচ্ছে। ছাদ থেকে আমরা এই স্লোগানগুলো শুনছি। এক সময় আস্তে আস্তে সেই স্লোগানগুলো থেমে গেল ।

এটা বোঝা গেল যে, সারা শহরে একটা হত্যাযজ্ঞ চলছে। মনে হল যে একটা

দানবীয় হামলা শুরু হয়েছে। একতরফা আক্রমণ চলছে। আমাদের এমন একটা ধারণা ছিল যে, বোধ হয় আমাদেরকে গ্রেফতার করবে এবং একটা পুরো মিলিটারি ক্রাক-ডাউন করবে, সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করে দেবে এবং আমাদেরকে এর মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু গণহত্যা শুরু করবে তা আমাদের ধারণা ছিল না। সাধারণ নিরীহ জনগণের উপর অস্ত্র ব্যবহৃত হবে তা আমরা বুঝতে পারিনি। ওরকমভাবে সারারাত কাটল ।

২৬ তারিখে সকালবেলা আমি বাথরুমে ঢুকে আমার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি শেভ করে ফেললাম। বেরিয়ে আসার পর তাজউদ্দীন ভাই বললেন, 'আমি একজন নতুন মানুষ দেখছি।' সেদিন থেকেই আমাদের পালাবার বা অন্য জায়গায় আমরা কীভাবে সংগঠিত করব সেই প্রস্তুতি গ্রহণ করি । কারণ, দেখলাম যে আর্মির জীপ ওই পাড়াতে চলাফেরা করছে এবং ২৫ তারিখ রাত থেকেই ফিজিক্যাল ইন্সটিটিউটে আর্মি এসে স্থান নিয়েছে। ওখানে একটা টাওয়ার করে সমস্ত এলাকার উপর নজর রাখছে। সেদিন সমস্ত ঢাকা শহরটাকেই তারা চিহ্নিত করে ফেলেছিল যে তারা কোথায় কোথায় স্থান নেবে, এবং সে সমস্ত জায়গায় মিলিটারি পজিশন নিয়ে নিয়েছে। এই রকম সারা ঢাকা শহরেই তারা স্থান নিয়েছিল । আমরা তখন দেখলাম যে, আমরা একটা নাজুক পরিস্থিতিতে আছি । আমরা এমন একটা বাড়িতে আছি যেখানে পরিবারের আর কোন সদস্য নেই । কোন মেয়েমানুষ, কোন ছেলেপেলে কেউ নেই। গফুর সাহেব, তাঁর এক ভাতিজা, আমরা দু'জন—এই চারজন লোক আছি ।

এখন নিজেরা যদি অন্য কোনরকম একটা অবস্থার মুখোমুখি হই তাহলে কী করব সেটাও আমরা ঠিক করে ফেললাম। গফুর সাহেব হচ্ছেন কনট্রাক্টর । তাজউদ্দীন সাহেব নাম গ্রহণ করলেন মোহাম্মদ আলি, আর আমি নাম গ্রহণ করলাম রহমত আলি। মোহাম্মদ আলি সাহেব গফুর সাহেবের ঠিকাদারী কাজটা ওখানে দেখাশুনা করেন । আর আমি পাবনায় থাকি, পাবনা থেকে বেড়াতে এসেছি, কিন্তু এখন আমরা এখানে আটকা পড়ে আছি। এরপর পরবর্তী যে সমস্যা সেটা হল রাইফেল নিয়ে—রাইফেলটাকে আমরা কোথায় কীভাবে রাখব। এই পরিস্থিতিতে ২৬ তারিখ সারাদিনই চলে গেল। আমরা রাতে রেডিও অস্ট্রেলিয়াতে শুনতে পেলাম যে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নির্বিচারে বাঙালিদের হত্যা করছে। পূর্ব পাকিস্তানের এই অবস্থা সম্পর্কে রেডিও অস্ট্রেলিয়ার মাধ্যমেই প্রথম বাইরের বিশ্ব জানতে পারল। এরপর বিবিসি এবং ভারতীয় রেডিওতেও শোনা গেল। আর ইয়াহিয়া খানও পাকিস্তান

রেডিওতে বক্তব্য দিলেন রাত্রিবেলা । সমস্ত দোষ আওয়ামী লীগের উপর এবং শেখ মুজিবের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এবং এই সমস্ত বলে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । আমাদের তখন সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, আমাদেরকে এখান থেকে বেরোতে হবে এবং একটা বিপ্লব, একটা সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং সারা বাংলাদেশব্যাপী আমাদের একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। সে জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের যে সমস্ত সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন সেগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই কারণে আমরা এখান থেকে সবচেয়ে দ্রুত কীভাবে বেরুতে পারি তখন সেই পরিকল্পনা আমাদের মাথায়।

২৭ তারিখ সকালবেলা দেখলাম যে, কিছুটা জীবনের গতি এসেছে। যদিও কারফিউ, কিন্তু পেছনের গলি দিয়ে লোক পানি আনতে যাচ্ছে কলতলাতে । বস্তির লোকেরা বেরোচ্ছে, আর কেউ কেউ ঝাঁপিতে করে জিনিস বিক্রি করছে। এদিকে আমাদের খাবারের রসদও কমে আসছে । এই রকম পরিস্থিতিতে এখানে বেশিক্ষণ থাকা সমীচীন নয়। আর এখানে থেকে তো কারো সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি না। আমি ২৭ তারিখ সকালবেলাতেই একজন মুসল্লির মত লোককে পেলাম ওই বাড়ির সামনে। আলাপ করে জানলাম তাঁর বাড়ি পাবনা জেলায়। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা কিনা এবং কুষ্টিয়ার আতাউল হকের বাড়ি চেনেন কিনা। তিনি বললেন তিনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং আতাউল হক সাহেবের বাড়ি চেনেন। তিনি আমাকে আতাউল হক সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলেন ।

তাঁরা আমাকে দেখে সাদরে গ্রহণ করলেন। তখন আমি ওই মুসল্লি ভদ্রলোককে বললাম, 'চাচা, আমাকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন ওই বাড়িতে মোহাম্মদ আলি সাহেব আছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে আসেন।' ওই ভদ্রলোক গেলেন, তাজউদ্দীন সাহেব ১৫/২০ মিনিটের ভিতরেই এসে পৌঁছালেন। তাঁর মাথায় একটা টুপি, লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরা। এবার আমরা লালমাটিয়া থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা, সাত মসজিদ রোড এবং ফিজিক্যাল ইন্সটিটিউট-এর আশপাশটা দেখতে গেলাম। যেইমাত্র সাত মসজিদ রোডের মুখোমুখি হয়েছি, দেখলাম যে একটা জীপ থেকে পাক আর্মিরা গুলি করতে করতে এগিয়ে আসছে। যেহেতু খুব কাছাকাছি ছিলাম তাই গুলিগুলো মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। আমরা তখন একটা বাড়ির পেছনে প্রাচীরের পাশে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তারপরে জীপটি পার হয়ে গেল । আর্মিরা এই জীপটা থেকে তখন চারদিকে

গোলাগুলি করছে আর এই বস্তিগুলি পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং একটা মিলিটারি বাংলায় বলছে, সব সরে যাও, সব সরে যাও। বস্তিগুলো পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং বস্তির লোকগুলো সব এসে আতাউল হক সাহেবের বাড়ির আশেপাশে স্থান নিচ্ছে। অনেক লোক জড়ো হল, এলোপাতাড়ি গুলি হচ্ছে ।

আতাউল হক সাহেবের তখন টিন শেড বাড়ি, সাইডের দেওয়ালটাও টিনের। তখন মনে হচ্ছিল এই টিন ছিদ্র হয়ে গুলি আমাদের গায়ে লেগে যাবে। আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে বললাম, 'চলুন পাশের বাড়িটাতে যাই। ওখানে লোকজন নেই এবং ওই বাড়ির চাবিটাও আতাউল হক সাহেবের বাড়ির লোকের কাছে আছে, দরজা টপকে চলে যাওয়া যাবে।' এটা ২৭ তারিখ। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আমি আর এখান থেকে নড়ছি না, গুলি লাগলে লাগবে।' তিনি রইলেন, কিন্তু আমি দেয়াল টপকে পাশের বাড়িতে গিয়ে থাকলাম। তারপর গোলাগুলি যখন কমল, তখন আবার ফিরে এলাম । ইতোমধ্যে ওই অঞ্চলের কিছু ছাত্র বুঝে ফেলেছে যে, আমরা এখানে আছি। সেই ছাত্ররা এসে আমাদেরকে রিপোর্ট করতে লাগল কী হয়েছে না হয়েছে। দেখলাম যে আর এখানে অপেক্ষা করা ঠিক নয় । আমরা ভাবছি কী করে সাত মসজিদ রোডটা পার হওয়া যায় । কিছুক্ষণের জন্য যেই পাকিস্তানিরা কারফিউ তুলেছে, সাথে সাথে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একটা বাজারের থলেমত হাতে নিয়ে। আমাদের দু'জনের মাথায় টুপি, যেন আমরা বাজার করতে যাচ্ছি। কয়েকটি রাস্তা পার হয়ে ধানমন্ডির ১৯ নম্বর যেখানে শেষ হল সেখান দিয়ে আমরা ভেতরের দিকে রায়ের বাজারের দিকটায় চলে যাবার পথে তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'একটু বাড়ির খবর নিয়ে গেলে কেমন হয় ?' আমি এতে খুব আপত্তি জানালাম, বললাম, 'আপনার বাড়ির উপর নিশ্চয় আঘাত হয়েছে এবং আপনার বাড়ির উপর এখনো নজর আছে, বাড়িতে গেলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।' তাজউদ্দীন সাহেব আর বাড়িতে গেলেন না ।

এখান থেকে আমরা রায়ের বাজারে ঢুকলাম। রায়ের বাজারে যেতেই আমাদের আওয়ামী লীগের কর্মীরা আমাদের চিনে ফেলল, তারা আমাদেরকে সংগ্রাম পরিষদের অফিসে নিয়ে তুলল। সংগ্রাম পরিষদ তখন রায়ের বাজারে একটা অফিসও করেছে। সেই অফিসে রীতিমত রাইফেল হাতে করে একজন পাহারা দিচ্ছে এবং সেখানে সমস্ত কর্মীরা তখনো কার্যরত আছে এবং তাদের সাহস অত্যন্ত বেশি। তাদের এতখানি সাহসের মুখে বাস্তব কথা বলতেও যেন আমাদের কষ্ট হচ্ছে। আমরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করে নিয়ে

ভেতরের রুমে গিয়ে আলাপ করলাম। বললাম যে, এই অবস্থাতে রাইফেল নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। আমাদের যে মিলিট্যান্ট ফোর্স আছে সেটাকে এখানে তাজা রাখতে হবে, কিন্তু কোন প্রকাশ্য সভা, অফিস ইত্যাদি না রেখে সারা শহরে আমাদের যোগাযোগ তৈরি করতে হবে। আমাদের কোথায় সংগ্রাম পরিষদের লোকজন আছে না আছে ইত্যাদি রিপোর্ট করতে হবে এবং এই মুহূর্তে যোগাযোগটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, যেন এক জায়গার খবর অন্য জায়গায় চলতে পারে। আমাদের যে অস্ত্র এবং ট্রেনিং এইগুলি নিয়ে এই সেনাবাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে হলে সম্মুখযুদ্ধে করা যাবে না, গেরিলা কায়দায় করতে হবে । তাদের সাথে কথা বলে সেখানে বসেই আমরা দুটো চিঠি লিখলাম । একটা তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর স্ত্রীকে লিখলেন, আর একটি আমি আমার স্ত্রীকে লিখলাম। পরে আমরা দু'জন যখন আলাপ করলাম তখন দেখলাম যে আমরা দু'জন প্রায় একই কথা লিখেছি, বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, জনগণের মধ্যে তোমরা হারিয়ে যাও। যদি আমরা কোনদিন জয়ী হতে পারি তাহলে দেখা হবে—এই ভাবধারার একটি কথা, তিন-চার লাইনের কথা । পরে জেনেছি, তাজউদ্দীন সাহেবের চিঠিটা পৌছেছিল, কিন্তু আমার চিঠিটা বোধ হয় পৌছাতে পারেনি।

কর্মীরা আমাদেরকে দুই জোড়া জুতা সংগ্রহ করে দিল। সেটা পায়ে দিয়ে অনেক পথ হাঁটতে হবে, এটা তারা বুঝতে পেরেছিল । এই কর্মীরাই আমাদেরকে রায়ের বাজারের পাশ দিয়ে যে ছোট্ট নদী আছে সেই নদী পার করে দিল একটা খেয়াতে। নদীর ওপারে যতদূর চোখ যায় শুধু মানুষের কাফেলা। আক্রমণের মুখে বাড়িঘর ফেলে তারা ঢাকা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, খুবই হৃদয়বিদারক দৃশ্য । আমাদের কাছে এটা খুব করুণ মনে হচ্ছিল যে, নিজের শহরকে ছেড়ে আজ হাজার হাজার লোক গ্রামে আশ্রয় নেয়ার জন্য চলে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে এই গরিব মানুষরা ছিল আর্মির মূল লক্ষ্য। এই রকমভাবে আমরা বহু পথ হাঁটলাম । হেঁটে আর একটা নদী পার হলাম। সে নদী পার হয়ে আমরা দোহার থানার ভেতরে গেলাম ।

যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই আমাদের কর্মীদের সাথে দেখা হচ্ছে। একটা বাজারে গেলাম। সে বাজারে কর্মীরা দ্রুত সভার আয়োজন করল। সেই সভায় তাজউদ্দীন ভাই ও আমি বক্তৃতা দিলাম। মিটিংয়ের পর আমরা সেখানে কিছুক্ষণ বসলাম। দোহার থানার আওয়ামী লীগের ও অন্যান্য দলের নেতারা এলেন । তাঁদের সাথে বৈঠক হল । যাবার পথে সব জায়গাতেই বাজার

পাচ্ছি, হাট পাচ্ছি, থানা পাচ্ছি; সর্বত্রই আমরা বলছি যে, এখানে এই সংগ্রাম পরিষদের অধীনে প্রশাসনকে নিয়ে আসা হোক । পুলিশ, আর্মি, আনসার বাহিনী তাদেরকে একত্রিত করে আমাদের একটা বিদ্রোহী ফোর্স তৈরি করা এবং আর্মি যদি এদিকে আসে তবে সম্মুখসমরে না গিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করা, অপদস্থ করা, তাদেরকে সবকিছুতে অস্বীকার, অসহযোগিতা করা, গ্রাম ছেড়ে প্রয়োজন হলে অন্য গ্রামে চলে যাবে—এই রকম এক একটা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছিলাম। অনেক গ্রামে দেখেছি যে লোক মারা গেছে, জানাজা হচ্ছে। ওই রকম দু'একটা জানাজাও আমরা পড়লাম, ঢাকা শহরে গুলিবিদ্ধ হয়ে এই লোকেরা মারা গেছে । এই যে মানুষের ঢল যাচ্ছে, তাদেরকে কিছু সাহায্য করবার জন্য প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে কৃষকরা মুড়ি, চিড়া, পানি নিয়ে তাদের বাহির বাড়িতে রেখেছে, কেউ কেউ রাস্তার উপরে রেখেছে। যারাই যাচ্ছে, তারা বলছে, আপনারা কিছু খেয়ে যান, কিছু পানি খেয়ে যান।' এই রকম একটা আতিথেয়তা—এ এক অপূর্ব দৃশ্য, এ আর দেখা যায়নি আগে। আমরা ভাবলাম এটাই হচ্ছে চিহ্ন যে আমরা স্বাধীন হব। এই লোকদেরকে তো কেউ নির্দেশ দেয়নি, কেউ বলে দেয়নি। কিন্তু তারা সমস্ত খাদ্যদ্রব্য এনে বলছে, 'আমাদের বাসায় থাকেন, আপনারা খেয়ে যান, অনেক পথ যেতে হবে।' এই যে আতিথেয়তা দেখা যাচ্ছে, এর তুলনা হয় না। আমরা নদী-খাল পার হচ্ছি, খেয়ার মাঝিরা কোন পয়সা নিচ্ছে না। তারা বিনা পয়সায় লোকদের পার করে দিচ্ছে। এক চরম একাত্মতা, যা আমি বাংলাদেশে আর কখনো দেখিনি ।

যেমন আমাদের সাথে যাচ্ছে এক বৃদ্ধা, সে নিজের পোটলাটা বইতে পারছে না, তার পোটলাটা আমিই আমার মাথাতে তুলে নিলাম। আর তাজউদ্দীন সাহেব একটা বাচ্চা ছেলের হাত থেকে তার বোঝাটা তুলে নিলেন। এইভাবে আমরা কিছুদূর এগিয়ে দিলাম । এই রকম সকলেই সকলের জন্য এগিয়ে আসছে। পথে একজন কর্মী একটা মোটরসাইকেল নিয়ে এল। সে মোটরসাইকেল নিয়ে এসেছে আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য । শহরে যেহেতু এই রকম ঘটনা ঘটেছে, এ পথে আমাদের নেতারা কেউ যাবেন, দেখা হবে, এটা সে প্রত্যাশা করে বসে আছে। সে আমাদেরকে স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্টের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে ওই সন্ধ্যাবেলায় আমি তোলা পানিতে গোসল করলাম, তাজউদ্দীন সাহেব পুকুরে নেমে গোসল করলেন। তারপর আমরা ওই বাড়িতে বৈঠকখানায় থাকলাম, খাওয়াদাওয়া করলাম।

যেহেতু মোটরসাইকেল ছিল একটা, তাই ছেলেটি সন্ধ্যার পর তাজউদ্দীন সাহেবকে নিয়ে গেল কিছুদূর, তারপর আবার ফিরে এসে আমাকে নিয়ে গেল।

এর পরদিন সকালবেলা দুটো মোটরসাইকেল পাওয়া গেল, আমরা দু'জন দুটোর পিছনে বসলাম । এখান থেকে আমরা গেলাম সুবেদ আলি টিপুর বাড়িতে । সুবেদ আলি টিপুকে পেলাম । তাঁকে বললাম, এখানে থাকতে হবে, লড়াই করতে হবে এবং যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে—এই কথাই আমরা সব জায়গায় বললাম । তিনি তখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আমরা যাচ্ছি কোথায় । আমরা তাঁকে বলেছি যে, আমরা সব জায়গাতেই যোগাযোগ করতে যাচ্ছি এবং শীঘ্রই এই যুদ্ধের নির্দেশ পাবেন । কীভাবে কী সংগঠিত করতে হবে, কোথায় কী পাওয়া যাবে সব নির্দেশ পাবেন। আমরা তখনও বলছি না আমাদের উদ্দেশ্য কী, আমরা কোথায় যাচ্ছি। আরো অনেক আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী সবার সাথে দেখা হল দোহার থানাতে ।

ওখান থেকে মোটরসাইকেলে আমরা এলাম আশরাফ আলি চৌধুরীর বাড়িতে। তিনিও প্রায় তখনই বাড়ি এসে পৌঁছেছেন। তাঁর দোতলা কাঠের বাড়ি । সেখানে আমরা হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। তিনি তখন আমাদের প্রভাবশালী নেতা। খাওয়াদাওয়ার পর আশরাফ আলি চৌধুরী তাঁর কলেজের বা স্কুলের দফতরি দিয়ে মোটরসাইকেলে আমাদের পৌছে দিলেন পদ্মার পারে। পদ্মার পারে এসেও আমরা পার হতে পারলাম না । সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর পদ্মায় তখন খুব উত্তাল ঢেউ। কোন মাঝি আমাদের পার করতে রাজি হল না। তখন আমরা ওইখানে আওরঙ্গবাদ নামক গ্রামে একটি তাঁতি পরিবারে থাকলাম। সেখানে গোসল করে খাওয়াদাওয়া করলাম। সেইদিনই আমরা রেডিওতে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনলাম। বুঝলাম যে সামরিক বাহিনীর ভিতরেরও কিছু লোকজন পাওয়া গেছে ।

পরদিন সকালবেলা আমরা নদী পার হলাম। পার হয়ে ওপারে গেলে একটা বাজার পেলাম । সেই বাজার থেকে আমাদেরকে দুটো ঘোড়া সংগ্রহ করে দেয়া হল । সে দুটো ঘোড়াতে চড়ে আমরা ফরিদপুরে যাব। কারণ সেখানে যে পথ সে পথে ঘোড়া ছাড়া আর কোন যানবাহন চলে না। ঘোড়াওয়ালা পিছনে পিছনে দৌড়ায়, আর আমরা ঘোড়ায়। এই দুই ঘোড়ায় চড়ে আমরা দুপুর নাগাদ ফরিদপুর শহরে এসে পৌছলাম ।

ফরিদপুর শহরে আমাদের আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি এবং এমপি

ইমামউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে গেলাম। সমস্ত শহর একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে। কারণ তখন ওখানে বিরাট গুজব যে আর্মি যে কোন সময় ফরিদপুরে এসে আক্রমণ করবে। তাই ফরিদপুর শহরের লোক সব পালিয়ে গেছে। ইমামউদ্দিন সাহেবও দূরে ছিলেন, শহরের বাইরে। তাঁর স্ত্রী দেখলাম খুব সাহসী মহিলা । তিনি আছেন এবং কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করছেন। তিনি আমাদের জন্য রান্নাবান্না করলেন। তাজউদ্দীন ভাই বললেন, 'শুধু ডালভাত খাব।' তাই তিনি ডালভাত তৈরি করেছেন। আমরা যখন খেতে বসছি তখন কিছু লোকজন এবং কর্মীরা এসে বলল যে, আর্মি এদিকে চলে আসতে পারে। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আর্মি আসলে জানিয়েশুনিয়ে আসবে। আগে ডালভাত খেয়ে নেই ।' উনি খুব দৃঢ়চিত্ত এবং সহজ ছিলেন, মানে মাথা খুব ঠাণ্ডা, উত্তেজনার কোন চিহ্ন ছিল না । জুতার কারণে তাঁর হেঁটে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে, ইতোমধ্যে পায়ের ফোসকা ফেটে গেছে; কিন্তু আমরা শক্তভাবেই হেঁটে এসেছি।

এরপর ওখান থেকে আমরা রিকশা নিয়ে কিছুদূর আসতেই পথে দেখা হল রাজবাড়ির এসডিও শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদের সাথে। তার কাছে খবর পেলাম যে, সে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত গিয়েছিল এবং ওইদিকে মুক্ত অঞ্চল হয়ে গেছে এবং কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ওই সমস্ত অঞ্চলের খবর খুব ভাল। প্রতিরোধ আন্দোলন খুব ভাল চলছে। এইসব এলাকা আমাদের সংগ্রামী মুক্তিবাহিনীর দখলে এবং কুষ্টিয়া দখলের জন্য প্রস্তুতি চলছে। সেখান থেকে আর্মিকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনাও চলছে। আমরা রাজবাড়ির এসডিও-র কাছে ভাল খবর পেলাম। ফরিদপুরের এসপি মিহির খুব একটা সহযোগিতা করছিল না। তাই তার সাথে দেখা না করে রিকশায় আবার রওনা হলাম ।

কিছুদূর যাবার পর আর রিকশা চলে না। কারণ ইতোমধ্যে আমাদের সংগ্রাম কমিটির লোকজন গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। তখন কিছুদূর আমরা হাঁটলাম । আবার কিছুদূর পর দেখলাম একটা বাস চলছে । সে বাস কিছুদূর গিয়ে আর খাদ অতিক্রম করতে পারে না । বাস ওখানে থামল । তারপর আমরা হেঁটে হেঁটে যখন কামারখালি ঘাটে পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হবে হবে। সেখানে আবার আমরা রেডিওর ঘোষণাটা শুনলাম। রেডিও থেকে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, পাক বাহিনীর বিভিন্ন কমান্ডোরা নানা জায়গায় আছে। অতএব আপনারা সাবধানে থাকুন, ইত্যাদি ।

আমরা নৌকাতে করে কামারখালি ঘাট পার হলাম। পার হয়ে হাঁটছি। মাগুরা ওখান থেকে ৮ মাইল পথ। আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে মাগুরাতে সোহরাব আলি সাহেবের কাছে । তাঁকে ২৫ মার্চের আগে কিছু টাকা দেয়া হয়েছিল অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। তাঁর কাছে গেলে একটা খবর পাওয়া যাবে যে তিনি কোন যোগাযোগ করতে পেরেছেন কিনা ।

আমরা হাঁটছি, আমাদের সঙ্গে বহু লোকজনও হাঁটছে। কারণ যারা নদী পার হয়েছে তারাও মাগুরাতে যাবে, কিন্তু কোন যানবাহন নেই। প্রায় ২০/৫০ জন লোক আমরা একসাথে যাচ্ছি, হাঁটছি। আমাদেরকে যেন কেউ চিনতে না পারে সে রকম বেশভূষা ধরে আমরা যাচ্ছি। মাগুরার কিছু আগে একটা কাঠের সেতু আছে চলাচলের জন্য। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি সেই কাঠের সেতুতে আগুন দেয়া হয়েছে, পাকিস্তানি কমান্ডোরা যাতে না আসতে পারে। সেটা তখনও জ্বলছে। এদিকে আমরা যখন নৌকায় উঠেছি তখন ওপার থেকে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে যে, নৌকায় কে আসছে । আমরা এপার থেকে বলছি, 'বন্ধু । তারা বলল, "ঠিক আছে, আসো।'

ইতোমধ্যে ওখানে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়ে গেছে; বন্দুক নিয়ে তারা পাহারা দিচ্ছে, কারা আসছে-যাচ্ছে এটা চেক করার জন্য। সবাই নৌকায় পার হবার পর শেষ যাত্রী ছিলাম আমরা। যে আনসার সেখানে দায়িত্ব পালন করছিল সে আমাদের সার্চ করল। আমার কাছে তো কিছু নাই । তাজউদ্দীন সাহেবকে সার্চ করতে গিয়ে পিস্তল পেয়ে মুখের দিকে চেয়ে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। তাজউদ্দীন সাহেবকে সে চিনতে পেরেছে।

তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'সোহরাব সাহেব কোথায় আছে আমাদেরকে বলো।' ছেলেটি বলল যে, 'সোহরাব সাহেব বাড়িতে নেই, শহরের একটু বাইরে আছেন।' আমরা বললাম, 'আমাদেরকে একটু নিয়ে যেতে পারো ?' উৎসাহে আনন্দে একেবারে ফেটে পড়ছে ছেলেটি। রাত দেড়টা-দুটোর সময় রিকশাওয়ালার বাড়ি গিয়ে রিকশা নিয়ে এল এবং আমরা সোহরাব সাহেবের বাড়ি যখন গেলাম তখন রাত তিনটা । আমরা তখন এত ক্লান্ত যে এই রকম ক্লান্ত আর কখনো হয়েছিলাম বলে মনে হয় না । ২৭ তারিখ ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছি, ২৮ তারিখের পর ২৯ তারিখ আসছে, অর্থাৎ ২৯ তারিখ শুরু হবে। ২৮ তারিখ দিবাগত রাত, তারপর যখন আমরা সোহরাব সাহেবের বাড়িতে রান্নার পর ভাত খেলাম, তখন ভোর চারটা ।

সকাল সাতটার মধ্যেই আমরা আবার তৈরি হয়ে গেলাম বের হবার জন্য। ওখানে তখন মাগুরার এসডিও কামাল সিদ্দিকী খুব ভাল সংগঠন করেছে। সে বিডিআর, আনসার, পুলিশ সকলকে নিয়ে একটা বাহিনী করে ফেলেছে । সংগ্রাম পরিষদের যে স্থানীয় নেতৃত্ব তারা সুন্দর সংগঠন করেছে । মাগুরার সংগঠন দেখে খুব ভাল লাগল । এখানে আমাদেরকে একটা জীপের ব্যবস্থা করে দেয়া হল। সেই জীপে করে আমরা সদর রাস্তা দিয়ে না গিয়ে মাগুড়া থেকে ঝিনাইদহ পর্যন্ত ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের একটা পুরনো রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই ঝিনাইদহ চলে এলাম। ঝিনাইদহ এসে আমাদের যে স্থানীয় নেতা আজিজ, আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি, তাঁর বাড়িতে উঠলাম । এখানকার এসডিপিও এবং পরবর্তীতে ঢাকার এসপি হয়েছিলেন মাহবুব—তাঁকে আমরা ডাকিয়ে আনলাম। মাহবুবের সাথে ইতোমধ্যে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুরের যোগাযোগ হয়েছে এবং কুষ্টিয়া দখল করবার একটা প্রস্তুতি চলছে। সেই অবস্থায় মাহবুবকে আমরা প্রথম আমাদের কনফিডেন্সে নিলাম এবং আমাদের পরিকল্পনার কথা তাঁকে জানালাম। তারপর জীপে করে আমি, তাজউদ্দীন সাহেব আর মাহবুব ঝিনাইদহ থেকে চুয়াডাঙ্গা এলাম ।

মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরী চুয়াডাঙ্গা প্রশাসনেরও ভার নিয়েছেন। আমরা তৌফিক এলাহীর সাথে আমাদের পরিকল্পনার ব্যাপারে আলাপ করলাম । আমি তখন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, চুয়াডাঙ্গা তখন কুষ্টিয়ার ভেতরে। ডা. আসহাবুল হক এবং অন্যান্য সবার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করে দেখলাম সেখানে সংগ্রাম পরিষদ করে তারা খুব ভাল সংগঠিত অবস্থায় আছে। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী হচ্ছেন সেখানকার ইপিআর-এর কমান্ডার । তিনি সেখানকার ইপিআর-এর পুরো প্লাটুন, ব্যাটালিয়ানসহ আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। এখানে আমাদের খুব শক্তিশালী ঘাঁটি পাওয়া গেল। এদের সকলেরই একটা দাবি যে, আমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন, অস্ত্র পেলে আমরা যশোর ক্যান্টনমেন্টও দখল করে নিতে পারি। এই রকম একটা মনোভাব, মনোবল তাদের ।

আমরা যখন ঝিনাইদহ ছেড়ে যাচ্ছি তখন হাজার হাজার লোক ট্রাক ভর্তি করে স্লোগান দিতে দিতে যশোর ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে। 'যশোর ক্যান্টনমেন্ট জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও', 'জয় বাংলা', এই স্লোগানে সমস্ত অঞ্চল মুখরিত এবং মানুষের মনোবল চূড়ান্ত পর্যায়ে। আমরা খুব ধীরস্থির । বুঝছি যে, এভাবে যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল করা সম্ভব নয়। আর যশোর ক্যান্টনমেন্ট

থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি ছুঁড়ছে যাতে মানুষ কাছে ভিড়তে না পারে। কিন্তু মানুষ চারদিক থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট ঘিরে রেখেছে। কুষ্টিয়াতেও একই অবস্থা। কুষ্টিয়াতে পাক বাহিনীর যে প্লাটুনটা ২৬ তারিখে গিয়েছিল তারা প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন, সার্কিট হাউজ, টেলিগ্রাফ অফিস এইগুলো দখল করে বসে আছে । ওখানেও হাজার হাজার মানুষ চারদিক দিয়ে তাদের ঘিরে রেখেছে। তারা যে যা বন্দুক, রাইফেল, গাদা বন্দুক পেয়েছে এইসব নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বসে বসে আর্মির দিকে গুলি ছুঁড়ছে। দুই পক্ষের ক্রস ফায়ারে ওখানকার ডিসি মারা গেছেন। দু'একজন আর্মির লোকও আহত হয়েছে।

এই যে আমরা পথ চলছি, সরকার গঠন এবং পাকিস্তানিদের মোকাবেলা করার চিন্তাটা কিন্তু ২৬ তারিখের পর থেকেই আমরা মনে মনে চিন্তা করছি। ২৭ তারিখ আমরা যখন ঢাকার বাইরে বেরিয়ে পড়েছি তখন আমরা এই কথাটা উপলব্ধি করেছি যে, স্বতঃস্ফূর্ত জনগোষ্ঠী যারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বা যাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাদেরকে একত্রিত করা, প্রয়োজনীয় সহযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং পরিচালনা করা প্রয়োজন। এই জন্য একটা সরকার দরকার এবং সেই সরকারের একটা শক্তিশালী সেন্ট্রাল কমান্ড দরকার । যদি আমরা একটা বিপ্লবী সরকার গঠন করি তাহলে কাল যদি চট্টগ্রামে, বরিশালে বা সিলেটে আরো কয়েকটি বিপ্লবী সরকার হয় তাহলে কোনটা আসল সরকার, কোনটা বৈধ সরকার এটা নিয়ে একটা বির্তকের সৃষ্টি হতে পারে । অতএব এই সমস্ত বিপর্যয় অ্যাভয়েড করার জন্য একটি দায়িত্বশীল এবং আইনানুগ সরকার গঠন করার ক্ষমতা যখন আমাদের রয়েছে, এখন সেটা আমাদের সবচাইতে প্রথম করা দরকার। এই আরগুমেন্টটি এত জোরালো ছিল যে এর বিরুদ্ধে পরবর্তীতে আর কোন কথা উঠতে পারেনি ।

আমি ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়াতে খবর পাঠিয়েছিলাম আমার বাড়ির পাশের কারাগঞ্জ ব্রিজটা অকেজো করে দিতে। ছেলেরা এমনভাবে পরীক্ষা করে সেতুটাকে চলাচলের অযোগ্য করেছিল যে মনে হচ্ছিল পথ ঠিকই আছে । যখন পাকিস্তানি আর্মি ওই পথে যাচ্ছিল আর নিচে পড়ছিল, তখন সাধারণ মানুষেরা ওদেরকে পিটিয়ে মারে। এই পথে একজন আর্মিও কুষ্টিয়া থেকে যশোরে ফিরে আসতে পারেনি। কিন্তু তাদের কাছে এত গোলাবারুদ ছিল যে সেটা ব্যবহার করলে তারা দু'এক মাস যুদ্ধ চালাতে পারত। কিন্তু জনপ্রতিরোধের মুখে তারা মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়েছিল, ফলে পিছিয়ে গেছে ।

আমরা ওখানে থাকতে থাকতেই সংবাদ এল কুষ্টিয়ায় বিজয় অর্জন করা গেছে। তখন সবচাইতে বড় দাবি কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর অঞ্চলের যে, আমাদের অস্ত্র দরকার। এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল স্বাধীন বাংলাদেশের মুখপাত্র হিসেবে ভারতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের কাছ থেকে কী সাহায্য পেতে পারি তার ব্যবস্থা করা । আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা ভারতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করব। আমরা তৌফিক এবং মাহবুবকে নিয়ে সাথে আরো কয়েকজন সশস্ত্র ছেলেসহ বেতনাপুর নামক সীমান্তের বিওপি-র দিকে যাই। পথে দেখি মানুষ এত সজাগ হয়ে গেছে যে পাকিস্তানি আর্মি যাতে না আসতে পারে তাই সব জায়গাতে তারা চেক করছে। আমাদের জীপটাও তারা কয়েকবার চেক করল । মানুষের মধ্যে আর্মির বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করলাম। বিওপি-র কাছাকাছি এসে আমাদের জীপটা বাংলাদেশের ভেতরেই থামানো হল ।

তাজউদ্দীন সাহেব এবং আমাদের সিদ্ধান্ত, আমরা আত্মগোপন করে সীমান্ত অতিক্রম করব না, আমরা সীমান্ত অতিক্রম করব স্বাধীন দেশের সরকারের মুখপাত্র হিসেবে। তখন তৌফিক এবং মাহবুবকে বলা হল, ‘তোমরা স্বাধীন দেশের অফিসার, তোমাদেরকে আমরা ভারতে পাঠাচ্ছি, তোমরা গিয়ে বলবে, স্বাধীন বাংলাদেশের যে হাইকমান্ড তার প্রতিনিধি তাজউদ্দীন সাহেব এবং আমীর-উল ইসলাম সাহেব এসেছেন। একটি স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিদেরকে যেভাবে সম্মান দিয়ে গ্রহণ করতে হয়, সেইভাবে তারা আমাদেরকে গ্রহণ করতে রাজি আছে কিনা জানালে আমরা ভেতরে যাব।' তৌফিক, মাহবুব সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। হয়ত তারা দিল্লীর সাথে, কলকাতার সাথে যোগাযোগ করতে সময় নিচ্ছে।

এদিকে এই জায়গায় একটা কালভার্ট ছিল, দু'পাশে বসবার মত জায়গা ছিল সেখানে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, প্রচণ্ড গরম, বসে থেকে থেকে আমরা শুয়ে পড়েছি, এমন সময় পাশের ঝোপের ভেতর থেকে ভারি বুটের শব্দ ভেসে এল । ওরা এসে আমাদেরকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'স্যার, ইউ আর ইনভাইটেড টু কাম টু আওয়ার ক্যাম্প।' ঠিক যেভাবে বিদেশী রাষ্ট্রের সম্মানিত অতিথিকে গার্ড অফ অনার দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদেরকেও সেইভাবে আমন্ত্রণ জানানো হল । আমরা ভেতরে গিয়ে শুনলাম ইস্টার্ন কমান্ডের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আইজি আমাদের সাথে দেখা করার জন্য ইতোমধ্যে রওনা দিয়ে

দিয়েছেন ।

কিছুক্ষণের ভেতরেই গোলোক মজুমদার এলেন। তাঁর সাথে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল যে, আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের লোকদের বাঙালি হিসেবে আমাদের প্রতি একটা সহানুভূতি আছে এবং থাকবে, কিন্তু আমরা সর্বভারতীয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের রেসপন্স চাই। এবং ভারত সরকার আমাদেরকে সেইরকম আশ্রয়, স্থান দেবে কিনা, যেখানে আমরা ট্রেনিং নিতে পারব, নিয়োগ করতে পারব, অস্ত্রশস্ত্র পাব এমন নিশ্চয়তা। এই কথা শুনে গোলোক মজুমদার বললেন, 'এই প্রশ্নের উত্তর শুধু একজনই দিতে পারেন, তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তবে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারি। এছাড়াও এখানে আসবার আগে আমি দিল্লীতে যোগাযোগ করেছিলাম, সেখান থেকে আজ রাতেই একজন আসছেন আপনাদের সাথে দেখা করতে।' আমরা গোলোক মজুমদারের কথায় রাজি হলাম ।

গাড়িতে কথা প্রসঙ্গে জানলাম, গোলোক মজুমদার ইতিহাসের ছাত্র। তিনি বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি কবিতাটি শুনিয়ে বললেন, বাংলা এমনই একটা জায়গা যেখানে বহিরাগতরা কোনদিনই পেরে ওঠেনি। মান সিং-এর কথা, আরো কয়েকজনের কথা বলে তিনি বললেন, 'ওরাও পারেনি, এবং এই যে আজ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনাদেরকে ধ্বংস করতে নেমেছে, দেখবেন তারাও পারবে না, জয় আপনাদের সুনিশ্চিত।' এমন আশ্বাসবাণী শোনাতে শোনাতে তিনি আমাদেরকে সোজা নিয়ে গেলেন দমদম এয়ারপোর্টে, যেখানে প্লেন থামে ঠিক তার কাছাকাছি জায়গায় । প্রায় ৬ ফুটের মত লম্বা একজন লোক প্লেন থেকে নেমে এলেন। আমরা জীপ থেকে নেমে একটা কালো অ্যাম্বাসেডার গাড়িতে উঠলাম, সাথে সেই ভদ্রলোক এবং গোলোক মজুমদার। এই ভদ্রলোক ছিলেন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী প্রধান রুস্তামজী। আমরা একসাথে 'অসম ভবনে' (আসাম হাউস) গেলাম ।

সেই রাতেই পশ্চিম বঙ্গের পুলিশ চীফ, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সেখানে আনা হল এবং তাঁদের সাথে আমাদের বৈঠক হল। তাজউদ্দীন সাহেব বিস্তারিতভাবে আমাদের আন্দোলন থেকে শুরু করে সমস্ত পরিস্থিতির বর্ণনা দিলেন। ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া সবই আমাদের মুক্ত এলাকা ঘোষিত হয়েছে এবং আমরা কী পরিস্থিতিতে এখানে এসেছি তাও বললেন। প্রত্যেকটি সীমান্ত

জেলার সাথে আমাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা একটা লিস্ট তৈরি করলাম, তাতে সীমান্ত জেলাগুলোর সমস্ত এমপি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নাম দেয়া হল যাতে এঁদের সাথে যোগাযোগ করা যায় এবং তাঁদের নিরাপদ এলাকায় নিয়ে আসা যায়। ওইসব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমাদের টেলিফোনে যোগাযোগ করে দেয়ার ব্যবস্থার জন্য বললাম। সেই রাতেই অয়্যারলেসের মাধ্যমে খবর চলে গেল সীমান্তবর্তী নেতৃবৃন্দকে খোঁজ করতে এবং আমাদের সাথে খবর আদানপ্রদানের জন্য। এছাড়াও অয়্যারলেসের মাধ্যমে পরদিনই চুয়াডাঙ্গায় যোগাযোগ করিয়ে দেবার আশ্বাস দিলেন রুস্তামজী । আলোচনা করতে করতে ভোর রাত হয়ে গেল। আমাদের কাপড়চোপড় কিছু নেই, রুস্তামজী তাঁর পায়জামা-পাঞ্জাবি দিলেন । তিনি মস্ত লম্বা মানুষ, কোন রকমে তাঁর কাপড় পরে আমরা ঘুমাতে গেলাম ।

পরদিন ওঁরা আমাদের জন্য কিছু কাপড় এবং প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দিলেন। সকালে চুয়াডাঙ্গায় আবু ওসমান চৌধুরী এবং ডা. আসহাবুল হকের সাথে ফোনে কথা হল। এদিকে আমরা তখন যে সিদ্ধান্তে এসেছি তা হচ্ছে যে, সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী আমাদের যে প্রস্তুতি আমরা দেখে এলাম পথে পথে, তা যথেষ্ট নয় একটা সৈন্যবাহিনীকে সম্মুখসমরে পরাস্ত বা মোকাবেলার জন্য। অতএব এই সমস্ত ছেলেদের একটা জায়গায় নিয়ে এসে একত্রিত করা, ট্রেনিং দেয়া, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া এবং তারপর যুদ্ধটাকে পরিচালনা করা, এই হল আমাদের চিন্তা । কিন্তু যারা ফিল্ডে আছে, যুদ্ধ করছে, তাদেরকে কথাটি বোঝাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তারা সবাই বলছে, না আপনারা অস্ত্র নিয়ে আসেন, আমরা সব দখল করে ফেলব।

যাই হোক, ৩০ তারিখ দিনের বেলা আমাদেরকে কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি দেখানো হল যেখানে আমরা অফিস করতে পারি । সে দিনই ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়িটা আমরা দেখি। এদিকে কলকাতায় পৌছবার পর তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে বলেছিলেন, ২৫ মার্চের আগে একদিন ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু যখন ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান, শেখ মণি, তোফায়েল আহমদ এদেরকে বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছিলেন সেই সময় হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকতে গিয়ে তাঁর কানে আসে বঙ্গবন্ধু ছাত্রনেতাদের বলছিলেন : '১০ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে গেলে খবর পাওয়া যাবে।' আরও একটি নাম শুনেছিলেন 'চিত্ত সূতার' । সেই অলক্ষ্যে শোনা কথার সূত্র ধরে তাজউদ্দীন সাহেব গোলোক মজুমদারকে বললেন ১০ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে নিয়ে যেতে। আমরা

সেই বাড়িতে গেলাম, কিন্তু সেখানে কেউ চিত্ত সূতার বলে কাউকে চেনে না। আমরা ফিরে এলাম । পরে জেনেছিলাম, ওই চিত্ত সূতার ছদ্মনামে সেখানে থাকেন এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর মাধ্যম হিসেবে কলকাতায় কাজ করেন ।

৩১ তারিখে আমরা সীমান্ত বিওপিতে গিয়ে আবু ওসমানের সাথে দেখা করে তাঁর হাতে অল্প কিছু অস্ত্র তুলে দেই। এই অস্ত্রটুকু দেয়া বিএসএফ-এর এক্তিয়ারে ছিল। সেখানে একটা মেশিনগান চালানোর ট্রেনিং দেয়া হল। এই সময় অয়্যারলেসে খবর এল বিশাখালিতে যুদ্ধ-অবস্থা, আবু ওসমান চৌধুরী যেন তাড়াতাড়ি চলে যান । আবু ওসমান চৌধুরী সেখান থেকে চলে গেলেন। আমরাও পরে ফিরে এলাম । সেই রাতেই আমরা দমদম এয়ারপোর্টে গেলাম, দিল্লী যেতে হবে। যে প্লেনে আমাদেরকে যেতে হল সেটা কোন সাধারণ প্লেন নয়, ভারতীয় আর্মির কার্গো প্লেন। খুব ধীরে চলে, ফলে কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে, ভেতরে কোন সীটের ব্যবস্থা নেই, খুব প্রচণ্ড রকমের কম্পন এবং শব্দ হয় । মূলত গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যই এভাবে যাবার ব্যবস্থা । আমাদের সাথে গোলোক মজুমদার, শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় ও আর একজন আছেন । দিল্লীতে যখন পৌছলাম তখন ভোর হয়ে এসেছে। সেখানে বিএসএফ-এর একটা গেস্ট হাউসে আমাদেরকে নেয়া হল। সেখানে আমাদের সাথে কর্নেল মেনন এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রধান কাউল দেখা করতে এলেন আলাদা আলাদাভাবে ।

পরে শুনেছি, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমাদের দেখা হওয়ার ব্যাপারে 'র' চেষ্টা করছিল কিছুটা বাধার সৃষ্টি করতে। আমার মনে হয় এখানে কয়েকটি বিষয় কাজ করেছিল। যেমন বিএসএফ-এর সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে, আমরা বাংলাদেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করছি, বিএসএফ-এর এই যে কৃতিত্ব, এতে যেন অনেকটাই 'র'-এর পরাজয় হয়ে গেছে—বলতে পারি এটা তাদের দুই ডিপার্টমেন্টের প্রতিযোগিতা। আর দ্বিতীয়ত, যেহেতু চিত্ত সূতারের মাধ্যমে আমরা আসিনি তাই একটা ঝামেলা বাধাবার চেষ্টা করেছে 'র'। আবার যখন শেখ মণি ১০ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে পৌঁছে এবং জানতে পারে তাজউদ্দীন সাহেব এবং আমি দিল্লীতে চলে গেছি, তখন তারাও বোধ হয় এই ব্যাপারে খুশি হতে পারেনি। কাজেই সব কিছু মিলে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটা কিছুটা বিলম্বিত হয় এবং বড় করে একটা প্রশ্ন ওঠে, এরাই যে তাজউদ্দীন বা আমীর-উল ইসলাম তার প্রমাণ দিল্লীতে কে

দিতে পারে ?

এদিকে সেই একই সময় আগরতলা থেকে সেখানকার প্রাদেশিক সরকারের সহায়তায় এম. আর. সিদ্দিকী দিল্লীতে পৌছেন। অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক, তিনিও দিল্লী পৌঁছেন এবং উত্তরবঙ্গ থেকে আব্দুর রউফও দিল্লীতে এসেছেন। এঁদের তিনজনকে যখন 'র' থেকে জিজ্ঞেস করেছে যে এখানে তাজউদ্দীন সাহেব এসেছে—তখন তিনজনই বলেছেন তাজউদ্দীন সাহেব মূল ব্যক্তি, যদি তিনিই হন তবে ঠিক আছে । তারপর সিরাজুল হক বাচ্চুকে নিয়ে এসে বোধ হয় একটা দরজার ফাঁক দিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবকে দেখানো হয়। তখন সে কনফার্ম করে ইনিই তাজউদ্দীন আহমদ। এরপর তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎ হয় ।

যতদূর মনে হয় ৪ তারিখের দিকে ইন্দিরা গান্ধী নিজে এসে তাজউদ্দীন সাহেবকে রিসিভ করেন। তাঁকে প্রথম প্রশ্ন করেন, ‘শেখ মুজিব কেমন আছেন ?’ তখন তাজউদ্দীন সাহেব বলেন, ‘আমার যখন তাঁর সাথে শেষ দেখা হয় তখন তিনি সমস্ত বিষয় পরিচালনা করছিলেন। তাঁর যে পরিকল্পনা ছিল সে মতই আমাদের কাজ চলছে এবং হাইকমান্ড হিসেবে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। যার যেটা দায়িত্ব সেভাবে কাজ করছি এবং আমি আমার দায়িত্ব হিসেবে এখানে এসেছি।'

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর এই আলোচনায় একটা কথা তাজউদ্দীন সাহেব খুব স্পষ্ট করে বললেন, ‘এটা আমাদের যুদ্ধ। আমরা চাই ভারত এতে জড়াবে না। আমরা চাই না ভারত তার সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে আমাদেরকে স্বাধীন করে দিক। এই স্বাধীনতার লড়াই আমাদের নিজেদের এবং আমরা এটা নিজেরাই করতে চাই। এই ক্ষেত্রে আমাদের যা দরকার হবে তা হচ্ছে, আমাদের মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলবার জন্য আপনার দেশের আশ্রয়, ট্রেনিংয়ের সমস্ত রকম সুবিধা এবং সে ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা এবং অস্ত্র সরবরাহ। এসব আমাদের জরুরী প্রয়োজন হবে। আর আমরা যে রকম পরিস্থিতি দেশে দেখে এসেছি তাতে মনে হয় যে দুই-এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রচুর শরণার্থী এদেশে ঠাঁই নেবে, তাদের আশ্রয় এবং আহারের ব্যবস্থা ভারত সরকারকে করতে হবে। বহির্বিশ্বে আমাদের স্বাধীনতার কথা প্রচারের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রাখবেন এটা আমরা আশা করি ।'

এই সবগুলো ব্যাপারেই শ্রীমতি গান্ধীর সাথে তাজউদ্দীন সাহেবের একটা একাত্মতা গড়ে ওঠে । এই উদ্দীপ্ত কথাটিতেই বোধ হয় শ্রীমতী গান্ধী আরো বেশি আকৃষ্ট হন যে, এই স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের। এই যুদ্ধটার আন্তর্জাতিকীকরণ যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকা দরকার। এই যুদ্ধকে যেন হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের লড়াই হিসেবে কেউ না দেখায়, কিংবা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ লড়াই হিসেবে কেউ না দেখায়, যা পাকিস্তানের প্রচেষ্টা হবে, সেই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে ।

এরপর দ্বিতীয় যে বৈঠক হয় সেখানে শ্রীমতি গান্ধী তাজউদ্দীন সাহেবকে জানান যে, বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়ে গেছেন। এই কথা শুনে তাজউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যা কিছু করণীয় তা করতে শ্রীমতি গান্ধীকে অনুরোধ করেন। ইন্দিরা গান্ধী আশ্বাস দেন তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন কূটনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে এবং তৎকালীন সভিয়েট ইউনিয়নের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের উপরে চাপ দেয়া হয় যাতে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে ।

শ্রীমতি গান্ধী তাজউদ্দীন সাহেবের মতের সাথে একাত্মতা পোষণ করবার পর মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দেশের ভেতরে-বাইরে এবং ভারতবর্ষের সাথে সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্ক প্রসারিত করবার প্রয়োজন এবং সেই সমস্ত দিক বিবেচনায় একটি সরকার গঠন করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। সেই সরকার গঠনের ব্যাপারেই আমরা এম. আর. সিদ্দিকী, আব্দুর রউফ এঁদের সাথে আলোচনা করেছি। তাঁরা সবাই একমত হলেন একটা সরকার গঠন এখনই প্রয়োজন। দিল্লীতে বসেই আমরা কিছু চিঠিপত্র পেলাম। যেমন সৈয়দ সুলতান সাহেবের কাছ থেকে, ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগ সভাপতি রফিক উদ্দিন ভূঞার কাছ থেকে । এই চিঠিগুলোতে লেখা ছিল যেন অবিলম্বে সরকার গঠন করা হয় এবং তাজউদ্দীন সাহেব যেন সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। তখন আমরা সবাই একমত হলাম যে, হাইকমান্ড হিসেবে যেটা কাজ করছিল সেটাই এখন ক্যাবিনেট হিসেবে কাজ করুক এবং তাজউদ্দিন সাহেব তার প্রধানমন্ত্রী হোন। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেবের প্রচণ্ড দ্বিধা ছিল নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করানোর বিষয়টিতে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘আপনি তো আওয়ামী লীগকে চেনেন না, এটা নিয়ে আওয়ামী লীগে কিন্তু নানা রকম ভুল বোঝাবুঝির চেষ্টা করানো হবে।' আমি বললাম, “কিন্তু সরকার গঠন করা ছাড়া এই মুহূর্তে তো আর কোন উপায়

নেই।' এরপর আমাদের হাইকমান্ডের মতো করেই আমরা একটি সরকার গঠন করি। আমরা যে সরকার গঠন করেছিলাম তা ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির। যুদ্ধ পরিচালনা করার মত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয় এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকারের পরিধি ছোট রাখাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর আনিসুর রহমান তখন দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। তাজউদ্দীন সাহেব, রেহমান সোবহান এবং আমি একসাথে মিলে বক্তৃতার একটা খসড়া তৈরি করি । তাজউদ্দীন সাহেব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশে বক্তৃতা দেবেন, যার কিছু অংশ রেহমান সোবহান এবং কিছুটা আমি লিখি । এই সময় তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কথাবার্তা বলে মিলিয়ে দেখা হচ্ছিল যে বক্তব্যের কথাগুলো রাজনৈতিকভাবে ঠিক হচ্ছে কিনা। তিনি নিজেও কোন পয়েন্ট যোগ করছিলেন, কোনটা বাদ দিচ্ছিলেন। এভাবেই আমরা একটি খসড়া বক্তৃতা প্রথমে ইংরেজিতে লিখি, তারপর বাংলায় অনুবাদ করা হয়। দিল্লীতে বসেই বক্তৃতাটি টেপে ধারণ করা হয়। এই টেপটির মুখবন্ধে আমার কণ্ঠে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ধারণ করা হয় ।

দিল্লীতেই সীলমোহর তৈরি করা হয় যেটা আমারই হাতের আঁকা, চারিদিকে গোলচক্র, মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্র। তাজউদ্দীন সাহেব এটি অনুমোদন করেন। আমরা সেই মনোগ্রামসহ লেটারহেড ছাপিয়ে ফেলি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লিখে। একটি সরকারের প্রাথমিক যে বিষয়গুলো থাকে তার প্রায় সব ঠিক করে ফেলি ।

আমরা যাতে যোগাযোগের জন্য সীমান্ত এলাকাগুলোতে যেতে পারি সেই জন্যে মিসেস গান্ধী একটা ছোট প্লেনের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল নগেন্দ্র সিংকে আমাদেরকে সমর বিষয়ে সহায়তা করার জন্য উপদেষ্টা হিসেবে দিলেন। তারপর আমরা কলকাতায় ফিরে আসি।

কলকাতায় ফিরে এসেই আমরা জানতে পারি, সেই ১০ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডের বাড়িতেই চিত্ত সূতার থাকতেন, কিন্তু অন্য নামে—যার ফলে কেউ আমাদেরকে জানাতে পারেনি যে এখানে চিত্ত সূতার থাকেন । এই বাড়িতে তখন শেখ মণি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ, আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ যুব-ছাত্র নেতারা উপস্থিত হয়েছেন ।

আমরা যে একটা সরকার গঠন করেছি এরকম আভাস-ইঙ্গিত তাঁরা পেয়েছেন এবং এ ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয়েছে যে আমরা কাউকে না বলে দিল্লীতে চলে গিয়েছি। ইতোমধ্যে মনসুর আলি সাহেব, কামরুজ্জামান সাহেব এবং প্রায় ৪০/৫০ জন আওয়ামী লীগের এমপি ও নেতৃস্থানীয় লোকজন কলকাতায় এসে গেছেন। তখন আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে আলোচনায় বসলাম ।

এই সময় যুব নেতাদের কাছ থেকে বিশেষ করে শেখ মণি এবং সিরাজুল আলম খানের কাছ থেকে একটা দাবি উঠল যে, যুদ্ধ অবস্থাতে একটা রেভলুশনারি কাউন্সিল তৈরি করতে হবে, এখানে কোন মন্ত্রিসভা তৈরি বা গঠনের প্রশ্ন ওঠে না—শুধু এমপিদেরকেই নয়, কাউন্সিলে যুবক এবং অন্যান্যদের সংশ্লিষ্ট করতে হবে । এই বৈঠকে দেখলাম বেশির ভাগ লোকজনই উত্তেজিতভাবে কথা বলছে । তাজউদ্দীন সাহেব যেহেতু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, আমরা সেভাবেই জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণ টেপ করেছি, শ্রীমতি গান্ধী এবং দিল্লীতে এই কথাটি সবাই জানে, কাজেই তিনি খুবই নাজুক পরিস্থিতিতে ছিলেন ।

আমি তখন কতকগুলো যুক্তি উত্থাপন করি যে, আমাদের একটা লিগ্যাল আরগুমেন্ট হচ্ছে, আমাদের একটা জনপ্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র আছে। একটা নির্বাচন হয়ে গেছে, সেই নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছি, কিন্তু আমাদেরকে সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। আমাদেরকে সংবিধান তৈরির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে । অতএব আমাদের একটা সরকার গঠন করবার যেমন নৈতিক দায়িত্ব আছে, তেমনি একটা সরকার গঠনের আইনগত অধিকারও আমরা পেয়েছি। পৃথিবীর খুব কম স্বাধীনতা যুদ্ধে এ ধরনের পরিস্থিতি থাকে। আইনগত কোন স্বীকৃতি যেখানে থাকে না, সেখানে তখন বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করা হয়, অর্থাৎ যার আইনগত ভিত্তি অত্যন্ত নড়বড়ে থাকে। কিন্তু এখানে আমাদের আইনগত ভিত্তি এত শক্তিশালী, কাজেই এই জিনিসটা আমরা হারাতে চাই না । এছাড়াও যদি আমরা একটা বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করি এবং কাল যদি চট্টগ্রাম, বরিশাল বা সিলেটে আরো কয়েকটি এমন সরকার হয় তাহলে কোন্‌টা আসল, কোনটা কী এ নিয়ে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে । অতএব এই সমস্ত বিপর্যয় এড়াতে যেহেতু একটি আইনানুগ সরকার গঠন করবার ক্ষমতা আমাদের আছে সেহেতু এটাই আমাদের প্রথম করা দরকার এবং বঙ্গবন্ধুর তৈরি করা হাইকমান্ড অনুযায়ী

মন্ত্রিসভার প্রস্তাব করা হয়েছে। সেখানে কারোই আপত্তি থাকার কথা নয়। তাজউদ্দীন সাহেব দলের সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষ থেকে জাতির এই দুর্দিনে ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা পাবার জন্য তিনি দিল্লী গেছেন—কর্তব্যের ডাকে তিনি সেখানে গেছেন এবং দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও সে অধিকার তাঁর আছে।

এই যুক্তিগুলো এত জোরালো ছিল যে এর বিরুদ্ধে আর কোন কথা উঠতে পারল না। ধীরে ধীরে সকলেই আমাদের যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তখন এই প্রশ্ন যাঁরা কোন একটা মতলব থেকে তুলেছিলেন তাঁরা যদিও এই যুক্তি অস্বীকার করতে পারছিলেন না, কিন্তু মনে মনে ফুঁসছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে সকলেই এই কথাটা মেনে নিলেন ।

তার পরদিন আমাদের যাবার কথা বিভিন্ন অঞ্চলে। কামরুজ্জামান সাহেব ও মনসুর আলি সাহেবকে রাজি করাতে হবে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য, যেহেতু দু'জনই সরকারের অংশ। ভোরবেলা আমি চলে গেলাম কামরুজ্জামান সাহেবের কাছে। তাঁকে জানালাম আমরা কোথায় যাচ্ছি, সেখানে তাঁকেও আমাদের সাথে যেতে হবে। আমরা সরকার গঠন করেছি, এতে তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন আছে কিনা তাও জানতে চাইলাম ।

কামরুজ্জামান সাহেব বললেন যে, এতে তাঁর সম্পূর্ণ সহযোগিতা এবং সমর্থন রয়েছে । তিনি বললেন, 'তাজউদ্দীন সাহেবকে বলেন, আপনারা যে সরকার গঠন করেছেন তাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। যদিও গতরাতে আমরা বলেছিলাম একটা বিপ্লবী সরকারের কথা, বিশেষ করে ছেলেরা বলেছিল সেটা, কিন্তু আপনি যে যুক্তি দিয়েছেন তারপর আমি আপনার কথা মেনে নিয়েছি।' এরপর তিনি বললেন যে, তাঁর স্ত্রী এবং পরিবার পথে আছে, তাঁরা না আসা পর্যন্ত তাঁদের জন্য কলকাতায় অপেক্ষা করতে হবে, তাই তিনি যেতে পারছেন না। মনসুর আলি সাহেবকে অনুরোধ করাতে তিনি রাজি হলেন ।

মনসুর আলি সাহেব, তাজউদ্দীন সাহেব, আমি, শেখ মণি, তোফায়েল আহমদ ও গোলোক মজুমদারসহ আমরা রওনা হলাম। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে বিমানটি টেকঅফ করল । প্লেনটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা খুব নিচু দিয়ে উড়ে যেতে পারে এবং খুব অল্প জায়গার ভেতর নামতে পারে । আমরা এইরকমভাবে কয়েক জায়গায় নামলাম। আগে থেকেই খবর দেয়া ছিল বিএসএফ-এর মাধ্যমে যে, যেখানে যেখানে আমাদের নেতাদের লোকজনদের

পাবে তাদেরকে যেন বর্ডারের কাছে নিয়ে আসে যাতে আমরা তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে পারি। আমরা ধুবড়িতে নেমে কোন নেতার সন্ধান পেলাম না। তারপর ওখান থেকে শিলিগুড়িতে এসে নামলাম । এখানে একটা ডাকবাংলোতে উঠলাম ।

এখানে কর্নেল নূরুজ্জামান এবং আবদুর রউফকে আমরা ডেকে পাঠালাম। তাঁরা রংপুর, নীলফামারী এ সমস্ত এলাকা থেকে আসলেন। তাঁরা আসার পর তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা হল। কর্নেল নূরুজ্জামানকে বলা হল, আপনি সেক্টর কমান্ডার হিসেবে কাজ করবেন। ইতোমধ্যে আমরা ৬ জন সেক্টর কমান্ডার নির্বাচন করেছি। ১০ এপ্রিলে তাজউদ্দীন সাহেবের যে বক্তৃতা প্রচার করা হবে সেই বক্তৃতাতেও সেক্টর কমান্ডারদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং কে কোন্ সেক্টরের দায়িত্বে থাকবেন তারও উল্লেখ আছে ।

এদিকে গোলোক মজুমদারের সাথে আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, সেই বক্তৃতার টেপটা তাঁকে দিয়ে দেব এবং শিলিগুড়ির ওখান থেকে এই ভাষণ রেডিওতে প্রচার করা হবে। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি তাঁকে টেপটা দিয়ে দিলাম। এরই মধ্যে শেখ মণি তাজউদ্দীন সাহেবকে বললেন, 'মামা, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।' তাজউদ্দীন সাহেব এবং শেখ মণি একটা ঘরে গিয়ে আলাপ করতে লাগলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক তারা আলাপ করার পর সেখানে আমাকে ডাকা হল । আমি যাবার পর তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, ‘দেখেন, শেখ মণি বলছে টেপ করা বক্তৃতাটা আজকে যাতে প্রচার করা না হয়, এটা দু-তিনদিন পর হলেও কোন অসুবিধা হবে না। আমরা যখন আগরতলা যাচ্ছি, সেখানে যারা আছে তাদের সাথে আলাপ করে একমত হয়ে এটা করা যাবে।'

শেখ মণি বিপ্লবী সরকারের কথা বলেছিলেন এবং গতরাতেই একটা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যুক্তির মাধ্যমে আমরা সেটা কাটিয়ে উঠে একমত হতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আগরতলাতে যাওয়ার পর এটা নিয়ে আবার একটা ঝামেলার যে আশঙ্কা তা আমি খুব অনুভব করলাম। সেইসাথে যাঁরা সত্যিকার অর্থে তখন যুদ্ধে লিপ্ত তাঁদের কাছ থেকে আমরা চিঠিপত্র-খবরাখবর পাচ্ছি, প্রত্যেকেই চাপ দিচ্ছেন যে সরকার গঠন করতে একদিনও যেন দেরি না হয়। দ্বিতীয়ত, এটা যদি প্রচারিত না হয় তাহলে দিল্লীতে এটা বুঝে ফেলবে যে, আমাদের সরকার গঠন করার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কোন অসুবিধা রয়েছে এবং সেটা ভবিষ্যতে আমাদের যে কোন কাজে তাদের বিশ্বাস সৃষ্টিতে

সহায়ক হবে না। এ সমস্ত ভেবে আমি এর প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু শেখ মণি খুব উত্তেজিত হয়ে গেল ।

আমি তখন সমস্ত যুক্তিগুলো তাদের দিলাম যে কেন এই সরকার গঠনের কথা এখনি প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেইসাথে আরো বললাম যে, আগরতলাতে হোক বা যেখানেই হোক, যাদের সাথে আমাদের দেখা হবে তারা এটা মেনে নিতে বাধ্য । কারণ, আমরা তো এমন কাউকে নিয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছি না যে লোকগুলোর নাম আগে ছিল না। যাঁরা যেভাবে কাজ করছিলেন তাঁরা সেভাবেই কাজ করতে থাকবেন। এটা হচ্ছে আমাদের ধারাবাহিকতা, এবং তাজউদ্দীন সাহেব যখন ঢাকাতে ছিলেন তখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর মতই কাজ করছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপ্রধানের মতই কাজ করছিলেন। অতএব আমরা এটা নূতন কিছু করছি না যে এটা কেউ অনুমোদন করবে না। এটা তো আগেই অনুমোদিত হয়ে আছে ।

তখন শেখ মণি বললেন, 'আপনি অত বুঝবেন না আমাদের ভেতরের কথা, বঙ্গবন্ধু আমাদের কী অথরিটি দিয়ে গেছেন।' এই কথাটাই মণি বলতে চাইলেন যে, বঙ্গবন্ধু তাঁকে একটা অথরিটি দিয়ে গেছেন । তাজউদ্দীন সাহেব আমার আর শেখ মণির মধ্যকার বিরোধটা মিটানোর জন্য বললেন, ঠিক আছে, মণি যখন বলছে যে আগরতলাতে গিয়ে এই সরকার অনুমোদন করানোর জন্য যা কিছু করা দরকার সে তা করবে, তখন তার কথাটা মেনে নিন ।

আমি খুব দ্বিধাগ্রস্ত মনে বললাম 'ঠিক আছে, দেখি আমি কী করতে পারি। ইতোমধ্যে বক্তৃতার টেপ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে চলে গেছে, কাজেই এটা ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা আমি ঠিক জানি না।'

আমি বাইরে এসে গোলোক মজুমদারকে ফোন করলাম। আমি বললাম, ‘যে টেপটা আমি আপনাকে দিয়েছি সেটা কোথায় ?' তিনি বললেন, ‘যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে সেটা চলে গেছে।' আমি বললাম যে, ‘টেপটার সম্প্রচার আপাতত কি স্থগিত করা যায় ?' তখন তিনি বললেন, ‘যদি আপনারা বন্ধ করতে চান তাহলে আমি হয়ত চেষ্টা করলে এখনো করতে পারি । কিন্তু তা করা কি ঠিক হবে ? বরং এটা করলে নানা জায়গায় নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হবে।' তখন আমি গোলোক মজুমদারকে বললাম যে, ‘তাহলে যেভাবে এটা নির্ধারিত হয়েছে সেভাবে চলতে থাকুক।' এই একটিমাত্র কাজে আমি তাজউদ্দীন সাহেবের কথা অমান্য করেছিলাম। এটা ঠিক হয়েছিল, কি সঠিক হয়নি তা

বিচার করবে আগামী ইতিহাস। আর পরবর্তীকালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে সেগুলো দেখলে বোঝা যাবে এটা বন্ধ করার চেষ্টার পেছনে কী চিন্তাভাবনা বা ষড়যন্ত্র ছিল।

আমি ফিরে এসে তাজউদ্দীন সাহেবকে বললাম 'গোলোক মজুমদারকে আপনার ইচ্ছার কথা বলেছি । তিনি হয়ত বা চেষ্টা করবেন এটা বন্ধ করার ব্যাপারে । কিন্তু টেপটা এখন আর তাঁর হাতে নেই।'

এর পরে রাতে আমরা খেতে বসেছি; খাবার টেবিলে শুধু তাজউদ্দীন সাহেব, শেখ মণি আর আমি। কারণ সেই সময় তোফায়েল আহমদ অসুস্থ হয়ে কলকাতাতে চলে গেছেন। মনসুর আলি সাহেবের জ্বর, তিনি শুয়ে পড়েছেন। আমি রেডিওটা অন করে দিয়েছি, এই সময় খবর হয়। রেডিও অন করতেই শুনি একটি ঘোষণা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ প্রচার করা হবে। আমরা তিনজনই তিনজনের চোখের দিকে তাকালাম। কারো মুখে কোন কথা নেই, আমরা চুপচাপ। আমরা চুপচাপ রেডিও-র ঘোষণা শুনলাম আর খেয়ে নিলাম। সকলেই বুঝলাম যে কী হয়ে গেছে। তারপর এই খবরটাকে নিয়ে পৃথিবীর সব রেডিও, ভারতের রেডিও পরদিন সকালবেলা থেকে সব স্টেশনের মাধ্যমে অনরবত প্রচার করতে লাগল । এদিকে কামরুজ্জামান সাহেব যখন সরকারের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানান তখন আমি মনসুর আলি সাহেবের সাথেও কথা বলি । তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আপনি তাজউদ্দীন সাহেবকে বলুন, এই সরকারে আমার সম্পূর্ণ মত আছে । গতকাল যেটুকু পার্থক্য ছিল তা আর কোনদিন আমার কাজের ভেতরে প্রকাশ পাবে না।' এখন থাকলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব আর মোশতাক সাহেব। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব এতে মত দেবেন নিশ্চয়ই, কারণ তাঁকে উপ-রাষ্ট্রপতি করে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব তাঁর মত পেতে কষ্ট হবে না। এই চারজন যখন মত দিলেন তখন মোশতাক সাহেব কিছুতেই এটা ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। সেদিক থেকে এই ক্যাবিনেট যে একটা কার্যকর ক্যাবিনেট হবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ।

পরদিন সকালবেলা প্লেনে করে ময়মনসিংহের উপর যে তুরা পাহাড়, সেই পাহাড়ের কাছে আমরা নামলাম। ওখানে আমরা শুনতে পেলাম যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব এবং আবদুল মান্নান সাহেব একটা রেস্ট হাউসে

আছেন, পাহাড়ের নিচে বিএসএফ-এর লোক পাঠানো হল । প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগল তাঁদের এসে পৌছাতে। আমরা সবাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব এবং তাজউদ্দীন সাহেব দু'জন সেখানেই একান্তে আলাপ করলেন। সমস্ত ঘটনা, যা ঘটেছে, সব বিবৃত করলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ফিরে এসে বললেন যে, তাঁর সম্পূর্ণ মত আছে এবং আমাদেরকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে নিয়ে আমরা আগরতলার পথে রওনা দিলাম ।

আমরা আগরতলাতে পৌছলাম সন্ধ্যায়; তখন ওখানে চট্টগ্রাম, সিলেট এবং অন্যান্য এলাকার সদস্যরা উপস্থিত হয়েছেন। এর ভেতরে মোশতাক সাহেব, ওসমানী সাহেব, এম. আর. সিদ্দিকী সাহেব পৌঁছেছেন। আমাদের প্রথম বৈঠক হল কর্নেল ওসমানীর সাথে । তাঁর সাথে কথা হল যে আমরা মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে সংগঠিত করব। কর্নেল ওসমানী তাঁর মতো করে পরিকল্পনার কথা বললেন যে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করা যাবে। তাতে কর্নেল ওসমানীর যে ধারণা সেটা ছিল একটা ট্রাডিশনাল যুদ্ধের ধারণা। তাঁর পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানের চাইতে শক্তিশালী একটা ডিভিশন গঠন করতে হবে। এটা একদিকে যেমন ছিল অবাস্তব, অন্যদিকে তা ঠিক আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত জনযুদ্ধের সম্পূরক চিন্তা ছিল না। তাঁর কথা সকলেই শুনলেন, তিনি সিনিয়র ব্যক্তি সকলের চাইতে এবং এ ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান আছে, তাই কেউ কিছু বলছেন না ।

২৬ মার্চের পর থেকে তাজউদ্দীন সাহেব যে আলাপগুলো করতেন সে আলাপের আঙ্গিকেই আমি তখন কর্নেল ওসমানীকে বললাম, 'আমরা একটা জনযুদ্ধে আছি, সেটা সংগঠিত করার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।' ট্রাডিশনাল ওয়ারফেয়ার-এর কথা বাদ দিয়ে কিভাবে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা যায় সে লক্ষ্যে আমি জেনারেল নগেন্দ্র সিং-এর সাথে কর্নেল ওসমানীর পরিচয় করিয়ে দেই এবং নগেন্দ্র সিং, ওসমানী ও আমি একটা বৈঠক করি ।

ইতোমধ্যে রাত্রিবেলায় সরকার গঠন নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য সমস্ত এমপিদের ডাকা হল। সেখানে সবচাইতে বেঁকে বসলেন খন্দকার মোশতাক সাহেব। মোশতাক সাহেব কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না ক্যাবিনেটে থাকতে । তাঁর এ রকম একটা মনোভাব যে, হয়ত তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী করলে ঠিক হত। তাজউদ্দীনের প্রধানমন্ত্রিত্ব তিনি মেনে নিতে চাচ্ছেন না ।

দ্বিতীয়ত, শেখ মণি ওখানে নেমেই চলে গেছেন তাঁর নিজস্ব ডেরায়। আমাদের এই সরকার গঠন করবার ব্যাপারে তাঁর যে সাহায্য করার কথা ছিল সেটা তিনি করলেন না।

তবে, একমাত্র মোশতাক সাহেব ছাড়া সকলেই খুব আনন্দিত যে আমরা ক্যাবিনেটটা গঠন করেছি। ফলে এখন যুদ্ধটা অন্য মোড় নেবে, জাতি একটা নেতৃত্ব খুঁজে পাবে। কিন্তু মোশতাক সাহেব বলছেন, তাঁকে মক্কাশরীফ পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে, তিনি হজ্জ করতে যাবেন এবং তাঁর যদি মৃত্যু হয় তাহলে দেশে যেন একটু কবরের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। মোশতাক সাহেব এ ধরনের খেয়ালী কথাবার্তা শুরু করে দিলেন এবং কিছুতেই মন্ত্রিসভায় থাকতে রাজি হচ্ছিলেন না ।

ডা. টি. হোসেনের সাথে মোশতাক সাহেবের খুব বন্ধুত্ব ছিল। টি. হোসেনই তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত টি. হোসেনকে বলা হল, 'আপনি রাজি করান।' তারপর তিনি রাজি হলেন এক শর্তে যে, তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী করতে হবে। সকলেই তাতে মত দিলেন। ক্যাবিনেট হল। জহুর আহমদ চৌধুরী তখন আধঘণ্টা ধরে মোনাজাত করলেন। এমন মোনাজাত করলেন যে সকলেরই সেদিন চোখে পানি এসে গিয়েছিল । তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, প্রিয়পরিজন সকলকে ছেড়ে আমরা এখানে এসেছি, বঙ্গবন্ধু কীভাবে আছেন আমরা জানি না; এই রকম পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছে আমরা সেই তওফিক চাই যেন স্বাধীন দেশে ফিরে যেতে পারি। আমরা কলকাতায় ফিরে এসে সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেবার জন্য চিন্তাভাবনা করছি । আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এই অনুষ্ঠানটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে হবে ।

চুয়াডাঙ্গাতেই অনুষ্ঠানটি হবে এমন একটা আভাস সেখানে দেয়া হয়েছিল । কিন্তু এই কথাটা ডাক্তার আসহাবুল হক অতি উৎসাহে প্রকাশ করে দেন সাংবাদিকদের কাছে। যার ফলে চুয়াডাঙ্গায় একটা বম্বিং হয়। চুয়াডাঙ্গায় আর আমাদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান কার্যকর হল না। ১৭ এপ্রিলের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ভীষণভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হল ।

ইতোমধ্যে আমাকে স্বাধীনতার ঘোষণা লেখার দায়িত্ব দেয়া হল। সেটা আমি লিখলাম। এই ঘোষণার ভেতরেই আমাদের সরকার গঠনের কথা থাকল।

ঘোষণাটি তাজউদ্দীন সাহেবকে দেখালাম। তাজউদ্দীন সাহেব দেখে বললেন এটা এখানে কাউকে দেখানো যায় কিনা, যাদের সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞান আছে। গোলোক মজুমদার সুব্রত রায় চৌধুরীর কথা বললেন, তিনি কনস্টিটিউশনাল লইয়ার হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ। তাঁর সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি খসড়াটি দেখে বললেন যে, খুব সুন্দর হয়েছে খসড়া এবং সমস্ত বিষয়গুলো এতে এসে গেছে। সুব্রত রায় পরবর্তীকালে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে একটা বইও লিখেছেন—Genesis of Bangladesh ।

সুব্রত রায় চৌধুরীর বাড়ি থেকে এসেই আমরা খসড়াটি চূড়ান্ত করে ফেললাম। এটাকে সাইক্লোস্টাইল করা, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের বক্তৃতা সাইক্লোস্টাইল করা, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের বক্তৃতা সাইক্লোস্টাইল করা, এই সমস্ত কাজ শেষ করে সাংবাদিকদের কীভাবে সমবেত করা যায় সে জন্যে আমি আর মান্নান সাহেব ১৬ তারিখ সন্ধ্যাবেলা কলকাতা প্রেস ক্লাবে গেলাম। এই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করবেন । লোকে লোকারণ্য প্রেস ক্লাব, তিল ধারণের স্থান নেই ।

আমরা সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথমেই বললাম, 'আমরা এসেছি আপনাদের নিমন্ত্রণ জানাতে। আপনাদের সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট কথা বলবেন, সে ব্যবস্থা করার জন্যই আমরা এসেছি । আপনারা আগামীকাল সকালে এখানে উপস্থিত থাকবেন। আমরা আপনাদের কোন এক জায়গায় নিয়ে যাব।' কোথায় নিয়ে যাব, বাংলাদেশের ভেতরে না বাইরে এমন অনেক প্রশ্ন করলেন সাংবাদিকরা । আমরা একটা কথাই বললাম, 'এর চেয়ে বেশি আমরা আপনাদের বলতে পারব না।' আমরা কোথায় যাচ্ছি তা সব জায়গায় গোপন রাখলাম। আগে থেকে কেউ এই বিষয়ে জানতে পারেনি। তাঁদের সাথে কথা হল যে, সকাল ৮টার সময় তাঁরা প্রেস ক্লাবে উপস্থিত থাকবেন ।

রাত ১২টা থেকে আমাদের কাজ শুরু হল। সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হল আমাদের কর্নেল ওসমানী সাহেবের পোশাক নিয়ে। তাঁকে ইউনিফর্ম পরাতে হবে। কিন্তু ভারতীয় বিএসএফ-এর যে সমস্ত কাপড়চোপড় এগুলো একটাও তাঁর শরীরে ঠিক হয় না। সে জন্য বড় বাজার থেকে দর্জি নিয়ে এসে তাঁর মাপের একটা ইউনিফর্ম তৈরি করা হল। এভাবে সারা রাত এবং ভোর পর্যন্ত কাজ চলল। ভোরে আমাদের ক্যাবিনেট, কর্নেল ওসমানী এবং আমাদের

লোকজন বৈদ্যনাথতলার পথে চলে গেলেন।

আমি আর মান্নান সাহেব প্রেস ক্লাবে গেলাম । প্রেস ক্লাব থেকে সাংবাদিকদেরকে নিয়ে রওনা দিলাম। প্রায় এক-দেড়শ ট্যাক্সি ভর্তি সাংবাদিক। সবাইকে নিয়ে আমরা চলেছি বৈদ্যনাথতলাতে । আমরা সকাল ১১টার দিকে পৌছলাম । ৩ ঘণ্টা লাগল পথে ।

আমরা আগে থেকেই আম্রকাননে সবকিছু ঠিক করে রেখেছিলাম। স্টেজ তৈরি করা হয়েছিল। ওখানে আমি দ্রুত ইংরেজিতে লেখা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি বাংলা করে দিয়েছিলাম। সমস্ত পার্লামেন্ট সদস্যদের পক্ষ থেকে চীফ হুইপ হিসেবে ইউসুফ আলি সাহেবকে প্লেনিপোটেনশিয়ারি নিযুক্ত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়, ইউসুফ আলি সাহেব ঘোষণাপত্রের বাংলা অনুবাদটি পাঠ করেন । সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব, তাজউদ্দীন সাহেব তাঁদের লিখিত বক্তৃতা দিলেন এবং এই বক্তৃতার কপি সাংবাদিকদের দেয়া হল। সে দিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথগ্রহণের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাংবাদিকরা কাভার করলেন যে, এটা হল আমাদের সরকারের আনুষ্ঠানিক সূচনা বা আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ। তৌফিক এলাহী, মাহবুব মেহেরপুরের আম্রকাননে গার্ড অফ অনার দিলেন। তাজউদ্দীন ভাই এক বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এই জায়গার নামকরণ করেন 'মুজিবনগর' । আর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, যুদ্ধের সময় সরকার শুধু এক জায়গায় উপস্থিত থাকবে না, যেখানে সরকার থাকবে সেটাই মুজিবনগর। তারপর আমরা চলে আসি ।

হোসেন আলি সাহেব তখন কলকাতায় পাকিস্তান মিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার। হোসেন আলি সাহেবকে খবর দেয়া হয় এবং কোন একটা হোটেলে হোসেন আলি সাহেবের সাথে তাজউদ্দীন সাহেবের একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। কারণ হোসেন আলি সাহেবও চাচ্ছিলেন এবং তাজউদ্দীন সাহেবও চাচ্ছিলেন পরস্পরের সাথে আলাপ করতে। ১৮ তারিখ সকালবেলা হোসেন আলি সাহেব মিশনের প্রায় সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করেন। হোসেন আলি সাহেবের কাছে মিশনের যে পরিমাণ টাকা ছিল সেই টাকাটা সম্পূর্ণ তুলে নিয়ে তিনি অন্য অ্যাকাউন্টে জমা করার ব্যবস্থা করেন যেন মিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতনের কোন অসুবিধা না হয় ।

হোসেন আলি সাহেবের স্ত্রী মাত্র কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। তিনি সেখানকার অবস্থা দেখে এসেছেন। মিসেস হোসেন আলি বিশেষ করে পতাকা তোলার ব্যাপারে নেতৃত্ব দেন। সেই সময়ে তাঁরা দু'জনই খুব সাহসের পরিচয় দেন। হোসেন আলি সাহেব আনুগত্য ঘোষণা করায় আমাদের ব্যাপারে একটা প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক সাড়া পড়ল। কলকাতাতে আমাদের একটা লিগ্যাল এনটিটি হল এবং এটাই আমাদের মিশন হিসেবে কাজ করায় সুবিধা হল যে, বাংলাদেশের প্রথম মিশন হচ্ছে কলকাতার সার্কাস এভিনিউতে।

১৮ তারিখ সকালবেলা আমরা মিশনের বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে আমরা ভেতরে গিয়ে হোসেন আলিকে অভিনন্দন জানালাম। হাজার হাজার লোক মিছিল করে কলকাতা এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে, ফুলের মালা দিয়েছে। প্রায় দু'সপ্তাহ সেই জায়গাটা উৎসবমুখর ছিল । বাংলাদেশ মিশনের সামনে তাঁবু খাঁটিয়ে দেশাত্মবোধক গান, বক্তৃতা দেয়া এসব চলতে থাকল। এরপর এই মিশনে আমরা একটা স্থায়ী লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন করি । ওই লিয়াজোঁ অফিসের দায়িত্বে আমি ছিলাম। বাংলাদেশ থেকে যত লোকজন আসতেন তাঁদের সকলকে ওখানে অভ্যর্থনা করার পর প্রাথমিক সাক্ষাৎকার নেয়া হত। নূরুল কাদের খান, আসাদুজ্জামান, এঁদের অফিসও এখানেই স্থাপন করা হল । অতএব আমাদের ছোটখাট অফিস ওখানে চলছিল । ইতোমধ্যে আমাদের প্রথম কাজ হল বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্যে তৎকালীন ১০৭টি দেশের কাছে চিঠি লেখা। স্বীকৃতির জন্যে চিঠি তৈরি করতে হবে, তারপর ১০৭টি চিঠি টাইপ করানোর কাজ । একটা বই ছিল আমাদের কলকাতা হাই কমিশনের লাইব্রেরিতে — Forms and Precedence of Diplomatic Correspondence; সেটা থেকে একটি চিঠি বাছাই করে সে ধাঁচে একটি চিঠি তৈরি করা হল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীদের কাছে চিঠি লেখা হল। চিঠিগুলোতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দস্তখত করলেন।

এই চিঠিগুলোতে কাউন্টারসাইন করার জন্য একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, পররাষ্ট্র মন্ত্রী কাউন্টারসাইন করবেন। কিন্তু মোশতাক সাহেব আর সেই চিঠিতে সাইন করতে চান না। শুরুতেই আমাদের এই সমস্ত চিঠিপত্রের যোগাযোগ মোশতাক সাহেবের কারণে কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল। তিনি একটি অজুহাত খাড়া করলেন, তাঁর পরিবার এখনো আসছে না, সেটা নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত । এর কিছুদিন পর তাঁর পরিবারপরিজন কলকাতায় পৌঁছলে

তিনি চিঠিতে দস্তখত করেন।

তারপর চিঠিগুলো কোথা থেকে পোস্ট করা হবে ? কলকাতা থেকে পোস্ট করলে সেটা কেমন হবে, এই ভাবনার পর শেষকালে তৎকালীন জিডিআর থেকে চিঠি পোস্টের ব্যবস্থা হল। জিডিআর-এ একটা সম্মেলন ছিল এবং মস্কোতেও তখন শান্তি সম্মেলন ছিল, সেই সম্মেলনে আব্দুস সামাদ আজাদ সাহেবকে পাঠানো হয়। ওখানে গিয়ে তিনি চিঠিগুলো পোস্ট করেন। আর ভারতবর্ষের চিঠি তাজউদ্দীন সাহেব যখন পরবর্তীতে দিল্লী যান তখন তিনি সাথে করে নিয়ে যান । আমাদের এই সময় খুব দ্রুত সাংগঠনিক তৎপরতা নিয়ে এগুতে হচ্ছিল । আমরা তখন বালিগঞ্জে একটা বাড়ি ভাড়া নেই— বালিগঞ্জ সার্কেল হাউস, এটা সুব্রত রায় চৌধুরীর বাড়ির খুব কাছেই। এই বাড়িতেই মান্নান সাহেব, আমি এবং আরো অনেকেই থাকি সেই সময়। আব্দুস সামাদ আজাদ সাহেবও এখানে থাকেন। এখানেই আমাদের মিটিং সিটিং হয়। আর মিশনটাকে আমরা ব্যবহার করতে থাকি আমাদের ফ্রন্ট অফিস হিসেবে।

কিন্তু মোশতাক সাহেবের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কিছুটা অনীহার ভাব রয়ে গেল । তিনি বললেন যে, যদি আমরা আগরতলা থেকে দু'জন লোক, মাহবুবুল আলম চাষী এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে এনে দেই তাহলে তিনি দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এই দু'জন লোককে আমরা খবর পাঠালাম আসার জন্য । তাঁরা এলেন। মোশতাক সাহেব এরপর শর্ত দিলেন, সার্কাস এভিনিউর বাংলাদেশ মিশনকে তিনি ফরেন অফিস হিসেবে ব্যবহার করবেন। এবং যেহেতু মিশনটা ফরেন অফিসের অধীনে তাই সেখান থেকে অন্যান্য সমস্ত অফিস সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে, আমার অফিসও সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে । আমরা তখন সব অফিস সরিয়ে ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে নিয়ে এলাম ।

হোসেন আলি সাহেবের অফিসই ফরেন অফিস হিসেবে রইল এবং একই সাথে আমাদের মিশন হিসেবেও কাজ চলত । এর ফলে ফরেন অফিস সম্পূর্ণভাবে চলে গেল মাহবুবুল আলম চাষী এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের হাতে। মাহবুবুল আলম চাষীকে ওখানে পররাষ্ট্র সচিব করা হয়। যার ফলে দুটো ধারা কাজ করতে লাগল। কারণ তাঁরা একটা সমঝোতা করে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ করে নানারকমের চিন্তাভাবনার ভেতরে এগুতে চাচ্ছিলেন, যেগুলো আমরা অনেক সময় ইন্টারসেপ্ট করেছি। বিদেশীদের সাথে যে বৈদেশিক

তৎপরতা করতে হয়েছে, সেটা প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকেই চালাতে হয়েছে এবং সেটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে হত। যেমন, বিদেশের সাথে যে সমস্ত লবি করা, অন্যান্য দেশের পার্লামেন্টের সদস্য, সিনেটর, আইনজীবীদের সাথে যে সমস্ত যোগাযোগ হত সেগুলো আমাকেই করতে হত ।

আমরা প্রথম থেকেই আঁচ করতে পারছিলাম যে, খন্দকার মোশতাক মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করছিলেন। কিন্তু আমরা সেই সময়ে ৫ জনের যে হাইকমান্ড সে হাইকমান্ডে তাঁকে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম যাতে কোন বিভক্তি না হয় ৫ জনের মধ্যে, কেউ যাতে না বলতে পারে এঁরা স্বাধীনতার পক্ষে নন বা অন্য কোন সমঝোতা করতে তাঁরা রাজি আছেন। মোশতাক সাহেবকে তখন যদি আমরা বিদেশে চলে যেতে দিতাম তাহলে তিনি হয়ত অন্য কোন লাইন ধরতেন বা পাকিস্তানিদের সাথে মিশে কিছু করতেন। সেটা আমরা চাইনি, সেইজন্য তাঁকে আমরা কাছে রাখতে চেয়েছিলাম ।

মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দীন সাহেবকে তিনটি মূল ফ্রন্টে কাজ করতে হয়। তিনটি মূল সমস্যার ভেতর তিনি পড়েন। একটি হচ্ছে যে, যারা যোদ্ধা, যুদ্ধ করছে, তার ভেতরে দুটো ধারা—একটা হচ্ছে পাকিস্তান আর্মি থেকে চলে আসা সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ আধা সামরিক বাহিনী অর্থাৎ ইপিআর, পুলিশ, আনসার; আর অন্যটি হচ্ছে যুবক, কৃষক যারা গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং অন্যান্য লোক । এই দুটোকে একসাথে করার একটা দায়িত্ব তাজউদ্দীন সাহেবের উপরে এসে পড়ে। এটি খুবই দুঃসাধ্য ছিল। আরো একটা সমস্যা যোগ হল, সেটা হচ্ছে 'মুজিব বাহিনী' নামের একটা বাহিনী। শেখ মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, আ. স. ম. রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ এই বাহিনী গঠন করল। অথচ এরা আমাদের সবচেয়ে বেশি যোদ্ধা শক্তি হিসেবে কাজ করবে আশা করা গিয়েছিল। এই যে আলাদা একটা বাহিনী মুজিব বাহিনী নাম দিয়ে গঠন করা হল—এই বাহিনীটা যুদ্ধ করার চাইতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল যে যুদ্ধপরবর্তী ঘটনাগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনাটা যেন তাদের প্রধান লক্ষ্য হয় । আমরা লক্ষ্য করি যে, মুজিব বাহিনী যেটা গঠিত হয়েছিল সেই মুজিব বাহিনীর ছেলেরা নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে আরো দশটি ছেলেকে তৈরি করেছে। সেই কাজটি খুব দ্রুত ঘটছিল ।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ওসমানী সাহেব ভেবেছিলেন আমরা যোদ্ধা হিসেবে বেশি

লোক পাব না। সে কারণে জেনারেল ওসমানী বললেন, আমার সোনার ছেলে দরকার। তখন আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ এদেরকে দায়িত্ব দেয়া হল রিক্রুটমেন্টের। তখন তাঁরা ওসমানী সাহেবকে এসে বললেন যে, একটা চিঠি লিখে দেন। তখন ওসমানী সাহেব রাজ্জাক এবং তোফায়েলকে অথরাইজ করলেন এইসব ছেলেদের নিয়োগ করার জন্য ।

এই চিঠি নিয়েই নাকি ওঁরা 'র'-এর মাধ্যমে মূলত দিল্লীতে যোগাযোগ করেছিলেন এবং একটা আলাদা বাহিনী গঠন করবার জন্যে দিল্লীর সম্মতি আদায় করে আসেন। দিল্লীর সম্মতি নিয়ে জেনারেল ওবানের অধীনে মুজিব বাহিনীর একটা প্রশিক্ষণ নেয়ার ব্যবস্থা করলেন। মুজিব বাহিনীতে যারা যেত তারা ভাল সুবিধা পেত। অতএব তাঁরা এভাবে আমাদের বহু কর্মীদেরকে এবং ভলান্টিয়ার বাহিনীতে যেসব কর্মী ছিল তাদেরকে মুজিব বাহিনীতে যুক্ত করলেন । আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ভেতরে এ ধরনের একটা বিভক্তি থাকায় অনেক ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি করে।

আর একটি জিনিস ঘটে যে, আমাদের যে সমস্ত সামরিক বাহিনীর কমান্ডাররা আছেন তাঁরা তাঁদের বাহিনীর লোকজন নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন, তাঁদের সাথে আবার স্থানীয় যুবকরা যোগ দেয়। স্থানীয় বলতে আমি বলছি, ওই অঞ্চলের বাংলাদেশ থেকে যারা গেছে এবং তারাও একটা অনিয়মিত বাহিনী তৈরি করে গেছে । অতএব, তাদের রেশন, কাপড়চোপড় ইত্যাদি জিনিস যেগুলো দেয়া হত, সেটাকে আবার অনেকজনের সাথে ভাগ করতে হচ্ছে। এই ধরনের একটা সমস্যা সৃষ্টি হল। অর্থাৎ একটা লিয়াজোঁর সমস্যা দেখা দেয় যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোশাক তারা পাচ্ছে না, প্রয়োজনীয় পরিমাণ রেশন তারা পাচ্ছে না। এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ক্যাম্পে। সেগুলো কো-অর্ডিনেট করতে হত । দ্বিতীয় যেটা হয়, আওয়ামী লীগের যে সমস্ত এমএলএ বা এমপি গেছেন তাঁদেরকে দায়িত্ব এবং কাজ গুছিয়ে দেয়া, এবং তাঁদেরও ব্যক্তিগত সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা সবকিছুই আছে, অতএব এই সমস্ত কিছুই তাজউদ্দীন সাহেবকে দেখতে হত এবং এসব ব্যাপারে বেশি সময় দিতে হত—এই সমস্ত সমস্যার কিভাবে সমাধান দেয়া যায়, কাকে কীভাবে দায়িত্ব দেয়া যায় । প্রত্যেক জেলার এমপিদেরকে এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে কীভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করানো যায় সেজন্য আমরা দ্রুত কিছু ইয়ুথ ক্যাম্প তৈরি করি । প্রতি ইয়ুথ ক্যাম্পে একজন এমপিকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

যুদ্ধে যাবার জন্য যে সমস্ত যুবকরা আসত তাদেরকে সাথে সাথেই আমরা ট্রেনিংয়ে পাঠাতে পারতাম না । তারা এই ক্যাম্পে থাকত। এখান থেকে তাদেরকে পরে ট্রেনিং দেয়া হত। কিছুটা পলিটিক্যাল মোটিভেশন দেয়া হত, তারপর তাদেরকে ট্রেনিং ক্যাম্পে নেয়া হত । এই ট্রেনিং ক্যাম্পে একজন এমপিকে দায়িত্ব দেয়া হত যে, তিনি এই ট্রেনিং ক্যাম্পে থাকবেন। এই সমস্ত কিছুকে ঠিক করে একটা গোছালো অবস্থায় আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

তৃতীয়ত, বৈদেশিক প্রচার এবং বিদেশী কূটনৈতিক তৎপরতা বাংলাদেশের জন্য। এই কাজটাও মূলত তাজউদ্দীন সাহেবকে দেখতে হয়। এই যে বিভিন্ন ধরনের কাজ, এই সমস্ত কাজের ব্যাপারে আমি তাঁর সাথে জড়িত ছিলাম প্রধান সহায়তাকারী হিসেবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আমার কাজ কী ? ' বললেন যে, 'আমি যা যা কাজ করি সবই আপনার কাজ ধরে নিতে পারেন, এবং আমার সমস্ত কাজের সাথেই আপনাকে থাকতে হবে।' তার ফলে যুদ্ধ পরিকল্পনা হোক বা কোন ক্যাম্পের বা কোন শাখায় কোন সমস্যা হোক বা জেনারেল ওসমানীর সাথে কোন সমন্বয়ের ব্যাপার হোক বা বিদেশীদের সাথে কোন কো- অর্ডিনেশনের কোন ব্যাপার হোক বা বিদেশ থেকে কোন এমপি প্রতিনিধি দল আসছে বা কোন রিলিফের ব্যাপার—এই সবটা জিনিস নিয়েই আমাকে খুব ব্যতিব্যস্ত এবং দৌড়াদৌড়িতে থাকতে হত।

তাজউদ্দীন সাহেব সমস্ত বিদেশীদের সাথে বাংলাদেশের ভেতরে গিয়ে দেখা করতেন। বিভিন্ন সময়ে বিদেশী এমপি বা প্রতিনিধিরা আসতেন বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা বলতে বা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করতে। তখন এমনভাবে ব্যবস্থা করতাম যে, তাজউদ্দীন সাহেবকে নিয়ে আমরা বাংলাদেশের ভেতরে চলে যেতাম। আমরা প্রবাসে সরকার গঠন করেছি এটা সবাই জানতেন, কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে দেখা করার যে মর্যাদা এবং ফলাফল তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে আমরা একটা বিরাট প্রচার পেতাম ।

সক্রিয় কোন ক্যাম্প যেখানে আমাদের ছেলেরা যুদ্ধ করছে, পাশে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলি হচ্ছে, এই রকম একটা অবস্থাতেই মাঠের ভেতরে এক ধরনের ক্যানভাসের চেয়ারে বসে আলোচনা এবং দেখাশোনা চলত। হয়ত কখনও পাশের ক্যাম্প থেকে ৩/৪ পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা হত। এভাবে বহু সাক্ষাৎকার

ঘটেছে। হয়ত সাক্ষাৎকার চলছে সে সময়েই সেই এলাকাতে খুব যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, কামান গর্জে উঠেছে; বাধ্য হয়ে তখন আমাদের কথা শেষ করতে হয়েছে। সেখানে সঙ্কেত দেবার জন্য ফিল্ড ফোন থাকত । এই ফিল্ড ফোনে খবর আসত যে, শত্রু হয়ত এদিকে আসছে, আপনাদের নিরাপদ জায়গাতে যাওয়া দরকার। এই রকম অবস্থার ভেতরে আমরা বহু সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিয়েছি। যেমন, একেবারে প্রথমদিকে এসেছিলেন বৃটিশ এমপি মি. ডগলাস ম্যান—এটা আমাদের সরকারের আত্মপ্রকাশ করার আগের ঘটনা।

মি. ডগলাস ম্যান বৃটিশ হাই কমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনারের বাড়িতে উঠেছিলেন । আমি তাঁর সাথে যোগাযোগ করলাম এবং তাঁকে নিয়ে সীমান্তে চলে গেলাম। তাজউদ্দীন সাহেব তার আগেই বেনাপোলের ভেতরে যশোরের কোন একটা জায়গায় গিয়ে থাকলেন। আমরা তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলাম। যেখানে আমাদের বেনাপোল কাস্টমস্ চেক পোস্ট সেখানে বাংলাদেশের ভেতরে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করলাম। সেখানে স্থানীয় মুক্তিবাহিনী কমান্ডার মেজর ওসমান চৌধুরীকে ডেকে আনা হল । আমাদের যখন কথাবার্তা চলছে ঠিক সেই সময়েই খবর এল যে, শত্রুপক্ষ কিছুদূরেই আছে এবং তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য ওসমান চৌধুরীর এখনি যাওয়া দরকার। ওসমান চৌধুরী তখনই চলে গেলেন । তো এই রকম অবস্থায় অনেক মিটিং হয়েছে। জন স্টোনহাউসের সাথে, পিটার শোরের সাথে, ডন সেজুয়াসের সাথে, তারপর টাইমস্-এর সাংবাদিক পিটার হেজেল হার্স্ট-এর সাথে—এমন অনেকগুলো সাক্ষাৎকার হয়েছে। এটা আমাদের বৈদেশিক তৎপরতার একটা দিক ছিল। তারপর জার্মান মন্ত্রী এসেছিলেন এক সময়, তাঁর সাথেও তাজউদ্দীন সাহেব দেখা করেছিলেন এই রকম একটা জায়গাতে বসে ।

তিনটি ক্ষেত্রে তাজউদ্দীন সাহেবকে খুব ব্যস্ত থাকতে হত। একটা হচ্ছে, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বদেরকে সংগঠিত করা এবং তাঁদেরকে কাজের দায়িত্ব দেয়া । আর একদিকে আমাদের যোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা, অস্ত্রের ব্যবস্থা করা, তাদেরকে দেশের ভেতরে পাঠানো ইত্যাদি। তৃতীয়ত, বিদেশের সাথে আমাদের যোগাযোগ করা ।

দিল্লীর সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখাটা ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাজউদ্দীন সাহেবের ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে দিল্লীর একটা বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর উপরে যে, তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। ফলে

তাজউদ্দীন সাহেবের উপরে দিল্লী নির্ভর করত এবং সেখানে তাঁর একটা যোগাযোগ ছিল এবং সেই যোগাযোগটা মি. নাথ নামক ভদ্রলোকের মাধ্যমে হত। কয়েক সপ্তাহ পরপর তাজউদ্দীন সাহেব দিল্লীতে গিয়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করতেন, কথাবার্তা বলতেন। কখনো তিনি একা গেছেন, কখনো সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভা নিয়ে গেছেন, কখনো সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব এবং তাজউদ্দীন সাহেব এই দু'জন গেছেন, এরকমভাবে দিল্লীর সাথে যোগাযোগটা হয়েছে। এছাড়া দিল্লীর সাথে চিঠিপত্রেও যোগাযোগ ঘটেছে ।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যখন বিদেশে কূটনৈতিক তৎপরতার কাজে যান তার আগে তাজউদ্দীন সাহেব ইন্দিরা গান্ধীর কাছে একটা ব্রিফিং পাঠান এবং তিনি সেটা নিয়ে বিদেশে যান ।

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে তাজউদ্দীন সাহেবের যে ভূমিকা তা পরিষ্কার ছিল প্রথম থেকেই, যে কারণে তিনি শ্রীমতি গান্ধীকে প্রথম সাক্ষাতে বলেছিলেন যে, এটা মূলত আমাদের যুদ্ধ এবং আমরাই এই যুদ্ধ করতে চাই। এবং আমরা ভারতবর্ষের কাছ থেকে যেটা চাই সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের সাহায্য-সহযোগিতা, যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, অস্ত্রের ব্যবস্থা, বিদেশে কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা। এই যুদ্ধ যেন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পরিণত না হয় এটা যেমন তিনি প্রথম দিন বলেছিলেন, তেমনি স্বাধীনতার পর ২২ তারিখে যখন তিনি ফিরে যাচ্ছেন ঢাকায় সেই সময় গোলোক মজুমদার, রুস্তামজী উপস্থিত ছিলেন দমদম এয়ারপোর্টে—সেই সময় বিদায় জানাতে গিয়ে রুস্তামজী বলেন যে, আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে; তখন তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, অবশ্যই দুটি স্বাধীন দেশের মর্যাদার ভিত্তিতে আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে ।

তিনি তাদেরকে এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বন্ধু, তোমরা আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছ। সেই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে এখন আত্মপ্রকাশ করেছি এবং সেই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আমরা তোমাদের কাছ থেকে সেই ভালবাসা এবং মর্যাদা আশা করি । প্রথম যেদিন আমরা ভারতবর্ষের বর্ডারে ঢুকি সেদিন এবং যেদিন আমরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসি সেদিনও সেই একই কথা তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন। আমরা যখন বর্ডারে ঢুকি তখন তিনি বলেছিলেন, একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদেরকে যদি ভারত উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করতে রাজি থাকে তবেই আমরা

ভেতরে যাব ।

তাজউদ্দীন সাহেব ভারতঘেঁষা, এটা আমাদের শত্রুরা প্রচার করেছে। আবার কেউ কেউ হয়ত ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ থেকেও এই ধরনের উসকানিমূলক কথাবার্তা বলেছেন । কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব খুবই সজাগ ছিলেন যেন আমাদের স্বাধীনতা মেঘাচ্ছন্ন না হয় ভারতবর্ষের কোন চাপের মুখে বা ভারতের কোন অতিপদক্ষেপের কারণে। সেটার প্রমাণ দুটি জায়গায় পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে, যখন ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইয়াহিয়া খান ভারতের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিল এবং ভারতের সরাসরি যুদ্ধে জড়িত হওয়া ছাড়া উপায় নেই, সেই সময়ে তাজউদ্দীন সাহেব শ্রীমতি গান্ধীকে বললেন যে, বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য ঢুকবার আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃত দিতে হবে এবং কীভাবে সৈন্য ঢুকবে তার একটা ভিত্তি তৈরি করতে হবে। সেই ভিত্তি ছাড়া বাংলাদেশে ঢোকা যাবে না । তাজউদ্দীন সাহেবের কত বড় দূরদর্শিতা, এবং তিনি কত বেশি সজাগ থাকলে এই কথা বলা সম্ভব, এটা ইতিহাস নিশ্চয়ই বিচার করবে। অথচ এটার জন্যই তাঁকে দোষারোপ করা হয় যে, তিনি নাকি ভারতের সাথে চুক্তি করেছিলেন। চুক্তি যদি বলা হয়, চুক্তি নিশ্চয় করেছেন, কিন্তু সেই চুক্তি ছিল যে, ভারত আমাদেরকে স্বীকৃতি দেবে, তারপরে ভারতের সৈন্য বাংলাদেশে ঢুকবে এবং যৌথ কমান্ডের মাধ্যমে ঢুকবে। যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ভারতকে সবসময় আমাদের সাথে, আমাদের কমান্ডের সাথে একত্রিত থাকতে হবে। এবং যখনই বাংলাদেশ সরকার বলবে তখনই ভারতের সৈন্যদের বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

এই চুক্তি যদি তিনি করে থাকেন তবে এর চেয়ে ভাল এবং মহৎ এবং এত সুন্দর চুক্তি আমি তো পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখি। যখন অ্যালাইড ফোর্স ফ্রান্সে ঢুকেছিল তখন তো এই রকম চুক্তি করে তারা ঢোকেনি। এমনকি সাম্প্রতিক অতীতে বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের সময় যে আমেরিকান টাস্কফোর্স বাংলাদেশে ঢুকল, তারা তো কোন চুক্তি ছাড়াই ঢুকেছিল। এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, তাজউদ্দীন সাহেব কত দূরদর্শী, কত সজাগ, কত সতর্ক ছিলেন। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, স্বাধীনতার প্রশ্নে যৌথ বাহিনীর অধীনে ভারতীয় সৈন্য ঢোকার আগেই তিনি কিন্তু চুক্তি করেছিলেন—যে চুক্তির জন্য তাঁকে আবার দোষ দেয়া হয় । এটা আমার কাছে খুবই আশ্চর্য লাগে। অথচ এই চুক্তির বলেই স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেয়ার অনুরোধ জানান ।

তাজউদ্দীন সাহেবের দেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট প্রকাশ ঘটে এভাবে—যেহেতু মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ অবস্থাতে থাকার ফলে তাদের পারিবারিক জীবন যাপন করতে পারছেন না, সে কারণে তাজউদ্দীন সাহেব প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পণ করেছিলেন, যতদিন যুদ্ধ চলবে, বাংলাদেশ স্বাধীন না হবে, ততদিন তিনি তাঁর পারিবারিক জীবন যাপন করবেন না। তিনি তাঁর এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। সে সময়ে অনেক দুর্যোগ, দুর্বিপাক তাঁর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে এসেছে। যেমন তাঁর বুকে একটি ফোড়া হয়, ডায়াবেটিসের কারণে এতে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর খুবই সেবাযত্নের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তিনি সেই সময়েও (তখন তাঁর পরিবার কলকাতাতে) তাঁর পরিবারের কাছে যাননি ।

আর একটি ঘটনা আমার মনে আছে। তাঁর একমাত্র ছেলে সোহেল খুব অসুস্থ, এই অসুখ খুব মারাত্মক রূপ নিচ্ছিল। আমার নিজের এক ছেলেও সেই সময় এইরকম ইনফেকশান হয়ে মারা যায়, এ ব্যাপারে সবাই খুব উদ্বিগ্ন। তাঁকে বহুবার অনুরোধ করা হয়েছে, কিন্তু তিনি একটা কথাই বলতেন যে, “আমি তো ডাক্তার নই, আপনারা ডাক্তার দেখান।' আমরা যখন একদিন বাংলাদেশের ভেতরে কাজ করে ফিরছি সেই সময় গোলোক মজুমদার প্রায় এক রকম জোর করে তাঁর পরিবার যেখানে থাকতেন সেই ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন । তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সন্তানের বিছানার শিয়রে দাঁড়ালেন, দুই চোখ বুজে হয়ত তিনি তাঁর প্রার্থনা করলেন দুই-এক মিনিট, তারপর তিনি ফিরে গেলেন। এগুলো তাঁর দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ।

ক্ষমতার প্রতি তাজউদ্দীন সাহেবের যে কোন আকর্ষণ ছিল না, সে কথা আমি আগেও বলেছি। যখন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা বলা হল, তখন তিনি সবচাইতে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁর সহযোগীরা যদি এটা অপছন্দ করেন বা তাঁকে প্রতিযোগী ভাবেন, তাতে যদি যুদ্ধের কোন ক্ষতি হয়, অসুবিধা হয়—এই ব্যাপারগুলো তাঁর খুব দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। আমরা একই রুমে পাশাপাশি বেডে থাকতাম কিছুদিন । অনেক কথা হত রাতে । তিনি বলতেন যে, দেখুন, প্রত্যেক দিনই ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে। তার সাথে আমরা সম্পৃক্ত। আসুন আমরা এমনভাবে কাজ করি, যেন ঐতিহাসিকদেরও ভবিষ্যতে আমাদের খুঁজে পেতে কষ্ট হয় যে আমরা এর পেছনে কীভাবে কাজ করেছিলাম । তিনি খুব আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন। নিজেকে খুব আড়াল করে রাখতে চাইতেন । নিজের ভূমিকাকে গোপন করে

রাখতেন। যেটা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল । এই বৈশিষ্ট্য যুদ্ধের সময়ও প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে ।

তাঁর প্রয়োজন ছিল খুব সীমিত । প্রয়োজন খুব কম থাকত । দুটো ট্রাউজার, দুটো হাওয়াই শার্ট, কয়েকটি গেঞ্জি, মোজা, স্যান্ডেল—এগুলি ছিল তাঁর যুদ্ধকালের সম্পত্তি। এগুলো ছাড়া তো কিছু তাঁর ছিল না। আর একটা ছোট্ট রেডিও। কাপড়গুলো তিনি নিজের হাতে কাচতেন । যখনই গোসল করতেন, তখনই নিজে কেচে সেগুলো আবার শুকাতে দিতেন। তাঁর নিজের ব্যাপার যাতে কারো জন্য বোঝা না হয়, কোন বেয়ারা বা কোন পিয়ন বা অন্য কোন লোক বা বিএসএফ- এর কোন কর্মচারীর, এদিক থেকে তিনি খুব সজাগ থাকতেন। তাঁর নিজের কাজে যেন তারা ব্যস্ত না হয় । কাজেই তাঁর নিজের কাজের দায়িত্ব কাউকে বহন করতে দিতে চাইতেন না । নিজের বিছানাটা নিজে ঠিক করতেন, নিজের জুতাটা নিজে পলিশ করতেন। পরের দিকে মকফুর নামের একজন পিয়ন ছিল। সে হয়ত জোর করে তাঁর গেঞ্জিটা নিয়ে কাচত বা জোর করে জুতাটা নিয়ে ব্রাশ করত। কিন্তু তিনি নিজের ব্যক্তিগত কাজ সহজে কাউকে দিয়ে করাতেন না ।

তাজউদ্দীন আহমদ ও মুক্তিযুদ্ধ এ দুটো জিনিস এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে যে, এটাকে পৃথক করা মুশকিল। মুক্তিযুদ্ধের সাথে তাজউদ্দীন সাহেব সম্পূর্ণভাবে মিশে আছেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাজউদ্দীন সাহেব এর সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন যে, একটা থেকে আর একটা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের সাথেই তিনি সম্পৃক্ত। মুক্তিযুদ্ধও তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধটাকে সমন্বয় করা, নেতৃত্ব দেয়া, এর নির্দেশনা দেয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল এবং সেটাকে তিনি খুব সঠিকভাবে এবং সার্থকভাবে দিতে পেরেছিলেন বলে আমার মনে হয় ।

তাজউদ্দীন ভাই বঙ্গবন্ধুকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতেন। প্রথমদিকে তাঁকে দেখেছি প্রায় ছলছল চোখে বলছেন যে, মুজিব ভাই, আপনি আমাকে এত বড় বিপদে ফেলে রেখে গেলেন। এটা তিনি নিজেকে বলতেন। তিনি যে অফিসে বসতেন সেখানে কোথা থেকে বহু কষ্ট করে বঙ্গবন্ধুর একটা ছবি সংগ্রহ করে সেটাকে বাঁধিয়ে রাখলেন। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে যখন স্বীকৃতি দিল সেদিন সাংবাদিকরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে এলেন যে, আপনার প্রতিক্রিয়া কী ? তখন তিনি বললেন, “আমার কাছে আপনারা জিজ্ঞেস করতে এসেছেন

আমার প্রতিক্রিয়া কী ? আমি তো মাত্র ধাত্রীর কাজ করেছি। এবং যে ধাত্রী সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার খবর পিতার কাছে পৌছাতে পারে না, সে ধাত্রীর যে রকম মনের অবস্থা, আমার অবস্থাও সেরকম । এটা বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। বললেন যে, 'মুজিব ভাইয়ের কাছে আমি খবরটা পৌছাতে পারছি না, এর চাইতে বড় দুঃখ আমার আর কী আছে!'

এদিকে প্রথম থেকেই মুজিব বাহিনী করার ব্যাপারটা তাজউদ্দীন ভাইসহ আমরা খুব অপছন্দ করেছি এই কারণে যে, আমরা মনে করেছি এটা একটা বিভক্তি সৃষ্টি করবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। অল দি এস্ শুড নট রিমেইন ইন ওয়ান বাস্কেট—এই কথাটা আমি ভারতীয় একজন কর্মকর্তার কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলাম । তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এর আসল উদ্দেশ্যটা কী ? আর দিল্লী সরকার বা 'র' কেন এটা করছে ? এই প্রশ্নের জবাবের জন্য তিনি কিছু সময় নিয়েছিলেন। সময় নিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, এর উত্তর একটিই : ইন্ডিয়া ডাজ নট ওয়ান্ট টু কীপ অল দি এস্ ইন ওয়ান বাস্কেট। তো সেটা একটা কারণ। আর এটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা একে অপরের বিরুদ্ধে, এটাও একটা কারণ ছিল। আমি লক্ষ্য করেছি যে, ‘র' বা এ জাতীয় কোন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে যেখানে স্বাধীনতা যুদ্ধ হতে গেছে সেই সমস্ত জায়গাতেই খুব মেসি কাজকর্ম হয়েছে।

কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য হচ্ছে যে, তাজউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে আমরা যে যোগাযোগটা করেছিলাম সেটা সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ের যোগাযোগ। যতদিন আমরা যুদ্ধ পরিচালনা করেছি ততদিন সেই রাজনৈতিক পর্যায়েই যোগাযোগটাকে রক্ষা করেছি। আমরা কখনোই কোন গোয়েন্দা সংস্থা বা রাষ্ট্রীয় অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে যাইনি এবং আমরা এটাকে খুব অপছন্দ করেছি। আমার মনে হয় যে, শ্রীলংকাতে যে মেসি ব্যাপারটা হয়েছে, এর অনেকখানি দায়িত্ব 'র'-এর। কারণ ‘র’ এই সমস্ত টাইগার বাহিনী তৈরি করার ব্যাপারে এক সময় সাহায্য করেছিল। আবার শ্রীলংকাকে সাহায্য করতে গিয়ে টাইগারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীকে অস্ত্রধারণ করতে হয়। যার ফলে এই মেসি ব্যাপারটার কারণে হয়ত রাজীব গান্ধীর জীবনটা পর্যন্ত গেল। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেবের মত যোগ্য নেতৃত্ব থাকার কারণে তারা এটা সম্পূর্ণভাবে করতে পারেনি। কিন্তু চেষ্টা তারা অনেক করেছিল।

আমি তাজউদ্দীন সাহেব সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের

জন্য বলছি, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ এবং বিশ্বের সমস্ত দেশের সাথে আমরা বন্ধুত্ব চাইব এবং সেই বন্ধুত্ব হবে মানুষের সাথে মানুষের বন্ধুত্ব, রাজনীতির বন্ধুত্ব বা সরকারের সাথে সরকারের বন্ধুত্ব। কিন্তু কোন এজেন্সির মাধ্যমে যেন কোন জাতি বা রাষ্ট্র বা সে দেশের নাগরিকরা আমাদের দেশের কোন অমঙ্গল করতে না পারে ।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে যান, ফলে এই যুদ্ধে তিনি যে নেতৃত্ব দিলেন সেটা স্পিরিচুয়াল লিডারশিপ, ফিজিক্যাল লিডারশিপ দিতে পারলেন না । এর ফলে কতকগুলো গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে আমাদের ইতিহাসে, আমাদের মননে, মানসিকতায়। এবং বঙ্গবন্ধু যখন ফিরে এলেন এটা তাঁর স্বীকার করে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল যে, তাঁর অবর্তমানে নতুন একটা দেশ হয়ে গেল যেখানে তিনি শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এটারই সুযোগ নিয়ে কিছু লোক, বিশেষ করে যুবকরা যারা একটা আলাদা বাহিনী করতে চেয়েছিল, একটা বিপ্লবী কাউন্সিল তৈরি করতে চেয়েছিল, যারা একটা আইনানুগ সরকারের পরিবর্তে একটা নতুন নেতৃত্বের কথা ভাবছিল, যেখানে তাদের নিজেদের ভূমিকা সামনে আসবে—এই যে কাঁচা আকাঙ্ক্ষা—তারা পরে বঙ্গবন্ধুকে নানাপ্রকারে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, তাজউদ্দীনের বোধ হয় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার পোটেনশিয়ালিটি আছে। এটা বঙ্গবন্ধু কনশালি না হলেও অবচেতনভাবে বিশ্বাস করতেন ।

বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন সাহেবের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার কিছু কারণ ছিল। যেহেতু তাঁর অবর্তমানে বাংলাদেশ স্বাধীন হল, সেখানে বঙ্গবন্ধু ফিজিক্যালি থাকতে পারলেন না, সশরীরে নেতৃত্ব দিতে পারলেন না, এটা যেমন একটা ব্যাপার, আবার তাজউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুর ক্ষমতার চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়াতে পারেন, এইরকম একটা কথা তাঁকে কেউ কেউ বুঝিয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা বা কোন উপদল করবার বিন্দুমাত্র চিন্তা তাজউদ্দীন সাহেবের ছিল না ।

দেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা, সেই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে নিরূপণ করতে পারেননি। তিনি রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা পালন করবার জন্য কখনো প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, কখনো প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর যে ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল জাতির পিতা হিসেবে, রাজনৈতিক ভূমিকারও ঊর্ধ্বে যার স্থান ছিল—তিনি জাতির

পিতা, জাতি তাঁকে সেই জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল ঐতিহাসিকভাবেই— সেই জায়গাটাতে না গিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় নেতা এবং রাজনৈতিক নেতা এবং দলীয় নেতার ভূমিকা পালন করলেন। তাজউদ্দীন ভাই আর দু'চারজন ছাড়া আমরা যারা তাঁর চারপাশে ছিলাম তারা তাঁকে এই ভূমিকা পালন করতে উৎসাহিত করেছিলাম, যে কোন কারণেই হোক না কেন ।

তাজউদ্দীন সাহেব পদত্যাগ করবেন সেই সময়ে এ ধরনের কথাবার্তা তিনি অনেক সময় বলতেন। কিন্তু সেটা এভাবে দ্রুত ঘটবে তা বুঝিনি । বঙ্গবন্ধু যখন চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থা করলেন, আমরা আশা করেছিলাম যে ওই সময়েই তিনি এটা প্রকাশ্যে বলবেন যে, তিনি এই ধারাতে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সেটা বঙ্গবন্ধুর জন্য যেমন দুর্বলতা, তেমনি বাংলাদেশের জন্য দুর্বলতা, এ দুটো কারণ মিলেই নব্যস্বাধীন দেশে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হবে; এ কারণেই বোধ হয় তাজউদ্দীন সাহেব এটা করতে পারেননি। কিন্তু পেছনের দিকে তাকালে আমার কাছে মনে হয় যে, সেটা যদি করা সম্ভব হত তাহলে বোধ হয় অনেককিছু অ্যাভয়েড করা যেত। এমনও হতে পারত, বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন সাহেব দু'জনই বেঁচে থাকতেন। এই বিরোধটা সামনে আসা উচিত ছিল। যেহেতু রাজনৈতিকভাবে আমরা একদলীয় ব্যবস্থাটা বিশ্বাস করিনি, তার ফলে সবকিছুই কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গেছে ।

তাজউদ্দীন সাহেবের প্রাণনাশের হুমকির ব্যাপারটা তিনি অনেক সময় নিজেই উল্লেখ করতেন, যে কারণে তিনি আলাদা কোন স্ট্যান্ড নেননি। তাজউদ্দীন সাহেবের প্রাণনাশের হুমকি মুক্তিযুদ্ধের সময়ও ওই যুবক ছেলেরা দিয়েছিল। ওই যুবক ছেলেরা ঘৃণা ছড়াবার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাত যে, তাজউদ্দীন সাহেব এবং আমি নাকি বঙ্গবন্ধুকে ধরিয়ে দিয়ে এসেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন ছেলে তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে এসে স্বীকারোক্তিও করেছিল যে, তাজউদ্দীন সাহেবকে হত্যা করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে। সে অস্ত্রটা তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে রেখে গিয়েছিল।

বাকশাল সম্পর্কে তাজউদ্দীন ভাই বলতেন যে, এটা সঠিক পদক্ষেপ নয়, গণতন্ত্রের জন্য বঙ্গবন্ধু এতকাল যুদ্ধ করে এসেছেন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রই হচ্ছে আমাদের দাবি—সেই '৫৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত। হঠাৎ করে এই দিক পরিবর্তন করাটা ঠিক হচ্ছে না, এতে কোন প্রয়োজন মেটানো যাবে না।

একটা কথা আমার মনে আছে, সেটা ১৯৭৪ সাল, বঙ্গবন্ধু তাঁর ইজি চেয়ারে

বসে আছেন। সেখানে তাজউদ্দীন সাহেব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব, সেরনিয়াবাত সাহেব, শেখ মণি, তাহের উদ্দিন ঠাকুর এবং আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় কথা বলতে বলতে হঠাৎ বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি যে প্রেসিডেনশিয়াল ফর্মের কথা বলছি তোমরা এটাকে কী মনে কর ?' এর আগে কেউ এরকম আলোচনা শোনেনি। হঠাৎ একটা পিনপতন নীরবতার সৃষ্টি হয়। তখন আমি এই কথাটা বলে ফেললাম যে, 'দেখেন, প্রেসিডেনশিয়াল এবং পার্লামেন্টারি সিস্টেমের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা আছে। আমি সেগুলোর ভেতর যেতে চাই না। আমি একটা সহজ হিসেবের কথা বলি যে, পৃথিবীতে যত ক্যু হচ্ছে এবং এটা যত প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে হয়েছে তার সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সংখ্যা খুবই নগণ্য ।' আমার কথার পর তাজউদ্দীন সাহেব একটা সামগ্রিক বিশ্লেষণ দিলেন যে, রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির কুফল কী ।

তারপর তাজউদ্দীন ভাই যখন একটা কনভিন্সিং আরগুমেন্ট করলেন তখন বঙ্গবন্ধু বললেন, "না, না, আমি এ রকম কিছু ভাবছি না। তবে তোমাদেরকে বললাম আর কি ।' এই বলে কথাটার পাশ কাটিয়ে গেলেন ।

এরও প্রায় ৫/৬ মাস পর গণভবনে আলোচনা হচ্ছিল বাকশাল করা নিয়ে । তখন বেশির ভাগ এমপি এর বিপক্ষে বক্তৃতা করেছিলেন। দুই দিন ধরে ১২৮ জন এমপি এর বিপক্ষে বললেন। বঙ্গবন্ধু তখন আলোচনা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, 'আমি তোমাদের সব কথা বলতে পারব না, ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে, ক্যান্টনমেন্টে যাতায়াত শুরু হয়েছে; তারা যখন আসবে তখন আমাকে স্যালুট দেবে, কিন্তু তাদের হাতে স্টেনগান থাকবে এবং তোমাদের কারো মাথা থাকবে না। আমি তোমাদের বলছি, তোমরা আমার কথার কোনদিন অবাধ্য হওনি, এবারও হবে না। আমি বলছি যে, তোমরা আগামীকাল এই বিল পাস করবে।' এই কথা সংক্ষেপে বলে বক্তব্য শেষ করলেন। তারপর বের হয়ে এসে তাজউদ্দীন সাহেবের হাত ধরে তাঁকে তিনি বাগানে নিয়ে গেলেন ।

আমি কিছু এমপি-র সাথে লেকের ধারে চলে গিয়েছিলাম, সেখানে কিছু নারকেলের চারা রোপণ হয়েছে। এমন সময় তিনি সেখানে এসে দলবলসহ আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী দেখছ ?' আমি বললাম, 'আমি নারকেলের চারা দেখছি।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমার এই নারকেলের চারাগুলো কত সুন্দর হয়েছে!' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তা তো ঠিক।

কিন্তু আপনি আজকে যে চারাগাছ পুঁতলেন, এই চারা যে কী বিষফল জন্ম দেবে তা বুঝতে পারছি না।' তিনি বললেন যে, 'তোমার মাথায় এটা ভূত ?' এভাবে তিনি পরের দিন বিল পাস করালেন। মঈনুল হোসেন সাহেব এবং জেনারেল ওসমানী এঁরা দু'জন ভোট দিলেন না। তাঁরা পার্লামেন্টেও গেলেন না, আমরা সবাই গেলাম । হাত তুলে বিল পাস করিয়ে এলাম ৪/৫ মিনিটের ভেতরে । এটা পড়ে দেখারও সুযোগ আমাদের হয়নি।

আমার যেটা মনে হয়, আর্মি কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগ চাচ্ছিল সেই সময় থেকে, এবং এটা বোধ হয় বঙ্গবন্ধুর কাছে কোন না কোনভাবে প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধু হয়ত ভেবেছিলেন যে, আর্মিকে রিপ্লেস করবার এটা একটা পদ্ধতি হবে যে তাদেরকেও আমি সাথে নিয়ে নেব বাকশালের ভেতরে। এতে আর্মি, আমলাতন্ত্র এবং অন্যান্য দলের লোকজন সবাই থাকবে। যে কোন পলিসি হোক সবাই মিলে করা হবে ।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের ব্যাপারে আমাদের প্রচণ্ড আপত্তি ছিল । শেষ পর্যন্ত আমি, কামাল হোসেন, আসাদুজ্জামান খান এই তিনজন যুক্তি করি যে, বঙ্গবন্ধুকে আমরা তিনজন গিয়ে বলব তিনি যাতে ওইদিকে পা না বাড়ান । যেদিন বিল পাস হবে সেদিন পর্যন্ত আমরা লবি করলাম । শেষ পর্যন্ত তাঁর ঘরে গেলাম, পার্লামেন্ট ভবনের অফিসে। সেখানে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, এমন কোন্ ক্ষমতা তাঁর প্রয়োজন, কারণ সব ক্ষমতাই তাঁর আছে। Criminal Procedure Code এবং Bangladesh Penal Code-এর সব পাওয়ারই তাঁর আছে। এমন কোন কাজ যেখানে তিনি ঠেকে গেছেন, সেটা যদি আমাদেরকে বলেন তাহলে আমরা এর সমাধান খুঁজতে পারি। এজন্য সংবিধান বদলানো ঠিক হবে না। কারণ তিনি সবচেয়ে বেশি নিবর্তনমূলক আইনের শিকার হয়েছেন। তাই নিবর্তনমূলক আইন পাস করানোর কোন ব্যবস্থা যেন তিনি না নেন ।

অনেক কথা এবং আলোচনার পর তিনি বললেন যে, ‘দেখ, তোমার বিলেত থেকে পাস করে এসেছ, তোমরা পশ্চিমের গণতন্ত্র দেখেছ—এইগুলো আমাদের দেশে চলবে না। আমি আমার দেশের লোককে জানি ভাল।' তখন আসাদুজ্জামান খান সাহেব নরম হয়ে গেলেন। তিনি ধরে ফেললেন যে, আমরা বিলেতি চিন্তার লোক আর তিনি দেশি চিন্তার লোক। তখন আসাদুজ্জামান খান সাহেব বললেন যে, ‘বঙ্গবন্ধু দেশের নেতা, প্রধানমন্ত্রী, তিনি যখন বলছেন,

তখন আমাদের আর কি বলার আছে।' তখন আমি আর কামাল হোসেন সাহেব চলে এলাম । আমি তাঁকে না বলে পার্লামেন্ট ছেড়ে চলে আসি, আর কামাল হোসেন সাহেব তাঁর অনুমতি নিয়ে চলে যান। তাজউদ্দীন সাহেব তখন পার্লামেন্টে। তিনি এই ব্যাপারে আর না বলতে পারেননি। আমি ভোট দেইনি, কামাল হোসেন সাহেবও ভোট দেননি ।

তাজউদ্দীন সাহেব যে কষ্টটা মনে নিয়ে মারা গেলেন সেটা হল, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় নয় মাসে কী হল, কীভাবে দেশটা স্বাধীন হল, কীভাবে এই মুক্তিযুদ্ধটা হল, কার কী ভূমিকা—এই ব্যাপারটা বঙ্গবন্ধু কোন দিন তাঁকে জিজ্ঞাসাও করেননি। এবং তাজউদ্দীন সাহেব এই নয় মাসের ভূমিকা রিপোর্ট করারও কোন সুযোগ পাননি। এটা তাঁর সবচেয়ে বেশি কষ্ট ছিল যে, এই নয়টি মাস যেন ইতিহাসের পাতায় নেই। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃতিটুকুও বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে তিনি পাননি ।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাজউদ্দীন সাহেবের বড় দুর্বলতা ছিল, বঙ্গবন্ধুকে তিনি এমনভাবে ভালবাসতেন যে তিনি তাঁর উপর অভিমান করতেন—হয়ত দেখাই করতেন না, বাড়িতে থেকে হয়ত টেলিফোনের জবাব দিতেন না—কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সামনে এলে আবার সবকিছু ভুলে যেতেন। তিনি একথা বলতেন যে, 'দেশকে আমি ভালবাসি, দেশকে ভালবাসতে গিয়েই বঙ্গবন্ধুকে ভালবেসেছি এবং দেখেছি যে, দেশের এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বঙ্গবন্ধুর মত একজন নেতা দরকার।' এই কথাগুলো তাজউদ্দীন সাহেব '৭২-'৭৪-এর দিকে বলতেন। আবার সেই সময়ের অনেক কিছুই তাজউদ্দীন সাহেব মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব খুব অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে সংগঠন বঙ্গবন্ধু করেছেন সেই সংগঠনেই নিজেকে নিবেদিত করবেন। নিজের প্রচেষ্টাতে আর একটা সংগঠন করবেন—এমন মানসিকতা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল।

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যে কাজটি করতে হয়েছে সেই কাজটি তিনি করেছেন সুচারুরূপে । কিন্তু প্রতিটা মুহূর্তে তিনি খুব ব্যথিত বোধ করতেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু নেই, ঝামেলাটা তাঁকে পোহাতে হচ্ছে। কারণ রাজনীতিতে যে কতকগুলো খুচরো ঝামেলা থাকে, এই খুচরো ঝামেলা করতে তিনি মানসিকভাবে কোনদিনই প্রস্তুত ছিলেন না । তিনি নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান মানুষ; সে কারণেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক, রাজনীতির যে বাড়তি

কাজগুলো থাকে, সে বাড়তি কাজগুলো করতে তিনি খুব রাজি ছিলেন না। যেমন, পিঠে চাপড় দিয়ে কথা বলা, মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর করে দেয়া, পকেট থেকে পাঁচশ'টি টাকা বের করে দেয়া যে, তুমি এই টাকাটা রাখো—এ ধরনের কাজে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। সে কারণে রাজনীতির এই বাড়তি কাজগুলো তাঁর ঠিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল না।

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার শেষ কথা হয় ১৫ অগাস্ট। ১৫ অগাস্ট আমি বঙ্গবন্ধু হত্যার পরই বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং অন্য এক বাসায় গিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবকে ফোন করলাম। তিনি বলেছিলেন যে, 'আমি তো ক্যাবিনেটে ছিলাম না—' বা এরকম একটা কথা, কিন্তু হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল । তারপর ফোন করে আর পেলাম না । ততক্ষণে বোধ হয় তাঁর টেলিফোন কেটে দিয়েছে।

তাজউদ্দীন সাহেব পদত্যাগের পর পরিষ্কার করে কিছু বলতেন না, পাশ কাটিয়ে যেতেন অনেক কিছু। তিনি বোধ হয় তখন ভাবতেন যে, দেশটি যেভাবে চলছে এতে পতন অনিবার্য। একে ঠেকাবার উপায় নাই। যখন ত্রিদলীয় ঐক্যজোট হল তখন থেকেই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি খুব শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল আওয়ামী লীগের বিপক্ষে একটা শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে আমরা একটা ভারসাম্যের ভেতর দিয়ে চলতে পারব। বিরোধী দল আমাদের কাজের সমালোচনা করবে; তার ফলে আমরা সৎভাবে, ভালভাবে এগিয়ে চলব—এবং শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে উঠুক এটা তিনি চাচ্ছিলেন।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু যখন ত্রিদলীয় ঐক্যজোট করলেন তখন দেখলেন যে, বহুদলীয় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। ওই সময় মণি সিংকে আমার সামনেই বলেছেন যে, 'দাদা, আপনারা ত্রিশূল হয়ে আসলেন। এর এক শূল দিয়ে আপনারা মারবেন বঙ্গবন্ধুকে, আর এক শূল দিয়ে আমাদেরকে, আর এক শূল দিয়ে বাংলাদেশকে।' একথা তিনি বলেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে একটা পরিকল্পনা সেল গঠন করা হয়েছিল। শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, কৃষি, শিল্প-কারখানা, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ এ সমস্ত ব্যাপারে আমাদের প্ল্যান তৈরি হয়েছিল। খান সারওয়ার মুরশিদ, ড. আনিসুজ্জামান, মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, ড. স্বদেশ বোস, ড. মুশাররফ হোসেন এই সেলে ছিলেন ।

স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু অস্ত্র উদ্ধারের ডাক দিলেন, এটা তাজউদ্দীন সাহেবের মনঃপূত হয়নি। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব এটা বঙ্গবন্ধুকে বলতেও পারেননি । কারণ বলতে গেলে আবার সন্দেহ করে বসতে পারেন যে, এদের অস্ত্র তোলার ব্যাপারে তাজউদ্দীন সাহেবের আপত্তি কেন—নিশ্চয় কোন কারণ আছে! কারণ, বঙ্গবন্ধুকে তাঁর চারপাশের লোক নানারকম কান ভাঙানি দিচ্ছিল।

তাজউদ্দীন সাহেবের পরিকল্পনা ছিল, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ না করে এর পেছনে যে মানুষগুলো আছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা। যদি অস্ত্রের পেছনের লোকগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে অস্ত্র স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাবে। সেজন্য তিনি দেশ মুক্ত হবার সাথে সাথে প্রতিটি জেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র খুলেছিলেন। সেখানে তাদের অস্ত্রসহ তারা থাকবে, তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হবে । এরপর তারা নিজ নিজ পেশায় চলে যাবে । তারা রাজাকারদের অস্ত্র উদ্ধারে সাহায্য করবে। তারা এই ক্যাম্পে থাকবে, এতে যত অর্থই লাগুক না কেন। তাঁর প্রথম বিবেচনা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ক্যাম্প করা। তাতে প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কাজে তাদের লাগানো যেত ।

কিন্তু পরবর্তীতে এটি আর করা হল না । তাদেরকে সোজা বলা হল, তোমরা অস্ত্র জমা দিতে আসো । তাতে যেগুলো ভারি অস্ত্র, যেগুলো নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না, সেগুলো জমা হল, কিন্তু ছোট ছোট অস্ত্র রয়েই গেল। সেগুলো কোনদিনই উদ্ধার করা গেল না এবং এই ছেলেগুলোকে আমরা হারিয়ে ফেললাম । অথচ এরা ছিল মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় ফসল ।

মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট দেয়ার পদ্ধতিটা ছিল ভুল। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল বলে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজও শেষ হয়ে গেল, এটা কিন্তু ঠিক হয়নি। তাজউদ্দীন ভাইসহ আমাদের ইচ্ছে ছিল, আমরা নিজেরাও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এই ক্যাম্পে এসে থাকব। দরকার হলে আমরা আমাদের নিজেদের কাজে যাব না। আমরা এই ক্যাম্পের সাথে থাকব যতদিন দেশের পুনর্গঠন না হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পূর্ণভাবে স্থিতিলাভ করতে যতদিন সময় লাগবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের ক্যাম্প চলতেই থাকবে। মুক্তিযুদ্ধ একটা প্রক্রিয়া ছিল, চলমান প্রক্রিয়া, যা ১৬ ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে যায়নি। পরে ক্রমশ

সেই প্রক্রিয়াটার সাথে বিরোধ ঘটল । এবং যা হল তাতে মনে হয়, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব এবং আমরা বাংলাদেশে সত্যিকার ন্যায়বিচার, সমাজে সুষম বণ্টন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করবার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে যে সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম, সে সুযোগ আর পাওয়া যায়নি ।

[21.6.1991/২৮.৬.১৯৯১/১২.৭.১৯৯১/২৭.৭.১৯৯১]

আমীর-উল ইসলাম : ব্যারিস্টার, সক্রিয় রাজনীতিক ও আইনজীবী। বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী ।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত

তাজউদ্দীন সাহেবের নাম ছাত্রজীবন থেকেই জানি। আমি ছাত্র রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলাম । কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেবের দল আর আমার দল এক ছিল না । তাজউদ্দীন সাহেব ছাত্র লীগের নেতা, সেটা জানতাম । তিনি আমাদের কিছু সিনিয়ার, তাঁর সাথে সরাসরি আমার বিশেষ কোন পরিচয় ছিল না । তাঁর সম্পর্কে খুব ভাল শুনতাম। হেলাল উদ্দিন চৌধুরী বলে একজন আমার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি সিলেটের লোক। ভাল ফুটবলার ছিলেন। পরবর্তীতে সিভিল সার্ভিসের সদস্য হয়েছিলেন। সেই হেলাল ভাই তাজউদ্দীন সাহেবের কথা খুব বলতেন। তাঁরা বোধ হয় দু'জন রুমমেট ছিলেন কিছুদিন। তিনি বলতেন, এই মানুষ খুব চিন্তাশীল ব্যক্তি। এইরকম ভদ্র, শান্তশিষ্ট মানুষ যে একটা দলের নেতা তা বোঝা যায় না।' একজন জ্ঞানী ও অতি অমায়িক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে তাঁর বন্ধুরা সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। সেইসাথে তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র । এটা বলছি '৫১-'৫২ সালের কথা।

ছাত্র ইউনিয়ন তখনও হয়নি। ছাত্র ইউনিয়ন হয়েছে ১৯৫২ সালে। কিন্তু ইউনিয়ন ধরনের ছেলে আছে। সংস্কৃতি সংসদ ছিল। আমরা মনে করতাম যে, ছাত্র লীগ নিজের দল না, কিন্তু স্বগোষ্ঠীর দল। ছাত্র লীগের মধ্যে দুটি উপদল ছিল । তার মধ্যে একটা ছিল একটু ডানঘেঁষা। অপরটি প্রগতিশীল গোষ্ঠী। আর তাজউদ্দীন সাহেব সম্বন্ধে আমরা শুনলাম যে, ছাত্র লীগের প্রগতিশীল গোষ্ঠীর যে অংশ, তিনি সেই গোষ্ঠীর লোক ।

১৯৫৪ সালে তাজউদ্দীন সাহেব নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশ নিয়ে তাতে জয়লাভ করলেন। বেশ কয়েকজন ছাত্র সেই সময় নির্বাচন করেন । আমাদের হলের শামসুল হক সাহেবও নির্বাচিত হলেন। খালেক নেওয়াজ সাহেবও নির্বাচিত হলেন। আমাদের খুব ভাল লাগল ।

এরপরে আমি সিভিল সার্ভিসে যোগ দেই। শেখ সাহেবকে ভাল চিনতাম এবং তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল । কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ হয়নি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসার পর ।

১৯৬৯ সালে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যখন বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডি গেলেন তখন তাঁর সাথে অন্যান্যদের মধ্যে তাজউদ্দীন সাহেবও ছিলেন। সেখানে দেখলাম, তিনি খুব বড় মনের মানুষ, বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের মানুষ

তাজউদ্দীন সাহেব। আর শেখ সাহেবও সবসময় কথা প্রসঙ্গে রেফারেন্স দেন তাজউদ্দীন সাহেবের। সরকারি অফিসার হিসেবে আমি তখন তাঁদের দেখাশোনা করতাম । আমার ডিউটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের দেখাশোনা করা। আমি তখন রাওয়ালপিন্ডিতে পোস্টেড। তখন তাঁকে দেখে আমার খুব ভাল লাগল । আর যেটা আমার মনে হল, তিনি খুব সরল মানুষ। তাঁর চেহারার মধ্যে এক ধরনের সারল্য ছিল। তখন তো তিনি আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি। তাঁর সাথে কথা বললে সেই রকম মনে হয় না। এই সাধারণ ধরনের একজন। খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন, বেশি কথা বলেন না। সাধারণত রাজনৈতিক নেতারা খুব বেশি কথা বলেন, শুনতে হয় বেশি। তাঁর কাছে গেলে তিনিই শোনেন বেশি, এইভাবেই তাঁর সাথে পরিচয়। তখনই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মাল, যদিও তাঁকে আমি খুব বেশি জানি না।

আর একজন ভদ্রলোক তাজউদ্দীন সাহেবের খুব প্রশংসা করতেন, তিনি হলেন জহিরউদ্দিন সাহেব। একসময় তিনি পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম।

তারপর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমি ওয়াশিংটনে। সেখানে আমরা কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা কী হচ্ছে জানতে আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব হারুন-উর রশিদকে (বর্তমানে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত) ১৩ এপ্রিল ১৯৭১-এ কলকাতা পাঠিয়ে দিলাম। আমাদের মনে হল আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে । কিন্তু কী করব ? আগে ওখানে গিয়ে সে দেখে আসুক। ইতোমধ্যে আমরা স্বাধীনতা ঘোষণার কথা জেনে গেছি। আরো খবর পেলাম যে একটি সরকার গঠিত হচ্ছে। এই খবরটি দিলেন জাকারিয়া খান চৌধুরী (পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের মন্ত্রী)। তিনি তখন বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে কলকাতা হয়ে লন্ডন গেছেন ।

টেলিফোন করে খবর জানালেন। জাকারিয়া সাহেব আরো জানালেন যে, তাজউদ্দীন সাহেব স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। তখন আমাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছে যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম যদি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হন, তা হলে তো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী হবেন ।

যাই হোক, হারুন-উর রশিদ তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ২৩ এপ্রিল

ওয়াশিংটনে ফিরে আসেন। হারুন-উর রশিদ আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা ও কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন এবং তিনি বললেন যে, তাজউদ্দীন সাহেব একেবারেই নিবেদিতপ্রাণ, যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তিনি এই যুদ্ধে আমাদের সবার সমর্থন ও সহযোগিতা চান ।

তারপর থেকে আমরা নানা সূত্রে সরকারের এবং মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর পেতে থাকি । সেই সাথে তাজউদ্দীন সাহেব সম্পর্কে একটা ধারণা করে ফেলি যে তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করছেন। মুক্তিযুদ্ধের নেতা তিনি। আগস্ট মাসে মরহুম এম. আর. সিদ্দিকী সাহেব বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হয়ে ওয়াশিংটন এলেন । তাঁর মুখে শুনি তাজউদ্দীন সাহেবের কথা । যারাই বাংলাদেশ বা মুজিবনগর থেকে আসে তাদের মুখেই শুনি এই মানুষটির ত্যাগ, তিতিক্ষা, আনুগত্য ও দৃঢ়তার কথা। পাকিস্তানিরা মনে করত তিনিই হলেন তাদের বড় শত্রু । অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও অধ্যাপক রেহমান সোবহান '৬৯ সাল থেকে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কাজ করছেন। তাঁরা তুলে ধরলেন তাঁর আর একটি দিক । মার্চের অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার সময় একটি বড় সমস্যা ছিল জীবনপ্রবাহ অব্যাহত রাখা । এ বিষয়ে তাঁরা তাজউদ্দীন সাহেবকে দেখেন অত্যন্ত প্রয়োগবাদী, বাস্তবধর্মী একজন প্রশাসক হিসেবে। পঁয়ত্রিশটি নির্দেশের খুঁটিনাটি ঠিক করেন তিনি, মোটা দাগে দিকনির্দেশনা দিতেন বঙ্গবন্ধু। তাঁদের দু'জনের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ছিল কোন বিশেষ মাত্রায়, একের ভাষা বা ইঙ্গিত অন্যজন সহজেই অনুধাবন করতেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ব্যাপারে তাজউদ্দীন আহমদের কোন সংশয় ছিল না এবং এর বিকল্প কিছুও তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না ।

এদিকে ভারতের অর্থমন্ত্রী ওয়াই. বি. চ্যাবন এসেছিলেন ওয়াশিংটনে । আমি তাঁর সাথে দেখা করেছিলাম। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম, মুজিবনগর সরকারের ভেতরে কিছু ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তবে তার প্রতিকার সম্ভব।

একই সময়ে তওফিক ইমাম (পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের সচিব) মুজিবনগর থেকে আমাকে একটা চিঠি লিখল যে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আপনি প্রশাসনিক পুনর্গঠনের ওপর কিছু একটা লেখেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমি এই কাজটি আগে করেছি। তওফিক নিশ্চয় তাজউদ্দীন সাহেবকে একথা বলেছে। তাই তিনি আমাকে এই কাজের দায়িত্ব দিলেন। আমি এটা

লিখে বাংলাদেশের মুখ্য সচিবকে ৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে ওয়াশিংটন থেকে পাঠিয়ে দেই । তারপর আমি বাংলাদেশ এলাম ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২। ঢাকায় এসেই আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলাম। সেইসাথে সেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও আমার দেখা করার ইচ্ছা, যাঁর অধীনে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি।

তাজউদ্দীন সাহেবের মহত্ত্ব সম্পর্কে শুধু আমার না, অনেকেরই সেই সময় ধারণা ছিল যে, মহাভারতে আছে রামের খড়ম সিংহাসনে রেখে ভরত তাঁর পক্ষে দেশ শাসন করেছিলেন, এটা একটা পৌরাণিক কাহিনী, কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা বাস্তব হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুর নামেই তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করলেন।

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ আমি তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা করতে তাঁর হেয়ার রোডের সরকারি বাসভবনে গেলাম। সেটাই বলতে গেলে তাঁর সাথে আমার সরাসরি পরিচয়। রাত দশটার দিকে গিয়েছিলাম । ফিরেছিলাম সেই রাত একটার দিকে । গল্প হল । শুধুই মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ । আমাদের কাছ থেকেই শুনেছেন বেশি, আবার কখনও অল্পবিস্তর নিজেও বলেছেন ।

মনে আছে, বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর সাথে ২৫ মার্চ রাতে তাঁর যখন শেষ দেখা হয় তখন বঙ্গবন্ধু কোনমতেই গা ঢাকা দিতে রাজি হলেন না । বঙ্গবন্ধু তাঁর হাত ধরে বললেন, তুমি সরে পড়, তুমি পারবে।'

তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে এই কথাটিই ছিল তাঁর নেতা এবং অগ্রজের আমানত। তিনি কখনও তাঁর আন্দোলনকে ব্যর্থ হতে বা পথভ্রষ্ট হতে দেননি। আর আমার প্রসঙ্গে বললেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একবার ভেবেছিলাম আপনাকে মুজিবনগরে ডাকব। কিন্তু তারপর ঠিক করলাম, না, আপনার আমেরিকায় থাকাটাই মুক্তিযুদ্ধের জন্য বেশি প্রয়োজনীয়।'

এদিকে আমি জানুয়ারি মাসের শেষে ঢাকায় আসার আগেই খবর পেয়েছিলাম যে, আমাকে পরিকল্পনা কমিশনের সচিব নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমি এই পদে যোগ দেব কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ ছিল। এমনকি সরকারি চাকরি করব কিনা তা নিয়েও আমার চিন্তাভাবনা ছিল। এই অবস্থায় ঠিক হল ড. গোলাম রব্বানী সচিব পদে বহাল থাকবেন, আমি সচিব পদমর্যাদায় বিশেষ বিশেষ কাজ করে যাব ।

পরিকল্পনা কমিশনে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, বিদেশী সাহায্য নেয়ার ব্যাপারে তাজউদ্দীন সাহেব খুবই অনিচ্ছুক। তাঁর সাথে অফিসিয়াল বিভিন্ন বিষয়ে মাঝেমধ্যেই কথা হত। সাহায্য, অনুদানের বিষয়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম, যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসনের জন্য আমাদের এ ধরনের মাস্টার প্ল্যানের দরকার। আর এটি দ্বিপক্ষীয় কোন ব্যবস্থা না হয়ে আন্তর্জাতিক বা বহুজাতিক পরিকল্পনা হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমস্যার কথা মনে রেখেই আমি এই কথাগুলো বলেছিলাম । এখানে একটা কথা বলতেই হয়, তিনি অর্থ ও পরিকল্পনা কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি কখনই কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করেননি। উঁচু পর্যায়ের কোন সিদ্ধান্ত যা ক্যাবিনেটে যাবে এমন ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে ডেপুটি চেয়ারম্যান ড. নূরুল ইসলাম এবং অন্যান্য সদস্যদের সাথে পরামর্শ করতেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে কানাডীয় উন্নয়ন সংস্থার (CIDA) প্রধান মসিয়েঁ লাজোয়া ঢাকায় এলেন। তিনি কুইবেকের মন্ত্রী। তাঁর সম্মানে বড় একটা রিসেপশনের আয়োজন করা হল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে (বর্তমান শেরাটন হোটেল)। এই সভায় তিনি ঘোষণা করলেন, কানাডা বাংলাদেশকে ৪৫ মিলিয়ন ডলারের অনুদান দেবে। তাঁর এই ঘোষণায় তাজউদ্দীন সাহেবকে একটু বিমর্ষ দেখাচ্ছিল, আমার মনে হল এত ঢাকঢোল বাজিয়ে অনুদান নেয়ার ব্যাপারটি তাঁর খুব বেশি পছন্দ হয়নি। একফাঁকে তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে একজন বাম দলীয় রাজনীতিবিদ এসে বলতে লাগলেন, সিআইএ সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে, কিছু লোক আছে যারা দেশটাকে কলোনি বানাবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি পাশেই ছিলাম, চুপ থাকতে পারলাম না । বললাম, ‘স্যার, বাংলাদেশ কোন সোনার থালা না যে বিদেশীরা বাংলাদেশকে নেবার জন্য বসে আছে। সিআইএ এজেন্ট খুঁজতে গেলে কেউ আবার কেজিবি এজেন্ট খুঁজবে, এতে দেশের ক্ষতি হবে।' তাজউদ্দীন সাহেব মাথা দুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, এজেন্ট ফেজেন্ট কিছু না। আমরা কী করি সেটাই আসল। কিন্তু আমরা যে সোনার থালা নই, এটা কী করে আমাদের লোকের মাথায় ঢোকান যায় ? প্রত্যাশার জোয়ারে আমরা ভেসে যাচ্ছি, টেনে ধরাটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা।'

বাংলাদেশ যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় জাতিসংঘের আনরব (UN Relief Operation for Bangladesh) মিশনের সাহায্য চায় । সম্ভবত মার্চ মাসে পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য আনরব একটি মিশন

পাঠায়। এই মিশনে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং জাতিসংঘের অনান্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা ছিলেন। এর নেতৃত্ব দেন ভারতে নিযুক্ত অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত আরনা জাইলার। তাঁরা সরেজমিন ধ্বংসলীলা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং জরুরী ভিত্তিতে কী কী উপকরণের প্রয়োজন, কি কাজ করতে হবে, তার একটি কার্যক্রম বানাবেন। এই মিশনের দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে । আমরা নিজেরা যে হিসেব করেছি বা যে কর্মকাণ্ড চিন্তা করেছি তার একটা ব্রিফ বানানো হয় পরিকল্পনা কমিশনে। মিশন এসে সর্বপ্রথমে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় বসবে। আমার কাজ হল প্রস্তুতিপর্বে মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ—আমাদের ব্রিফ মন্ত্রী অনুমোদন করবেন, আমাদের কথা মন্ত্রী মিশনকে বলবেন। তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে এক বিকেলে আমার লম্বা বৈঠক হল। তিনি আমার কথা শুনলেন, কোন কোন জায়গায় প্রশ্ন করলেন, ব্যাখ্যা চাইলেন। আমরা কৃষি উপকরণ খুব বেশি করে চাচ্ছি, সেইসাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে চাই। সবচাইতে বড় সমস্যা অভ্যন্তরীণ পরিবহন । বিস্তারিত আলোচনার পর আমি পরিকল্পনা সচিবের দপ্তরে ফিরে গেলাম। বৈদেশিক সাহায্য সম্বন্ধে তাজউদ্দীন সাহেবের মতামত নিয়ে বাজারে তখন অনেক গুজব ছিল। কেউ কেউ বলতেন, তিনি বৈদেশিক সাহায্যে বিশ্বাস করেন না। তিনি চান কৃচ্ছ্রতাসাধন করে জাতীয় বিনিয়োগের প্রসার । আবার কেউ বলতেন, তাজউদ্দীন সাহেব বৈদেশিক সাহায্য চান, কিন্তু তা শুধু বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে নেবেন। কারো কারো মতে, তিনি মনে করতেন যে বড় দাতা তার সাহায্যের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাই তাদের, বিশেষ করে আমেরিকাকে পরিহার করা উচিত।

ড. রব্বানী জানতে চাইলেন কী হল। আমি বললাম যে, তিনি সম্পূর্ণ ব্রিফটা শুনলেন, কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা চাইলেন এবং দু'একটি জায়গায় প্রশ্ন করলেন। তিনি কীভাবে মিশনের কাছে বিষয়টি পেশ করবেন তা নিয়ে কোন আলাপ করেননি। আমাদের ব্রিফে আমরা কী সাহায্য চাচ্ছি সে সম্বন্ধে আমি তাঁকে অবহিত করেছি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁর, তিনি আমাকে ব্রিফ বদলাতে বলেননি। তাই মিসেস জাইলারের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত তাজউদ্দীন সাহেবের প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না ।

সম্ভবত পরদিনই জাইলার মিশনের সাথে তাজউদ্দীন সাহেব আলোচনায় বসলেন। তিনি তাঁর নিজের মত করে দেশের ধ্বংসলীলার একটি চিত্র

দিলেন। আর এও জানালেন যে, এই খেসারত দেশটি দিয়েছে শুধু তাদের গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য । তিনি কোথায় কোন্ ক্ষেত্রে জরুরী সাহায্যের প্রয়োজন তার হিসেব দিলেন। অতিরিক্ত কথা বললেন যে, রপ্তানি প্রক্রিয়াকে সত্বর জোরদার করতে হবে এবং বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ার বিষয়টিতে জোর দিতে হবে। আমরা যারা মিশনের সঙ্গে ছিলাম তাদের বুক কয়েক ইঞ্চি সম্প্রসারিত হল। তাজউদ্দীন সাহেব খুব গোছালোভাবে যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্য ও দাবি বা অবস্থা তুলে ধরলেন। মিশনের যখন বিদায়কাল ঘনিয়ে এল তখন মহিমান্বিত জাইলার আমাকে জানালেন, তাজউদ্দীন সাহেবের কথাগুলোকে ভিত্তি করেই তাঁরা তাদের কার্যক্রম প্রণয়ন করছেন। আমি সত্যিই ভীষণ অভিভূত হলাম। যদিও তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল যে তিনি অ্যান্টি- আমেরিকান—অনুদান সাহায্য নিতে চান না, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী, ধারণাটা অনেকটা এমন। একদিকে শ্রদ্ধাবোধ, সাথে একটু রিজারভেশন । একটা যুদ্ধ পরিচালনা করলেন একেবারেই নিঃস্বার্থভাবে। আমার সামনে যত আলোচনা হল, কথাবার্তা হল, কোথাও আমি শব্দটি নেই। নিজের আমিত্ব প্রকাশের কিছুমাত্র চেষ্টা নেই । তাঁর সরলতা, বিশ্বস্ততা খুব ভাল লাগত ।

এপ্রিলের ১৬ তারিখে আমি ওয়াশিংটন ফিরে গেলাম। যাবার আগে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা করে যাই। আমি যে পরিকল্পনা কমিশনে যোগ দিলাম না, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই বললেন না। দেশের নানা সমস্যা নিয়ে কথা হল— পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফিরিয়ে আনা, বাজেট প্রণয়নের সমস্যা, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার নিয়েও কিছু কথাবার্তা হল। বিশ্বব্যাংক ও মুদ্রা তহবিলের সদস্য হওয়ার বিষয় নিয়ে এবং স্বাধীনতার আগের বৈদেশিক সাহায্য সম্বন্ধে আমি দুটো প্রতিবেদন পেশ করেছিলাম, কমিশন একটি ছয় মাসের পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রণয়ন করেছিল, তা নিয়ে কিছু মন্তব্য করলেন। তাঁর একটি মন্তব্য ছিল, উচ্চাশার যে বিস্ফোরণ হচ্ছে তাতে অমঙ্গল নিহিত, হতাশা হয়ত অনেক ক্ষতিসাধন করবে ।

ওয়াশিংটন পৌছেই আমি সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করলাম । আমার যুক্তি ছিল, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার ফলে আমার মধ্যে যে রাজনৈতিক প্রভাব পড়েছে তা সিভিল সার্ভিসের জন্য উপযুক্ত নয় ।

আমার পদত্যাগ সরকার গ্রহণ না করে আমাকে ওয়াশিংটন দূতাবাসের সাময়িক

চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের দায়িত্ব দিলেন । অগাস্ট মাসে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক ও মুদ্রা তহবিলের সদস্য হয়। এর মধ্যে খবর পেলাম, বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় যোগ দিতে সেপ্টেম্বর মাসে তাজউদ্দীন সাহেব ওয়াশিংটনে আসবেন। আমি সরকারকে জানালাম, এটি হবে বাংলাদেশ থেকে উচ্চ পর্যায়ের প্রথম আমেরিকা সফর, সুতরাং অর্থমন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের সভা করা ছাড়াও আমেরিকান উচ্চ পর্যায়ে দেনদরবার করতে পারেন। আমি আরো জানালাম, অর্থমন্ত্রীর সফর শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেব না। আমি প্ল্যান বানাতে শুরু করলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকান জনগণ আমাদেরকে জোর সমর্থন জানিয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদ এই সমর্থনটা চেয়েছিলেন, যদিও আমেরিকান সরকার সমর্থন দেয়নি। সেই তিনি আসছেন, আমি মিটিং ছাড়াও খুব সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম। তাজউদ্দীন সাহেব ওয়াশিংটনে আমাদের বন্ধু মহলে সুপরিচিত ব্যক্তি, তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী অনেকেই জানেন, অনেকে '৭১ সালে তাঁর সঙ্গে মুজিবনগরে দেখাও করেছেন । আমেরিকান সরকারি মহলও এই স্বল্পবাক, প্রচারবিমুখ, দৃঢ়চেতা মানুষটিকে জানতে চায়, তাঁর চিন্তাভাবনা পরখ করে দেখতে চায়। বাঙালি ও ভারতীয় মহল মুক্তিযুদ্ধের এই একনিষ্ঠ নেতার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। আমি প্রস্তাব করলাম যে, তাজউদ্দীন সাহেব ব্যাংক ফান্ডের বড় কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন, সভা-সমিতি, সংবর্ধনা এগুলোতে হাজির হবেন। এছাড়াও আমেরিকান সরকারের বড় কর্তাদের সাথে দেখা করতে হবে, বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সংবর্ধনা গ্রহণ করতে হবে, আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের সাথে পরিচিত হতে হবে। এই বন্ধু মহলে ছিলেন অসংখ্য কংগ্রেস সদস্য, সাংবাদিক-প্রচারমাধ্যমের ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক ও আমেরিকান প্রশাসনের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, গীর্জার নেতৃত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিক্ষকবর্গ । ঢাকা থেকে খবর পেলাম, তাজউদ্দীন সাহেব ব্যাংক মিটিংয়ে আসছেন, এর বাইরে অন্যান্য যোগাযোগে রাজি নন। বেশ হতাশ হলাম। কিন্তু এর পরপরই আবার বার্তা পেলাম, তিনি সব ধরনের প্রোগ্রামই করবেন, তবে তা হতে হবে আড়ম্বরহীন, গরিব বিধ্বস্ত দেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং অর্থমন্ত্রীর জন্য হোটেলে সুইট নেয়ার দরকার নেই, শুধু একটি এক শয্যার কক্ষ হলেই যথেষ্ট। নতুন অফিস নিয়ে বাড়তি খরচ করে লাভ নেই, তাই এই খরচটি এড়িয়ে অফিসের কাজ চালাবার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেয়া হল ।

ওয়াশিংটনে সমস্ত অনুষ্ঠানই হল আড়ম্বরহীন, কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। তাজউদ্দীন সাহেব অনেকের সাথেই দেখাসাক্ষাৎ করলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন দেশের অর্থমন্ত্রী, আমেরিকার অর্থমন্ত্রী জর্জ শুলজ এবং এইড প্রশাসক ড. জন হান্না, বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা এবং মুদ্রা তহবিলের পিয়ার পল সোয়াইটজার । এই প্রতিটি সাক্ষাতেই আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয় । মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সমস্ত মিটিং-আলোচনার ফাঁকে প্রতিদিনই তাঁর সাথে আমার সমাজতন্ত্র, দুর্নীতি, উন্নয়ন, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এমনকি বিতর্ক পর্যন্ত হয়ে যেত। আশ্চর্য বিষয়, আমি লক্ষ্য করতাম তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখান না। আমি সরকারের কত রকম সমালোচনা করছি, কত কী বলছি, তিনি শুধু শুনছেন। আমার মনে হল, তিনি অনেক বিতর্কের অবতারণা করেন শুধু যুক্তিগুলো অনুধাবনের জন্য।

সমাজতন্ত্রে বাংলাদেশের উত্তরণ নিয়ে একদিন তাঁর সাথে গভীর একটি আলোচনা হয় । তাঁর কথা ছিল যে, আমরা সবাই সমাজতন্ত্রের বৈষম্যহীন সমাজে আকৃষ্ট, কিন্তু কী করে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলব তা তো জানি না । পশ্চিমের শিক্ষালয় থেকে আহরিত সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকথা দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা খুবই কষ্টকর। সরকারি খাতে উদ্বৃত্তের ব্যবস্থা করে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ করের কি কোন ভূমিকা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হতে পারে ? প্রয়োজনমত সম্পদ যদি সবাইকে নিশ্চিত করা যায় তাহলে প্রত্যক্ষ করের তো কোন অবকাশ থাকে না। অথচ আমাদের উদ্বৃত্তের জন্য প্রত্যক্ষ কর

এবং বৈদেশিক বাণিজ্য করই হচ্ছে প্রধান উপাদান। আমাদের বৈপ্লবিক অভিভূতিটি ছিল এত স্বল্পস্থায়ী এবং এতে স্বার্থের সমাহার ছিল এত জটিল যে এর উপর ভিত্তি করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন। আমাদের নেতৃত্বও যে সেজন্য প্রস্তুত আছে তাও সজোরে দাবি করা যায় না।

আমার মনে হল, স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘাত, আদর্শ ও প্রয়োগবাদের মধ্যে ফাঁক নিয়ে তিনি ছিলেন গভীরভাবে চিন্তিত । প্রতিটি আলোচনায় বাংলাদেশের সমস্যা এবং কৌশল নিয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্বাসনের জন্য কি করতে হবে সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল পরিষ্কার। বাংলাদেশের প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁর হিসেব ছিল সহজসরল।

বিশ্বব্যাংক, মুদ্রা তহবিল এবং অন্যান্য মিটিংগুলো হল আশাতীত সাফল্যজনক। ম্যাকনামারার পরিচিতি ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কমপিউটার মনের মানুষ হিসেবে। তিনি তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আলোচনায় অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করলেন। বিশ্বব্যাংকের কাছে ২০০ মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হল। ১৬০ মিলিয়ন ডলার চলতি প্রকল্পের জন্য এবং ৬২ মিলিয়ন ডলার নতুন প্রকল্পের জন্য ঋণ চুক্তি সম্পাদন হয়। মুদ্রা তহবিল থেকে পাওয়া যাবে ৬২.৫ মিলিয়ন ডলার। আমেরিকার ট্রেজারি সেক্রেটারি (অর্থমন্ত্রী) জর্জ শুলজ-এর সাথে বৈঠকের পর তাঁদের দু'জনের সম্পর্ক এমন ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছে, যা পরবর্তী বছরগুলোতেও একইরকম থেকে যায়। আমেরিকান এইড ডাইরেকটার ড. হান্নার সাথে আলোচনাও অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। আমেরিকান প্রশাসনে তাজউদ্দীন সাহেব সম্পর্কে ধারণা ছিল, তিনি অত্যন্ত কট্টর ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর সাথে আলোচনার পর সেই ধারণাটা বদলে যায় । তাঁরা প্রত্যেকেই সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, মানুষটি বাস্তববাদী বা প্র্যাগম্যাটিক।

সফর শেষ করে ফেরার সময় তিনি আমাকে দুটো কথা বললেন। এক, আমি যেন এক্ষুণি চাকরি থেকে পদত্যাগ না করি, আর অন্যটি গূঢ় তত্ত্বকথা— দেশকে গড়ে তুলবার জন্য প্রয়োজন নিবেদিত দেশপ্রেম ।

সত্যি কথা বলতে, আমি তখনও জানি না তিনি আমার সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন। কারণ ওই যে ওয়াশিংটনে অবস্থানের ক'টা দিনের আলোচনা-বিতর্কের কথাই আমার মাথায় ছিল। এর কয়েকদিন পরেই আমি লন্ডনে গেলাম। বন্ধু মঈদুল হাসান (মূলধারা একাত্তর বইয়ের লেখক) বললেন, 'আপনি তাজউদ্দীন সাহেবকে কী বলেছেন যে শুধু মুহিত ছাড়া আর কোন কথা নেই ? মনে হল একেবারেই মোহিত করে ফেলেছেন।' এইভাবেই আমি প্রথম জানলাম আমার প্রতি তাজউদ্দীন সাহেবের মনোভাব ।

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে পরবর্তী দুই বছর এই নিবেদিতপ্রাণ নেতার সঙ্গে কাজ করার অনেক সুযোগ আমার হয়েছিল। তখনই প্রত্যক্ষ করেছি, তিনি এক বিরাট মাপের প্রশাসক। একজন দক্ষ প্রশাসকের মত নিরপেক্ষতা, চট্ করে একটা বিষয় বুঝে ফেলার ক্ষমতা এবং কোন কিছুর গভীরে পৌঁছে বিশ্লেষণ করবার মত তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল তাঁর। তাঁর আলোচনায়, নোটে, সিদ্ধান্তে সবসময়ই আমি লক্ষ্য করেছি জ্ঞানগর্ভ গভীরতা। তাঁর আলোচনা, কথাবার্তা সবসময়ই ছিল স্ট্রেইটফরোয়ার্ড। এদিকেও আছি,

ওদিকেও আছি— এটা তিনি কখনই করতেন না ।

১৯৭২ ছিল পুনর্বাসনের বছর, অর্থনীতিকে সচল করার সময়। মুক্তিযুদ্ধে বাম রাজনীতির বিকাশ বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সবিশেষ এগিয়ে দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বহু শিল্পপতি তাদের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা সংস্থা পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। এগুলোর ব্যবস্থাপনার ভার সরকারকে নিতে হয়। এসব প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রতিষ্ঠান মিলে ৮২ শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারের হাতে এসে পড়ে। এই অবস্থায় অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ ছিল স্বাভাবিক। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার খাতিরে যে শিল্পনীতি গ্রহণ করা হল, তাতে ব্যক্তিমালিকানা খাতের সুযোগ মোটেই রইল না। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র শিল্প রইল ব্যক্তি উদ্যোগের আওতায়। ২৫ লাখ টাকা হল ব্যক্তিমালিকানা খাতের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ-সীমা। সরকারের পক্ষে ছোট ছোট পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা হল অত্যন্ত জটিল। দেখা গেল যে, শিল্প নীতির কড়াকড়িতে বিনিয়োগ মোটেই হচ্ছে না। ব্যক্তিমালিকানা খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগের কোন সুযোগই ছিল না। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিল। এ ব্যাপারে প্রয়োগবাদী সুপারিশ প্রণয়নের কৃতিত্ব তাজউদ্দীন আহমদের। শিল্প মন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলামের অবদান ছিল বিনিশ্চায়ক। বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য সুযোগদান, মাত্র ১৮টি শিল্পকে সরকারি খাতে রেখে বাকি সব শিল্পে ব্যক্তি উদ্যোগের ব্যবস্থা করা, বিনিয়োগের সীমা ২৫ লাখ থেকে ৩০০ লাখে বর্ধিত করা—এসব সুপারিশ পেশ করেন তাজউদ্দীন সাহেব । ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে নতুন শিল্প নীতি ঘোষণা করা হয় ।

এদিকে আমি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিতে চাইছি, অথচ তাজউদ্দীন সাহেব বিনা নোটিশে আমাকে এক তারবার্তা পাঠালেন যে, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে আমাকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সাময়িকভাবে বিশ্বব্যাংকে একান্ত নির্বাহী পরিচালকের পদে নিযুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমি যেন অনতিবিলম্বে দায়িত্ব গ্রহণ করি। ভদ্রলোকের সঙ্গে রোজই বিতর্ক হয়েছে, অনেক কড়া কড়া মন্তব্য করেছি। আর তিনি কিনা আমাকে একটি অযাচিত চাকরি উপহার দিচ্ছেন। প্রায় বছরখানেক এই চাকরিতে ছিলাম এবং আরো প্রায় বছরখানেক এর জের টানতে হয়।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় একটি দাতাগোষ্ঠীর

সম্মেলন আহ্বান করে। যদিও বাংলাদেশ এইড গ্রুপ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৪ সালের অগাস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯৭৩ সালের সভাকে এর পথপ্রদর্শক বিবেচনা করা যায় । এই সম্মেলনে বাংলাদেশ তাদের উন্নয়ন সমস্যা ও কৌশল সম্বন্ধে দাতাদের অবহিত করে এবং তাদের প্রয়োজনের হিসেব দেয়। বিশ্বব্যাংক, অর্থ তহবিল এবং আনরব অর্থনৈতিক অবস্থান, সম্পদের প্রয়োজন, কারিগরি সাহায্যের ক্ষেত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করে। একটি জটিল বিষয় ছিল পাকিস্তানের ঋণ সমস্যা। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সঙ্কট মুক্তিযুদ্ধের আগেই সৃষ্টি হয়। তবে মুক্তিযুদ্ধে সঙ্কটটি গুরুতর আকার ধারণ করে। পাকিস্তান ১৯৭১ সাল থেকেই তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়। ১৯৭৩ সালে তাদের আবদার ছিল যে, ঋণের একাংশের বোঝা বাংলাদেশের ভাগে ফেলতে হবে। আমাদের কথা ছিল যে, পাকিস্তান তখন বাংলাদেশকে স্বীকার করছিল না বরং তাদের সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের অংশ বলে দাবি করছিল, সুতরাং তাদের কোন ঋণ আমরা বহন করতে পারি না। আর তাদের সঙ্গে যদি আলোচনা শুরু হয় তখন আরো সব লেনদেনের হিসেব করতে হবে।

সম্মেলনের আগের দিন দাতাগোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে আমাদের একটি বৈঠক হয় । বৈঠকে আমাদের তরফ থেকে ছিলেন চারজন—তাজউদ্দীন আহমদ, ড. কামাল হোসেন, ড. নুরুল ইসলাম এবং আমি। এই বৈঠকে এই জটিল বিষয় নিয়ে কথাবার্তা পাকা করা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। দাতাদের কথা হল যে, যে সব প্রকল্প বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হয় সেগুলোর জন্য অপরিশোধিত ঋণের দায়িত্ব বাংলাদেশকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করতে হবে। ড. হোসেন আইনের অবস্থান বিশ্লেষণ করে আমাদের বক্তব্যকে জোরালোভাবে তুলে ধরলেন। যুক্তি অকাট্য, কিন্তু দাতারা তাঁদের পাওনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চান। তাজউদ্দীন সাহেব উপসংহারে বললেন, বাংলাদেশ সমস্যাটির গুরুত্ব স্বীকার করে এবং এর সমাধানে ভূমিকা রাখতে চায়। যথাসময়ে আইনগত ফাঁকের সুযোগ তারা নেবে না। তবে বাংলাদেশকে কোন ঋণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যে ভিত্তির প্রয়োজন তা পাকিস্তানকে তৈরি করে দিতে হবে, অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাদের স্বীকার করতে হবে। বাংলাদেশ অবশ্য এজন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করে বসে থাকবে না, কিন্তু এই মুহূর্তটা যথোপযুক্ত নয়। বাংলাদেশ তার উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের সদিচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যেসব পুরনো প্রকল্প

পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি, বাংলাদেশ সেগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেবার সময় এসব প্রকল্পের পুরো ঋণের বোঝা গ্রহণ করছে, যদিও অসম্পাদিত কাজের খরচ যৎসামান্য। বাংলাদেশের প্রয়োজন বড়ো মাপে সম্পদ প্রবাহের, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে আগুয়ান হতে লম্বা হাতে বিনিয়োগ করতে হবে। এবং এই উদ্যোগে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা ও সহমর্মিতা বাংলাদেশ কামনা করে ।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসের শেষে তাজউদ্দীন আহমদ দ্বিতীয়বারের মত ওয়াশিংটন সফরে আসেন। উপলক্ষ ছিল আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সংস্কার কমিটির একটি সভা। এই কমিটিকে বলা হত বিশজনের কমিটি বা 'কমিটি অফ টুয়েন্টি'। দু'বছর সভা-সমিতি করে কমিটি বিশ্ব অর্থব্যবস্থার সংস্কারে সামান্য কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কমিটির সভা-সমিতি ছাড়াও এবারে অর্থমন্ত্রী আমেরিকান সরকারের সঙ্গে নানা বিষয়ে সংযোগ স্থাপন করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স, কৃষি মন্ত্রী আল বাটজ এবং এইডের প্রশাসক ড. জন হান্নার সঙ্গে তাঁর বিস্তৃত আলোচনা হয় ।

প্রত্যেকটি আলোচনায় দুটি বিষয় গুরুত্ব পায়। একটি হল খাদ্য সরবরাহ। কংগ্রেসের অনুদানের অধীনে বাংলাদেশ আমেরিকা থেকে প্রচুর গম আমদানি করছিল। মন্ত্রী যে সমস্যাটি তুলে ধরেন তা ছিল আমদানির নির্ঘণ্ট নিয়ে । নবান্নের আগে বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল তিন লাখ টন আমেরিকান গম । অন্য বিষয়টি ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট ঋণের বোঝা বিভাজন। তাজউদ্দীন সাহেব ঋণের ব্যাপারে তাঁর আগের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং এবারে সেই যুক্তি গৃহীত হয়। বিশ্বব্যাংকের সভাপতি রবার্ট ম্যাকনামারা জানালেন যে, ঢাকায় ঋণের বিষয়টি নিয়ে জারিজুরিটি সঠিক ছিল না। এবং বাংলাদেশের অত্যন্ত প্রয়োগবাদী অবস্থান এখন সব দাতা মেনে নিয়েছেন ।

সেক্রেটারি অব স্টেটস্ উইলিয়াম রজার্স যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি উত্থাপন করে বাংলাদেশকে নমনীয় হতে অনুরোধ করলেন এবং বললেন যে, নাইজেরিয়া বায়াফ্রার যুদ্ধাপরাধীদের মাফ করে দিয়েছে । তাজউদ্দীন সাহেব এই বক্তব্যকে গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন যে, বায়াফ্রায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশে কিন্তু সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার হরণে পাশবিক অত্যাচার করে পরাস্ত হয়। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ছিল ক্ষমতাশালী এবং তারা যে অপরাধ করেছে তার বীভৎস বিবরণ খোদ আমেরিকার সাংবাদিকরাও লিপিবদ্ধ করেছেন। তবুও বাংলাদেশ

সমস্ত সেনাবাহিনীকে ছেড়ে দিয়ে মাত্র ১৯৫ জনের বিচারের দাবি করেছে। এই বিচার মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়। রজার্সের একটি প্রারম্ভিক মন্তব্য ঐতিহাসিকভাবে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তিনি বলেন, 'আমাদের সম্পর্ক যখন ভাল তখন আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব ভাল লাগছে।' তাজউদ্দীন সাহেবের সপ্রতিভ উত্তর ছিল, 'আমেরিকার জনগণ ও সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সব সময়ই কিন্তু আমাদের সম্পর্ক ছিল উষ্ণ এবং বর্তমানে আপনাদের সাহায্য-সহায়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ ।'

এদিকে ওয়াশিংটনে একটি ঘটনা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কাজ করার অভিযোগে কিছু লোকের পাসপোর্ট প্রত্যাহার করে নিতে বলা হয় । এই প্রত্যাহারের আগেই সমস্ত লোকের দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমি সরকারকে লিখলাম যে, এদের বিরুদ্ধে আমি কোন নালিশ করব না। এটা সত্যি এরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়নি, আমরা এটাও জানি অনেকেই একটু সরেটরে ছিল, সরাসরি জড়িত হয়নি । কিন্তু এর অর্থই যে এরা সবাই শত্রুতা করেছে তা বলতে পারা যায় না । তবে কিছু লোক হয়ত করেছে । এ কারণে বিষয়টিকে পুনর্বিবেচনা করা হোক। এতে কোন ফলাফল হল না। আদেশ হয়ে গেছে, তাই পাসপোর্ট প্রত্যাহার করে নেয়া হল। এমনই একটা কেস ছিল এ. জেড. এম. শামসুল আলমের। তার চাকরিও গেল, পাসপোর্টও গেল। তার শুধু একটাই প্রার্থনা, চাকরি না হয় নাই থাক, কিন্তু সে দেশে ফিরে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তাভাবনার পর আমরা তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম । তিনি দরখাস্ত দিতে বললেন । তাঁর মনোভাব ছিল যে, পাসপোর্ট কেন নেয়া হবে, অন্যায় হলে অবশ্যই আইন অনুযায়ী বিচার হবে। এই কেসটির কোন সম্ভাবনাই ছিল না—কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব দেশে ফিরে যাবার কিছুদিন পর শামসুল আলম তার পাসপোর্ট ফিরে পায় ।

১৯৭৪ সালের জুন মাসে বিশেষ কমিটির সর্বশেষ বৈঠকে তাজউদ্দীন আহমদ ওয়াশিংটনে আসেন। মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংক ছাড়াও আমেরিকা সরকারের সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ করতে হয়। বিষয় ছিল মূলত খাদ্য সাহায্য। এবারে এক নতুন উপসর্গ—কিউবার সঙ্গে ব্যবসার কারণে খাদ্য সরবরাহে বিলম্ব। বাংলাদেশ কিউবাতে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। আমেরিকার বৈদেশিক সাহায্য বিলের একটি শর্ত ছিল যে, কেউ যদি কতকগুলো নির্দিষ্ট কমিউনিস্ট দেশের সঙ্গে ব্যবসা করে বা তাদের জাহাজে যদি ওইসব দেশে মাল সরবরাহ করে তবে সেই দেশ আমেরিকার সাহায্য পাবে না। সমস্যাটি প্রথমে উত্থাপন করেন

এইড প্রশাসক ড্যানিয়েল পার্কার এবং পরে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী জোসেফ মিসকো। তাজউদ্দীন সাহেবের ব্যাখ্যা ছিল বাস্তববাদী এবং জোরালো। তিনি বলেন যে, কিউবার সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে। তারা কোন দ্রব্য আমদানি করতে চাইলে বাংলাদেশ সাগ্রহে তাতে রাজি হয়। বাংলাদেশের প্রগতির জন্য তার রপ্তানি বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এছাড়া ১৯৫৪ সালের আইন এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। আমেরিকা নিজেই বড় বড় কমিউনিস্ট দেশের সঙ্গে ব্যবসায় লিপ্ত, এই প্রেক্ষিতে এই আইনটিকে নমনীয় দৃষ্টিতে দেখা দরকার এবং সম্ভবত এর সংশোধনও প্রয়োজন। বাংলাদেশের খাদ্যসঙ্কটের গুরুত্ব বিবেচনা করে গম সরবরাহ ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা নিতে তিনি অনুরোধ করেন । অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সর্বশেষ ওয়াশিংটন সফর ছিল ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বর- অক্টোবরে । এই সফরে প্রথমে তিনি ব্যাংক ফান্ডের বার্ষিক সভায় অংশ নেন এবং পরে প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটন সফরে যোগদান করেন । এবারের সমস্যা ছিল সবই বড় মাপের। বাংলাদেশে তখন চলছে খাদ্যসঙ্কট, দুর্ভিক্ষ। বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের অবস্থা কাহিল। আমদানির খরচ যোগাতে পয়সা নেই । বাংলাদেশের টাকার বিনিময় হার নিয়ে ছিল হাজার প্রশ্ন। এই বিনিময় হারের সমস্যাটির সমাধান হয় ১৯৭৫-এর এপ্রিলে । অন্য যে সমস্যা সেটা ঠিক তত বড় সমস্যা নয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এইড গ্রুপের প্রথম সভা। এই সভাটি প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় ২৪ ও ২৫ অক্টোবরে। ওয়াশিংটনের পথে তাজউদ্দীন আহমদ সভিয়েট রাশিয়া সফর করে আসেন। এবারে তিনি ছিলেন অনেকটা চিন্তাক্লিষ্ট ও বিমর্ষ। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংককে জরুরী ভিত্তিতে বৈদেশিক লেনদেনের জন্য কিছু সাহায্য সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু ম্যাকনামারা সাহেবের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, অক্টোবরের আগে কেউ কোন অঙ্গীকার করতে রাজি ছিলেন না। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সূত্রে ঋণ গ্রহণের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। নতুন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের জন্য মাত্র পাঁচ-দশ মিলিয়ন ডলারের বেশি কিছু আহরণ করা ছিল দুরূহ। খাদ্য সাহায্যের জন্য অঙ্গীকার যা পাওয়া গেল তার সরবরাহ ছিল বিলম্বিত। প্রায় প্রতিদিন এইসব বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হত। জাপানি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং তখন তাঁকে দেখলাম কিছুটা আশাবাদী, জুনেও এই অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক আলোচনা হয়েছিল। ওয়াশিংটন থেকে তাঁর জাপানে যাওয়ার কথা, প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে তিনি প্রস্তুতিপর্বে অবদান রাখবেন। এই সফর নিয়ে তিনি ছিলেন বেশ উৎসাহিত। কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা ।

ওয়াশিংটনে তাজউদ্দীন আহমদের এই চারটা সফরে আমার স্ত্রী ও আমি তাঁর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পাই। এ ছাড়াও ১৯৭৪ সালের শুরুতে তাঁর সঙ্গে রোমে বিশেষ কমিটির একটি অধিবেশনে সফরসঙ্গী ছিলাম । ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রস্তুতি সভায়ও তাঁর সঙ্গে ছিলাম জেদ্দায় । বস্তুতপক্ষে তিনি অর্থ সচিব ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ বৈরুতে অপেক্ষা করছিলেন এবং মরহুম রাষ্ট্রদূত আতাউর রহমান এবং আমি জেদ্দায় আমাদের সদস্যপদের জন্য তদবিরে লিপ্ত ছিলাম । প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুর রহমানের সৌজন্যে আমরা প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মর্যাদা লাভ করি এবং তখনই অর্থমন্ত্রীর দল বৈরুত থেকে জেদ্দায় আসেন। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে ব্যাংক ফান্ডের সভা হয় নাইরোবিতে, সেখানেও তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে ছিলাম ।

'৭৪-এ খবর এল, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন আসবেন। প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটন আসা নিয়ে আমাদের অনেকেরই একটু আপত্তি ছিল । তিনি ওয়াশিংটনে আসবেন, কিন্তু তাঁকে তেমন সংবর্ধনা দেয়া হবে না যেটা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রাপ্য। বঙ্গবন্ধু আমাদের কাছে শুধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি বিশ্বের বিস্ময়কর নেতা। তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আপ্যায়ন করা হবে না এটা আমাদের মনঃপূত হচ্ছিল না।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে স্বল্প সময়ের সাক্ষাৎ ছাড়াও আমরা আমাদের সাধ্যমত বিভিন্ন সিনেটরদের সাথে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ এবং চা-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলাম। বিশ্বব্যাংক প্রধান রবার্ট ম্যাকনামারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন । তাজউদ্দীন সাহেব, নূরুল ইসলাম সাহেবও এই আলোচনার সময় ছিলেন । যাই হোক, তাজউদ্দীন সাহেবকে আমি খুব স্ট্রংলি সমস্ত কথা বললাম । তিনিও আমার সাথে একমত হলেন । বললেন, এই সফরটা দাওয়াতের মাধ্যমে হলে আসলেই ভাল হত ।

দেশে ফেরার আগে এক রাতে কথার ফাঁকে তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'মনে হচ্ছে এটাই আমার শেষ সফর।' আর কিছু খুলে বললেন না, কিন্তু আমার মনে হল যেন বলতে চেয়েছেন বঙ্গবন্ধু তাঁর ওপর আস্থা হারিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্যার, আপনি যদি বলেন এটা আপনার শেষ সফর তা হলে কী করবেন ?' বললেন, 'কী আর করব ? আমি এমপি আছি, এমপি থাকব।

আর রুটি-রুজির একটা ব্যবস্থা করতেই হবে । আমাকে তো আওয়ামী লীগেই থাকতে হবে । আমি কখনও আওয়ামী লীগ ত্যাগ করতে পারব না এবং রাজনীতি ত্যাগ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু যা হবে, আমি মন্ত্রী থাকব না ।'

তাজউদ্দীন সাহেব অত্যন্ত শিক্ষিত এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এটা হয়ত অনেকেই জানে না যে, তিনি সমস্ত কাজের ফাঁকে লেখাপড়ার জন্য সময় বের করে নিতেন। বিশ্বের চিন্তাধারা, ভাবনার সাথে নিজেকে ওয়াকেবহাল রাখার একটা প্রচেষ্টা তাঁর ছিল। সম্পূর্ণ প্রচারবিমুখ ছিলেন বলেই এটা কিন্তু প্রকাশ করতেন না । তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে গিয়ে আমরা এই ব্যাপারগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। মাঝে মাঝে বলতাম, 'স্যার, আপনি তো আসলে রাজনীতিবিদ না।' তিনি প্রতিক্রিয়া দেখাতেন না। খুব সাধারণভাবে বলতেন, ‘আসলেই রাজনীতিটা ডিফারেন্ট গেম।'

তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল । তাঁর মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি কখনই অন্যের উপর চাপিয়ে দিতেন না। ধৈর্যের সাথে কথা শুনতেন। যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন। খুব সাদাসিধা মানুষ। মনে কোন প্যাচ ছিল না। নিজে রাজনীতিবিদ হলেও সব খোলাখুলি বলে দিতেন । ফ্র্যাঙ্কনেসটা ছিল দারুণ ।

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার পরিচয়টা খুব অল্প সময়ের। বলতে গেলে ১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত। এরই মধ্যে তাঁকে আমি দেখেছি একজন মানুষ কীভাবে শুধু মানুষের জন্যই চিন্তা করতে পারে এবং কীভাবে শুধু অন্যের ভালটাই চাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাঁর দেশপ্রেম। যা ছিল অতুলনীয়। দেশের উন্নতি, দেশের ভালর জন্য তিনি নিজের মত পরিবর্তন করতে দ্বিধা করতেন না । তাঁকে আমি কোনদিনও হতাশ হতে দেখিনি। দেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একসাইটেড হয়ে যেতেন। দেশ তাঁর কাছে ছিল প্রায় স্বপ্নের মত একটা কিছু। দেশটা সমৃদ্ধিশালী হবে, মানুষের সমান অধিকার থাকবে, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হবে, রাষ্ট্র নাগরিকের কল্যাণের জন্য কাজ করবে, নাগরিকের কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু এর সবকিছুই হবে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে যাতে করে উন্নয়নের সব দিকেই একটা ভারসাম্য রক্ষা করা যায় ।

তাজউদ্দীন সাহেব প্রচণ্ড রকমের আত্মসমালোচনায় বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন । তিনি বলতেন, আমরা তো দেশ শাসন করছি, দেশের মঙ্গল চাই, কাজেই আমাদের দুর্বলতা আছে এগুলো মানা উচিত। স্বীকার করা উচিত। আমরা

তো সব জানি না, তাই শিখতে হবে। মানুষ, প্রশাসন, রাজনীতিবিদ, সবাই মিলেমিশে দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করবার যে ইচ্ছা, এটা যে যৌথ মিলিত দায়িত্ব, এই বোধটা প্রচণ্ডভাবে তাঁর মধ্যে ছিল। উনি আমাদেরকে ব্যুরোক্র্যাট হিসেবে ভাবেননি, দেশ গড়ার অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ।

তাঁর মনে খুব অভিমান ছিল। ভীষণ অভিমান নিয়ে বলেছিলেন, মুজিব ভাইকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী বলেননি। কারণ তাঁর মুজিব ভাই কোন দিন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেননি। ভেবেছিলেন হয়ত সৈয়দ সাহেবের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেবও বলেছেন, বঙ্গবন্ধু তাঁকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেননি ।

আমার সাথে তাজউদ্দীন সাহেবের শেষ দেখা অগাস্টের ৪ অথবা ৫ তারিখ ১৯৭৫-এর রাতে। তখন ঢাকায় গুজব, যারা তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে দেখা করতে যায় তার একটা হিসেব রাখা হয়। আমি এটিকে তেমন গুরুত্ব দিলাম না। বন্ধু জিয়াউল হক ও আমি তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। অনেক কথা হল। আমি বাকশাল পছন্দ করি না। এই ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি বঙ্গবন্ধুকেও বলেছিলাম, তাজউদ্দীন সাহেবকেও বললাম। তাঁর সাথে কথা বলে আমার কাছে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হল যে, বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে তাজউদ্দীন সাহেব বাংলাদেশকে চিন্তা করেন না। এ যেন ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত প্রকাশ। তিনি বললেন যে, ‘দেখুন, মুজিব ভাই যদি বাকশাল করে ভুল করে থাকেন তাহলেও আমাকে এখানেই থাকতে হবে । আমার আর কোন পথের কথা আমি চিন্তা করি না, কেননা আমি সারাজীবন তাঁর সঙ্গেই ছিলাম । আমি এভাবে এ অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারি না। আমার কী বিশ্বাস, না বিশ্বাস সেটা অন্য বিষয়। কিন্তু এখানে আমার কোন বক্তব্য নেই। ঘটনা হচ্ছে, উনি যখন করেছেন আমাকে যোগ দিতেই হবে। তবে রাজনৈতিক অঙ্গন যখন অস্থির, মানুষের হতাশা বড় গভীর। মুজিব ভাই হয়ত খুব বড় ঝুঁকি নিয়েছেন। এতে তিনি নিজেও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারেন, সাথে আমরাও মারা পড়ব।'

পরবর্তীতে আমরা স্মরণ করেছি কী প্রফেটিক উচ্চারণই না তিনি করেছিলেন! [11.11.1996]

আবুল মাল আব্দুল মুহিত : সরকারি কর্মকর্তা। বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আবু ওসমান চৌধুরী

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী পুরো এলাকাটাকে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন নামকরণ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি। এই পুরো দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করি । পরবর্তীতে এই এলাকাটি আট এবং নয় নম্বর সেক্টর হয়েছে । আমাদের সাথে ৩০ এবং ৩১ মার্চ কুষ্টিয়ায় পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধ হয়। আমরা সেই যুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে অভাবিত জয়লাভ করি। চারজন অফিসারসহ দু'শো সৈন্যের একটি বিরাট পাকিস্তানি বাহিনী সেখানে আমাদের হাতে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। শুধু একজন লেফটেন্যান্ট বেঁচে যায় ।

এরপর আমরা যখন আমাদের হেড কোয়ার্টার চুয়াডাঙ্গা থেকে সরিয়ে মেহেরপুরে নিয়ে যাই তখন আমরা একটি বোর্ড গঠন করেছিলাম। সেই বোর্ডে তৌফিক-ই এলাহী, মাহবুব, নূরুল কাদের খান, ডাক্তার আসাবুল হক, স্থানীয় ব্যাংকের ম্যানেজারসহ আরো দু-একজন ছিলেন। ডা. আসাবুল হক ছিলেন আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। বোর্ডের পক্ষ থেকে আমরা নির্দেশ দিলাম ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুরের ব্যাংকে যত টাকাপয়সা, সোনার গহনা আছে সব টেক ওভার করো । যেহেতু আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে কাজেই এই সমস্ত টাকাপয়সা যুদ্ধের কাজে লাগবে। আমাদের জোয়ানেরা তাদের ট্রাঙ্ক খালি করে দিল । তাদের ট্রাঙ্কে বোর্ডের সমস্ত সদস্যের সামনে টাকাপয়সা হিসাব করে লিস্ট তৈরি করে রাখা হল । প্রায় পাঁচ কোটি পঁচাশি লক্ষ টাকা জমা হয়েছিল। সেই সাথে সম্ভবত ২৫/২৬ কেজি সোনা। পরবর্তীতে আমরা এই সমস্ত টাকাপয়সা এবং সোনা বাংলাদেশ সরকারের কাছে জমা দেই। তৌফিক, মাহবুবদের মাধ্যমেই জমা দেয়া হয় ।

এদিকে মার্চের ৩১ তারিখে আমরা খবর পেলাম তাজউদ্দীন আহমদ এবং ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। তৌফিক-ই-এলাহী এবং মাহবুব তাঁদের দু'জনকে সীমান্ত অতিক্রমে সহায়তা করেন। আমি তখন কুষ্টিয়ায় যুদ্ধে লিপ্ত। ফিরে এসে এই সংবাদ শুনি। এরপর এপ্রিলের ৫ তারিখ আমার কাছে খবর এল এখনই আমাকে গেদে সীমান্তে গিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা করতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা জীপে করে সেখানে রওনা হলাম । আমার সাথে নায়েক সুবেদার মুজিবর রহমান এবং ড্রাইভার ছিল। খুব সম্ভবত মাহবুবও ছিল। গেদে সীমান্তে পৌছবার পর আমাদেরকে

সবাই সাদরে স্বাগত জানালেন। সেখানেই তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার প্রথম পরিচয় । তিনি আমার কাছে কুষ্টিয়া এবং আশেপাশের সমস্ত এলাকার বিস্তারিত খবরাখবর জানতে চাইলেন এবং আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা কী জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, 'আমরা ইতোমধ্যে যশোরকে প্রায় ঘেরাও করে রেখেছি, তাই আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা যশোরে পাকিস্তানি বাহিনীকে আক্রমণ করা। এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র শক্তি জনগণ। জনগণের শক্তিই আমাদের অস্ত্র। কারণ আমাদের কাছে অস্ত্র বলতে যা আছে তা থ্রি-নট-থ্রি, সেগুলো ওদের অস্ত্রের কাছে একেবারে কিছুই না । হয়ত এক লক্ষ লোক আমরা মার্চ করাতে পারব, কিন্তু আমাদের যথেষ্ট ক্যাজুয়ালটি হবে, কারণ আমাদের লং রেঞ্জ অস্ত্র নেই। পাক বাহিনী ওদের সমস্ত লং রেঞ্জ অস্ত্র আমাদের দিকে তাক করে রেখেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের যদি দশ হাজার লোকও ক্ষয় হয় তবুও আমরা শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব।'

তাজউদ্দীন সাহেব আমার সমস্ত কথা শুনে বললেন, ‘আপনাদের কী কী অস্ত্র, গোলাবারুদ লাগবে তার একটা লিস্ট তৈরি করে দিন।' সেখানে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আইজি গোলোক মজুমদার এবং ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার লে. কর্নেল চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে একটি এলএমজি দিয়ে বললেন, এটি আপনাদেরকে গুডউইল হিসেবে দিলাম। সেই এলএমজিটা চেকোস্লাভাকিয়ার তৈরি এবং এর ব্যবহারের সাথে আমরা পরিচিত ছিলাম না । সেখানেই নায়েক সুবেদার মুজিবর রহমানকে এই এলএমজি চালনার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এমন সময় আমাদের হেড কোয়ার্টার থেকে খবর এল, পাকিস্তানিরা আক্রমণ করেছে। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে গেলাম । পাকিস্তানিরা বিশাখালি নামক এলাকায় আক্রমণ করে। আমরাও কাউন্টার আক্রমণ করলাম। আমাদের এই আক্রমণে পাকিস্তানিরা বিরাট একটি মার খেল ।

এদিকে ১০ এপ্রিল আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হল । কিন্তু কিছু প্রভাবশালী তরুণ নেতা সরকার গঠনের বিরুদ্ধে খুব সোচ্চার ছিল এবং ওরা বলা শুরু করল, মন্ত্রীটন্ত্রী সাজতে হবে না, ওয়ার কাউন্সিল করে যুদ্ধ চালানো হোক। ওদের এই তৎপরতার ফলে তাজউদ্দীন সাহেব এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্নজনের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করলেন। যোদ্ধাদের মতামতও তিনি নেন। আমাদের কাছে যখন এই প্রশ্নটা এল তখন আমরা স্পষ্ট বলেছি, সরকার গঠন যথার্থ, যদি সরকার গঠন করা না হয় তবে ভারত

সরকার কোন অজুহাতেই আমাদেরকে অস্ত্র এনে দিতে পারবে না। আমরা যদি বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে অস্ত্র না পাই, তবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত হব না, আমরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে বিশ্বের চোখে পরিচিতি লাভ করব। কাজেই সরকার গঠন করা একান্ত কর্তব্য।

আমি বলব, সেদিন তাজউদ্দীন সাহেবের দৃঢ়তার জন্যই কিন্তু সরকার গঠন সম্ভব হয়েছে। সরকার পরিচালনার মূল দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন, এটি আমরা সকলে খুব ভালভাবেই জানতাম। আবার সরকারের ভেতরে থেকে খন্দকার মোশতাক যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী আপত্তিজনক যে সমস্ত তৎপরতা চালাচ্ছিলেন সেই সমস্ত অপতৎপরতাকেও তাজউদ্দীন সাহেব অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। মুক্তিযুদ্ধের উপরে কোনরকম অশুভ ছায়া যেন না পড়ে এই বিষয়ে তিনি ছিলেন সদাসচেষ্ট । এমনকি শেষের দিকে খন্দকার মোশতাকের পরিকল্পনা ছিল, পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে তিনি জাতিসংঘে যাবেন, সেখানে আমেরিকার সহায়তায় পাকিস্তানের সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছে মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করে দেবেন। খন্দকার মোশতাক আরও একটি ধুয়া তুলেছিলেন যে, স্বাধীনতা না শেখ মুজিবুর রহমান, তোমরা কোনটা চাও। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, আমরা স্বাধীনতাও নেব, শেখ মুজিবকেও ফিরিয়ে আনব। অর্থাৎ আমরা দুটোই চাই। স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিব এই দুটোর ব্যাপারে কোন আপস নেই । আমাদের সামনে যখন এই প্রশ্ন এল, তখন আমরাও বলেছি আমরাও দুটোই চাই । তাজউদ্দীন সাহেবের বিচক্ষণতা এবং সদাসতর্ক দৃষ্টির কারণে খন্দকার মোশতাকের সমস্ত চক্রান্ত ধরা পড়ে যায়। তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর জাতিসংঘে যাওয়া বন্ধ করে দেন। এভাবে তাজউদ্দীন সাহেব আমাদের স্বাধীনতার বিভিন্ন ধরনের বিরুদ্ধ শক্তিকে দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করে মুক্তিযুদ্ধকে প্রতি মুহূর্তে সঠিক খাতে প্রবাহিত রাখতে পেরেছেন। সে জন্য তিনি সত্যিই নমস্য।

যাঁরা সে দিনের এই ঘটনাগুলো জানতেন তাঁরা সবসময় তাজউদ্দীনকে সম্মান জানিয়েছেন, আজও তাঁকে সালাম জানান। এছাড়াও আমরা আরো খবরাখবর পেতাম, তিনি কখনও বাসায় পরিবারের কাছে যেতেন না। নিজ হাতে নিজের সমস্ত কাজকর্ম করেন। তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি পরিবারের সাথে বসবাস করবেন না। এই প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছিলেন। সেই যুদ্ধদিনে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো জেনে

তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি অনেক গুণ বেড়ে গেল । তারপর আমরা মাঝেমধ্যে হেড কোয়ার্টারে আসা- যাওয়া করতাম, সেখানে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা হলে তিনি সবসময় কুশল জিজ্ঞাসা করতেন এবং রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইতেন। এছাড়াও তিনি ব্যতিক্রমহীনভাবে বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন করতেন। এসমস্ত কারণে সর্বমহলে বিশেষ করে যোদ্ধাদের মধ্যে তাঁর প্রতি ভক্তি ছিল অপরিসীম। তাঁর যে সমস্ত কাজকর্ম আমরা দেখেছি, শুনেছি, যুদ্ধদিনে তা আমাদের খুব ভাল লেগেছে। বিশেষ করে তাঁর একটি কাজ আমার সব চাইতে ভাল লেগেছিল, সেটি হচ্ছে, তিনি বিদেশী অতিথি বা সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে দেখা করতেন। যেমন, বেনাপোল কাস্টমস্ হাউসে যখন আমাদের বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ছিল এবং আশেপাশের এলাকায় তখন যুদ্ধ চলছে, সেই সময় বিদেশীদের সাথে কথা বলতে, মুক্তাঞ্চল দেখাতে তিনি এই এলাকায় চলে আসতেন। বিদেশী অতিথিদের যে সময়টা দেয়া থাকত তার চাইতে কিছু সময় আগে তিনি এসে অপেক্ষা করতেন এবং অতিথিদেরকে রিসিভ করতেন। বেশির ভাগ সময় যুদ্ধের কারণে আমি বিভিন্ন দিকে থাকতাম, ফলে আমার স্ত্রী (৭ নভেম্বর ১৯৭৫ অভ্যুত্থানের সময় গুলিতে নিহত হন) এবং উপস্থিত অন্যান্যরা প্রধানমন্ত্রী এবং অতিথিদের পায়ে হেঁটে মুক্তাঞ্চল দেখাতে নিয়ে যেতেন। এভাবেই তাঁর সাথে আমাদের সুন্দর এক স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এদিকে সম্ভবত মে মাসের শেষের দিকে জিয়াউর রহমানকে তিনটা ব্যাটেলিয়ান দেয়া হয় একটা ব্রিগেড ফোর্স গঠন করবার জন্য । জিয়াউর রহমান ব্রিগেড ফোর্স গঠন করল ঠিকই, কিন্তু এর নাম দিল জিয়া ফোর্স বা জেড ফোর্স । সাধারণত আর্মিতে কোন কমান্ডার বা কোন ব্যক্তির নামে কোন সময়ই কোন ফোর্সের নামকরণ করা হয় না, কোথাও এর নজির নেই। এই ঘটনায় ওসমানী সাহেব জিয়াউর রহমানের প্রতি বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে গ্রেফতার করতে চাইলেন এবং এ নিয়ে এক ধরনের জটিলতা দেখা দিল। তখন তাজউদ্দীন সাহেব এই ব্যাপারটির একটি সম্মানজনক এবং সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধান করে দেন। তিনি ওসমানী সাহেবকে বললেন, ‘আপনার তো শুধু এই একটা ব্রিগেড হলেই চলবে না, আরো ব্রিগেড দরকার । তাই জিয়াউর রহমানকে গ্রেফতার না করে খালেদ মোশাররফের ফোর্সকে ‘কে’ ফোর্স করে দিন, শফিউল্লার ফোর্সকে ‘এস’ ফোর্স করে দিন, তাহলে আর জিয়াউর রহমান আলাদাভাবে চিহ্নিত হবে না। তার গুরুত্বটা

ভাগ হয়ে যাবে।'

ওসমানী সাহেব কখনই রণাঙ্গনে যেতেন না, কারো সাথে খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না, এই নিয়ে প্রায় সবারই অভিযোগ ছিল। যাই হোক, যুদ্ধের দিনে এমন অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার সমাধান হয়েছে তাজউদ্দীন সাহেবের ধীরস্থির আচরণ এবং বিচক্ষণতার কারণে।

আরো একটি ঘটনা, আমি যখন আমার সেক্টরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়ে চলেছি, সেই সময় আগস্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ওসমানী সাহেব আমাকে ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে বদলি করলেন। সেখানে তিনি আমার জন্য একটি নতুন পোস্ট তৈরি করেছেন—অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অব লজিস্টি। ওসমানী সাহেবের বদলির আদেশের পর কলকাতায় গিয়ে দেখলাম সেখানে সত্যি অর্থে আমার কোন কাজ নেই । আমি একেবারে খোঁড়া হয়ে বসে রইলাম । আমি মনে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি, কারণ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের যে সূচনা তা আমরাই করেছিলাম কুষ্টিয়ার যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এমনকি আমার প্রমোশনের বেলাতেও ওসমানী সাহেব আমার সাথে ন্যায্য বিচার করেননি। সেই সময় আমি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বরাবর একটি দরখাস্ত লিখেছিলাম। পরে সৈয়দ সাহেব এবং তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে ডেকে বলেছিলেন, ‘দেখ, এখন আমরা পরের মাটিতে বসে আছি। যতদিন এখানে আছি ততদিন নিজেদের ভেতরের বিষয়গুলো নিয়ে খুব বেশি কিছু করা যাবে না । ইনশাল্লাহ আমরা যখন স্বাধীন হব তখন স্বাধীন দেশের মাটিতে আমরা তোমার ওপর সুবিচার করব।' এই কথার উপরে আমার আর কোন কথা থাকে না । সেই তাজউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে স্বাধীন দেশের মাটিতে কত রকমের ষড়যন্ত্র হল। তাজউদ্দীন আহমদ—যাঁকে আমি-আমরা ১৯৭১ সালে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি, যাঁর মধ্যে দেখেছি দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, এক অতুলনীয় দেশপ্রেমবোধ, অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতা। আমি মনে করি সে দিন দেশের হাল ধরবার জন্য যদি তাজউদ্দীন সাহেব না থাকতেন তবে এমন সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি সম্ভব হত না ।

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার শেষ দেখা হয় ১৯৭৩ সালে তিনি যখন অর্থমন্ত্রী। তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সুন্দর। আমার এখনও মনে পড়ে এবং চোখের সামনে ভাসে, তিনি আমাদেরকে কী রকমভাবে রেসপেক্ট করতেন।

তিনি নেই । আল্লাহ্ তাঁকে বেহেশত নসীব করুন । আমি সব সময় তাঁর জন্য এই দোয়াই করি ।

[২২.০৪.১৯৯৯]

আবু ওসমান চৌধুরী : অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল, মুক্তিযুদ্ধকালে সেক্টর কমান্ডার।

আলী তারেক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দীন আহমদের কথা আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তাজউদ্দীন আহমদ একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি অধ্যায় ।

প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। আমি তখন ছাত্র। একই সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির সাথেও জড়িত। সে সময় আমি যশোর জেলা ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরবর্তীতে খুলনা জেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক হই ।

বাংলাদেশের মফস্বলের এক ছাত্র হয়েও ছাত্র লীগের সক্রিয় কর্মী হবার কারণে সেই সময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক নেতৃত্বের সাথে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—যদিও তাজউদ্দীন ভাইয়ের সাথে ছাত্রনেতা হিসেবে মুখচেনা পরিচয়ের চাইতে আর বেশি সম্পর্ক তখন হয়নি । পরবর্তীতে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয় ।

তাজউদ্দীন ভাই এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি আওয়ামী লীগের মূল সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকলেও বঙ্গবন্ধু এবং তিনি পরস্পর সমার্থক হয়েছিলেন। স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম ছিলেন, আর সেই নামের নেপথ্যে যে ব্যক্তি কাজ করতেন তিনি তাজউদ্দীন আহমদ। শেখ মুজিবের মাঝে তাজউদ্দীন একাত্ম হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাঝ থেকে তাজউদ্দীনের সেই আত্মা অপসারিত হওয়ায় বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক বিপর্যয় ঘটেছিল ।

আমি ছাত্রজীবন শেষ করে খুলনা থেকে প্রকাশিত দি ওয়েভ পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দিয়ে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করি । পরে ইংরেজি দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার-এ যোগ দিয়ে ঢাকায় সাংবাদিকতা শুরু করি। সাংবাদিক হিসেবে আমি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের আরো কাছাকাছি হবার সুযোগ পাই। এ সুবাদেই বাংলাদেশের কোটি কোটি জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত স্নেহভাজন হবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় রাজনৈতিক সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালনকালে তখনকার বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, তাজউদ্দীন সাহেব যেন স্বাধীন বাংলাদেশের কথাই ভাবছেন। আমার মতে বঙ্গবন্ধু সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার

স্বপ্ন দেখেছিলেন। এবং আসলেও তিনি সমগ্র পাকিস্তানের নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যার বাস্তব রূপদান পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রমূলক মনোভাবের কারণে সম্ভব হয়নি। বরং আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় যুদ্ধ।

২৫ মার্চ ১৯৭১-এর রাতে বঙ্গবন্ধু আত্মগোপন করতে রাজি না হওয়ায় তিনি পাকিস্তান আর্মির কাছে ধরা পড়েন এবং তাঁকে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ঐতিহাসিক ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরের আম্রকাননে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে । ২৫ মার্চের কালরাত্রির পর প্রথমদিকে আমি ঢাকা থেকে পালিয়ে যাবার কথা চিন্তা করিনি । বাংলাদেশের বিরাজমান পরিস্থিতির ওপর সাংবাদিকতায় নিজেকে মগ্ন রাখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ৪ এপ্রিল যশোরে আমার বাবা, কলেজ পড়ুয়া দুই ভাইসহ ১৭জন আত্মীয়স্বজনকে পাকিস্তান আর্মি হত্যা করে। আমিও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হই। বন্দি হবার পর আমাকে বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার যে মামলা শুরু করেছিল সেই মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষি হতে এবং এ জন্য তারা আমাকে পাকিস্তান যাবার প্রস্তাব দেয়। সেই মুহূর্তে আমি ওই প্রস্তাব মেনে নিয়ে পরদিন সকালে তাদের সাথে পাকিস্তান যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে সেই বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত হই । বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে সেই রাতেই স্ত্রী ও কন্যাকে আমার বড় ভাই-ভাবীর হাতে সমর্পণ করে আমি ঢাকা থেকে পালিয়ে যাই। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলা পৌঁছাই। সেখানে তখন মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরী দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করলে তিনি তার পরদিনই আমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। কলকাতা গিয়ে আমি প্রথমে দেখা করি জনাব এম. আর. আখতার মুকুলের সঙ্গে। মুকুল ভাই আমাকে নিয়ে গেলেন ৮ থিয়েটার রোডে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয়ে। সেখানে আবার নতুন করে পরিচয় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে ।

তাজউদ্দীন ভাই আমার কাছ থেকে বাংলাদেশের বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ নিলেন এবং আমাদের সেই আলাপের মধ্যেই তাঁর কাছ থেকে কী যেন একটা ইঙ্গিত লক্ষ্য করলাম। পরদিনই তিনি আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন । থিয়েটার রোডে তাঁর সামনে বসে আবার আলাপ হল । আলাপের পর তিনি আমাকে কিছু লেখালেখির দায়িত্ব দিলেন।

প্রথম দিন আমি তাঁর নির্দেশমত লিখে সেটা তাঁর কাছে দিলে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং আমাকে বললেন, 'তারেক, এখন থেকে আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন।' আমাকে তথ্য বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হল ।

সেই সময় আমি তাজউদ্দীন সাহেবের মধ্যে এমন একজন মানুষকে দেখেছি, যে মানুষ কোন দিন নীতির প্রশ্নে কোন বিষয়ের সঙ্গে আপস করতেন না। তিনি শুধু দেশপ্রেমিক ছিলেন না, তাঁর মত করে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষদের এত গভীরভাবে ভালবাসতে আমি আর কাউকে দেখিনি। এমনকি আজও দেখিনি। তিনি কখনই কোন কাজের জন্য নিজে বাহাদুরি নেয়ার চেষ্টা করতেন না। বঙ্গবন্ধুর যে কোন সাফল্য ও রাজনৈতিক সার্থকতার মধ্যে তাজউদ্দীন সাহেবের যে পরিতৃপ্তি আমি লক্ষ্য করেছি সে কথা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। মনে হত বঙ্গবন্ধুর বাইরের আবরণের মানুষটি তাজউদ্দীন আহমদ। তাঁর আর একটি দিক দেখে আমি খুব অবাক হয়েছি। সেটা হল, সব ধরনের সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাজউদ্দীন ভাই খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। এবং তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতে পারতেন। থিয়েটার রোডের একটি কক্ষে একটি চৌকি, কাঠের স্ট্যান্ডের উপরে পেরেক দিয়ে আটকানো সাড়ে তিন টাকা দামের সাধারণ মশারি, একটি বালিশ, একটি মাদুর, একটি কাঁথা এবং একটি চাদর নিয়ে রাতে ঘুমাতেন। সে ঘুমও মাত্র মাপা দু'ঘণ্টার জন্য । অর্থাৎ রাত ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। বাকি ২২ ঘণ্টার ২ ঘণ্টা বাদ দিলে ২০ ঘণ্টাই তিনি কাজ করতেন— বিভিন্ন বৈদেশিক প্রতিনিধিদলসহ নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে, দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দাপ্তরিক নির্দেশ দিয়ে, কাগজেকলমে কাজ করে কিংবা রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে। তাঁর নিজস্ব কোন ব্যয় ছিল না। সিগারেট খেতেন না, কোন সৌখিন জিনিস ব্যবহার করতেন না। মদ স্পর্শ করতে দেখিনি, কিংবা কোন নারীর প্রতি তাঁর কোন ধরনের আসক্তি তো দূরের কথা সামান্যতম দুর্বলতাও আমি লক্ষ্য করিনি। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মিসেস তাজউদ্দীন ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতা এসে পৌছেন। কলকাতার সিআইটি রোডে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় । কিন্তু তাজউদ্দীন ভাই একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বাংলাদেশের মাটিতে যতদিন স্বাধীনতার পতাকা তিনি না ওড়াতে পারবেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ স্বজনদের কারো সাথে দেখা করবেন না। এ কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। থিয়েটার রোড থেকে মাত্র ৩/৪ মাইলের দূরত্বে তাঁর পরিবার থাকতেন ।

যুদ্ধ চলাকালে তাঁর একমাত্র ছেলে সোহেল প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয় । ১০৪-এর ওপর জ্বর, সে ভুল বকছে। অবস্থা ভাল না, ভীষণ ছটফট করছে। এ খবর তাঁকে দিতে গিয়ে আমি তাঁর কাছ থেকে ভীষণ ধমক খেয়েছি । আমি তাঁকে বাসায় যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি আমাকে ধমকের সুরে বলেছিলেন, 'ভবিষ্যতে আর কখনো এ ধরনের কথা আমার সামনে উচ্চারণ করবেন না । এখন আমার স্ত্রী-সন্তান নেই । সমস্ত বাংলাদেশের মুক্তিপাগল মানুষ আমার সন্তান। আমি এখন তাদের চিন্তায় ব্যস্ত। তাই আমাকে এসব ব্যাপার নিয়ে আর বিরক্ত করবেন না।' এ থেকেই জানি তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞায় ছিলেন অটল ।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবী টলে উঠল। ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ তাজউদ্দীন ভাই মুক্ত যশোর পরিদর্শন করেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেদিন তিনি যশোর টাউন হল ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ দেশ স্বাধীন হল। ২২ ডিসেম্বর দুটি আর্মি হেলিকপ্টারে তাজউদ্দীন ভাই, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে লক্ষ জনতা সংবর্ধনা দিয়ে তাঁদের এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের বরণ করে নিল। তাঁদের সঙ্গে একই হেলিকপ্টারে আমিও এসেছিলাম এবং সেদিনের সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ।

দেশে ফিরেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করলেন। তখন দেশের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল পুনর্গঠন, পুনর্বাসন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পোড়ামাটি নীতির কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো এবং অর্থনীতি পুনর্গঠনে বিশ্বের অনেক দেশ সাহায্যের হাত সম্প্রসারণ করল । যাই হোক, আমার একদিনের কথা মনে পড়ে । আমেরিকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জন্য শর্তসাপেক্ষে কিছু সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে একজন প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তখন তিনি স্পষ্টভাবে তাঁকে বলেছিলেন, ‘বেগারস মে নট হ্যাভ আ চয়েস, বাট উই বাংলাদেশ পিপ্ল, উই আর নট বেগারস্, উই হ্যাভ অ্যাচিভ্ড্ আওয়ার ইনডিপেনডেন্স থ্রু আ ব্লাডি স্ট্রাগল অব লিবারেশান। তাই কোন শর্তসাপেক্ষে কারো সাহায্য নিতে আমরা ইচ্ছুক নই।' এ ধরনের দৃঢ় মনোবল বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোন রাষ্ট্রনায়কের ক্ষেত্রে আজও লক্ষ্য করিনি।

তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন স্বজনপ্রীতির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণতার এক মূর্ত প্রতীক। অনেকে তাঁকে ভীষণভাবে ভারতঘেঁষা মনে করে। কিন্তু আমি এ ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে বলতে চাই, তিনি কখনই ভারতঘেঁষা ছিলেন না। তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড কৃতজ্ঞতা ও মানবতাবোধ কাজ করত । ভারত মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে; অস্ত্র, শক্তিসহ সর্ববিষয়ে সাহায্য করে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করতে যে ভূমিকা রেখেছিল সে জন্য তাদের প্রতি তাজউদ্দীন ভাইয়ের কৃতজ্ঞতা ছিল। এই কৃতজ্ঞতা দেখানোটা খুবই স্বাভাবিক একটা নর্মস্-এর মধ্যেই পড়ে। ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। সে দিন লক্ষ লক্ষ জনতা সংবর্ধনা দিয়ে তাঁকে বরণ করে নিল । অশ্রুসিক্ত নয়নে প্লেন থেকে বঙ্গবন্ধু অবতরণ করে যখন তাজউদ্দীন আহমদকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তখন আমার মনে হল বুঝি দুটি মন, দুটি আত্মা, দুটি দেহ এক হয়ে গেল। আমার বুঝতে ভুল হচ্ছিল কোনটি শেখ মুজিব, কোনটি তাজউদ্দীন। অশ্রুসিক্ত নয়নে বঙ্গবন্ধু ট্রাকে উঠলেন । ওই ট্রাকে আওয়ামী লীগের মূল নেতৃবৃন্দসহ ছাত্র নেতৃবৃন্দও ছিলেন। আমারও ওই ট্রাকে থাকার সুযোগ হয়েছিল। ট্রাক লক্ষ জনতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। অশ্রুসিক্ত বঙ্গবন্ধু হঠাৎ তাজউদ্দীন ভাইয়ের কানে কানে বললেন, 'তাজউদ্দীন, আমি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হব!'

যাই হোক, সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হবেন। শুধু আনুষ্ঠানিকতা বাকি। আমি তাজউদ্দীন ভাইয়ের কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, ‘এই মুহূর্তে আপনাকে পদক্ষেপ নিতে হবে।' তাজউদ্দীন ভাই বললেন, ‘বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় আমার নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই । আর তাঁর নির্দেশ আমাকে পালন করতেই হবে।' আমি তাঁকে আবার বললাম, 'তাজউদ্দীন ভাই, আপনি কাকে বেশি ভালবাসেন, বাংলাদেশকে না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ?' তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আলী তারেক, আমি বঙ্গবন্ধুকে বেশি ভালবাসি।' বঙ্গবন্ধুর মাঝেই যে তাজউদ্দীন বিরাজমান, সেই কথাটি সে দিন আবার নতুন করে আমি উপলব্ধি করলাম। তাজউদ্দীন ভাই হয়ত বোঝাতে চেয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধুর মধ্য দিয়েই তিনি বাংলাদেশকে দেখেন ।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর পরই একটি বিশেষ চক্র, যারা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রতিনিয়ত তাজউদ্দীন ভাইয়ের বিরোধিতা করেছে, বিশেষত খন্দকার মোশতাক ও তার অনুগতরা এবং মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ, আবার তাঁর বিরুদ্ধে তৎপর

হয়ে ওঠে। তারা প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে তাজউদ্দীন ভাইয়ের নামে বঙ্গবন্ধুর কান ভারি করতে থাকে। ফলে বঙ্গবন্ধু ক্রমে তাঁর ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেললেন। তাজউদ্দীন ভাই ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রতিটি সাফল্যের নায়ক। অথচ সেই মানুষটিকে অবিশ্বাস করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু যে ভুল করেছিলেন তার মাশুল তাঁকে দিতে হয়েছে চরম মূল্য দিয়ে ।

তাজউদ্দীন ভাই ছিলেন অত্যন্ত সুনিপুণ ও সুশৃঙ্খল মানুষ। মন্ত্রণালয়ের সকল ফাইলের খুঁটিনাটি ভালভাবে দেখে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তাঁর মতামত দিতেন। তাঁর বিশ্লেষণী শক্তি এবং ত্বরিত সিদ্ধান্ত দেয়ার গুণ ছিল অনন্য। তিনি ছিলেন আপসহীন। একদিনের কথা মনে পড়ছে, বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন ভাইয়ের কাছে একটি ফাইল পাঠিয়েছেন অনুমোদনের জন্য। তাজউদ্দীন ভাই মন্তব্যে লিখেছিলেন: অর্থমন্ত্রী হিসেবে এটা অনুমোদন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার নির্দেশ অনুমোদন করতে পারছি না বলে দুঃখিত। যেহেতু আপনি প্রধানমন্ত্রী এবং আপনার ক্ষমতা রয়েছে সকল মন্ত্রীর উপরে, যে নির্দেশ আপনি এই ফাইলে দিয়েছেন, ইচ্ছা করলে সেটা নিজেই অনুমোদন করতে পারেন। আমার অনুমোদনের প্রয়োজন নাই ।

এর কিছুদিন পরই মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দিন ভাই পদত্যাগ করেন ।

[10.06.1991]

আলী তারেক : **১৯৭২-৭৪** সালে অর্থমন্ত্রীর গণসংযোগ অফিসার, অ্যাডভোকেট, রাজনীতিক ।

আবু সাইদ চৌধুরী

আমি তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের একান্ত সচিব ছিলাম। যতদিন তিনি মন্ত্রিসভায় ছিলেন সেই পুরো সময়টা আমি তাঁর সাথেই ছিলাম । এই দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার সামনাসামনি কখনও দেখা হয়নি, পরিচয়ও ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তিনি জাতীয় নেতা, সেই হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নাম আমি জানতাম ।

আমি তখন সংস্থাপন বিভাগে সিনিয়র সেকশন অফিসার, দু'চার দিনের মধ্যেই ডেপুটি সেক্রেটারি হব। এইরকম এক সময় হঠাৎ সংস্থাপন সচিব নূরুল কাদের খান টেলিফোন করলেন। তিনি অনেক আগে থেকেই আমার পরিচিত এবং এক সময় আমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলাম । ফোনে তিনি আমাকে বললেন, 'আবু সাইদ, তোমাকে একটা নতুন পোস্টিং দেয়া হচ্ছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের পোস্টিং ?

তিনি বললেন, "তুমি তাজউদ্দীন সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি হবে।' আমি শুনেই আঁতকে উঠলাম । বললাম, "আমি প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে চাই না। আমি এ কাজ কোনদিনও করিনি এবং এ কাজ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাও নেই। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপারও আছে, তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে কেন একসেপ্ট করবেন? তিনি আমাকে চেনেন না। প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে হলে তাঁকে পার্সোনালি চেনা দরকার। হয়ত বা তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন না।'

আমার এই কথা শুনে তিনি ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে জবাব দিলেন, 'দায়িত্ব আমার। তুমি এখনই চলে যাও। আমি ফোনে বলে দিচ্ছি যে তুমি যাবে। তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করে তুমি কীভাবে কাজে যোগ দেবে, কবে যোগ দেবে সে সমস্ত আলোচনা করে এসো।'

আমি তখন বললাম, 'আপনি ভুল করছেন বোধ হয়। তাজউদ্দীন সাহেব নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণ করবেন না। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি এখানেই ছিলাম—আপনি কেন আমাকে পাঠাচ্ছেন ? '

নূরুল কাদের সাহেব রেগে গেলেন, বললেন, "আবু সাইদ, তোমাকে আমি বারবার বলছি তুমি তাঁর সাথে গিয়ে দেখা করো, তারপরও তুমি আমার সাথে তর্ক করছ! তোমার সামনে এখন দুটো অপশন । একটা, ইমিডিয়েটলি

প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে জয়েন করা। আর না হয় সাসপেনশন । তুমি কোন্টা একসেপ্ট করবে ?'

তখন আমি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হলাম । মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে আমি গেলাম তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের ওখানে। তারিখটা ছিল ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২। আমি সেদিন সকালেই আমার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছি। মা মারা গেছেন ১০ তারিখে, কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা তখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি বলে আমি লোক মারফত খবর পেয়েছি তিন দিন দেরিতে।

আমি একটা স্লিপে আমার নাম লিখে নিচের দিকে লিখলাম : সংস্থাপন সচিব পাঠিয়েছেন। রুমের ভেতরে লোকজন ছিলেন, আমি ভাবলাম আমাকে বোধ হয় অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই তিনি আমাকে ভেতরে ডাকলেন । এমনভাবে তিনি আমাকে রিসিভ করলেন যেন আমি তাঁর অনেক দিনের পরিচিত কেউ। আমি ভেতরে গেলাম ।

তাঁর সামনে তখন বাংলাদেশের দু'জন স্বনামধন্য অফিসার বসা। তিনি তাঁদের সাথে কথা বলছেন। কোন কটু কথা না, কিন্তু খুব শক্ত ভাষায় কথা বলছেন। আমিও কিন্তু সেটা শুনছি। আমার মনে আছে, তিনি বললেন, 'আপনারা এদিকে ছিলেন, চাকরি করেছেন, সেটা নানা কারণেই হতে পারে । সে কারণেই আপনাদের সেই সময়ের ভূমিকাকে আমি প্রাধান্য দেব না, ওভারলুক করব, অ্যাট লিস্ট আমি একেবারেই মনে করব না যে আপনাদের কোন ভূমিকা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে । তবে আজ থেকে যেন আপনাদের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের পক্ষে হয়। আমি আপনাদের কাছে কোন রাজনৈতিক সমর্থন চাচ্ছি না। রাজনৈতিক শক্তি আমার যথেষ্ট । রাজনীতিতে দেয়ার মত আপনাদের কিছু নেই। আপনাদের কাছে শুধু প্রশাসনিক সমর্থনটা চাই । আশা করি আপনারা এটা করবেন এবং আমি আপনাদের সাথে সত্যি কথাই বলছি। এ বিষয়ে আর কোন কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনারা এখন যেতে পারেন।' আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'আবু সাইদ সাহেব এসেছেন, আমি এখন তাঁর সাথে কথা বলব।' আমি তখন তাঁদের কত জুনিয়ার–আমার সাথে কথা বলার জন্য তাঁদেরকে বিদায় করছেন। আমি বোকা বনে গেলাম।

আমি একটু দূরে একটা চেয়ারে বসে ছিলাম। তিনি বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, আসেন।' এখানে বলে রাখা দরকার, তিনি কিন্তু আমাকে সবসময় আপনি এবং চৌধুরী সাহেব বলতেন। তিনি কখনও 'আবু সাইদ' বলে সম্বোধন

করেন নাই। যাই হোক, আমি সামনে গিয়ে বসলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কোথায় ছিলেন ?' এটা তাঁর প্রথম প্রশ্ন। আমি বললাম, 'স্যার, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাস আমি ছিলাম বৈরুতে। আমি আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছিলাম ইউএসএ-র একটা স্কলারশিপে। আমি দেশে ফিরি জুন মাসে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় । তারপর আমি সংস্থাপন বিভাগে পোস্টেড হই ।' আমি এমনভাবে সব বলছি যেন তিনি আমাকে একসেপ্ট না করেন। কারণ সত্যি বলতে নূরুল কাদের আমাকে তাঁর কাছে একরকম জোর করেই পাঠিয়েছেন। আমি ভাবছি তিনি যেন চিন্তা করেন, এর তো মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্ক নাই, সুতরাং এই লোককে আমার সাথে রাখব না । সবশেষে বললাম, 'আমাকে আমার মনের সাথে আপস করে ওই পোস্টিংয়ে থাকতে হয়েছিল, কারণ আমি বহুদিন পরে দেশে ফিরেছিলাম। তখন শুনেছিলাম আমার ইমিডিয়েট বড় ভাইকে নাকি মেরে ফেলেছে পাকিস্তানে, তার কোন খবর নেই। তারপর আমার স্ত্রী, ছেলেদের সাথে দেশে ফিরেই যোগাযোগ করতে পারিনি,' ইত্যাদি। তাজউদ্দীন সাহেব মিটমিট করে হাসতে লাগলেন । (পরে দেখেছি, মেজাজ যখন খারাপ থাকত তখন তাঁর দিকে তাকানোও যেত না, আর যখন মুড খুব ভাল থাকে তখন তিনি মিটমিট করে হাসতেন এবং সে হাসিটা এত মিষ্টি ছিল যে ভোলার নয় ।) আমি ভাবলাম তিনি হয়ত বলবেন, 'আচ্ছা চৌধুরী সাহেব, আপনি এখন যান, পরে জানাব।'

কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, আপনি কি একেবারে কাজে যোগ দেয়ার জন্য চলে এসেছেন ?

আমি বললাম, 'না স্যার, আমাকে তো নূরুল কাদের সাহেব এইমাত্রই বললেন আপনার সাথে দেখা করতে। আমি ডেস্কে ছিলাম, ওই অবস্থাতেই এসেছি, ফাইলগুলোও খোলা রয়েছে।'

তিনি তখন বললেন, 'আমি নূরুল কাদেরকে বলে দিচ্ছি ইন্টারকমে । আপনি ফাইলগুলো আনিয়ে নেন। আর এখন থেকেই আপনি কাজে যোগ দেন।'

আমি বললাম, 'স্যার, আমাকে দু'দিন সময় দেন। একটু চিন্তা করে দেখি। আমার মা মারা গেছেন, সেখানেও আমার যাওয়া প্রয়োজন ।'

তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি আমার এখানে কাজে যোগ

দিয়ে ছুটিতে যান।' আমি তাই করলাম এবং পরদিনই যশোর চলে গেলাম। আমার সমস্ত জীবন ধরে একটা নীতি ছিল, যে কাজটা পছন্দ হয়নি কিন্তু করতে হবে, সেটা যখন করতে আরম্ভ করব আমি ভীষণভাবে বিশ্বস্ত থাকব সেই কাজের প্রতি । তখন আমার মধ্যে আর অন্য কোন চিন্তা থাকে না । যাই হোক, আমি ফিরে এসে কাজে যোগ দেয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি আমার জন্য অ্যাসিসট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি খুঁজে বের করেন।' এটা খুব স্বাভাবিক, তিনি সবাইকে চিনবেনও না। আমি মাযহারুল ইসলামকে তাঁর অ্যাসিসট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে নিয়ে এলাম ।

তাজউদ্দীন সাহেব দু'বেলাই সচিবালয়ে অফিস করতেন। রাত ৮টা-৯টা পর্যন্ত তাঁর সাথে আমরা কাজ করতাম। অনেক সময় এর চাইতে বেশি রাতও হয়ে যেত । দুপুরবেলা আমরা বাসায় খেতে যেতাম । কখনও কখনও তাঁর খাবার বাড়ি থেকে আনা হত, তিনি অফিসেই খেয়ে নিতেন। দেশের বাইরের সমস্ত ট্যুরে আমাকে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে যেতে হত । আর দেশের ভেতরে মাযহার যেত। তবে কাপাসিয়াতে আমিও যেতাম, কারণ তিনি বলতেন কাপাসিয়াতে আমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন ।

তাজউদ্দীন সাহেব অত্যন্ত ডিসিপ্লিন্ড্ মানুষ ছিলেন। রাজনীতি করেছেন সারাজীবন, কিন্তু সাংঘাতিক ডিসিপ্লিন মেনে চলতেন । তিনি বলতেন, “যখন যাকে যে রকম সময় বরাদ্দ করছি ওই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় কেউ আসবে না। ওই সময়টা দ্বিতীয় কারো জন্য নয়। এক্স-এর সময় এক্স আসবে, ওয়াই-এর সময় ওয়াই। আমার অফিসে থাকা অবস্থায় অফিসে আমি কোন রাজনৈতিক কাজকর্ম, দেখাসাক্ষাৎ করব না। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলে দিয়েছি, আমাকে অফিসের সময়ে কখনও ডাকবেন না—একমাত্র কোন মারাত্মক জরুরী পরিস্থিতি ছাড়া। এমনকি আমি বলেছি, অফিস টাইমে কোন মিটিংও ডাকবেন না। এখন আমাদের দেশকে গড়তে হবে ।

তাজউদ্দীন সাহেব এই দেশ গড়ার কথাটা সবসময় বলতেন । তিনি বলতেন, ‘এই দেশকে গড়তে হবে। একে গড়তে গেলে আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। তিনি সমস্ত সরকারি কর্মকর্তাদেরকে বলতেন যে, ‘দেখুন, এখন আমাদের দেশ গড়ার সময়। প্রচুর পরিশ্রম করার সময়। এখন আমাদের সময় নষ্ট করার সময় নাই।' এই কথাটা তিনি সব সময় যেমনি বলতেন, তেমনি মেনেও চলতেন। তিনি মাযহারকে বলে রেখেছিলেন, “বাইরের যারা

দেখা করতে চাইবে প্রত্যেককেই সময় দেবেন। শুধু নির্ভর করবে কাকে কখন সময়টা দেয়া হবে। আর এই বিষয়ে যদি কোন সমস্যা হয় তবে চৌধুরী সাহেবের সাথে আলাপ করে নেবেন, তখন চৌধুরী সাহেব যেটা বলবেন সেটাই চূড়ান্ত হবে।' মাযহার মাঝে মাঝে অসুবিধায় পড়লে আমার কাছে আসত, তখন আমি বুঝেশুনে বলে দিতাম। তাজউদ্দীন সাহেব মাযহারকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন । মাযহারকেও তিনি আপনি করে বলতেন । তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কাজে যোগ দেয়ার কয়েকদিন পরেই আমি বলেছিলাম যে, ‘স্যার, আমি কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিলাম একটা সময়ে, সেটা ছাত্রজীবনে। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র এবং আমার রাজনীতিতেও আগ্রহ ছিল, কিন্তু আমি কখনই নিজেকে কোন পার্টির সাথে জড়াইনি। আমি তাই আশা করব, আপনার সাথে যখন আমি থাকব আপনি আমাকে কখনও দলীয়ভাবে জড়িত করবেন না।' তিনি শুনে বললেন, ‘চৌধুরী সাহেব, ঠিক আছে, কিন্তু আমার রাজনীতির ব্যাপারেও আপনি কখনই আগ্রহ দেখাবেন না। এটা আপনাকে বলা থাকল।' আমাদের দু'জনের মধ্যে এই সমঝোতাটা শেষ দিন পর্যন্ত চলেছিল ।

তাজউদ্দীন সাহেবের আর একটি বিষয় ছিল। পাঁচজন নিয়ে বসে গল্প করা, এটা অফিসে কখনই তিনি করতেন না। হয়ত অর্থ সচিবের সাথে কথা বলছেন, মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে নিতেন, তখন আমরা এই তিনজন, আর কেউ না। তখন যদি কোন মন্ত্রীও আসতেন, আমার রুমে বসতে হত মন্ত্রীকে। এই আলোচনা শেষ হয়ে যাবার পর আবার যখন মন্ত্রী ঢুকবেন বা কোন পলিটিক্যাল কেউ ঢুকবেন তখন আমাদের কারো ঢোকা নিষেধ ছিল । তিনি সময়টাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন।

তিনি সকালবেলার প্রথম অংশে এক থেকে দেড় ঘণ্টা অফিশিয়াল ডাক এবং ফাইলগুলো দেখে নিতেন । সেখানে যেগুলো জরুরী আমি সেগুলো মার্ক করে দিতাম, যেন তিনি শুরুতেই দেখে দিতে পারেন। তিনি না ডাকলে আমি কখনও তাঁর রুমে যেতাম না। মাযহারকে আমার বলা ছিল, তাজউদ্দীন সাহেব এলে তুমি রিসিভ করবে এবং রুমে নিয়ে যাবে। তিনি ফাইলপত্র দেখতে শুরু করলেই তুমি বেরিয়ে যাবে। তিনি নিজে না ডাকলে আর ভেতরে যাবে না। তারপর তিনি হয়ত মিনিট দশেক ডাক দেখার পর আমাকে ডাকতেন। আমার আর তাঁর রুমের মধ্যে একটা দরজা ছিল, আমি ভেতরে ঢুকে যেতাম। তিনি বলতেন, ‘আসেন চৌধুরী সাহেব, একসাথে বসে কাজ করি। তাহলে

তাড়াতাড়ি হবে।' অনেক সময় আমি ডাকগুলো পড়তাম আর তিনি বসে বসে সিদ্ধান্ত নিতেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন, জায়গাবিশেষ চিহ্ন দিয়ে রাখতেন, অনেকগুলো জিনিস আমি মার্ক করে দিতাম । এইভাবে কিছু আলাপ-আলোচনা হত, তিনি সিদ্ধান্ত লিখতেন ।

তাঁর হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর পরিপাটি ছিল এবং সিদ্ধান্তগুলো তিনি খুব গুছিয়ে বাংলায় লিখতেন। কোন ফাইলের সামান্য কোন সমস্যাও তাঁর দৃষ্টি এড়াত না । ফাইল দেখার বিষয়টি যে একটা রেকর্ড এই ব্যাপারে উনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন । তাই সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যেন জিনিসটি সঠিক হয়, কোন ভুলভ্রান্তি না ঘটে। কখনও আমিও বলতাম, 'স্যার, এই ফাইলটি তদন্তে পাঠিয়ে দিন, এখানে একটা গণ্ডগোল আছে। দেখবেন, একবার গেলে এটি আর ফিরবে না এবং ফিরলেও অত্যন্ত সাবধানে ফিরবে।' তাজউদ্দীন সাহেব এত বুদ্ধিমান, এত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু আমার কথা তিনি কোনদিনও ফেলেননি। তিনি আমাকে ভীষণ বিশ্বাস করতেন। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ফাইলে তাঁকে কেউ কোনদিন জব্দ করতে পারেনি। এরপর ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সময় বিভিন্ন লোকজনের সাথে দেখাসাক্ষাতের জন্য বরাদ্দ ছিল। তারপর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একনাগাড়ে অফিসিয়াল কাজকর্ম । সন্ধ্যার পর আবার দেখাসাক্ষাৎ ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারা বাংলাদেশ সফরে এলেন। যেহেতু আমেরিকান সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছিল তাই তাজউদ্দীন সাহেবের আমেরিকান সরকারের যে কোন প্রতিনিধি, এমনকি বিশ্বব্যাংকের প্রতিও একটা বিরূপ ধারণা ছিল । ম্যাকনামারা বাংলাদেশে আসার আগে প্রশ্ন উঠল, কে তাঁকে রিসিভ করবেন বিমানবন্দরে গিয়ে। সাধারণত অন্যান্য দেশে অর্থমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রধানকে রিসিভ করেন। কোন কোন দেশের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীও রিসিভ করেন, এটাই প্রটোকল। আর ম্যাকনামারা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, বিশ্বব্যাংকের প্রধান এবং এক সময় আমেরিকান ডিফেন্স সেক্রেটারি ছিলেন, সুতরাং তাঁর একটা আলাদা মর্যাদা ছিল । অনুন্নত দেশে গেলে তাঁকে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীই বিমানবন্দরে গিয়ে রিসিভ করেন বা সী অফ করেন। যাই হোক, এখানে ঠিক করা হল যে অর্থমন্ত্রী বিমানবন্দরে যাবেন, রিসিভ করবেন, ডিনার দেবেন এবং তারপর তাঁকে বিদায় জানাবেন। আর প্রধানমন্ত্রীর সাথে ম্যাকনামারার একটা সৌজন্য সাক্ষাৎকার থাকবে। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব

বললেন, 'না, আমি যাব না । আমার যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি প্রটোকল মনে করি না যে, ম্যাকনামারাকে অর্থমন্ত্রীর গিয়ে রিসিভ করতে হবে। আর তাদের যা ভূমিকা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, সেই ভূমিকা থাকা অবস্থায় আমি তাকে ঠিক গ্রহণ করতে পারব না, রিসিভ করা দূরের কথা। এই জন্য আমি যাব না।' এটা নিয়ে বেশ হৈচৈ হল। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ম্যাকনামারাকে রিসিভ করেছেন।

এর আগে ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে তাজউদ্দীন সাহেব দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় ম্যাকনামারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ২৬ জানুয়ারিতে ভারত সরকার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এমন করে বসার ব্যবস্থা করেছিলেন যেন তাজউদ্দীন সাহেবের আসনের পাশেই ম্যাকনামারা বসেন। তাজউদ্দীন সাহেব পুরো সময়টা ম্যাকনামারার পাশে ছিলেন, কিন্তু কোন কথা বলেন নাই । এটা অনেকেরই চোখে পড়েছে। এবং তিনি ইচ্ছা করেই ম্যাকনামারার সাথে কথা বলেন নাই ।

এরপর '৭২-এর সেপ্টেম্বর মাসে তাজউদ্দীন সাহেব বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় যোগ দিতে ওয়াশিংটন গেলেন। ইতোমধ্যে এই ৮/৯ মাসে অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর আগের সেই মনোভাব অনেকাংশেই কমে গেছে। একটা উন্নয়নমুখী অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকাটা কী, বিশেষ করে বাংলাদেশের তখনকার প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকাটা কী হবে বা বিশ্বব্যাংকের সাহায্য নিলে আমরা কতদূর এগোতে পারি, এগুলো সম্বন্ধে তাঁর একটা ভাল ধারণা হয়ে গেছে। এবং তখন আমরা বিশ্বব্যাংকের সদস্যও হয়ে গেছি। ওয়াশিংটনে যাবার পর অনেকের সাথেই তাঁর দেখা হল, এর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা, যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি, সেক্রেটারি অব স্টেটস্-এর সাথে তিনি দেখা করলেন । আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, কিছু কংগ্রেসম্যান, কিছু নাম-করা সিনেটর—তার মধ্যে সিনেটর টেড কেনেডির সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অনেকেই তখন ওয়াশিংটনে ছিলেন না বলে দেখা করতে পারেন নাই । ম্যাকনামারার সাথে তাঁর লম্বা মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ে অর্থ সচিব মতিউল ইসলাম সাহেব, প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হামিদুল্লাহ সাহেব, আমাদের রাষ্ট্রদূত হোসেন আলি, আবুল মাল আব্দুল মুহিত সাহেব ও আমি উপস্থিত ছিলাম ।

আলোচনার বক্তব্য নোট করলাম আমি ও মুহিত সাহেব। তাজউদ্দীন সাহেব খুব সুন্দরভাবে বাংলাদেশের প্রয়োজনগুলো তুলে ধরলেন। তাঁকে ম্যাকনামারা বারেবারেই প্রশ্ন করলেন যে, তোমাদের জাতীয়করণ এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার মাঝে কীভাবে তোমরা এই লোনগুলো ব্যবহার করবে—এমন নানা প্রশ্ন করলেন। তাজউদ্দীন সাহেব সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন। সেইসাথে তিনি একটা রূপরেখাও দিলেন যে, এটা পরস্পরের সম্পূরক হবে, আর তোমাদের ঋণ এবং সহযোগিতা আমরা এমনভাবে ব্যবহার করব যাতে সম্পূর্ণ অর্থনীতিটা সুন্দর রূপ ধারণ করে। এই আলোচনায় ম্যাকনামারাকে খুব সন্তুষ্ট বলে মনে হল । তিনি জানতে চাইলেন আমরা কী কী চাই। আমাদের দিক থেকে প্ল্যান তৈরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাদের কোন্ কোন্ সেক্টরে সহযোগিতা দরকার । যেমন আমাদের এনার্জি, এগ্রিকালচার, ওয়াটার সেক্টর এবং আরো নির্দিষ্ট কিছু সেক্টরে সহযোগিতা পেলে আমরা এখুনি কাজগুলো আরম্ভ করতে পারি । আলোচনা শেষে ম্যাকনামারাকে খুবই প্রফুল্ল মনে হচ্ছিল।

ওখানে বিশ্বব্যাংক প্রধান সমস্ত দেশের অর্থমন্ত্রীদের সম্মানে একটা অফিশিয়াল ডিনার দেন। এরপর আর একটা অফিশিয়াল ডিনার দেন প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান বা প্ল্যানিং কমিশন প্রধান এবং অর্থ সচিবদের সম্মানে । সেই ডিনারে নূরুল ইসলাম সাহেব এবং মতিউল ইসলাম সাহেব গিয়েছেন । আমরা হোটেল রুমে বসে কথা বলছি । মুহিত সাহেবও এসে আমাদের সাথে যোগ দিলেন। আমাদের তখনও খাওয়া হয়নি। তাজউদ্দীন সাহেব মুহিত সাহেবকে বললেন, 'মুহিত সাহেব, আপনি খাবারের অর্ডারটা দিয়ে দেন। আপনি তো আবার এই দেশী লোক।' মুহিত সাহেব টেলিফোনে খাবার অর্ডার দিলেন। খাবার এসে গেল রুমে। আমরা তিনজন ওখানে খেয়ে ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং অর্থ সচিবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম । কারণ পরদিনই একটা মিটিংয়ের বিষয়ে আলোচনার জন্য এই দু'জনকে প্রয়োজন ।

ডিনার শেষে তাঁরা রুমে এলেন। রুমে ঢুকেই ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম সাহেব ভীষণ উচ্ছ্বসিতভাবে তাজউদ্দীন সাহেবকে বললেন,

'আপনি তো ম্যাকনামারাকে পাগল করে দিয়েছেন। আজকে আমাদের যে ডিনার ছিল সেই ডিনারে বেশির ভাগ সময় তিনি আপনার সম্বন্ধে কথা বলেছেন এবং বিশেষত আমার কাছে আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেছেন, একজন বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ না হয়েও তাজউদ্দীন আহমদের চিন্তার যে গভীরতা এবং সেই চিন্তাকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে পারার যে ক্ষমতা, তিনি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের খুবই সফল অর্থমন্ত্রী হবেন।' ডেপুটি চেয়ারম্যান আরও বললেন, 'জানেন তো, ম্যাকনামারা সাধারণত এই ধরনের কথাবার্তা বলেন না, তিনি প্রশংসা করতে গেলেও খুব মেপে মেপে প্রশংসা করেন । কিন্তু আপনার সম্বন্ধে যেটা বললেন এবং সবার সামনে তাঁর উচ্ছ্বসিত অভিমত—আমাদের সত্যিই গর্ব হয়েছে।' সমস্ত মিটিং-আলোচনা মিলিয়ে ওয়াশিংটনে অর্থমন্ত্রীর এই সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয় ।

এদিকে ওয়াশিংটনেই আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে মুহিত সাহেব দেশ সম্পর্কে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে প্রতিদিনই কথা বলতেন। এরকমই কথার ফাঁকে মুহিত সাহেব ন্যাশনালাইজেশন পলিসির বিরোধিতা করে সাংঘাতিক সমালোচনা করলেন একেবারে তাজউদ্দীন সাহেবের সামনাসামনি। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আমাকে আপনি বোঝান এই অবস্থায় আপনি যদি অর্থমন্ত্রী থাকতেন আপনি কী করতেন ।' মুহিত সাহেবও বিস্তারিত বললেন, স্যার, আমি এই এই করতাম। সব শুনে তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আপনি রাজনীতি করেন নাই বলে কথাগুলো বলছেন। আমি রাজনীতি করি এবং আমি সারাজীবন ধরে রাজনীতি করেছি বলে আপনার আর আমার মধ্যে এই তফাৎটা আপনি দেখছেন।' তাজউদ্দীন সাহেব বেশ শক্ত কথাই বললেন। 'আপনি হয়ত কিছু অর্থনীতির বই পড়েছেন। বড় বড় অর্থনীতিবিদদের বুলি শিখেছেন এবং আপনি সেগুলো আওড়াচ্ছেন। আর মাঠে-ময়দানে বৃষ্টিতে ভিজে সারাজীবন ধরে রাজনীতি করে মানুষের নাড়িনক্ষত্রকে বুঝে দেশের পরিস্থিতিকে বুঝে সেই পরিস্থিতিতে কী ধরনের পলিসি নিতে হবে তা আমি বুঝব, আপনি বুঝবেন না।' মুহিত সাহেব আবার তাঁর এইসব কথার জবাব দিলেন। এইভাবে অনেক তর্কবিতর্ক হল। এসব হবার পরে আমি মনে করেছি তাজউদ্দীন সাহেব নিশ্চয় দেশে ফিরে ওয়াশিংটন থেকে মুহিত সাহেবকে ফিরিয়ে আনবার জন্য অর্ডার দেবেন।

যাই হোক ওয়াশিংটন থেকে লন্ডনের পথে প্লেনের মধ্যেই তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে পেছন থেকে ডেকে নিয়ে তাঁর পাশের খালি সিটে বসতে বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'মুহিতকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন ?' আমি মনে মনে ভাবলাম, সর্বনাশ হয়ে গেছে মুহিত সাহেবের। আমি বললাম, 'স্যার, আমি তাঁকে চিনি ছাত্রজীবন থেকে।' আমি আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্লাস

পয়েন্ট বললাম যাতে তাঁর ক্ষতি না হয়। আরও বললাম, ফরেন সার্ভিসের যাঁরা বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনি একজন এবং তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য টাকা সংগ্রহ করেছিলেন । তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, আমি সব জানি। আমি এই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করেছি। সত্যি সে ব্রিলিয়ান্ট অফিসার।' আমি বললাম, 'আমি তো ভেবেছিলাম তাঁকে আপনি একটা কিছু করবেন। আমার ধারণার একেবারে উল্টো কথা বলছেন, স্যার!' তিনি বললেন, 'মুহিতের জন্য আপনাদের গর্ব হওয়া উচিত। তবে এখন তিনি ইকোনমিক মিনিস্টার, তাঁকে আরো ভাল জায়গায় ব্যবহার করা উচিত।' তিনি বললেন, 'আমি অবশ্যই তাঁকে দেশের কাজে ভাল জায়গায় ব্যবহার করব।' আমার মনে হল তাজউদ্দীন সাহেব মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন মুহিত সাহেবকে কোথায় দেয়া যাবে। কিছুদিন পরে দেখলাম তাঁকে এডিবি- তে পাঠানো হল। এটা কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেবই করেছিলেন। কারণ এই নিয়ে উচ্চপর্যায়ের সাংঘাতিক আপত্তি ছিল এবং বিতণ্ডাও হয়েছিল। ওই তর্কবিতর্ক ঝগড়ার কথা মনে করে পরে মুহিত সাহেবও আমাকে বলেছিলেন, 'সাইদ, এমন ব্রিলিয়ান্ট মন্ত্রী আমি জীবনে দেখিনি।'

দেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তাজউদ্দীন সাহেবের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে বলে দিয়েছিলেন যে, 'দেশের ইকোনমির ব্যাপারে প্রতিদিনের রিপোর্ট আমাকে দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে টাইপ করে দেবেন। যেন আমি পুরো চিত্র পাই। এখানে কোন কিছু লুকানোর চেষ্টা করবেন না। এতে আমি মনে করব আপনি আমার বন্ধুর মত কাজ করেছেন। কারণ আমি সঠিক চিত্র পেলে তখনই সেই অনুযায়ী কাজ করার একটা সুযোগ পাব। কখনও আমার সন্তুষ্টির চেষ্টা করবেন না। একদিক থেকে ড্রেনেজ হয়ে সব বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, আর আপনি বলছেন খুব ভাল ইকোনমির অবস্থা, এটা কখনও আমাকে বলবেন না । বরং একটু খারাপ কিছু দেখলেই আমাকে বলবেন, যেন আমি সংশোধন করার চেষ্টা করতে পারি।' এই রিপোর্টগুলো তাঁর কাছে আসত, সেগুলো পড়ে তিনি পিরিওডিক্যাল রিপোর্ট তৈরি করতেন, সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতেন, সমাধানের সুপারিশ করতেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর এই আন্তরিক প্রচেষ্টা অনেক সময় বাধাগ্রস্ত হত। তাজউদ্দীন সাহেব অত্যন্ত প্রাগম্যাটিক মানুষ ছিলেন। দেশের স্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে তাঁর কোন সময়ই কোন আপত্তি ছিল না। এমনকি

তিনি এক পর্যায়ে ভাবছিলেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের প্রাইভেটাইজেশানের দিকে যাওয়া প্রয়োজন ।

তিনি বলতেন, দেশের কাছে আমাদের অঙ্গীকার ছিল জাতীয়করণ করা, কিন্তু বাস্তব অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি পরিবর্তন প্রয়োজন এবং এই ক্ষেত্রে আমার কাছে দেশের মানুষ বড়, অঙ্গীকার নয়। তাজউদ্দীন সাহেব শেখ সাহেবকে বলেছিলেন যে, মানুষের কাছে আমাদের অঙ্গীকার আছে ঠিক আছে, আমরা আবার আগের মত তাদের সামনে যাব, বলব, আমরা আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু এই পথে এই এই সুবিধা এবং এই এই অসুবিধা দেখা দিয়েছে, তাই আমরা বর্তমান পদক্ষেপগুলো নিতে যাচ্ছি । আমরা এইভাবে সভা করে মিটিং করে সমস্ত জাতিকে বুঝিয়ে আমাদের সাথে নিয়ে নেব ।

তাঁর এইসব চিন্তা থেকেই দেখি পরবর্তীতে ব্যক্তিমালিকানা খাতে বিনিয়োগের সীমা ২৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে খুব সম্ভবত ৩ কোটি টাকা (সঠিক অঙ্ক এই মুহূর্তে মনে নেই) করা হয় । কয়েকটি শিল্পকে সরকারি খাতে রেখে বাকি শিল্পগুলোকে ব্যক্তিমালিকানায় দেয়ার সুপারিশ করেন তাজউদ্দীন সাহেব। বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে তিনি যখন এমন ধরনের চিন্তা এবং সুপারিশ করছেন তখন কিছু মানুষ বঙ্গবন্ধুকে মিথ্যা এবং ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন যে, সরকারকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই তাজউদ্দীন এই সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলছেন। দেশ নিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবের যে ধরনের চিন্তাভাবনা ছিল তা অনেকাংশেই কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এবং বোঝা যেত তিনি প্রতি পদক্ষেপেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন ।

তাজউদ্দীন সাহেবের আশ্চর্য একটা জিনিস ছিল যে, তিনি বিশ্বের যেখানেই গেছেন তাঁর যুক্তি, গভীরতা, সরলতা দিয়ে প্রতিপক্ষকে মুগ্ধ করে ফেলতেন । তিনি যে কোন জিনিসকে উপস্থাপন করতেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। '৭৩ সালে আমরা মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ সফরে গিয়েছিলাম। কুয়েত আমাদেরকে এর কিছুদিন আগে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কুয়েতে আমাদের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন লে. জে. খাজা ওয়াসিউদ্দিন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর ভাল অবদান ছিল, যদিও তিনি উর্দুভাষী এবং তাঁর স্ত্রী পাঞ্জাবি ।

এয়ারপোর্টে যখন আমরা নামলাম তখন দেখি আমাদের রাষ্ট্রদূত, দূতাবাসের কিছু লোকজন এবং অল্প কিছু বাঙালি যাঁরা কুয়েতে থাকেন, আর কুয়েত সরকারের দু'জন জুনিয়র পর্যায়ের অফিসার এয়ারপোর্টে এসেছেন আমাদেরকে

রিসিভ করার জন্য । এটা দেখে অর্থ সচিব কফিলউদ্দিন মাহমুদ সাহেব এবং আমার খুব খারাপ লাগল। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব রাজনীতিবিদ, তিনি এটা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্যই করলেন না এবং এ ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়াও তিনি দেখালেন না। স্বাভাবিকভাবেই তিনি হেসে ওই অফিসারদের সাথে কথা বললেন ।

তারাও খুব বিব্রত বোধ করছে বোঝা গেল । ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলছে যে, 'এক্সেলেন্সি, আমাদের মিনিস্টারের বোন বা খুব নিকট আত্মীয় মারা গেছেন, যে কারণে তিনি নিজে এয়ারপোর্টে আসতে পারেননি, তাই আমরা এসেছি। তবে তিনি পরে আপনার সাথে দেখা করবেন।' কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি এটা একেবারেই বাজে অজুহাত ।

তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আমার সাথে তো তাঁর মিটিং আছে । তাই যখন মিটিং হবে, তখন নিশ্চয়ই তোমাদের অর্থমন্ত্রীর সাথে দেখা হবে। প্রয়োজন হলে আমি আমার এখানে থাকার সময়টা একদিন বাড়িয়ে নেব তাঁর শোক কিছুটা কম হওয়ার জন্য । তারপর আমরা আলোচনা করব।'

তাজউদ্দীন সাহেব ব্যাপারটাকে খুবই সহজভাবে নিলেন । আমরা এয়ারপোর্ট থেকে বের হলাম। অতিথি হিসেবে হোটেলের ব্যবস্থা ছিল খুবই চমৎকার, একেবারে আলাদা সুইট আমাদের প্রত্যেকের জন্য। তাজউদ্দীন সাহেবের জন্য রয়্যাল সুইট ইত্যাদি। তাজউদ্দীন সাহেব, অর্থ সচিব, রাষ্ট্রদূতসহ আমরা আলাপ-আলোচনা করলাম। পাকিস্তানের নানা ধরনের অপপ্রচারের ফলেই আমাদের সাথে এই ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অহেতুক অজুহাত খাড়া করা হচ্ছে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল । একদিন পর কুয়েতের অর্থমন্ত্রী সময় দিলেন, কিন্তু সময়টা আসর আর মাগরেবের সময়ের মধ্যে—অর্থাৎ যতটা কম সময় দেয়া যায়। আমাদের রাষ্ট্রদূত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমস্ত পরিস্থিতিকে সামাল দিচ্ছিলেন যাতে কোনভাবেই আলোচনা ভণ্ডুল হয়ে না যায় ।

কুয়েতের অর্থমন্ত্রী এসেই প্রথম যে কথা বললেন, 'তোমরা কেন পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছ ?' আগে থেকেই আমাদের মনটা খারাপ ছিল, এই প্রশ্নে মনে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হল। তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর সমস্ত জীবন রাজনীতি করেছেন, কিন্তু তিনি যে কত উচুমানের রাজনীতিবিদ, এটি ওইদিন আরো ভালভাবে বুঝলাম । তিনি এমন ভাব করলেন যেন কিছুই হয়নি, এই প্রশ্নটা একেবারেই সাধারণ প্রশ্ন । অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিলেন, 'দেখ, আমাদের

সমস্যাটি ছিল মূলত অর্থনৈতিক । তুমিও অর্থমন্ত্রী, আমিও অর্থমন্ত্রী, তাই এই বিষয়টি তোমাকে বললেই তুমি বুঝবে ভাল।' খুব সংক্ষেপে পুরো বিষয়টি তুলে এনে বললেন, এই এই কারণে আমাদের সাথে তাদের দূরত্ব হতে থাকে। এর মধ্যে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। আমরাও মুসলমান তারাও মুসলমান। সত্যি বলতে পাকিস্তান আমরাই এনেছিলাম। বাঙালি না হলে পাকিস্তান আসত না। কিন্তু কুয়েতের মন্ত্রী ঘুরেফিরে সেই পাকিস্তানের পক্ষেই কথা বলেন ।

কফিলউদ্দিন মাহমুদ সাহেব আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, তিনি বললেন যে, 'এক্সেলেন্সি, আপনি আজকে এই ঠাণ্ডা এয়ারকন্ডিশন্ড্ রুমে আপনার বর্ধিষ্ণু অর্থনীতিতে বসে এই কথাটি খুব সহজে বলতে পারলেন । কিন্তু আমাদের দেশের লোক কী অত্যাচারের মধ্যে ছিল এবং তারা কী অত্যাচারের প্রেক্ষিতে স্বাধীন হয়েছে এটার সঠিক চিত্রটা যদি আপনি জানতেন তা হলে এই প্রশ্নটি আমার মন্ত্রীকে আপনি করতেন না । আপনি শুনে রাখুন, ইসলামের নামে পাকিস্তানিরা কী বর্বরতা করেছে । আমি একজন খাঁটি মুসলমান এবং আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, ইসলামের সমস্ত জিনিসগুলো আমি পালন করি এবং আমার মন্ত্রীও করেন এবং আমাদের ডেলিগেশনের যাঁরা সদস্য সবাই করেন।' পাকিস্তানিরা ইসলামের নামে বাংলাদেশে যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তার সমস্ত বৃত্তান্তগুলি কফিলউদ্দিন মাহমুদ সাহেব দিলেন। এই কথাগুলো বলার মাঝে মাঝে তিনি আবার কুয়েতের মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি হলে কী করতেন এখানে ?'

তাজউদ্দীন সাহেব ইচ্ছে করেই কফিলউদ্দীন মাহমুদ সাহেবকে কথা বলার সুযোগ দিলেন। তিনি রাজনীতিবিদ, তিনি জানেন যে, কোন সময় কাকে কীভাবে সুযোগ দিতে হয়। তিনি যখন দেখলেন যে কফিলউদ্দিন সাহেবের কথা শেষ হয়ে গেছে তখন তিনি আবার বলতে শুরু করলেন। বললেন যে, 'আমরা পাকিস্তানের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখতে চেষ্টা করব। আমরা ইতোমধ্যে পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে আছি এবং আমরা ওআইসি সম্মেলনে যাব।'

আগুনের উপর যেন পানি পড়ল, কুয়েতের অর্থমন্ত্রী 'ব্রাদার' বলে ডাকা শুরু করলেন, কথা বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে দেন। অর্থাৎ আরব কালচার, যারা বন্ধুত্ব করতে চায় তারা যেমন করে তিনিও তেমন করতে লাগলেন । সেখানেই তিনি অফিশিয়াল ডিনারের প্রস্তাব দিলেন পরদিনের জন্য ।

কুয়েতের অর্থমন্ত্রী যে ডিনার দিলেন সেটা একেবারে বিশাল ব্যাপার । খুব কম দেশে অর্থমন্ত্রীর ডিনারে এত লোক এবং এত গুরুত্বপূর্ণ লোককে দাওয়াত দেয়া হয় । সমস্ত পরিস্থিতি যেন মুহূর্তে বদলে গেল । যতদূর খেয়াল আছে, বাংলাদেশের জন্য বেশ কিছু কমিটমেন্ট তাঁরা করেছিলেন । কুয়েত থেকে আমরা সৌদি আরব এবং বাগদাদে গেলাম। সৌদি আরবেও ধর্মের বিষয়টি উঠেছিল, তবে মোটামুটি আমরা ভাল রিসেপশন পেয়েছিলাম। বাদশা ফয়সালের সাথেও তাজউদ্দীন সাহেব দেখা করেন। তবে সৌদি আরব তখনও আমাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি। তাই কীভাবে আমরা ভিসা পাব বা পেতে পারি এই সমস্ত সমস্যার কারণে আমরা বৈরুতে গিয়ে হোটেলে বসে রইলাম । মুহিত সাহেব অগ্রবর্তী দূত হিসেবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পাসপোর্টে সৌদি আরবে গেলেন। সেই সময়ে মালয়েশিয়ার মহামান্য টুঙ্কু আব্দুর রহমান আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন এবং তিনিই সৌদি আরবে যাবার জন্য সব আইনগত ব্যবস্থা করিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত আমরা সৌদি আরবে যেতে পারি। ইরাকে ধর্মীয় বিষয় বা পাকিস্তান নিয়ে তেমন অসুবিধা হয়নি। তবে তারা এমন একটা ভাব করছিল যে, আমরাই বিপদের মধ্যে আছি, আমাদেরই অর্থনীতির অবস্থা খারাপ, তোমাদেরকে কী দিয়ে সাহায্য করব ? কিন্তু তারপরেও ইরাক আমাদেরকে বড় অঙ্কের আর্থিক অনুদান দিয়েছে। ওই অনুদানের চেকটা আমার ব্রিফকেসে ঢাকায় আসে ।

তবে সবদিক মিলিয়ে আরব দেশগুলো থেকে আমরা ভাল সাড়া পেয়েছিলাম। সৌদি অর্থমন্ত্রী তো তাজউদ্দীন সাহেবের খুব ভাল বন্ধু হয়ে গেলেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জঘন্য অপপ্রচারগুলো খণ্ডন করতে তাজউদ্দীন সাহেব যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা ছিল এক কথায় অনন্য। কিন্তু বিদেশে তিনি যে ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছিলেন দেশে সেই তুলনায় সহযোগিতার মাত্রা ছিল খুবই কম ।

তাজউদ্দীন সাহেব স্তুতিবাক্যে কখনই খুশি হতেন না। তোষামোদকে তিনি খুব ঘৃণা করতেন । কেউ যদি কখনও তোষামোদ করত তবে তাকে ঘর থেকে বের করে দিতে পর্যন্ত আমি দেখেছি। অনেক সময় অনেকেই খুব কাছাকাছি গিয়ে তোষামোদ করে কথা বলতে চাইত, তিনি তার কথাটা বন্ধ করে দিয়েই বলতেন, 'কী আপনার দাবি সেটা বলেন। আপনার ওই সমস্ত কথা বলার দরকার নাই, ওইসব আপনি অন্য জায়গায় গিয়ে বলবেন।' শর্টকাট করে দিতেন। আর তিনি তো খুব ডিসিপ্লিনড্ ছিলেন, তাঁর কাছে ওরকম কিছু নিয়ে

কেউ যেতও না ।

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কাজ করতে গিয়ে যখন দেখলাম তিনি আমার কোন ক্ষতি করবেন না বা ক্ষতি করার মত মানুষ তিনি না, তখন আমি তাঁকে বেশ শক্ত কথা শোনাতাম। আমাকেও তিনি বলতেন যে, 'চৌধুরী সাহেব, আমাকে কিন্তু কোন অপ্রিয় জিনিস যেটা আমার জানা দরকার সেটা আপনি লুকাবেন না।' আমি বলতাম, 'স্যার, আপনার সাথে আমি যে রকম কথা বলি তাতে আপনি না হয়ে অন্য কেউ হলে আমার চাকরিই চলে যেত। আপনি আমাকে সে স্বাধীনতা দিয়েছেন সে জন্য আপনাকে লুকানোর কোন প্রশ্নই উঠে না।' স্তুতিবাক্যের চেয়ে তিনি বরং কটু কথা শুনতে পছন্দ করতেন।

আমি তাঁকে প্রায়ই বলতাম, 'স্যার, বাইরে আপনার সম্বন্ধে একটা কথা চালু আছে, আপনি ভারতঘেঁষা এবং আপনি বাংলাদেশকে বিক্রি করে দিয়েছেন।' তিনি এর জবাবে অন্যদিন মিটমিট করে হাসতেন। একদিন বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, আমার একটাই শুধু দুর্বলতা আছে যে, আমি সারা জীবন আমার নীতি হিসেবে কারো সাথে কখনো বেইমানি করি নাই। কেউ কোনদিন বলতে পারবে না যে তাজউদ্দীন কারো সাথে বেইমানি করেছে। হয়ত কারো সাথে শক্ত ব্যবহার করেছি, কাউকে গালাগালি দেয়া দরকার, দিয়েছি, কিন্তু কারো সাথে জীবনে বেইমানি আমি করি নাই। আপনি তো জানেন না '৭১-এর সেই দিনগুলোর কথা, কী প্রেক্ষিতে আমি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, কী ঘটনার পরম্পরায় আমি ভারতে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং তারপর থেকে কীভাবে আমাদের এই স্বাধীন দেশের মুখ দেখার সৌভাগ্যটা হয়েছিল। এইসব কিছুর পেছনে ওরা আমাদেরকে যে সমর্থন দিয়েছিল, আশ্রয় দিয়েছিল এক কোটি রিফিউজিকে এবং এক বছর ধরে তারা খাইয়েছে, আপনার কি একটা কৃতজ্ঞতাবোধ থাকবে না, চৌধুরী সাহেব ? আমার কিন্তু সেটা আছে। সেই কৃতজ্ঞতাবোধকে যদি কেউ মনে করে যে আমি প্রো-ইন্ডিয়ান তাহলে সে ক্ষেত্রে আমি তাই ।'

আমাকে একটা ফাইল বের করে দেখালেন যে, 'দেখেন এর মধ্যে কী আছে, পড়ে দেখেন। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমার যে নোট বিনিময়, সেই বিনিময়টার মধ্যে কী আছে পড়ে দেখেন আপনি। এটা পড়ার পর আপনি আমাকে বলেন যে, আমি প্রো-ইন্ডিয়ান কিনা।' তিনি কিন্তু সেদিন এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন । আমি তাঁর সামনে পড়লাম, পড়ে আমি বললাম যে, 'স্যার, আমি

পড়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু আমি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি, আমার ভূমিকা ছোট। কিন্তু আপনার বিরাট ভূমিকা। আপনার ইমেজকে আমি আমার সন্তুষ্টি দিয়ে বদলাতে পারব না। সম্ভবও নয়। আমি যেটা সর্বোচ্চ করতে পারি, সেটা হল আপনার খারাপ জিনিসটাই বেশি আপনার চোখের সামনে তুলে ধরব। ভাল জিনিসটা মাঝে মাঝে তুলব। যাতে আপনি নিজেকে বা নিজের সম্বন্ধে কিছু করার বা পরিবর্তনের সুযোগ পান ।' এই ধরনের কথাবার্তা বলে মাঝে মাঝে পরে আমি ভাবতাম এই কথাগুলো বলে আমি ঠিক করছি কিনা। পরে ভাবতাম তিনিই তো আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এইভাবে বলতে। তিনি স্তুতিবাক্য যে পছন্দ করেন না সে তো আমি নিজেই দেখেছি ।

তিনি আমাকে এইসব কথাবার্তার জন্য কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন সেটা আমি বেশ পরে জেনেছি। ইতোমধ্যে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হামিদুল্লাহ সাহেব একদিন টেলিফোন করে আমাকে বললেন যে, 'চৌধুরী সাহেব, আপনি একটু আসেন, আমার সাথে কফি খেয়ে যান। আপনাকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলব।' টেলিফোনে তিনি ইন্টারেস্টিং কথাটি যে কী সে সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত দিলেন না । আমি তাঁর কাছে যাওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন যে, 'আমি কালকে তাজউদ্দীন সাহেবের বাসায় গিয়েছিলাম। সন্ধ্যাবেলা অনেকক্ষণ ছিলাম। তাঁর সাথে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা হল। তিনি আমাকে ডিসকারেজ করলেন তাঁর বাসায় যেতে।'

এটা শুনেই আমিও বললাম, 'স্যার আমাকেও ওই বাসায় গেলেই বলেন, কেন এসেছেন, আপনাদের অসুবিধা হবে, এই বাসার উপর নজর রাখা হয় ।'

হামিদুল্লাহ সাহেব বললেন, 'এরপর কথায় কথায় উঠল যে আপনি কেমন আছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমার সাথে আপনার এর মধ্যে দেখা হয়েছে কিনা। আমি বলেছি আবু সাইদের সাথে প্রায়ই দেখা হয়। তখন আপনার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তিনি করলেন। একজন মন্ত্রী তাঁর কোন অফিসার সম্বন্ধে এত প্রশংসা করেন আমি জীবনে শুনিনি । তিনি বললেন যে এই রকম একজন অফিসার থাকলে সেই অফিসে তো দশ জন অফিসার থাকার দরকার ছিল না। আবু সাইদের মত এই রকম অফিসার যদি শেখ সাহেবের পাশে থাকত তাহলে শেখ সাহেব আজকে এইরকম ভুল করতে পারতেন না । বাংলাদেশের ইতিহাসটা অন্যরকম হত।'

একবার একটা ফাইল এল আমাদের মন্ত্রণালয়ে। সেই ফাইলে দেখা গেল, খন্দকার মোশতাক ১২ বা ১৪ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলেন কোন একটা ব্যাংক থেকে পাকিস্তান আমলে। এখন তিনি মন্ত্রী থাকা অবস্থায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত করেছেন যেন তাঁর ওই লোনটা মওকুফ করে দেয়া হয় । এই দরখাস্ত পড়ে তাজউদ্দীন সাহেব খন্দকার মোশতাকের কাছে টেলিফোন করলেন। বললেন যে, 'মোশতাক ভাই, আপনি ঋণ মওকুফ চাচ্ছেন, কিন্তু আপনার টাকার পরিমাণটা তো এমন কিছু বেশি না । আর মন্ত্রী হিসেবে এক মন্ত্রী আর এক মন্ত্রীকে ঋণ মওকুফ করে দিচ্ছে দেখতে ভাল লাগে না । আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, এটা নিয়ে পরে আপনি সমালোচনার মুখোমুখি হতে পারেন। আপনি মন্ত্রী না হলে কেউ এই নিয়ে কোনদিন আলোচনাও করত না। কিন্তু যেহেতু আপনি বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী, স্বাভাবিক কারণেই হয়ত এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে মন্ত্রী তাঁর ক্ষমতাবলে ঋণ মওকুফ করিয়ে নিয়েছেন। আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন—যদিও নিচের দিক থেকে ঋণ মওকুফের সুপারিশ করা হয়েছে।' এই কথা বলার পরে মনে হল খন্দকার মোশতাক এটা খুব পছন্দ করলেন না। কারণ টেলিফোন রেখে দিয়ে তাজউদ্দীন সাহেব একটা মন্তব্য করেছিলেন যা তিনি সাধারণত করতেন না।

তাজউদ্দীন সাহেব বললেন যে, 'আমি হলে তো কখনই এই ধরনের আবেদন করতাম না। প্রথম কথা হচ্ছে যে, পরিমাণটা ছোট। দ্বিতীয় কথা, এরকম অসুবিধা কষ্ট তো অনেকেরই হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আমাদের গাড়ি চুরি গেল। দেশের বাড়ি পুড়িয়ে দিল। আমি কি কখনও বলেছি সরকারকে যে আমাকে এরকম ক্ষতিপূরণ দেয়া হোক বা এটা নিয়ে আমি হৈচৈ করেছি ? যুদ্ধের সময় কষ্ট হবেই, সেটা সবারই হয়েছে এবং আমাদেরও হয়েছে। তাঁর মন্ত্রী হিসেবে এই কাজ করাটা ঠিক হবে না বলে আমি মনে করি।' আমি তখন বললাম যে, 'স্যার, কিন্তু তিনি এই সুবিধা চাচ্ছেন, আর সব দিক থেকে রিকমেন্ডেডও হয়েছে—আপনি চিন্তা করে দেখেন । আবার তিনি তো ফোনে রাগও করেছেন বললেন।' আমার যতদূর মনে আছে, তিনি সই দিয়ে দিলেন । কিন্তু তিনি তখন একটা কথা বলেছিলেন যে, 'চৌধুরী সাহেব, ওই লোকটা কিন্তু একটা ভাইপার, একে আপনারা কেউ বাইরে থেকে চিনবেন না। আমি দেখেছি এ সাপের চাইতেও বিষাক্ত।' এই মন্তব্যটা তাজউদ্দীন সাহেব করেছিলেন খন্দকার মোশতাক সম্বন্ধে ।

এছাড়াও হয়ত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করছেন কয়েকজনের সাথে, সেই

সময় তিনি কখনও উল্লেখ করেছেন খন্দকার মোশতাকের রোল, তাঁর '৭১-এর ভূমিকা, যে জন্য তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ থেকে সরাতে হয়েছিল। মাহবুব আলম চাষীর ভূমিকা সম্পর্কেও বলেছেন কখনও। কী হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে আমরা কখনই জানতে চাইনি, এর বেশি তিনিও আর বলেননি । মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই তিনি অত্যন্ত ইমোশনাল হয়ে যেতেন। তিনি যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমর্পণ করেছিলেন এটা বোঝা যেত তাঁর কথা থেকে । তিনি সবসময় বলতেন যে, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্ব, আমাদের প্রেরণা ।

তাজউদ্দীন সাহেব মানুষকে সাংঘাতিক সম্মান করতেন। যার যেটুকু প্রাপ্য সেই সম্মানটুকু তিনি সবসময় দিতে চাইতেন। বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে আলাপকালে প্রায়ই বলতেন, দেশ চালাবেন কাদেরকে নিয়ে ? যারা আপনার স্বর্ণসন্তান তাদেরকে শত্রু বানিয়ে বিরোধিতা করে দেশ চালান যায় না। কোন দেশে কেউ কখনই সেভাবে চালাতে পারেনি । তিনি বহু ইতিহাস টানতেন । তিনি বলতেন, যদি কেউ শত্রুতা করে সে জন্য তো গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস্ কন্ডাক্ট রুলস্-ই আছে, সেই রুলে আমরা তার বিচার করব। আমি ঢালাওভাবে কেন দোষারোপ করব, এটা তো ঠিক নয় । তাজউদ্দীন সাহেব এই সমস্ত কথাগুলো বলতেন, কিন্তু ভাল কথা বোধ হয় কেউ শোনে না ।

যুদ্ধ-অপরাধীদের ব্যাপারে তাঁর একটা ক্লিয়ার পলিসি ছিল এটা একেবারে কনভিকশন পলিসি যে, যুদ্ধ অপরাধ যে করেছে যদি সে পাকিস্তান আর্মি হয়ে থাকে তবে তাদেরকে যেভাবে ইন্টারন্যাশনাল আইনে বিচার করা দরকার, সেটা করব। আর সে যদি বাঙালি হয়ে থাকে তবে তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব থেকে বিচ্যুত না করে দেশের আইন অনুযায়ী বিচার করতে হবে। গোলাম আযম সম্পর্কে ঠিক এই কথাটাই তিনি বলেছিলেন একটা নির্দিষ্ট ঘটনা থেকে। এ. জেড. এম. শামসুল আলম বলে একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ছয় দফা দাবির বিরুদ্ধে এবং এক পাকিস্তানের দাবিতে বহু আর্টিক্ খবরের কাগজে লিখেছিলেন। বাংলাদেশ যখন হয় তখন তিনি ট্রেনিংয়ে ওয়াশিংটনে ছিলেন। তাঁর বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছিল। বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক মিটিংয়ে যোগ দিতে তাজউদ্দীন সাহেব যখন ওয়াশিংটন গেলেন আমি তখন মুহিত সাহেবের গেস্ট হিসেবে তাঁর বাসায় ছিলাম ।

শামসুল আলম মুহিত সাহেবকে এসে খুব করে অনুরোধ করল তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে। এই কথা শুনে মুহিত সাহেব বললেন, "আরে রাখো, তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে আমি তোমাকে নিয়ে যাব কিসের জন্য ? আমি তাঁর সাথে প্রতিদিন ঝগড়া করি, আমি তোমার কেস নিয়ে যাব না, তুমি সাইদকে ধর।'

শামুসল আলম আমাকে বলল, 'সাইদ ভাই, আমার একটা আবেদন আছে । আপনি তো জানেন, আমি খুব কষ্টের মধ্যে আছি। আমার স্কলারশিপ শেষ হয়ে গেছে। আমার ছেলেমেয়ে দেশে রয়েছে। আমাকে তো বাংলাদেশের ন্যাশনালিটি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এখন আমার পাসপোর্টও নাই । আমি দেশে ফিরতে পারছি না। আমার এখানে না খেয়ে মরার অবস্থা হয়েছে। আমাকে কি একটু তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন ? আমি দেশে ফিরতে চাই।' আমি বললাম 'দেশে ফিরলে আপনার বিচার হতে পারে, আপনি সেটা জানেন ?' শামসুল আলম বলল, 'তা হোক, বিচার হলে যা আছে ভাগ্যে তাই হবে, কিন্তু আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ফিরতে চাই। আমি এখন অনুতপ্ত।' আমি বললাম, 'এটা অতি স্পর্শকাতর ব্যাপার । আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু কোন সুপারিশ করব না। তাঁর সম্বন্ধে আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, হি ইজ ভেরি শার্প । আপনার প্রত্যেকটা কথা তিনি স্ক্যান করবেন। সে ক্ষমতা তাঁর আছে। এবং অল্পতেই চটে যান।' এটাও আমি তাকে বললাম ।

তাজউদ্দীন সাহেবকে আমি বললাম যে, 'স্যার, এখানে একটা ছেলে বিপদের মধ্যে আছে, আপনার সাথে দেখা করতে চায়।' তিনি বললেন, "কী নাম বলেন তো ?' বললাম যে, 'এ. জেড. এম. শামসুল আলম।' তিনি চিৎকার করে বললেন যে, 'সে তো এখানে, ওয়াশিংটনে আছে।' আমি বললাম, "হ্যাঁ, স্যার।' তাজউদ্দিন সাহেব আমার চাইতে বেশি বলে ফেললেন, "জানেন কত ক্ষতি সে করেছে, আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ করেছি, তখনও সে আর্টিক্ লিখেছে।' আমি বললাম, 'সব জানি, স্যার। এখন সে বিপদে আছে। আমি মনে করি, আপনার তার কথা শোনা উচিত। আমি তার সম্পর্কে কোন সুপারিশ করব না । সিদ্ধান্ত আপনার।' তাজউদ্দীন সাহেব একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে।'

সন্ধ্যাবেলা একটা ফাঁক পাওয়া গেল, ১৫/২০ মিনিটের। আমি শামসুল আলমকে বললাম, '২০ মিনিটের মধ্যে আপনার সমস্ত কেসটা উপস্থাপন করতে হবে

এবং আপনার যে বক্তব্য আপনি সেটা বলবেন।' শামসুল আলমের কিছু কথা শুনে তিনি বললেন, আপনার ন্যাশনালিটি কবে গিয়েছে ? শামসুল আলম বলল, স্যার, ওই গেজেট নোটিফিকেশনে সবার একসাথে গিয়েছে।' তখন তিনি বললেন, 'এটা খুব কঠিন ব্যাপার—এটা আমার হাতে না । এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রাইম মিনিস্টার দেন । আপনি একটা কাজ করুন, আবু সাইদ চৌধুরীর কাছে আপনার একটা দরখাস্ত দিয়ে যান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে "ওয়াশিংটনে উপস্থিত অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে" কথাটি লিখে। এটা আপনি রেখে যান। কী হবে আমি বলতে পারব না। তবে আমি এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হাতে দেব, পারলে দু'একটা কথাও বলব। আপনি যেতে পারেন।' ১০ মিনিটের মধ্যে কথা শেষ করে শামসুল আলমকে তিনি বিদায় দিলেন।

আমাকে তাজউদ্দীন সাহেব ওই রাতেই বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, কাল যখন শামসুল আলম দরখাস্তটা দিয়ে যাবে, সেটা আপানার কাছে সাবধানে রাখবেন। এই কাজটি বাংলাদেশ সরকারের অন্যায়। সে যখন অপরাধী, তাকে দেশে নিয়ে বিচার কর, নাগরিকত্ব কেন বাতিল হবে ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান যুদ্ধ-অপরাধী যারা ছিল তাদের কি জার্মানির নাগরিকত্ব থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল? বাদ দেয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচার হয়েছে। তারপর যার যে শাস্তি সে সেটাই পেয়েছে। গোলাম আযমের অপরাধের জন্য যদি তার ফাঁসির হুকুম হয় তবে তা বাংলাদেশেই হবে বিচারের পর।'

আমি বললাম, 'স্যার, তাই বলে আপনি গোলাম আযমকে দেশে নিতে বলবেন?' তিনি বললেন, 'গোলাম আযম নিশ্চয়ই বাংলাদেশে ফিরবে, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে। তারপর আমরা তাকে যুদ্ধ-অপরাধের অভিযোগে বিচার করব। বিচারে সে যদি খালাস হয় তবে তাই হবে, আর যদি শাস্তি হয় তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। সবচাইতে বড় কথা, আমার দেশের মানুষ জানবে তার অপরাধ। ঘৃণা করবে অপরাধীকে, প্রতিটি মানুষের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে। আইনের বিচারে যা শাস্তি হয় সে পাবে।'

তাজউদ্দীন সাহেব দেশে ফিরেই তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল মান্নান সাহেবকে ফোন করলেন। ফোনে শামসুল আলমের ঘটনাটি বলে বললেন, 'আমি এটা সুপারিশ করে দিচ্ছি। তাকে নাগরিকত্ব দিয়ে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে হবে, তারপর হোম মিনিস্ট্রি যদি মনে করে বিচার করা উচিত তাহলে বিচার

করেন। আপনি এটি বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যান।'

দিন দুয়েক পরে আমি তাজউদ্দীন সাহেবের রুমে বসা, লাল টেলিফোন বেজে উঠল । কথাতে বুঝলাম প্রধানমন্ত্রী ফোন করেছেন । তাজউদ্দীন সাহেব কিছুক্ষণ শুনলেন, এক পর্যায়ে বললেন, 'মুজিব ভাই, এই বিষয়ে আপনার সাথে আমার কিছু কথা বলবার ছিল। আজকে শামসুল আলমের দরখাস্তের কারণে বলবার সুযোগ হল । প্রথম কথা, আমাদের কোন অধিকার নেই যে মানুষটা বাংলাদেশে জন্মেছে তাকে দেশের নাগরিকত্ব থেকে বহিষ্কার করার। এটা অন্যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অন্যায় সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করা উচিত। দ্বিতীয় কথা, আমি শামসুল আলমের দরখাস্ত পাঠিয়েছি যেটা এখন আপনার কাছে আছে, সেটা দেখেন এবং সে যে অন্যায় করেছে এই কারণে তাকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে দেশের আইন অনুযায়ী বিচার করবার ব্যবস্থা করেন।'

তিনি বঙ্গবন্ধুকে আরও বললেন, ‘গোলাম আযমকেও দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই সমস্ত লোকেরা বিদেশে থাকলে তাদের শাস্তি তো হল না । এই দেশের মানুষ তো জানতেই পারল না যে তারা কী জঘন্য অপরাধ করেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় । সুতরাং দেশে তাদের আসতে হবে । দেশে ফিরে আসার পর তাদের বিচার করতে হবে। এবং বিচারে যে শাস্তি হবে সেই শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে, যদি কেউ বেকসুর খালাস পায় সেটা সে পাবে।' তাজউদ্দীন সাহেবের কথা শুনে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়েছে । তিনি যে কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন সেটা তখন ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি। আইনের শাসনের প্রতি তাঁর যে আস্থা এবং শ্রদ্ধা ছিল সত্যিই তা অতুলনীয় । তিনি অপরাধীর বিচার চেয়েছেন—সেই বিচার যে বিচার এই দেশের মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে চিরকাল । যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা থাকবে, দেশপ্রেমের পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে মানুষ সত্যিকার মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার শক্তি অর্জন করবে।

তাজউদ্দীন সাহেব প্রচণ্ড রকমের আশাবাদী মানুষ ছিলেন—যাকে বলা যায় রোবাস্ট অপটিমিজম্। আমরা যদি কখনও বলতাম, চারিদিকে হতাশা, দুরাশা—এই সমস্ত কোন কথা, তখন তিনি বলতেন, ‘আপনারা বই পড়েন ।' আমাকে বলতেন, ‘চৌধুরী সাহেব, আপনি বসে বই পড়েন, ইতিহাস পড়েন। তখন বুঝবেন আমাদের মত এমন ভয়াবহ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের অবস্থা

কী হয় এবং অন্যান্য দেশে কী অবস্থা হয়েছিল । এই অবস্থা সাময়িক এবং আমরা নিশ্চয়ই এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসব। তবে সব কিছু নির্ভর করবে আমাদের উপর। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অন্যান্য বিষয়গুলো আমরা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব তার উপর ।' তিনি সমস্ত বিষয়গুলো বুঝতেন, কিন্তু হতাশ হতেন না। সব সময় সাহসের কথা বলতেন ।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিতভাবে কথা বলতেন। বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসতেন অত্যন্ত বেশিরকম। এমনকি যখন ধারণা করা যায় তাঁদের মধ্যে একটা দূরত্ব দেখা দিয়েছে তখনও তিনি বঙ্গবন্ধুর কথা বলতেন গভীর শ্রদ্ধার সাথে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি নিখুঁত গভীর এক বিশ্বস্ততা ছিল তাজউদ্দীন সাহেবের। আমার ধারণা, বঙ্গবন্ধুও তাঁকে মনে মনে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন । তাজউদ্দীন সাহেব সাধারণত আমাকে তাঁর বাসায় যেতে বলতেন না। খুব বিশেষ কোন কাজ থাকলে যেতে বলতেন। এ ছাড়া আমি যদি যেতাম সেটা আমার ইচ্ছা। সেই সময় রবিবারে ছুটি থাকত। এক শনিবারে আমরা কাজ সেরে রাত ১০টার পর যখন সচিবালয় থেকে ফিরছি সেই মুহূর্তে তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, কাল আমরা কিছু অফিশিয়াল কাজ করব । আমি পিএ-কে বলে দিয়েছি ফাইলগুলো বেঁধে গাড়িতে দিতে।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'স্যার, পুরো সপ্তাহ ধরে রাত ৯টা-১০টা পর্যন্ত কাজ করছি । আগামীকাল ছুটির দিন, স্যার, আমার তো একটা সংসার আছে।'

তিনি বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, কালকের দিনটা একটু কষ্ট করতে হবে, কারণ কাল আমি কিছু জরুরী ফাইল ছাড়ব । আপনি তো জানেন ফাইলগুলো আমার টেবিলে আছে।'

পরদিন সকালে আমি তাঁর হেয়ার রোডের বাসায় গেলাম। আমি যাবার আগেই তিনি দোতলার বারান্দায় বসে ফাইল দেখা শুরু করেছেন। আমি তাঁর পাশে রাখা চেয়ারে বসলাম। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে একটি ফাইলে লিখছিলেন। প্রায় দুই পৃষ্ঠা মত লিখে সেটা একবার পড়ে সই করে 'লিলি, লিলি' (বেগম জোহরা তাজউদ্দীন) বলে ডাকতে লাগলেন। বেগম তাজউদ্দীন রুম থেকে বের হয়ে আসতেই তিনি বললেন, 'ওই প্রমোশন কেসটা আমি অনুমোদন দিয়ে দিলাম।' বেগম তাজউদ্দীন বললেন, 'তুমি বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী, তুমি তোমার মন্ত্রণালয়ের কাকে প্রমোশন দেবে না দেবে সেটা তোমার ব্যাপার,

এর মধ্যে আমার তো বলবার কিছু নেই।' তাজউদ্দীন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, "লিলি, তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু এই কেসটার সাথে তোমার একটা সম্পর্ক আছে, তাই তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।' আমি তাজউদ্দীন সাহেবের কথা শুনে ভাবছিলাম ব্যাপারটা কী । ঠিক ওই সময় মুখে প্রশান্তির হাসি নিয়ে তিনি আমার দিকে সেই ফাইলটা এগিয়ে দিলেন ।

আমি আগাগোড়া ফাইলটি পড়লাম। একজন কর কর্মকর্তার পদোন্নতির ফাইল। নিচ থেকে নোটিং হয়ে উপরে এসেছে এবং পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তবে লেখা হয়েছে, স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর বিতর্কিত ভূমিকার বিষয়টি বিবেচ্য । তাজউদ্দীন সাহেব রেফারেন্স দিয়ে দিয়ে লিখেছেন এবং যার সারমর্ম হচ্ছে : আমি তাঁর এসিআরগুলো দেখলাম। চাকুরি জীবনের রেকর্ড অনুযায়ী তাঁর পদোন্নতি পাওয়া উচিত। আর মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বিতর্কিত ভূমিকা ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কারো প্রতি সন্দেহবশত কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে বলে আমি মনে করি না। যদি তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ থাকে তবে তা আলাদাভাবে উত্থাপন করা যেতে পারে। যেহেতু নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ এখানে দেখানো হয়নি বা কোন প্রমাণও নেই, তাই আমি বিষয়টিকে বিবেচনার মধ্যে না এনে তাঁর এই পদোন্নতি অনুমোদন করলাম। পড়া শেষ করে বললাম, 'স্যার, এখনও বুঝিনি ব্যাপারটা যে কী, আর ভাবীকেই বা আপনি ওই কথা বললেন কেন!' এবার তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, '২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ শুরুর মুহূর্ত কয়েক আগে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই । কিন্তু লিলি যেতে পারেনি, ভাড়াটে সেজে কপালগুণে আর্মির হাত থেকে ছোট দুটো বাচ্চাসহ রক্ষা পায়। তারপর একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ঘুরতে ঘুরতে ধানমন্ডি ১৩ নম্বর রোডের লেকের পাশে পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে ওঠে পাঁচ বছরের মিমি আর এক বছরের সোহেলকে নিয়ে। সে সময় ভদ্রলোক বাসায় ছিলেন না। ফিরে এসে লিলির উপস্থিতি পছন্দ করলেন না । রাতে কারফিউয়ের মধ্যেই সেই ভদ্রলোক বললেন, আমার বাড়িটা তো একদম বড় রাস্তার পাশে, যদি আর্মি এখানে এসে পড়ে তবে সবার অসুবিধা হবে। তাই আপনি আমার সাথে আসুন, আমি আপনাকে দুটো বাড়ি পরে রেখে আসি। লিলি সেই রাতে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ভদ্রলোকের সাথে বের হল। বাসার গেটের বাইরে গিয়ে তিনি বললেন, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি একটা জরুরী জিনিস নাকি চাবি ফেলে এসেছি,

এক মিনিটে নিয়ে আসছি । ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন । অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে লিলি আবার ভেতরে ঢুকে দরজায় কড়া নাড়ল, বেল বাজাল, কিন্তু ভেতর থেকে কেউ আর দরজা খুলল না। তখন আর কোন উপায় না দেখে লিলি সমস্ত রাত রাস্তার ওপর বাড়ি তৈরির জন্য স্তূপ করে রাখা ইটের পাশে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে বড় রাস্তায় আর্মির আনাগোনা আর কারফিউয়ের মধ্যে বসে রইল ।

'এবার শুনুন, সেই ভদ্রলোকটিই এই লোক—আমি যাঁর পদোন্নতির কেস অনুমোদন করলাম। আমি মনে করি আমাদের জীবনের এই ঘটনার সাথে তাঁর চাকুরিজীবনকে এক করে দেখা উচিত নয়। কেউ হয়ত কোনভাবে জেনেছে আমার পরিবারের সাথে তাঁর এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল, তাই তাঁর ফাইলে এসেছে মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকার কথা । '

তাজউদ্দীন সাহেবের কথা শেষ হলে আমি থমকে গেলাম । বিস্মিত হয়ে শুধু বললাম, 'স্যার, ইউ আর আ গ্রেট ম্যান!' তারপর আমরা আবার অন্যান্য ফাইলগুলো দেখতে শুরু করলাম।

ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সাংঘাতিক নৈর্ব্যক্তিক একটা মনোভাব ছিল তাজউদ্দীন সাহেবের। তাঁর মনোভাবটা ছিল এমন যে, আমার হাতে যেন কারো কোন ক্ষতি না হয়। যে উপকার পাবার হয়ত যোগ্য নয় সে যদি উপকার পেয়ে যায় পাক, কিন্তু আমার হাতে যেন কারো অপকার না হয় ।

একদিন তিনি অফিসে এলেন। দেখলাম মেজাজ খুব খারাপ। যে দিন দেখতাম তাঁর মনমেজাজ ভাল নেই সে দিন তিনি নিজে না ডাকা পর্যন্ত আমরা সামনে যেতাম না । সে দিন কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই আমাকে ডেকে নিলেন। খুব গম্ভীর হয়ে আছেন। বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, আজ সকালের কাগজগুলো আপনি পড়েছেন ?'

আমি বললাম, 'স্যার, কিছু কিছু পড়েছি। আর আজ তো একটাই নিউজ আছে—লাল বাহিনী সম্পর্কে। মাথায় লাল পট্টি দিয়ে ওরা অফিসার ফজলুর রহমানকে ধরেছে।'

তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আপনার প্রতিক্রিয়া কী ?'

আমি বললাম, 'স্যার, আমার কথা তো খুব সহজ, সরকারি কর্মকর্তাদের মরাল

ভেঙে দিয়ে প্রশাসন চালাতে পারবেন না ।

তিনি বললেন, একদম ঠিক। এই কথাই আমি আপনার কাছ থেকে আশা করেছিলাম।'

তাজউদ্দীন সাহেব তখনই লাল টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে বঙ্গবন্ধুকে ফোন করে বললেন, 'মুজিব ভাই, কী হচ্ছে দেশে ? আপনার আশেপাশে যারা ঘুরছে তারা তো দেশটাকে শেষ করে ফেলার সব ব্যবস্থা করে ফেলছে। তারা আপনাকে ভুল চিত্র দিচ্ছে। দেশটা রসাতলে চলে যাচ্ছে । আপনাকে আমি এই বিষয়ে অনেকবার সাবধান করেছি, কিন্তু আপনি আমার কথা শুনলেন না। আমি এই মুহূর্তে আপনার কাছে আসছি, আমি আপনাকে সামনাসামনি কথাগুলো বলতে চাই এবং এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া করতে চাই।' ফোন রেখেই তিনি গাড়ি বের করতে বললেন।

বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব ড. ফরাসউদ্দীনের সাথে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল ছিল। তাজউদ্দীন সাহেব বের হয়ে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর ফরাসউদ্দীন আমাকে ফোন করে বললেন, 'সাইদ ভাই, আমার এখানে তো কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। আপনার বস তো সাংঘাতিক রেগে এসেছেন দেখলাম।' আমি তাঁকে লাল বাহিনীর ঘটনাটি বললাম। ফরাসউদ্দীন আমাকে বললেন, 'তাজউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুর রুমে ঢুকে দেখেন লাল বাহিনীর মান্নান এবং শেখ মণি বসা। তিনি সাথে সাথে বলেছেন, এরা যতক্ষণ এখানে রয়েছে ততক্ষণ আমি আপনার সাথে কোন কথা বলতে চাই না। ওদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তারপর তারা পাশের রুমে চলে গেলে দু'জন কথা বলেছেন। খুব সম্ভবত তাজউদ্দীন সাহেব সরকারি কর্মকর্তাদের ডিফেণ্ড করে কথা বলেন।' এই ঘটনার পরদিন দেখলাম লাল বাহিনীর কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে গেল । তাজউদ্দীন সাহেবের একটা ব্যাপার ছিল, তিনি বঙ্গবন্ধুর ভালর জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য যে কোন কিছু বলতে বা করতে প্রস্তুত ছিলেন । কিন্তু এমন কিছু লোকজন ছিল যারা সব সময় তাজউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর কাছে মিথ্যা কথা বলত। এসবের ফলেই হয়ত দু'নেতার মধ্যে ক্রমশ দ্বিমত দেখা দিল ।

একটা সময় এল যখন তাজউদ্দীন সাহেবকে দেখে খুব বিষণ্ন মনে হত । আমি মাঝে মাঝেই আমার সহকর্মী মাযহারকে (সহকারী একান্ত সচিব) বলতাম, 'স্যারকে এরকম বিষণ্ন মনে হয় কেন ? তিনি তো সব সময় হেসে হেসে কথা

বলতেন, আর আজকাল মনে হয় তাঁর হাসিটাও যেন বিষণ্ণতায় ভরা।' মনে হত খুব বেশি রকম চিন্তিত তিনি ।

তাজউদ্দীন সাহেবের একটি অভ্যাস ছিল, তাঁর দুটো হাতেরই বুড়ো আঙুল তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে ছুঁয়ে রাখতেন। যখন তিনি খুব চিন্তিত, অথবা কোন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন তখন এই দুই আঙুল খুব দ্রুত স্পর্শ করতেন, মনে হত আঙুল খুঁটছেন। এক দিন আমাকে তাঁর রুমে ডেকে নিতেই দেখলাম উদ্বিগ্ন চেহারায় বসে আছেন এবং দ্রুত আঙুল খুঁটছেন । আমি বুঝে ফেললাম তিনি বিশেষ কোন ব্যাপারে হয়ত চিন্তিত আছেন। এমন অবস্থায় আমি সাধারণত কোন কথা বলতাম না, তাই চুপ করে রইলাম। প্রায় মিনিট পাঁচেক পর আত্মগতভাবে তিনি বললেন, "চৌধুরী সাহেব, আর পারা গেল না, আর থাকা যাবে না। এই মানুষটির সাথে আর থাকা যাবে না। আওয়ামী লীগের বেশির ভাগ মানুষই অমানুষ হয়ে গেছে। এরা যে সমস্ত পলিসি নিচ্ছে, যে সমস্ত কাজ করছে, তাতে আর থাকা যায় না ।'

আমি একটু আপত্তি করার চেষ্টা করলাম ।

তিনি বললেন, 'আপনি ভেতরের খবর জানেন না। অসম্ভব, এদের সাথে থাকা অসম্ভব।'

এদিকে কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীদের এবং বিশ্বব্যাংকের মিটিং ছিল সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে । এ ছাড়াও তৎকালীন সভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপীয় কয়েকটি দেশ থেকে রাষ্ট্রীয় দাওয়াত ছিল তাঁকেসহ মোট চারজনের। আমি এই দাওয়াতটির কথা উল্লেখ করে বললাম, 'স্যার, আপনি বাকি তিনজন কাকে কাকে সিলেক্ট করবেন ?'

তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আমাকে একটা দিন সময় দিন । '

এক দিন পর আমি আমার টেবিলের উপর রাখা একটি নোট দেখলাম । তিনি লিখেছেন: অনুগ্রহ করে ওই সমস্ত দেশের সরকারকে জানিয়ে দিন, বাংলাদেশ থেকে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং তাঁর একান্ত সচিব আবু সাইদ চৌধুরী প্রতিনিধিত্ব করবেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন । আমি এই নোট পড়ে সঙ্গে সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর রুমে গেলাম। তাঁকে বললাম, 'স্যার, এটা আপনি কী করলেন ? আপনি তো শত্রু হওয়ার ব্যবস্থা করলেন । দল থেকে কাউকে নেবেন না, এতে আপনি শত্রু হয়ে যাবেন।' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন,

‘চৌধুরী সাহেব, এর কারণ আছে। আমি যদি দল থেকে দু'জনকে সাথে নেই তাহলে আরও শত্রুতা তৈরি করব।' আমি তবুও তাঁকে বললাম, ‘স্যার, তবুও আর একটা দিন ভেবে দেখেন।' পরদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'আমার সিদ্ধান্ত একই আছে।'

সেই পুরো ট্রিপটা আমরা দু'জনে পাশাপাশি আসনে ছিলাম । দেশ নিয়ে, দল নিয়ে তিনি দীর্ঘ সময় কথা বললেন । তিনি নিজেই এক একটা ইস্যু তুলতেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন। আমি কখনও পক্ষে বলতাম, আবার কখনও বিপক্ষে যুক্তি দিতাম । বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি কথা বলছেন । তিনি যেন নিজের কাছে নিজের মনের কথাগুলোকে আরো স্পষ্ট, আরো পরিষ্কার করে নিতে কথাগুলো বলছেন । ভারি আস্তে করে ‘চৌধুরী সাহেব' বলে এক একটা ইস্যু তুলতেন। তারপর তো আমরা এক এক করে বিভিন্ন দেশে গেলাম ।

প্রতিটি দেশেই আমাদের রাষ্ট্রদূতেরা বললেন, স্যার, আর টিকতে পারছি না। দেশের যা অবস্থা তাতে এখানে খবরের কাগজে সরকার সম্পর্কে কিছু না কিছু কথা থাকছে, বিভিন্নভাবে কথাবার্তা হচ্ছে এবং রাষ্ট্রদূত বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে এগুলো খণ্ডন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত কথাবার্তা শোনার পর তাজউদ্দীন সাহেবের মনমেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল । তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, এমনকি আমার সাথেও কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিলেন । এই সময়টাতে তিনি বার কয়েক বললেন, আর থাকা যায় না ।

এই সফরের এক পর্যায়ে আমরা যখন মস্কো গেলাম তখন সেখানে রাষ্ট্রদূত ছিলেন শামসুর রহমান খান (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী)। তাঁর বাড়িতে এক রাতে খেতে বসেছি—তাজউদ্দীন সাহেব, রাষ্ট্রদূত, তাঁর স্ত্রী এবং আমি—এমন সময় বাংলাদেশ থেকে ফোন এল। বঙ্গবন্ধু অর্থমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন। তাজউদ্দীন সাহেব ফোন ধরলেন, বললেন, 'মুজিব ভাই, আপনাকে আমি আমার যা বলার ছিল বলে দিয়েছি। আর আমি এই ব্যাপারে কোন কথা বলব না । সিদ্ধান্ত আপনার।' আমি ওই পাশের কথা তো শুনতে পাচ্ছি না। শুধু তাজউদ্দীন সাহেবেরটা শুনছি। তিনি আবার বললেন, ‘আমি আপনাকে এভাবে আমেরিকা যেতে নিষেধ করেছিলাম । আপনার জন্য রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে যাবার ব্যবস্থা হলে তখন আপনি রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে সেখানে যাবেন। আপনি জাতিসংঘে যাচ্ছেন, সেখান থেকে দেশে ফিরে আসুন। কিন্তু

আপনি যদি ওভাবে ওয়াশিংটন যেতে চান তবে যান, আমার আর করার কিছু নেই।' ভীষণ মন খারাপ করে তাজউদ্দিন সাহেব ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'একসাথে আর থাকা গেল না ।'

আমাদের সফরের শেষ পর্যায়ে ওয়াশিংটনে আমরা বিশ্বব্যাংকের সভার জন্য পৌঁছে দেখি, বঙ্গবন্ধু নিউইয়র্কে পৌঁছে গেছেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সাথে তাঁর জন্য ১৫ মিনিটের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাজউদ্দীন সাহেব এই জায়গাতেই দ্বিমত পোষণ করেছিলেন যে, কেন বঙ্গবন্ধু দাওয়াত ছাড়া এভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন। বঙ্গবন্ধুর মর্যাদায় কোন রকম আঁচড় পড়বে এটা তাজউদ্দীন সাহেবের পক্ষে মেনে নেয়াটা খুব কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি আগেও বলেছি, তিনি যা কিছু করতেন সবচাইতে আগে বঙ্গবন্ধুর মঙ্গল চিন্তা করতেন। তাজউদ্দীন সাহেব স্বভাবতই সত্যবাদী মানুষ ছিলেন এবং তাঁর খুব ঘনিষ্ঠজনদের কাছে তিনি সমস্ত কিছু খোলাখুলি বলতেন । অর্থাৎ দেশের মঙ্গলের জন্য যা বলা দরকার, তিনি সে কথাই বলতেন। পাশাপাশি তাঁর সাংঘাতিক গুণ ছিল, যখন দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতেন তখন তিনি বঙ্গবন্ধুর সম্মান, মর্যাদাকে তুলে ধরেছেন সবচাইতে আগে ।

বঙ্গবন্ধুর ওয়াশিংটন সফরের সময় তাঁর সাথে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা দেখা করবেন, এই জন্য তাজউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুর আলোচনার মূল বিষয়গুলো আলাদা করে তৈরি করলেন। বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে অন্যান্য কর্মকাণ্ডে তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং সহযোগিতা প্রদান করেন।

আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুকে রিসিভ করতে যাই। বঙ্গবন্ধুর সাথে ফোর্ডের মিটিং ফলপ্রসূ হয়নি। তাজউদ্দীন সাহেব খুব মর্মাহত ছিলেন, কারণ তিনি এমনভাবে দেখা করতে দিতে চাননি ।

এরপর তিনি দেশে ফিরে এসে বিমানবন্দরে একটু শক্ত বক্তৃতা দিলেন । বললেন, উটপাখির মত ঝড়ে বালিতে মাথা গুঁজে থাকলে চলবে না । এই ৩৭ দিনের বিদেশ সফর থেকে ফিরে আসার দিন কয়েক পর একদিন সকালে তাজউদ্দীন সাহেব অফিসে এসে বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, আপনাকে সাক্ষি রেখে একটা কথা বলব।' আমি সাথে সাথে বললাম, 'স্যার, আমাকে সাক্ষি রেখে কী লাভ হবে আপনার ? আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা, কাল আপনি ছেড়ে দিলে আমি অন্য জায়গায় চলে যাব। তাই আমাকে সাক্ষি রেখে আপনার

কী লাভ ? আপনি বরং আপনার বিশ্বস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কাউকে সাক্ষি রেখে কথা বলেন।' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, "না, আপনি শুনবেন ।'

এই কথা বলেই তিনি বঙ্গবন্ধুকে লাল ফোনে টেলিফোন করলেন। বললেন, 'আপনার সাথে আমার কতকগুলো খুবই জরুরী বিষয়ে আলোচনা করা দরকার বলে আমি মনে করি। আপনার ওখানে আপনি লোকজন দিয়ে এত পরিবৃত থাকেন যে সেখানে বসে আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ হবে না বা সে রকম পরিবেশও নেই। সুতরাং আপনার সাথে কথা বলার জন্য আমি লাল টেলিফোনটাই বেছে নিলাম। আপনি একদলীয় শাসনব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে আমি অনেকবারই বলেছি আমার দ্বিমতের কথা, আর আজ আমার চূড়ান্ত মতামত দিচ্ছি। আমি আপনার এই একদলীয় শাসনের সাথে একমত নই। আপনি আমাকে বলুন, কেন আপনাকে এই পথে যেতে হবে ?' এটুকু বলে তাজউদ্দীন সাহেব থামলেন, তখন নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধু কিছু বললেন। এরপর তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'এক নম্বর কথা, আমি আপনার যুক্তিতে কনভিন্সড্ না। দুই নম্বর কথা—এটা প্রশ্ন না, এটা আমার স্টেটমেন্ট—বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার হাতে এতই ক্ষমতা দেয়া আছে যে সেই ক্ষমতাবলে দেশে একদলীয় ব্যবস্থা বা আর কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না । আপনার হাতেই তো সমস্ত ক্ষমতা আছে, কাজেই একদলীয় ব্যবস্থার পক্ষে আপনি যা বলছেন আমার কাছে এর কোন যৌক্তিকতা নেই। তৃতীয় কথা, আমি আর আপনি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগের ২৪-২৫টা বছর একসাথে বাংলাদেশের এমন কোন মাঠ-ময়দান নেই যেখানে যাইনি। আমরা বক্তৃতায় সব সময় বলেছি একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী দেশের কথা, যার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র । যে গণতন্ত্রের গুণগান করেছি আমরা সব সময়, আজকে আপনি একটি কলমের খোঁচায় সেই গণতন্ত্রকে শেষ করে দিয়ে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। আপনার এই সিদ্ধান্তে আমি অত্যন্ত জোরের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি।'

এরপর আরো দু-চারটি এমনই কথাবার্তা হল। সবশেষে তিনি যে কথাটি বললেন সেটি ছিল প্রফেটিক কথা। তিনি ইংরেজিতে বললেন, "বাই টেকিং দিস স্টেপ ইউ আর ক্লোজিং অল দা ডোরস্ টু রিমুভ ইউ পিসফুলি ফ্রম ইওর পজিশান । এই কথাটি আমি আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। মানুষের কিন্তু গত্যন্তর থাকবে না। ভবিষ্যতে আপনাকে কেউ ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইলে সেই সরাবার জন্য গণতান্ত্রিক কোন পথ আপনি খোলা রাখছেন

না। তখন একটাই পথ খোলা থাকবে আপনাকে সরাবার—আর সেটা হচ্ছে বন্দুক।'

মনে হল বঙ্গবন্ধু ফোনের ওই প্রান্তে রেগে গেছেন, তাঁর চিৎকারের শব্দ টেলিফোনের বাইরেও ভেসে আসছিল। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'কিন্তু মুজিব ভাই, সবচাইতে দুভার্গ্যজনক ঘটনা কী ঘটবে জানেন, আপনাকে এত নিষেধের পরেও আপনার সাথে ওই বন্দুকের গুলিতে আমরাও মারা যাব। আপনি তো শুধু মারা যাবেন না। দেশটারও ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে।'

এর কিছুদিন পরে তাজউদ্দীন সাহেবকে আমি বলেই ফেললাম, "স্যার, এই অবস্থায় আপনি তো বলছেন আর আপনি থাকতে পারছেন না বা থাকতে চাইছেন না, তবে আপনি কেন বঙ্গবন্ধুকে বলছেন না যে আপনি থাকবেন না?' তিনি বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, এই ব্যাপারে এইভাবে মুজিব ভাইকে বলায় আমার একটা অসুবিধা আছে, আপনারা সেটা জানেন না।' আমি বললাম, 'স্যার, কী অসুবিধা আমাকে বলেন।' তিনি বললেন, "স্বাধীনতার আগের দীর্ঘ সময়ে হয়ত আমি তাঁর পাশে গেছি, নয়ত তিনি আমার পাশে এসেছেন। শুধুমাত্র যখন কারাগারে বন্দি থাকতাম তখন আমরা দু'জন বিচ্ছিন্ন থাকতাম। এই যে একটা গভীর সম্পর্ক এ থেকে তাঁর প্রতি আমার একটা বিশ্বস্ততা গড়ে উঠেছে। এখন তিনি যদি আমাকে চলে যেতে বলেন আমি বেরিয়ে যাব, কিন্তু তাঁকে আমি সরাসরি বলব এই বিষয়টি আমার যেন কেমন মনে হয়, যদিও আমি মনেপ্রাণে চাচ্ছি আমি থাকব না।'

এর পরের কয়েকটা দিন দেখতেই পাচ্ছিলাম খুব অনিশ্চিত একটা অবস্থা । অক্টোবরের ২৬ তারিখ সকালবেলা তাজউদ্দীন সাহেব যখন সচিবালয়ে এলেন দেখলাম তিনি খুব উৎফুল্ল মেজাজে আছেন। পরে বুঝেছিলাম তিনি জানতেন কী ঘটতে যাচ্ছে ।

যাই হোক, আমাকে ডেকে বললেন, 'আজ আমি কারো সাথে দেখা করব না। যে সমস্ত প্রোগ্রাম আছে সেগুলো বাতিল করে সবাইকে জানিয়ে দিন । আমি নূরুল ইসলামের (ডেপুটি চেয়ারম্যান, পরিকল্পনা কমিশন) রুমে যাচ্ছি। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে ফোন আসবে, তখন আমাকে একটু খবর দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।'

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি মন্ত্রিপরিষদ সচিব তওফিক ইমাম এবং যুগ্মসচিব

হাবিবুল হক এসেছেন । দু'জনেরই চেহারা খুব মলিন, হাতে দুটো খাম । তওফিক ইমাম সাহেব বললেন, 'তাজউদ্দীন সাহেব কোথায় ?'

আমি বললাম, "তিনি নিচে নূরুল ইসলাম সাহেবের রুমে আছেন। খুব জরুরী বিষয় নাকি ?

তিনি বললেন, "ভীষণ জরুরী।'

আমি আবার বললাম, "কী এত জরুরী ?'

তিনি বললেন, "কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন। আপনি আমাদের মুখ থেকে নাই বা শুনলেন।'

তাঁরা দু'জনে নূরুল ইসলাম সাহেবের রুমে চলে গেলেন । ১০ মিনিটের মধ্যে তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর অফিসরুমে চলে এলেন। আমাকে ডেকে বললেন সচিব কফিলউদ্দিন মাহমুদ সাহেবকে ডাকতে। কফিলউদ্দিন মাহমুদ সাহেব এলে তাঁর দিকে তিনি একটি চিঠি এগিয়ে দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছে অর্থমন্ত্রীর জন্য ছোট একটি চিঠি। লেখাটা ছিল অনেকটা এমন : শুভেচ্ছা নেবেন। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আপনার মন্ত্রী পদে থাকা ঠিক হবে না। তাই আপনাকে ইস্তফা দেবার জন্য বলা হচ্ছে—বা এই রকম কিছু—আর এইসাথে পদত্যাগপত্র পাঠানো হল স্বাক্ষরের জন্য। ইতি—শেখ মুজিবুর রহমান ।

কফিল উদ্দিন মাহমুদ সাহেব পড়লেন এবং পড়া শেষ করে চিঠিটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে একদম কেঁদে ফেললেন। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগল । তিনি দু-তিনবার শুধু বললেন, 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া আল্লাহ্।' এরপর তাজউদ্দীন সাহেব টাইপ করে পাঠানো পদত্যাগপত্রে সই করে দিলেন। পদত্যাগপত্রটা হাতে নিয়ে সচিব এবং যুগ্মসচিব বললেন, "স্যার, কিছু মনে করবেন না, আমাদেরকে এরকম একটি অপ্রিয় কাজ করতে হল।' বঙ্গবন্ধু সাংবাদিক সম্মেলন করবেন। সমস্ত মন্ত্রীরা বসা এবং প্রেস বসা । গুরুত্বপূর্ণ অফিশিয়ালদেরও তিনি ডেকেছেন । পদত্যাগপত্র নিয়ে এই দু'জন চলে গেলেন ।

তারপর তাজউদ্দীন সাহেব জানালেন, তিনি খবর পেয়েছেন আর্মি এবং পুলিশকে সতর্ক করে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাজউদ্দীনের গতিবিধির

ওপর কড়া দৃষ্টি রাখুন। এমনকি আর্মিরা সচিবালয়ের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আমি এখন একবার মন্ত্রণালয়ে সবার সাথে দেখা করে বাসায় ফিরে যাব।' মাযহারকে বললেন, "আরহাম সিদ্দিকীকে (তাঁর বন্ধু) ফোন করে বলুন তাঁর গাড়িটা পাঠাতে। আমি আর সরকারি গাড়ি ব্যবহার করব না।'

সচিবালয় ছেড়ে চলে যাবার মুহূর্তে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্যার, আপনি এখন কী করবেন ? আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী ?' তিনি পরিষ্কার জবাব দিলেন, 'আমার প্রিন্সিপ্ল্ কখনও বদল হয় না। আর যেখানে আমার বিন্দুমাত্র কোন পদক্ষেপে, কোন কথাতে মুজিব ভাইয়ের ক্ষতি হতে পারে তেমন কোন অ্যাকশান আমি নেব না ।'

সেই সময় সংবাদ সংস্থা বিএসএস-এর চীফ ছিলেন জাওয়াদুল করিম সাহেব। তিনি আমার আত্মীয় হন। তিনি আমাকে পরে বলেছিলেন, 'সাইদ, একটা ব্যাপার দেখলাম তাজউদ্দীন সাহেবের পদত্যাগের দিন, বঙ্গবন্ধু একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন, সেখানে দেখলাম তিনি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত।' তাঁর চেহারায় একটা দুঃখের ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু একমাত্র খন্দকার মোশতাককে দেখলাম যার মুখে একটা ক্রূর হাসি । এমন একটা ভাব যে, হয়ে গেছে ব্যাপার, যা চেয়েছিলাম আমি করে ফেলেছি। এই জিনিসটা খুব লক্ষণীয় ছিল । খন্দকার মোশতাকের চেহারাটা এমন যে, সম্ভব হলে আনন্দে তিনি সবার সাথে কোলাকুলি করেন। মুখে ক্রূর একটা হাসি নিয়ে তিনি খুশি হয়ে ছুটোছুটি করছিলেন। আমাদেরকে প্রায় জড়িয়ে ধরছিলেন।' জাওয়াদুল করিম আমাকে বলেছিলেন, 'তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে বঙ্গবন্ধুর যে দ্বন্দ্ব, এটা তৈরি করেছে খন্দকার মোশতাক । এই লোকটা কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে ধ্বংস করবে।'

'৭৫-এর ১৫ অগাস্ট সকালে আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে ফোন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'চৌধুরী সাহেব, আমার জন্য সবচাইতে দুঃখের ব্যাপার কি জানেন, মুজিব ভাই হয়ত মনে করে গেলেন আমিই এই ঘটনা ঘটিয়েছি। তিনি জেনেও গেলেন না তাঁর কত ঘনিষ্ঠ লোক এই কাজটি করল।'

আমি তো জানি তাজউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুকে কী পরিমাণে ভালবাসতেন । মনে হল কেমন যেন একটা বিষণ্ণতা কাজ করছে তাঁর মধ্যে ।

এরপর অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমি আমার অফিসে কাজ করছি (আমি তখন উপসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিশ্বব্যাংক ডেস্ক), এমন সময় দাড়িওয়ালা একজন ভদ্রলোক হাতে একটা ফাইলসহ এসে বললেন তিনি বঙ্গভবন থেকে এসেছেন। বঙ্গভবন শুনে আমি একটু সতর্ক হলাম । ভদ্রলোক বললেন, তিনি গোয়েন্দা সংস্থার ইন্সপেক্টর, আমার কাছে এসেছেন তাজউদ্দীন সাহেব সম্পর্কে কিছু তথ্যের জন্য ।

আমি বললাম, 'তাজউদ্দীন সাহেব সম্পর্কে আপনি কী জানতে চান ?' তিনি বললেন, 'আপনি তাজউদ্দীন সাহেবের একান্ত সচিব ছিলেন, আপনি নিশ্চয়ই জানবেন তিনি কোন দুর্নীতি করেছেন কিনা বা অন্যায় কোন নির্দেশ দিয়েছেন কিনা।' লোকটি বঙ্গভবনের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে বললেন, 'তারা আজকে আমাকে বলে দিয়েছে আমি যদি তাজউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে কোন কিছু না নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাকে একদম গুলি করে দেবে। আমি রোজই খোঁজ করছি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু পাই কিনা, কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না ।' লোকটি কেঁদে ফেলবেন এমন তাঁর অবস্থা ।

আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি আল্লাহ্‌ভক্ত একজন মানুষ, আমিও আল্লাহকে ভয় পাই। সুতরাং একজন আল্লাহ্‌ভক্ত লোক আর একজনের সাথে কথা বলছেন। শুনে রাখুন, তাজউদ্দীন সাহেব কোন দুর্নীতি করেননি। তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। আর তিনি যদি দুর্নীতি করতেনও আমি আপনাকে বলতাম না।' .

লোকটি বললেন, 'স্যার, আমি তো বুঝতে পারছি, কিন্তু ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। এরপর তিনি একটা ফাইল বের করলেন। একটি চিঠি দেখিয়ে বললেন, 'স্যার, দেখুন তো এই চিঠিটি আপনার কিনা?' আমি দেখলাম তৎকালীন ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যানকে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের একান্ত সচিব হিসেবে লেখা আমার চিঠি। সেই চিঠিতে আমি পৌরসভার আইনের একটি ধারা উল্লেখ করে লিখেছিলাম যে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ৭৫১ সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি-র বাড়িতে তাজউদ্দীন আহমদ বসবাস করেননি এবং কোন ভাড়াও ছিল না, যা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত । তাই এই বাড়ির ট্যাক্স কিছু কম হবে। এমন একটা চিঠির নিচে আমার সই আছে । সেই চিঠিটা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন দেখে আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'এর মধ্যে আপনি দুর্নীতির কী গন্ধ পেলেন ?'

লোকটি বললেন, 'না, না, স্যার, আমি তা বলছি না, এটা আপনার লেখা কিনা, এই সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কী ?' আমি বললাম, ‘আমার বক্তব্য তো পরিষ্কার করে এই চিঠিতে লেখাই আছে। আর তো নতুন কোন বক্তব্য নেই। আমি এক সময় পৌরসভার প্রশাসক ছিলাম, তাই আমার সমস্ত আইন

জানা ছিল। আমি সেই আইনের ধারা উল্লেখ করে চিঠি দিয়েছিলাম । তাজউদ্দীন সাহেব এই বিষয়ে আমাকে কিছু বলেননি। আমিই তাঁকে বলেছিলাম, আইন যখন আছে, আর আপনি যখন এতদিন সেই বাড়িতে ছিলেন না, তখন বেশি ট্যাক্স কেন দেবেন ? এরপর বই পড়ে আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে সেই ধারা শোনালাম । তখন তিনি বললেন, প্রমাণ তো দিতে হবে। আমি সেইজন্যই লিখলাম ঐতিহাসিক কারণে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ১৯৭১।' আমি এই চিঠির একটি কপি করে রাখলাম। লোকটি চলে গেলেন ।

আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে অসম্ভব বেশি রকমের মিস্ করি । আমি মনে করি তিনি জীবিত থাকলে নিঃসন্দেহে এই বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এ কারণেই খন্দকার মোশতাক তাঁকে হত্যা করিয়েছিল।

আমি তাজউদ্দীন সাহেবের বঙ্গবন্ধুর সাথে কথোপকথনের সেই প্রফেটিক উচ্চারণের কথা স্মরণ করেছি ১৫ অগাস্ট তারিখে এবং আবার জেল হত্যাকাণ্ডের পর ।

[৫.১০.১৯৯৬/৭.১০.১৯৯৬]

আবু সাইদ চৌধুরী : সরকারি কর্মকর্তা, তাজউদ্দীন আহমদ-এর একান্ত সচিব ১৯৭২-৭৪।

এ. কে. খন্দকার

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার আগে আমার কোন রকম পরিচয় ছিল না। এমনকি আমি তাঁকে দেখিওনি। তবে খবরের কাগজে তাঁর নাম দেখেছি, বক্তব্য পড়েছি । তিনি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ যে প্রক্রিয়ায় শাসনকাজ চালিয়েছে তাতে তাজউদ্দীন সাহেবের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল, এটা জানতাম ।

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় আমি কলকাতা যাবার পর। সেখানে তিনি আমাকে যেভাবে গ্রহণ করলেন তাতে কোন আতিশয্য ছিল না। প্রথমেই তাঁর যে জিনিসটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটি হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে থাকতেন এবং সাধারণভাবে চলাফেরা করতেন। তিনি যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে আছেন, এই ধারণাটুকু বাইরের অন্য কারো পক্ষে করা কষ্টকর হত । কারণ তাঁর কথাবার্তায় কোন সময়ই এমন ভাব প্রকাশ পেত না। তাঁর সাথে আমার যেটুকু আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তাতে প্রথম থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম যে, তাজউদ্দীন সাহেবের একটা অত্যন্ত আন্তরিক চেষ্টা এবং প্রত্যয় ছিল বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে ।

একটা রাজনৈতিক দলকে সেই বিশেষ সময়ে ঠিক রাখতে গেলে একজন মানুষের পক্ষে অতি বিচক্ষণতার সাথে, অতি সুস্থ এবং ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত কিছুকে মানিয়ে নিয়ে, বিভিন্ন মতের যে বিরোধ সেগুলোকে সমন্বয় করে একসাথে মিলিয়ে, বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে বসে সমস্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে স্বাধীনতা যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ কঠিন কাজ ছিল । তাই তাজউদ্দীন সাহেব যেভাবে পরিস্থিতিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেটাকে একটা অসাধারণ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আমি দেখেছি তাঁর দল আওয়ামী লীগের ভেতরেই মতানৈক্য ছিল, ঠিক কতখানি ছিল সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মতানৈক্য যে ছিল এটা সত্যি। আওয়ামী লীগের বাইরেও যে অন্যান্য দলগুলো ছিল তাদের ভেতরেও যে মতানৈক্য ছিল না এমন বলা যায় না ।

আমি যা বলতে চাইছি তা হল তাজউদ্দীন সাহেব একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে

একটা বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থান করে দলের ভেতরে বেশ কিছু মতানৈক্য এবং দলের বাইরেও বেশ কিছু মতানৈক্য এবং একটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তা আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল ।

অনেক বিষয় ছিল, যেখানে আমার মনে হয়েছে যে তিনি কেন একটি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না, দিলে তো এই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যেত । কিন্তু আমি পরে ভেবে দেখেছি যে ঠিক সেই সময়ে, ঠিক সেইরকম একটা সিদ্ধান্ত দিলে হয়ত এর যে ফলাফল হত তা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে যেত অথবা স্বাধীনতার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করত ।

যেমন তিনি একদিন কথায় কথায় বলছিলেন যে, সবাই চিৎকার করছে ভারত কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এটা তো এত সহজ জিনিস না, এটা তো অনেক গভীরতর ব্যাপার । অর্থাৎ প্রথমদিকে যখন সবকিছু অনিশ্চিত, একটিমাত্র দেশের স্বীকৃতি নিয়ে হয়ত আরো অনেক গভীরতর, কঠিনতর সমস্যার সৃষ্টি হত এবং হয়ত বা স্বাধীনতা যুদ্ধের সমস্ত দিকটি বদলে যেতে পারত। এবং আসলেই সেই সময়টা কিন্তু সত্যিকারভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সময় ছিল না । সেই জন্যই বলছি, তিনি যেভাবে চিন্তা করতেন তা ছিল অতুলনীয়। তাঁর চিন্তা করার একটা শক্তি ছিল, যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন সেটা তাঁদের অস্বীকার করার উপায় নেই ।

জাতির একটি কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর উপর বিরাট একটি দায়িত্ব ছিল। সেই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তিনি যে একজন সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করতেন এটা আমার কাছে সত্যিই খুব অসাধারণ কাজ বলে মনে হয়েছিল । যেমন, আমি তাঁকে কোনদিন তাঁর বাসায় যেতে দেখিনি। এমনকি, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ঈদেও বাসায় যাননি। তাঁর দিনগুলো কী রকম কেটেছে বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি খুব ভোরে উঠতেন—ভোরে উঠেই কোন সময় দেখতাম তিনি অফিসের কাজ করছেন, কিছু লিখছেন । তাঁর হাতের লেখাটা অত্যন্ত সুন্দর ছিল, আর ভাষা ছিল অত্যন্ত চমৎকার। তারপর কোন সময় বাংলাদেশের মানুষ, কোন সময় ভারতের মানুষ, কোন সময় সাংবাদিকরা এসে তাঁর সাথে আলাপ করছেন। কিন্তু তার মধ্যেও তিনি যেগুলো জরুরী কাজ সেগুলো সমানে করে যাচ্ছেন এবং তিনি গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতেন । তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন ।

এক-আধ সময় মাঝে মাঝে যখন তিনি একা আছেন, আমাকে ডেকে পাঠাতেন। বলতেন, ‘কেমন মনে হচ্ছে আপনার ? কেমন আমরা এগুতে পারছি ?' তো আমার যা ধারণা তা আমি বলতাম। কোন সময় বলতাম 'হ্যাঁ', কোন সময় বলতাম ‘না’। কোন বিষয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মত দিয়ে দিতেন না। একটা বিষয়ের সবদিক বিচার করে তবে সিদ্ধান্ত দিতেন। তাঁর একটা গুণ ছিল যে, কোন বিষয় যুক্তিসঙ্গতভাবে বুঝিয়ে বললে তিনি তা গ্রহণ করতেন। আর যখন তিনি গ্রহণ করতেন না তখন ‘না' বলে দিতেন। আবার যখন কিছু করা হবে তখন তিনি সকলের মতামত নিতেন। তাঁর সীমাবদ্ধতা বোধ হয় একটা ছিল: তিনি হঠাৎ কখনও সারক্যাস্টিক মন্তব্য করে ফেলতেন।

যেমন, একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি, একবার বাংলাদেশের কোন একটি অঞ্চল থেকে দলীয় কিছু লোকজন এসে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা করলেন। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের কথা বলে নানা রকম কিছু দাবি করছিলেন এবং বলছিলেন, সহায়-সম্পত্তি পরিবার-পরিজন সব তাঁরা দেশে ফেলে এসেছেন। তাজউদ্দীন সাহেব বলে ফেললেন, ‘সব কিছু ফেলে এসেছেন সত্যি, কিন্তু স্বভাবটা তো ফেলে আসেননি, সাথে করে নিয়ে এসেছেন।' অবশ্য আমার মনে হয়, যে ধরনের প্রচণ্ড চাপের মধ্যে তিনি থাকতেন এবং আমাদের কিছু মানুষের চরিত্র যে ধরনের তাতে তিনি কেন আমিও চটে যেতাম ।

পুরো যুদ্ধের সময়টা আমি তাজউদ্দীন সাহেবের পাশাপাশি একটি ঘরে ছিলাম, মাঝে মাঝে তিনি যখন বিশ্রামের সময় পেতেন বা অবসর থাকতেন তখন বিভিন্ন বিষয়ে সামান্য মতবিনিময় হত । তখন আমার যেটি মনে হয়েছে যে, শুধু বিদেশী শক্তির হাত থেকে মুক্তি পেলাম এটাই বোধ হয় তাঁর সম্পূর্ণ ধারণা ছিল না । সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, শান্তি, বা দারিদ্র্যে নিমজ্জমান অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে উন্নতি করা, এই রকম একটা চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে ছিল; তবে ঠিক পরিকল্পনা বলতে যা বোঝায় সেই পরিকল্পনা নিয়ে আমার সাথে কোন কথা হয়নি ।

একটি কথা আমার মনে আছে যে, ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর আমি যখন ঢাকা থেকে ফিরে যাই তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি দেখলেন, কী অবস্থা এইসব। মানুষের বোধ হয় একটু আবেগবোধ সৃষ্টি হয়। আমি বললাম যে, আমার মনে হয় না কেউ বড়লোক

হবে, বড় চাকরি করবে এই রকম প্রত্যাশা নিয়ে আছে। খাওয়াপরার জন্য ন্যূনতম যা দরকার সেজন্য আমরা যারা উঁচু পদে আছি তাদেরকে পাঁচশত টাকা করে যদি বেতন দেয়া হয়, তবে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দূর করে একটা সমতামূলক সমাজব্যবস্থার দিকে এগুতে পারব। সাম্যবাদ বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই অর্থে আমি কথাটি বলি নাই; একটা সমাজে বিচার থাকবে এমন একটা সহনীয় অবস্থার কথা আমার ভাবনায় ছিল ।

আর একটি বিষয়—মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই ফ্রন্ট থেকে এসে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা করতেন। তাঁর শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি এদের সবার সাথে দেখা করতেন, তাঁদের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে এবং ধৈর্যের সঙ্গে শুনতেন। আমি দেখেছি, দেশকে স্বাধীন করতে হলে সেই স্বাধীনতায় কিছুটা হলেও অবদান রাখছেন এমন মানুষদের সাথে তাজউদ্দীন সাহেব যখন কথা বলতেন তখন তাঁর আচরণের মধ্যে একটা অনুভব থাকত, যেখানে একটা শ্রদ্ধা, একটা অনুমোদন, একটা প্রশংসা প্রকাশ পেত। একটি মানুষ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এসে তার কথাটি যদি বলতে পারে যে, আমি এই কাজটা করেছি, তাতেই সে একটা আত্মতৃপ্তি পায় । এবং সেইসাথে যেটা প্রয়োজন একটা মানুষকে উৎসাহ দেবার জন্য, অনুপ্রেরণা দেয়া, সেটা তিনি দিয়েছেন। আমি সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছি এবং আমার একটা মতও ছিল যে, যতটুকু কাজই একজন মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে করে থাকুন, সেটা শোনাও কিন্তু তাঁকে উৎসাহ দেয়া ।

মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করা হত ইয়ুথ ক্যাম্পের মাধ্যমে। সত্যি কথা বলতে কি, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল থেকে তাদের নেয়া হত। এটা আমার ভাল লাগেনি । আমার মনে হয়েছিল যে, এটা তো কোন দলের যুদ্ধ নয়, এটা জাতীয় যুদ্ধ। আমি যে মতেই বিশ্বাস করি না কেন, আমার যুদ্ধ করবার অধিকার আছে এবং যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার যে প্রস্তুতি দরকার সে প্রস্তুতি পাবার অধিকারও আমার আছে। এটা কিন্তু আমি প্রথম থেকেই বিশ্বাস করতাম। একদিন আমি জেনারেল ওসমানীর সাথে বলছিলাম যে, ‘স্যার, এইসব ঠিক নয়। এই দেশকে মুক্ত করার জন্য দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক বিভিন্ন পেশার লোক এসেছে, তাদের প্রত্যেকের অধিকার আছে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে—যে যতটুকু করতে পারে তাকে সে সুযোগ না দেয়া খুব অন্যায়।'

সময়টা আমার ঠিক মনে নেই, তখন এই বিষয়ে একটি মিটিংও হয়েছিল, যেখানে ডি. পি. ধর এবং ভারতের একজন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একটি সর্বদলীয় কমিটি করার কথা বলা হয়েছিল । তারপর একটি সময়ে বিভিন্ন দল থেকেও যুবক নেয়া শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দেয়ার জন্য। সেই পরিস্থিতিতে তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আলোচনায় আমি বলেছিলাম, 'স্যার, যে মানুষটি বা যে যুবকটি এ দেশের জন্য যুদ্ধ করতে চায় তাকে সাহায্য করা উচিত, যাতে সে যুদ্ধ করতে পারে। এটা তো ব্যক্তিগত যুদ্ধ নয়, দলীয় যুদ্ধও নয়। এটা জাতীয় যুদ্ধ।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ মত দিয়েছিলেন যে অন্যান্য দল থেকেও ট্রেনিং দেয়ার জন্য ছাত্র-যুবক নেয়া হবে । এটা তিনি অনুমোদন করলেন। এটা অনুমোদন করতে গিয়ে তিনি বেশ প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েছিলেন। অনেকেই বোধ হয় আপত্তি তুলেছিলেন, তবে তিনি যে মতটি দিয়েছিলেন সে মতটি পরিবর্তন করেননি। আমার উপর ট্রেনিংয়ের ভারটা ছিল, তাই আমি নিজে জানি তিনি বিভিন্ন মতের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ।

তখন তো ভারতের সাথে একটা সমঝোতায় আসা হয়েছে, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের যদি ট্রেনিং না দেয়া হয় তাহলে যুদ্ধ করবে কীভাবে। প্রথমে অত্যন্ত অল্প সংখ্যায় ট্রেনিং দেয়া হত এবং প্রথমদিকে ভারত যে অস্ত্র দিত তা অপর্যাপ্ত ছিল। কারণ হিসেবে বলা যায়, ভারত তখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কী করবে, ঠিক তার নীতিটা কী হবে—কোন নীতিতে ভারত যাবে, না এইভাবেই সাহায্য করবে, না একটা সমঝোতার চেষ্টা করবে। ভারতের মধ্যেও আমি দেখেছিলাম, বিভিন্ন মতানৈক্য ছিল । অনেকের ধারণা ছিল যে, এটা পাকিস্তানের ব্যাপার, এটা বাংলাদেশ হলেই বা আমাদের কী, এটাও আর একটা পাকিস্তান যে না হবে তার নিশ্চয়তা কী ? এই ধরনের নানা মত ছিল।

সেই সময় অস্ত্রশস্ত্র এত কম ছিল যে, যেমন একজনকে আমি একটা গ্রেনেড দিয়ে ভেতরে পাঠালাম, সেই গ্রেনেড ফাটাবার পর সে কী করবে ? কোন সময় দশজন গেলে তাদের সাথে হয়ত একটা পিস্তল দেয়া হত । কী হবে একটা পিস্তল দিয়ে দশজনের ? যাই হোক, অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, শিবিরগুলো থেকে বেশি করে ট্রেনিংয়ে পাঠানো হবে ।

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, এটা ঠিক, ভারত আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু যেভাবে বলা হয় যে ভারত স্বাধীন করে দিল, সেই

কথাটা আমি সেভাবে স্বীকার করি না। কারণ, এই দেশে ৯৩ হাজার সৈন্য যেভাবে সম্পূর্ণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গোটা সীমান্তে বাংকার তৈরি করে অবস্থান করে ছিল, তাদেরকে এই নয়-দশদিনের যুদ্ধে পরাজিত করা এত সহজ ছিল না ।

এটা সম্ভব হয়েছিল একটিমাত্র কারণে, সেই সময়ে, অর্থাৎ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পর থেকে যখন রীতিমত যুদ্ধ শুরু হল তখন মুক্তিযোদ্ধারা সমস্ত বাংলাদেশকে এমন একটা পর্যায়ে এনে ফেলেছিল যে, পাকিস্তানিদের পক্ষে দিনের বেলা চলাফেরা করা অসম্ভব ছিল, রাতের বেলা তো অনেক দূরের কথা। যেটাকে বলে ইনটেলিজেন্স ব্লাইন্ডনেস, অর্থাৎ তাদের কিছুই জানা ছিল না, কোথায় গেলে নিরাপদভাবে যাওয়া যাবে, কোথায় কী আছে, কোথায় কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে। যেখানে হয়ত পাঁচজন গেলে চলত সেখানে তারা হয়ত ত্রিশজন চলে যেত। কারণ সেই ভয়টা তাদের ছিল যে, যে কোনদিক থেকে মুক্তিবাহিনী তাদেরকে গুলি করবে।

সুতরাং ডিসেম্বরের পরে যে যুদ্ধটি আরম্ভ হল তখন একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মত ছিল যে, যশোর ক্যান্টনমেন্ট ও কুমিল্লাতে ঠিক যুদ্ধ হয়নি। এতবড় ক্যান্টনমেন্ট ছিল, কিন্তু তারপরও তারা পালিয়ে বেঁচেছিল। তাদের যুদ্ধ করার মনোবল মুক্তিবাহিনী সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছিল। কাজেই বলা সম্পূর্ণ অন্যায় যে, ভারত বাংলাদেশকে মুক্ত করে দিয়েছে। ভারত নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করেছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা দেশটাকে পাকিস্তানিদের পরাজয়ের একদম শেষ প্রান্তে নিয়ে এসেছিল—এই কথাটা স্বীকার করতেই হবে। এটাই সত্য ঘটনা। এটা কোন আবেগের কথা নয়। এটা কোন কল্পনাপ্রসূত গল্পের কথা নয় । এটাই সত্য, ভারত থেকে আমরা অস্ত্র পাচ্ছিলাম, ভারতেই ট্রেনিং নেয়া হয়েছিল এবং একই যৌথ কমান্ডের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ।

এখানে আর একটি কথা বলা দরকার, মুক্তিযুদ্ধের সময় নারায়ণগঞ্জ তেলের ডিপো এবং চট্টগ্রাম তেলের ডিপোর উপর যে আক্রমণটি করা হয় তা ভারতীয় বিমান বাহিনী করেনি, সেটা বাংলাদেশ বিমান বাহিনী করেছে, আমরা করেছি। আমরা যে ছোট একটি বিমান বাহিনী করেছিলাম, সেই বিমান বাহিনীই যুদ্ধে প্রথম আক্রমণ করেছিল। এটা মানুষ আজও জানে না। এমনিতে আমাদের বিমান বাহিনী অত্যন্ত ছোট ছিল, শক্তিও খুব কম ছিল; তবু ৩ ডিসেম্বর প্রথম আক্রমণ যেটি পূর্ব পাকিস্তানে হয় সেটা বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কর্তৃক করা

হয়েছে। আমি যখন সীমান্ত অতিক্রম করে কলকাতায় যাই তখনই তাজউদ্দীন সাহেবকে বলেছিলাম, যে করেই হোক আমাদের বিমান বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। আমরা ঠিক সেইভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি। বহু এয়ারম্যান এসেছে, বহু টেকনিশিয়ান এসেছে যারা এয়ারক্রাফট মেইনটেইন করতে পারবে। অপারেশন ফ্লাইটের ক্যাপ্টেন আছে, হেলিকপ্টার পাইলট আছে। এর মূল্য যে কতখানি, ঠিক যুদ্ধ শুরু না হলে বোঝা যাবে না ।

মাস দু'তিনেক পরে তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে দেখলাম তাজউদ্দীন সাহেব আছেন, তাঁর রুমে ভারতীয় ডিফেন্স সেক্রেটারি, এয়ার চীফ মার্শাল, এয়ার মার্শাল জোয়ান এরা সব বসে আছেন। ভারতীয় ডিফেন্স সেক্রেটারি লাল-এর স্ত্রী ছিলেন বাঙালি। সেইদিক থেকে তাঁর একটা সহানুভূতি ছিল বাঙালিদের প্রতি। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা কীভাবে কী করতে পারি । আমি বললাম যে, 'আমাদের তো কিছু অফিসার এবং লোকজন আছে, আমরা একটা নিজস্ব বিমান বাহিনী গড়ে তুলতে পারি।'

আমাকে বলা হল যে, 'না, আপনারা আমাদের সাথে ফ্লাই করেন।' তখন আমি বললাম, 'যদি আমাদের ছেলেরা ভারতীয় এয়ার ফোর্সের সাথে ফ্লাই করে তাহলে তারা কোন্ নিয়মকানুনের আওতায় পড়বে ?' তখন তিনি বললেন যে, 'স্বভাবতই ভারতীয় এয়ার ফোর্সের রুলস্ অ্যান্ড রেগুলেশন্সের আওতায় আসবে।' আমি তখন বলেছিলাম, 'আমরা কিন্তু স্বাধীন দেশের মানুষ । আমরা আরেকটি দেশের নিয়ম এবং বিধির আওতায় আসতে পারি না।'

আমি তাজউদ্দীন সাহেবের চোখের দিকে তাকালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল আমার এই বক্তব্যের প্রতি । তারপরে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হল ।

তাজউদ্দীন সাহেবের একটি পরিকল্পনা ছিল মুক্তিযোদ্ধা যুবক ও ছাত্রদের নিয়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করা, যাতে তারা একটা কাজের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে । তবে এই ব্যাপারে তাঁর সাথে আমার খুব বিস্তারিত আলোচনা হয়নি।

আবার এদিকে ওয়ার কাউন্সিল নিয়ে একটা বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল । বড় বড় যে তিনজনের নাম বলা যায় তাঁরা সামরিক নেতৃত্ব দাবি করছিলেন। নানা রকম বিতর্ক হয়েছিল । জেনারেল ওসমানীর মতের সাথে তাঁদের অনেকের

মতের মিল ছিল না এবং সময়ে সময়ে তাঁরা এই চিন্তাও করেছেন যে আলাদা হয়ে যাবেন । আমার জানা মতে তাজউদ্দীন সাহেবের কাছেও তাঁরা বলেছেন এবং তাজউদ্দীন সাহেব সবসময় চেষ্টা করেছেন এমন কোন ধারণা বিদেশের মাটিতে সৃষ্টি না করতে যাতে মনে হয় যে, যারা যুদ্ধ করতে এসেছে তাদের মতের মধ্যে সাংঘাতিক একটা সংগ্রাম হচ্ছে বা তাদের মতানৈক্য আছে। এটা যাতে প্রকাশ্যভাবে বাইরে স্থান না পায় এই চেষ্টা তাজউদ্দিন সাহেব বহুবার করেছেন । জেনারেল ওসমানী জিয়াউর রহমানকে টারমিনেশান লেটার দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর ধারণা ছিল জিয়াউর রহমান তাঁর আদেশ মানেন না। জামালপুরের কামালপুরে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের অনেক লোক মারা গিয়েছিল । এইজন্য ওসমানী সাহেব জিয়াউর রহমানকেই দায়ী করতেন।

এদিকে যুদ্ধ যেভাবে চলছিল তাতে আমার নিজের একটি ধারণা হয়েছিল যে, ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা দেশে ফিরে যাব। কারণ সামরিক বাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে কিছুটা সামরিক অভিজ্ঞতা, সামরিক চিন্তাধারা তো থাকেই এবং পাকিস্তানের অবস্থান, ভারতের অবস্থান, চায়নার অবস্থানের প্রেক্ষিতে সমস্ত মিলিয়ে একটা ধারণা হয়েছিল যে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা দেশে ফিরে আসতে পারব। ১৪ ডিসেম্বর সিলেট মুক্ত হয় । জেনারেল ওসমানী তখন সিলেট গেলেন। সেই সময় যুদ্ধের গতি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। তাই আমি তাঁকে বললাম যে, ‘স্যার, যুদ্ধের গতি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, আপনি থাকলে ভাল হয়।' তবুও তিনি চলে গেছেন । তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আলাপ করে গেছেন কিনা তা জানি না ।

১৬ ডিসেম্বর সকালে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে আমাকে ডেকে পাঠানো হল। আমাকে তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, ‘জেনারেল ওসমানী কোথায় আছেন, তাঁর সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না; ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আপনি বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করবেন পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে।'

আমার গায়ে যে পোশাকটি ছিল সেই পোশাকেই সোজা দমদম এয়ারপোর্টে চলে গেলাম। জেনারেল অরোরা এবং অন্যান্যরা দমদম এয়ারপোর্টে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি প্লেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্লেন ছেড়ে দিল । প্লেনে এসে আগরতলা নামলাম । সেখান থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকা এলাম । ঢাকা এসে তেজগাঁও এয়ারপোর্টে নামলাম। সেখান থেকে আমরা রেসকোর্স

ময়দানে এলাম ।

সেদিন যে একটিমাত্র দৃশ্য আমার চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে ভেসেছিল এটা সবসময় বুঝিয়ে বলা মুশকিল। আমরা যাচ্ছি, রাস্তার দু'ধারে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা মানুষের মুখে দেখেছি স্বস্তির ছাপ, শান্তির ছাপ, বিপদমুক্তির ছাপ ।

সেদিনই কলকাতা চলে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করলাম। দেখা করে দেশের পরিস্থিতি জানালাম। তার পরদিনই আমি ঢাকা চলে আসতে চেয়েছিলাম । আমি ভেবেছিলাম দেশে যেটুকু আছে, বিমান বাহিনী হোক, আমি হোক কিংবা আর যাই আছে, তা রক্ষা করা উচিত। আমাদের যারা সাহায্য করেছে তাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর বোধ হয় করা যায় না। কিন্তু জেনারেল ওসমানী আমাকে বাধা দিলেন । তখন পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমি তাঁর সম্পূর্ণ 'না'-এর বিরুদ্ধে ফিরে এসেছি। অবশ্য আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে বলেছিলাম যে, ‘স্যার, আমাকে যেতে হয়। না গেলে বিমান বাহিনী যেটুকু আছে, সেটুকুও থাকবে না । সব লুটপাট হয়ে যাচ্ছে।' তখন তিনি আমাকে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যান ।’

দলীয় রাজনীতির সব দিক আমি ঠিক বুঝতাম না, কিন্তু এই প্রথম বুঝলাম যে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় শুরু থেকেই যে গণ্ডগোল ছিল, তা তখন একটা বড় আকার ধারণ করেছিল।

তাজউদ্দীন সাহেব ভারতপন্থী এই কথাটা আমি বহু শুনেছি । কিন্তু আমার নিজের ধারণা যে, তাজউদ্দীন সাহেব প্রথম, দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ পর্যন্ত আগাগোড়া দেশপ্রেমিক ছিলেন ।

সবশেষে বলতে পারি, স্বাধীনতা আনতে হবে এই সম্বন্ধে তাজউদ্দীন সাহেবের বিন্দুমাত্র দ্বিধা, বিন্দুমাত্র দ্বিমত ছিল না । এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা, তিনি জীবনে আর কাউকে তেমন শ্রদ্ধা করতেন কিনা জানি না। আমার সাথে তাঁর যেটুকু আলোচনা হয়েছে তাতে মনে হয়েছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। যে দিন তিনি জানতে পারলেন বঙ্গবন্ধু ফিরে আসছেন, তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। কতখানি ভালবাসা থাকলে একজন মানুষ আর একজন মানুষের জন্য কাঁদতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

[১.৩.১৯৯২]

এ. কে. খন্দকার : আব্দুল করিম খন্দকার। অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল, মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ বাহিনীর উপ-প্রধান। পরে বিমান বাহিনী প্রধান, রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী। সংসদ সদস্য, সপ্তম জাতীয় সংসদ।

কফিল উদ্দিন মাহমুদ

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমাদের বন্ধু ওয়াহিদুজ্জামানের মাধ্যমেই এই পরিচয় ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াহিদুজ্জামান আমার এক বছরের জুনিয়র ছিলেন। স্কুল জীবনে তিনি এবং তাজউদ্দীন সাহেব ডাফরিন হোস্টেলে ছিলেন এবং ঢাকা মুসলিম বয়েজ হাই স্কুলে পড়তেন। দু'জনে খুব ভাল বন্ধু ছিলেন। পরে তাজউদ্দীন সাহেব সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে চলে যান এবং সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত কয়েক বছর তাঁর লেখাপড়ায় সাময়িক বিরতি ঘটে। এই সমস্ত কথা আমি ওয়াহিদুজ্জামানের কাছ থেকেই জেনেছিলাম । সেই সময় তাঁর সাথে আমার মাঝেমধ্যে দেখা হত । তিনি তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেননি। আমার যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় যাই- যাই অবস্থা তখন তিনি আসেন। কিন্তু তিনি ছাত্র মহলে আগে থেকেই খুব সুপরিচিত ছিলেন । এর কয়েকটা কারণ হল, ছাত্র হিসেবে তিনি খুব ভাল ছিলেন, ম্যাট্রিকে খুব ভাল ফল করেছিলেন, বোধ হয় বোর্ডে প্রথম দশ-বার জনের মধ্যে তিনি ছিলেন এবং ইন্টারমিডিয়েটেও তিনি চতুর্থ স্থান লাভ করেছিলেন। ভাল ছাত্র হিসেবে তাঁর খুব সুনাম ছিল এবং তখনকার দিনে মোটামুটি যাঁরা ভাল ছাত্র তাঁরা একজন আর একজনকে চিনতেন। সেই হিসেবেও আমি তাঁকে চিনতাম । তিনিও হয়ত আমাকে চিনতেন। কিন্তু ভাল ছাত্রটাই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল না। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই অত্যন্ত সমাজ-সচেতন ছিলেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক ব্যাপারেও খুব সচেতন ছিলেন।

তখনকার দিনে ছাত্র রাজনীতিতে মুসলিম লীগের পক্ষে তাঁর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল । মুসলিম লীগের ভেতর দুটো অংশ ছিল। তার মধ্যে যে অংশ প্রগতিবাদী ছিল তিনি তার সঙ্গে সবসময় জড়িত ছিলেন। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, যদিও বর্তমানের তুলনায় তখন খুব কম ছিল বিষয়টি, তবুও এরকম শোনা যেত যে, ছাত্রদের হাতে যখন কোন টাকাপয়সা বা ফান্ড যেত তার ভেতরে হেরফের হত। কোনখানে কোন রিলিফ কাজকর্মে গেলে সেখানেও কিছু হেরফের হত। কিন্তু এ রকম কোন কথা সে সময়ে কখনও তাজউদ্দীন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ওঠেনি। তাঁর পরিচয় ছিল দুটো। প্রথম, তিনি অত্যন্ত শক্ত চরিত্রের মানুষ ছিলেন, যেটা একবার ভাল বুঝতেন

সেটা তাঁর মাথা থেকে সরানো খুব মুশকিল ছিল। এবং যে কোন জিনিস ভাল করে বুঝবার জন্য, খুব ঝুঁকি নেবার জন্য তিনি সবসময়ই প্রস্তুত ছিলেন। আর একটা পরিচয়, তিনি অত্যন্ত সৎ ছিলেন । তাঁর সততা সম্বন্ধে সেই সময় কোন রকম প্রশ্ন কেউ তোলেনি । অনেকে তাঁর সম্বন্ধে বলত যে, একটু রাগী, একটু কড়া মেজাজি। কিন্তু এই কথা কেউ বলত না যে তাঁর সততাতে কোন রকমের কোন ত্রুটি বা খুঁত ছিল ।

আমি পড়াশোনা শেষ করে কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি, তারপর সিভিল সার্ভিসে যোগ দেই। এরপর বহু বছর পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার আর সরাসরি কোন যোগাযোগ ছিল না। তবে দূর থেকে তাঁর কথা মাঝে মাঝে শুনতাম, তিনি ধীরে ধীরে রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিচ্ছেন । তারপর আবার আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগটা হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর, তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী । শেখ সাহেব ফিরে আসার পর তিনি অর্থমন্ত্রী হলেন । আমি এই সময়টায় প্রথমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলাম সচিব পদমর্যাদায়, তারপর অর্থ সচিব ছিলাম। এই সময় তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় । এবং তিনি কীভাবে চলেন, কীভাবে থাকেন, কী তাঁর চিন্তাধারা, কী তাঁর কার্যকলাপ, কী তাঁর আদর্শাবলী, কী তাঁর কাজের প্রণালী এইসব সম্বন্ধে আমি খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ পাই ।

আমি আগে থেকেই জানতাম, তিনি বেশ শক্ত চরিত্রের এবং খুব সৎ মানুষ। কিন্তু আমি কাছ থেকে এই বিষয়গুলি আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পাই। তাঁর ভেতর আরো একটা জিনিস দেখি। তিনি একদিকে যেমন রাজনীতিবিদ ছিলেন অন্যদিকে তিনি একটা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন, যেখানে তার ভূমিকা ছিল একজন প্রশাসকের। আরো দেখেছি, তাঁর রাজনীতির দিকটা এবং প্রশাসনের দিকটা তিনি মোটামুটি আলাদা রাখতেন। তিনি যখন রাজনীতির কাজ করতেন সেটার সঙ্গে তিনি প্রশাসনের যোগ রাখতেন না, আবার যখন প্রশাসনের কাজ করতেন তখন সেখানে রাজনীতি নিয়ে একটা জট পাকাতেন না। তিনি দুটোকে সম্পূর্ণ আলাদা অংশ হিসেবে দেখতেন। এবং সেজন্য তিনি যখন রাজনৈতিক সভা-সমিতি বা আলাপ-আলোচনা করতেন সেখানে আমরা যারা মন্ত্রণালয়ের সচিব বা কর্মচারী ছিলাম আমাদের তেমন কোন আনাগোনা ছিল না। আবার আমরা যখন তাঁর সঙ্গে কাজ করতাম আমাদের মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারে, তখন কিন্তু ওখানে রাজনীতিবিদদের কোন আনাগোনা থাকত না। এ

রকমও দেখেছি, মন্ত্রণালয়ে আমরা কাজ করছি, সেখানে বেশ হোমরাচোমরা মন্ত্রী বা মন্ত্রী পর্যায়ের লোক এসেছেন, তিনি তাঁদেরকে বলে দিয়েছেন, 'আমি এখন অফিসের কাজ করছি, এই সমস্ত ব্যাপারে সময় দেয়ার মত সময় এখন আমার নেই, তোমরা অন্য সময় এস, তখন আমি তোমাদের কথা শুনব।'

আবার তিনি যখন প্রশাসন সম্পর্কে কোন রকমের সিদ্ধান্ত নিতেন তখন সেটা তিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পয়েন্ট অব ভিউ থেকেই নিতেন। অবশ্য তিনি যেহেতু একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন তাই প্রশাসনের স্বরূপ কী রকম হবে, তাঁর নীতি কী হবে, তাঁর চলার ধরন কী হবে এগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বৃহত্তর রাজনৈতিক দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করত। কিন্তু ছোটখাট ব্যাপারে রাজনৈতিক কোন রকমের বিবেচনা তিনি ওখানে আনতেন না । রাজনীতিতে যেটা প্রায়ই হয় যে, এই জিনিসটা যদি করেন তাহলে এবার একটা সুবিধা হতে পারে—এ সমস্ত যুক্তি তাঁর কাছে কোন সময়ই কাজে লাগত না । আমি নিজে তা দেখেছি । অনেক সময়ই তাঁর এলাকা থেকে মানুষজন এসে বলতেন যে, ওই জিনিসটা আমাদের এলাকার জন্য করিয়ে দেন; তখন তাঁকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'না, না, আমি তো সমস্ত দেশেরই মন্ত্রী । অতএব, আমার প্রতি আমার এলাকার যে দাবি আছে, সে রকম দাবি সমস্ত দেশেরই আছে। আমি সমস্ত দেশ থেকে আলাদা করে আমার নিজ এলাকার জন্য বিশেষ কিছু করব, এইজন্য আমি মন্ত্রী হইনি । বরং সমস্ত দেশকে দিয়েথুয়ে, তারপর আমি নিজের এলাকার কথা চিন্তা করব।' তিনি এ রকম একটা মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তাঁর প্রশাসন চালাতেন ।

আমি তাঁর সঙ্গে প্রায় দুই বছর ছিলাম, তাঁর মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে কাজ করেছি। এই সময়ের ভেতরে আমার তো ঠিক মনে পড়ে না যে তিনি আমাদের কোনদিন বলেছেন, এ আমার আপন লোক, এ আমার সমর্থক, এ আমার আত্মীয়—অতএব, আপনি এদের জন্য একটা কিছু করেন বা আপনি একটু দেখবেন কি ? এই ধরনের কোন কথা বা নির্দেশ আমি তাঁর কাছ থেকে পাইনি । হয়ত দু-একটা পেয়েছি তিনি বলেছেন, কিন্তু সেটাও রাজনৈতিক দিক থেকে । যেমন, হয়ত একজন দেশের জন্য বিরাট স্বার্থত্যাগ করেছে এবং বর্তমানে দুরবস্থায় আছে, এই রকম ক্ষেত্রে কিছু করা সম্ভবপর হয় কিনা—এ ধরনের দু- একটা কথা তিনি বলেছেন ।

তাঁর নির্দেশ ছিল, কোন লোক যেন কোন তদবিরের জন্য তাঁর মন্ত্রণালয়ে না

আসে। আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে। একজন আমার কাছে এসেছিল। সে তাজউদ্দীন সাহেবের ভাগিনা কি ভাইপো এ রকম বলে আমার কাছে পরিচয় দিল এবং বলল, ‘আমার এই কাজটা আপনি করুন।' আমি তার বিষয়টি একটু দেখলাম। দেখলাম যে, আইনসম্মত বা বিধিসম্মতভাবে এই কাজটা করা যায় না। তখন আমি তাকে কথাটা খুব ভালভাবে বুঝিয়ে দিলাম যে, আপনি তাজউদ্দীন সাহেবের আত্মীয় বটে, কিন্তু আমাদের যে নিয়ম-কানুন আছে তাতে তো এই কাজটা আমরা করে দিতে পারি বলে মনে হয় না।' তখন সে তাজউদ্দীন সাহেবের দোহাই দিয়ে বলল, ‘আমি তাঁর নিকট-আত্মীয়, এই কথাটা কি আপনি একটু বিবেচনা করবেন না ?' তখন আমি তাকে একটু পরীক্ষা করার জন্য বললাম, “ঠিক আছে, আপনি যখন এসেছেন এবং এই রকম একটা কাজ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করছেন, আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে বিষয়টি বলব, তিনি আমাকে যে রকম নির্দেশ দেবেন আমি সেভাবে পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা করব।' এই কথা শুনেই সে যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। বলল, ‘আপনি আমার কাজ করেন বা না করেন, তাঁর কানে যেন এই কথাটা না ওঠে। তিনি আমার ওপর ভীষণ রাগ করবেন এবং আমার অত্যন্ত সমস্যা হবে।'

এই ঘটনা আমি নিজে দেখেছি এবং তাজউদ্দীন সাহেবের তো বেশ অনেক বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁদের আসা-যাওয়া অনেক জায়গাতেই ছিল, কিন্তু কেউ কোন একটা অন্যায় আবদার বা অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে বা আমাদের কাছে এসেছেন বলে আমার মনে হয় না। তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন এমনকি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও তাঁদের সেই অনুরোধ যদি যুক্তিযুক্ত না হত উনি না করে দিতেন। যদি তিনি দেখতেন যে, একটা জিনিস যুক্তিযুক্ত তাহলে সে বন্ধু হোক বা না হোক অত্যন্ত শক্ত করে পদক্ষেপ নিয়ে ওই কাজটা করে দিতেন।

যার মাধ্যমে তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়— ওয়াহিদুজ্জামান— সেও তখন আমাদের বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য ছিল। সে আমাকে বলত, 'তাজউদ্দীনের সঙ্গে আমার বহুদিনের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিচয়, কিন্তু কোন একটা অন্যায় আবেদন বা অনুরোধ তাঁর সামনে নিয়ে যেতে আমার সাহস হয় না। ন্যায়সঙ্গত কোন কিছু নিতে আমার সঙ্কোচ হয় না, এবং ন্যায়মত হলে আমি যথাসম্ভব তাঁর কাছ থেকে কাজ পাই ।'

আমার মনে হয় তাজউদ্দীন সাহেবের মধ্যে এই বিষয়গুলো বরাবরই ছিল।

অর্থাৎ, যাদের সঙ্গে তাঁর ভাল পরিচয় নেই তারাও তাঁর কাছ থেকে সবসময় একটা ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত বা একটা ন্যায়বিচার পেতে পারত। এ ব্যাপারে এখন অনেক দিন পরে দুটো ঘটনা মনে আসছে, সেগুলো আমি বলছি। সেই সময়ে ঢাকাতে বন্ডেড ওয়্যারহাউস করার প্রস্তাব নিয়ে তিন-চারজন এলেন। বন্ডেড ওয়্যারহাউসের-এর অর্থ হল, বিদেশী দ্রব্যের একটা দোকান হবে এবং মূলত কূটনীতিক এবং বিদেশী মুদ্রায় কেনার অনুমতি যাঁদের আছে তাঁরা এখান থেকে তাঁদের সেই বিদেশী মুদ্রার পরিবর্তে জিনিসপত্র কিনতে পারবেন। সিদ্ধান্ত নেয়া হল, আমরা এই ব্যাপারে কোন রকমের পক্ষপাতিত্ব করব না। কতকগুলো নিয়মাবলী আমরা ঠিক করে দিলাম, এই নিয়মাবলী যারা পালন করবে, আমরা তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দেব। এবং এতে যে ক'টা দোকান হওয়া দরকার তার চাইতেও যদি বেশি দোকান হয়, তাহলেও আমরা অনুমতি দিয়ে দেব, তারপর তারা সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট.....যে টিকে থাকতে পারে টিকবে, যে টিকে থাকতে পারবে না তার দোকান উঠে যাবে। অর্থাৎ আমাদের সেখানে কোন বক্তব্য থাকবে না, এই সিদ্ধান্ত আমরা নিলাম। আমি এই প্রস্তাব করলাম এবং তাজউদ্দীন সাহেব তা অনুমোদন করলেন। সেই হিসেবে যাঁর সঙ্গে আমারও কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তাজউদ্দীন সাহেবেরও কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, এমন একজন প্রথম অনুমতি পেলেন ।

কিছুদিন পরে সেই ব্যক্তি এসে বললেন, ‘আপনারা আমাকে বন্ডেড ওয়্যারহাউস করার অনুমতি দিয়েছেন, আমি কাজ করছি এবং আমার কাজ বেশ ভালভাবে এগিয়ে চলছে, তাই আমি আপনাকে এবং অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে চাই।' আমি বললাম, ‘দেখুন, আমরা এটা ব্যক্তিগত অনুগ্রহ হিসেবে দেইনি। কতকগুলো নিয়ম করে দিয়েছিলাম, সেই নিয়ম অনুযায়ী আপনি পেয়েছেন। এর বাইরে আমরা কিছু করিনি।' সে সময় তাজউদ্দীন সাহেবও আমার কামরায় এসে গেলেন কোন একটা কাজে । আমি তাঁকে সম্পূর্ণ বিষয় খুলে বললাম। তাজউদ্দীন সাহেব সাথে সাথে বললেন, ‘ধন্যবাদের কোন কাজ তো আমরা করিনি । আমরা কতকগুলো নিয়ম করে দিয়েছিলাম, সেই নিয়ম অনুযায়ী আপনি অনুমতি পেয়েছেন।'

তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর সমস্ত কাজকর্মে নিজেকে নৈর্ব্যক্তিক এবং ন্যায়পরায়ণ অবস্থানে রেখে সিদ্ধান্ত নিতেন। সেখানে ব্যক্তিগত পছন্দ, না-পছন্দ, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ব্যক্তিগত গুরুত্ব এইসব তিনি কখনও বিবেচনায় আসতে দিতেন না। এবং এর একটি চরম প্রমাণ আমি অন্য একটি ঘটনাতে পাই।

কর বিভাগে খুব উচ্চ পর্যায়ে একটি পদ খালি হয় এবং পদোন্নতির মাধ্যমে সে পদ পূরণের প্রয়োজন হয়। যাঁরা সম্ভাব্য পদোন্নতি পেতে পারেন তাঁদের সমস্ত কেসগুলো বিচার-বিবেচনা, আলাপ-আলোচনা করে আমি এক কর্মকর্তার নামে একটা প্রস্তাব তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে পাঠাই তাঁর অনুমোদনের জন্য ।

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার কাজের ধরন ছিল এ রকম যে, আমি যখন কোনদিন তাঁর কাছে কোন ফাইল পাঠাতাম, প্রায় পরদিনই আমি এই সমস্ত ফাইলগুলো আবার যথাযথ সিদ্ধান্তসহ পেয়ে যেতাম । ক্বচিৎ দু-একটা হয়ত দেরি হত এবং সেগুলোতে অনেক সময় হয়ত তিনি কিছু আলাপ-আলোচনা করতে চাইতেন এবং তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন। বলতেন, 'আপনার সঙ্গে এই ব্যাপারে কিছু আলাপ-আলোচনা করা দরকার।' তারপর আলাপ-আলোচনা করে আমরা যদি একমত হতে পারতাম, তাহলে তো হয়েই যেত। আর তা না হলে আমি যদি তাঁকে বোঝাতে পারতাম তাহলে তিনি আমার মতে সায় দিতেন। অথবা আমি ভিন্নমত পোষণ করলে তিনি হয়ত যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে বলতেন, 'আপনি বলেছেন, সেটা বোধ হয় এই কারণে ঠিক হবে না।' আমি প্রায়ই দেখতাম যে, তিনি যে কথাগুলো বলতেন সেগুলো যুক্তিসঙ্গত এবং আমি তাঁর কথাটা সানন্দচিত্তে মেনে নিতাম। এরকম কোনদিন হত না যে, তিনি তাঁর মত ধরে আছেন, আমিও আমার মত ধরেই আছি বা তিনি আমাকে উপেক্ষা করে একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন—এই রকম হত না। হয় আমি তাঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতাম, না হয় তিনি আমাকে কনভিন্স করতেন। এই রকম আমাদের কাজের ধরন ছিল। এ ব্যাপারে কোন দিন কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। অনেকের কাছেই শোনা যেত, তিনি খুব একজন কড়া মেজাজি লোক, রাগী মানুষ, অনেক সময় অনেকের সঙ্গে উনি মেজাজ দেখিয়ে কথাবার্তা বলেন। কিন্তু আমার এই দুই- আড়াই বছরের অভিজ্ঞতায় কোনদিন তিনি আমার সঙ্গে মেজাজ করেছেন, এমন কখনও আমি দেখিনি। আমার একটা গর্বের এবং কৃতজ্ঞতার বিষয় এই যে, আমি যেমন তাঁকে সবসময় সম্মান করেছি, তেমনি আমার প্রাপ্য সম্মান তিনি আমাকে সবসময় দিয়েছেন।

তো যে ফাইল সম্পর্কে বলছিলাম সেটা তো তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু দেখলাম যে তিন-চার দিন সেই ফাইলটা আমার কাছে ফিরে আসছে না। আমি অনেকটা আশ্চর্য হলাম যে, তাঁর কাছে তো এতদিন এই ফাইল থাকার কথা নয়, এই সমস্ত কেস তো তাঁর কাছে থাকে না। আমি মনে

মনে কিছুটা অবাকই হচ্ছিলাম যে, ব্যাপারটা কী! ৪/৫ দিন পর তাজউদ্দীন সাহেব নিজেই সেই ফাইল প্রসঙ্গ তুলে আমাকে বললেন, 'মাক্সুদ সাহেব, এই ফাইলটা আপনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন এবং নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছেন এটা আপনার কাছে ফেরত যাচ্ছে না কেন।' আমি বললাম, 'ঠিকই, আমি তো ভাবছি আপনার কাছে তো এই রকম একটা কেস এতদিন থাকার কথা নয়, ব্যাপারটা কী ? এর ভেতরে কি কোন গণ্ডগোল আছে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে খুব ভাল চিনি না । কাগজপত্রে তাঁর রেকর্ড যেগুলো আছে সেগুলো দেখেই এবং অন্যান্য যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে ওই কর্মকর্তার পদোন্নতির কেসটা সুপারিশ করেছি।'

এবার তিনি আমাকে বললেন, 'শোনেন, এই ভদ্রলোক আমার কাছাকাছি থাকতেন। ২৫ মার্চ রাতে আমি তো বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম, কিন্তু বাড়িতে আমার স্ত্রী, ছোট মেয়ে আর কোলের বাচ্চাটা ছিল। সেই রাতে আমার স্ত্রী ভাড়াটিয়া সেজে আর্মির হাত থেকে বেঁচে যান। পরদিন ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেয়াল টপকে বাড়ি ছেড়ে বাচ্চা দুটো নিয়ে দুই দিন এদিক সেদিক পালিয়ে থেকে এক পর্যায়ে এই ভদ্রলোকের বাড়িতে যান। সেই সময় ভদ্রলোক বাড়ির বাইরে ছিলেন। তাঁর গিন্নী আমার স্ত্রীকে বাড়ির ভেতরে একটা কামরায় জায়গা দেন। কিন্তু বাসায় ফিরে আমার স্ত্রীর উপস্থিতির সংবাদ শুনে তিনি এই বিষয়টি মোটেও পছন্দ করলেন না। তিনি "বিপদ টেনে আনা হয়েছে" এমন মন্তব্য করতে লাগলেন। আমার স্ত্রী পাশের ঘর থেকে তাঁদের সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলেন । কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ভদ্রলোক আমার স্ত্রীর কাছে এসে বললেন যে, "আমার বাড়ি তো আপনাদের বাড়ির পাশেই। খোঁজখবর করলে ওরা নিশ্চয় আমার বাড়িতেও আসবে এবং সেটা খুব নিরাপদ হবে না । আমি বরং আপনাকে পাশেই একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে আসি ।" এই কথা বলে তিনি আমার স্ত্রীকে বাইরে ডেকে নিলেন। তখন আমার স্ত্রীর কোলে দুধের ছেলে। রাস্তায় অল্প কিছুদূর গিয়ে ওই ভদ্রলোক বললেন, "আপনি একটু দাঁড়ান । আমি বাসায় চাবি ফেলে এসেছি, চাবিটা নিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।" ভদ্রলোক সেই যে বাড়িতে গেলেন এবং গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন, তারপর তিনি আর ফিরলেন না । আমার স্ত্রী ১০/১৫ মিনিট অপেক্ষা করলেন রাস্তার ওপর। তারপর বুঝলেন যে, ভদ্রলোক তাঁকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন। আমার স্ত্রীকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। তখন

আমার স্ত্রী নিরুপায় হয়ে মেয়েটা আর কোলের বাচ্চাকে নিয়ে কাছে কোন একটা ইটের পাঁজা ছিল, সে পাঁজার পেছনে লুকিয়ে রইলেন। বাইরে তখন কারফিউ। তারপর রাত যখন অনেক গভীর হল তখন ওখান থেকে চুপি চুপি আর একজন পরিচিত কারো বাড়িতে গেলেন, সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বন্ধুদের সহায়তায় অনেক পরে ভারতে চলে যান ।'

তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আপনি যাঁর কথা সুপারিশ করেছেন তিনি সেই ভদ্রলোক । একদিকে তো আমার জানা আছে কী ধরনের চরিত্রের লোক তিনি । আবার অন্যদিকে কাগজকলমে নথিপত্রে তাঁর যে ইতিহাস আছে তা দেখে মনে হয় আপনার সুপারিশ ঠিকই আছে। এই নিয়ে আমি ক'দিন থেকে ভাবছি । তো কী করব ঠিক বুঝতে পারছি না।' আমাকে বললেন, 'আপনি কী বলেন ?' আমি বললাম, 'আপনি এই ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে যে রকম জড়িত সেখানে আমার পক্ষে কোন রকমের মন্তব্য করা সঙ্গত এবং সমীচীন বলে আমি মনে করি না। আপনি যেটা ভাল মনে করেন, সেই সিদ্ধান্ত আপনি নিন এবং আমার তরফ থেকে কোন রকমের আপত্তি থাকবে না।' তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার একান্তই আমার । সরকারি ব্যাপারে তার পেছনের চাকরির যে ইতিহাস আছে সেগুলো বিচার-বিবেচনা করে যদি সে উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহলে সে পাবে, যদি উপযুক্ত না হয় তাহলে সে পাবে না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা কী, সে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কী করেছে না করেছে—এই জিনিসটা আমার এখানে আনা হয়ত ন্যায়সঙ্গত হবে না।' এই কথা বলে তিনি আমার সেই প্রস্তাবের বদৌলতেই তাঁর পদোন্নতির সুপারিশটা অনুমোদন করে দিলেন ।

এটা দেখে আমি বাস্তবিকই আশ্চর্য হলাম । যেখানে তাঁর স্ত্রী, শিশু সন্তান অত্যন্ত বড় বিপদের মুখে পড়তে পারত এই ভদ্রলোকের কাজের দরুন—এই কথাটাও তিনি ভুলে গিয়ে তাঁর পদোন্নতিটা অনুমোদন করে দিলেন! এটা আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য বিষয় বলে মনে হল। আমার মনে হল, আমরা গল্পে-ইতিহাসে অত্যন্ত মহৎ এবং মহান লোকদের যে সমস্ত উদাহরণ পড়ি, এটা তারই একটা। ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ক্রোধ, প্রতিশোধ—এগুলোর ঊর্ধ্বে উঠে নৈর্ব্যক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার যে ক্ষমতা, এটা সেই ক্ষমতা। আমি সেই মুহূর্তে আমার নিজের মনে স্বীকার করে নিলাম যে, আমার নিজের ক্ষেত্রে যদি এটা হত, ঘৃণা, প্রতিহিংসা ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে এই রকম সিদ্ধান্ত আমি হয়ত নিতে পারতাম না। এই একটা জিনিস আমাকে চিরদিন অভিভূত করবে

এবং আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মনে থাকবে ।

আমি বহুদিন সরকারি চাকরি করেছি এবং উচ্চপদস্থ মানুষের সাথে কাজ করেছি, কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এমন একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমি কারো দেখেছি বলে এত দীর্ঘ কর্মজীবনে আমার মনে পড়ে না। এই কথাটি এখনও যখন মনে পড়ে, আমার দুই চোখ পানিতে ভরে উঠে। এটি একটি বড় ঘটনা, কিন্তু ছোটখাট ঘটনাতেও আমি তাঁর এই মানসিকতাটা দেখেছি। সবকিছুর ঊর্ধ্বে, ঠিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে যা হওয়া দরকার ছিল, তাই তিনি করেছেন। এবং এটা তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও আনতে চেষ্টা করেছেন ।

আমি আগেই বলেছি, আমি সরকারি কর্মচারী ছিলাম, এবং তিনি আমাকে রাজনীতিতে কখনই জড়াতে চাইতেন না। আর আমি নিজেও এই ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাইতাম না । কিন্তু তবুও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ছিটেফোঁটা আমি সবসময়ই পেতাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'মাক্সুদ সাহেব, আমি এটাই দেখাতে চাই যে, একজন সৎ রাজনৈতিক কর্মী কোন রকমের অন্যায় বা কোন করমের দুর্নীতি বা কোন রকমের স্বজনপ্রীতি তোষণবাদ এইগুলো না করে শুধুমাত্র নিজের কাজ, নিজের চরিত্র এবং নিজের জনসংযোগের মাধ্যমে রাজনীতিতে সার্থক হতে পারে—আমি এই জিনিসটা দেখাতে চাই । আমার এই নির্বাচন বা রাজনীতির পদ দখল করতে টাকাপয়সা খরচ করার কোন প্রয়োজন নেই । আর আমার সেই প্রবৃত্তিও নেই। আমি কোন রকমের কোন অসাধু আচরণ অবলম্বন করতে চাই না। আমি নিজের দেশের লোকের জন্য নিজের হয়ে খেটে, নিজের চারিত্রিক সততা দিয়ে, নিজের জনসংযোগ বলে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারি কিনা এটাই আমি দেখতে চাই এবং নিজের কাছে প্রমাণ করতে চাই ।' তাজউদ্দীন সাহেবের বন্ধু সহযোগী ছিলেন ফকির সাহাবউদ্দিন সাহেব। তাঁর কাছেই শুনেছি যে, তাজউদ্দীন যতদিন বেঁচে আছেন এবং তিনি যতদিন তাঁর এলাকা থেকে নির্বাচিত হতে চাইবেন, ততদিন কারো পক্ষে সম্ভব নয় যে তাঁকে সেখানে পরাস্ত করে। এটা এই জন্য নয় যে, তিনি কোন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে কিংবা যথেষ্ট টাকাপয়সা খরচ করে অথবা কোন অন্যায় আচরণ করে জিতে আসবেন। তিনি তাঁর নিজের জনসংযোগ, তাঁর চরিত্রের মাধুর্য বা মাহাত্ম্যের মাধ্যমেই আসবেন ।

আমার মনে হয় তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর নিজের সামনে যে আদর্শ দাঁড়

করেছিলেন, সে আদর্শ অনুযায়ী তিনি তাঁর নিজের জীবনকে পরিচালিত করতেন এবং তাঁর নিজের সেই আদর্শ তিনি সার্থকভাবে অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই আমার ধারণা। তাজউদ্দীন সাহেব অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন, অত্যন্ত প্রাণবন্ত লোক ছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর এই বন্ধুবাৎসল্যের সুযোগ নিয়ে কোন রকমের অন্যায় কাজ তাঁর থেকে আদায় করেছে আমি তা দেখিনি। আমার মনে হয় যে শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের প্রধান কারণও এটি ।

শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বহুদিনের এবং তাঁরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ছিলেন। আমি শুধু তাজউদ্দীন সাহেবের কাছ থেকেই নয়, শেখ সাহেবের কাছ থেকেও শুনেছি যে তাঁরা দু'জন অবিচ্ছেদ্য ছিলেন এবং তাঁরা সবসময় একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিংবা তাঁরা দু'জনে শহর থেকে বহুদূরে লোকালয়ের বাইরে গিয়ে গভীর রাত্রে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেছেন। কিন্তু এইরকম অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকার পরেও তাঁদের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ এল—সেটা বোধ হয় তাজউদ্দীন সাহেবের এই চরিত্রের জন্যই যে তিনি যেটা অন্যায় মনে করতেন সেটার সঙ্গে তিনি সমঝোতা করতে রাজি ছিলেন না। শেখ সাহেব যতদিন বাস্তবিকই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাজউদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহায়তা পেয়েছেন । কিন্তু আমি জানি না, হয়ত আমারই ভুল কিংবা ঠিক, শেখ সাহেব যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি বাকশাল করবেন এবং সেই হিসেবে তিনি সমস্ত রাজনীতিকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাবেন, দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তাজউদ্দীন সাহেব এই ধারণাটিকে ঠিক গণতান্ত্রিক বলে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন, এটা ঠিক গণতান্ত্রিক হচ্ছে না। আমি ধারণা করতে পারি এই যে, তিনি শেখ সাহেবকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, বাকশাল করার যে সিদ্ধান্ত এটা সঠিক হচ্ছে না, ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না, গণতন্ত্রসম্মত হচ্ছে না। অতএব, আপনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমার মনে হয় তিনি শেখ সাহেবকে এই ব্যাপারে তাঁর মতে আনতে পারেননি। এবং এটাই আমার মনে হয় তাঁদের দু'জনের বিচ্ছেদের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।

আমরা একবার বিদেশে গিয়েছিলাম, সেখানে তিনি খবরের কাগজে একদলীয় শাসন সম্বন্ধে নানা রকমের সংবাদ পেলেন এবং কিছু নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদও পেলেন। সেইজন্য তিনি ঢাকা এয়ারপোর্টে এসে এর

বিরুদ্ধে কিছু আভাস দিলেন, এবং সেটাই তাঁর এবং শেখ সাহেবের বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়াল এবং এর কিছুদিন পর তাঁরা দু'জন দু'দিকে চলে গেলেন। যখন তাঁদের দু'জনের মধ্যে মতের মিল হচ্ছে না এমন এক পর্যায়ে একবার শেখ সাহেব আমাকে ডেকে নিলেন, শেরে বাংলা নগরে তাঁর যে ভবনটা ছিল ওখানে। আমি যখন গেলাম তখন সেখানে অনেক লোকজন ছিল। শেখ সাহেব আমাকে দেখে বললেন, 'আপনি আমার সাথে আসুন।' তিনি আমাকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন ।

শেখ সাহেবের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল যে, তিনি যখন কারো প্রতি প্রসন্ন হতে চাইতেন, তাঁকে খুব প্রসন্ন করতে পারতেন, খুব খুশি করতে পারতেন । তিনি আমার প্রশংসা করলেন, দু'একটা ভাল কথাও বললেন আমাকে, আমার মনে মনে ভালই লাগল যে কথাগুলো তিনি বললেন। সবশেষে তিনি বললেন, 'তাজউদ্দীনের কাছে কে আসে, কে যায়, কী কথাবার্তা হয়, সেটা আপনি মাঝেমধ্যে একটু আমাকে জানিয়ে যাবেন।' আমার মাথায় একেবারে বাজ পড়ার মত অবস্থা হল । আমার দু'জন বস—একজন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী, আর একজন আমার মন্ত্রী । আমি একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে বলব, আমি এই রকম পরিস্থিতিতে জীবনে কোন দিন পড়ি নাই। আমার শরীর একেবারে শিউরে উঠল এবং চোখমুখ অন্ধকার লাগল, কী করি এই মুহূর্তে!

শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে আমি বললাম, 'তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর রাজনৈতিক কাজ আর তাঁর প্রশাসনের কাজ একসঙ্গে করেন না । তিনি যখন আমাদের সঙ্গে থাকেন তখন প্রশাসনিক কাজই করেন এবং সেখানে কোন দলীয় সদস্য, এমপি বা কোন মন্ত্রী ওই সময় সেক্রেটারিয়েটের অফিসে আসুক এটা তিনি পছন্দ করেন না । এবং আমাদের সামনে রাজনৈতিক কোন কথাবার্তা বা কাজ তিনি করেন না । তাই আমি জানি না, তাঁর কাছে রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে কারা বেশি আসে এবং কী কথাবার্তা হয়। আমার মনে হয় তিনি তাঁর বাড়িতেই এই সমস্ত মানুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন, বা আপনাদের দলীয় অফিসে, যেখানে আমার আসা- যাওয়া নেই । অতএব, এই ব্যাপারে আমি বেশি কিছু জানি না। আর এছাড়াও যদি আপনি জানতে চান, তাঁর কাছে কে আসে, কী কথাবার্তা হয়, তাহলে আইন অনুযায়ী আপনার সাথে কী কথা হল এই বিষয়টি আমার যিনি মন্ত্রী তাঁকে আমার জানাতে হবে। আদারওয়াইজ ইট উইল বি আ গিল্ট অব ইনডিসিপ্লিন অ্যান্ড ইমরাল সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট।

একজন সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে আমাকে আপনি ডাকতে পারেন, অ্যাজ আ হেড অব দা মিনিস্টারস্ আপনি আমাকে নির্দেশও দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণত আপনার কাছে আসতে হলে আমার মন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। অথবা যদি অনুমতি নিয়ে আসা সম্ভব নাও হয়, তবে আপনার সঙ্গে কী কথাবার্তা হল না হল তার একটা মূল সার-সংক্ষেপ মন্ত্রীকে আমার জানাতে হবে, এটাই আমার সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে দায়িত্ব, এমনকি এই ট্রেনিং আমাদেরকে সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে দেয়া হয়। এখন আপানার পছন্দ হলে আমাকে অর্থ সচিব হিসেবে রাখেন বা না রাখেন, কিন্তু আমার পক্ষে এই নীতি থেকে সরে যাওয়া মুশকিল।' এর পরে তিনি আর বেশি কিছু বললেন না । মাঝে মাঝে যখন তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর কাজের মধ্যে সময় পেতেন তখন তিনি আমাকে ডেকে নিতেন। আমরা এক সঙ্গে চা পানের সময় নানা রকমের কথাবার্তা বলতাম । দু-একটি ব্যাপারে আমি তাঁর চোখে পানি পর্যন্ত দেখেছি। শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর এই যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল এবং তিনি তাঁর নীতির সাথে সমঝোতা করে শেখ সাহেবের সঙ্গে একমত হতে পারছেন না, সেটা পরিষ্কার বোঝা যেত। অন্য দিকে শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর যে এত দীর্ঘদিনের একটা যোগাযোগ সেটা ছিন্ন হয়ে যাবে, তাঁর যে একটা বিশ্বস্ততা সে জিনিসটা থাকছে না, এই জিনিসটা তাঁর অত্যন্ত মর্মবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে বহু দেশে যাবার সুযোগ আমার হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রথম দিকটায় অনেকেই আমাদেরকে সহজে স্বীকার করে নিতে চায়নি। তখন আমাদেরকে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি নিতে হচ্ছিল এবং সেই ব্যাপারে তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমাকে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাকসহ বিভিন্ন দেশে যেতে হয়েছিল। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ছিল তার নানা রকমের সভা-সমিতিতে আমাদের যোগ দিতে হয়েছিল । যেমন বিশ্বব্যাংক, ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক, কিংবা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ।

আমরা যখন মধ্যপ্রাচ্যে যাই, তখন পাকিস্তানি বিরূপ সমালোচনার ফল আমাদেরকে সাংঘাতিকভাবে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। পাকিস্তানি প্রচার বাংলাদেশ সম্বন্ধে মধ্যপ্রাচ্যে এমন একটা ভাবমূর্তি তুলে ধরেছিল যে, এরা মুসলমান নয় । এরা সব কাফের হয়ে গেছে। এরা সব হিন্দুর পদলেহী। অতএব মুসলিম দেশ থেকে কোন রকমের সহানুভূতি বা কোন রকমের স্বীকৃতি এদের পাওয়া উচিত নয় । আমরা মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই চেষ্টা

করেছি আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এই যে বিরূপ সমালোচনা সেটাকে খণ্ডন করতে। কোন কোন দেশে আমরা সফল হয়েছি পুরোপুরি। কোথাও আংশিক সফল হয়েছি। কয়েক জায়গায় আমাদেরকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল আমরা মুসলমান কিনা । তখন আমরা তাদের উদ্দেশে বলেছিলাম যে, তোমরা প্যাকিস্তানে যাও এবং বাংলাদেশেও যাও। তোমরা দেখে এসো, কোন দেশে মুসলমানরা বেশি ইসলামের অনুসারী এবং নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। আমাদের কথা তোমরা বিশ্বাস ক'রো না, তোমরা তোমাদের নিজের লোক পাঠিয়ে এটা যাচাই করে নাও। আজ বলতে গেলে লম্বা গল্প বা ইতিহাস হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু সেই সময় অনেক জায়গায় অনেকের সাথে আমাদের ভীষণ তর্কাতর্কি পর্যন্ত করতে হয়েছিল । এবং আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম ।

আমরা একবার মালয়েশিয়াতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বাৎসরিক মিটিংয়ে গিয়েছিলাম, সেইখানে এই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল যে, তোমরা কী চাও, কেন চাও ইত্যাদি। তখন তাজউদ্দীন সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হলেন এবং বললেন, "কতবার তোমাদের সামনে নতজানু হয়ে বলতে হবে যে আমরা একটা স্বাধীন দেশ, এবং আমাদের সাহায্য প্রয়োজন ?' তাজউদ্দীন সাহেবের এই দু-তিন মিনিট বলার পর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর শেষ হয়ে গেল এবং বাংলাদেশের যা দাবি ছিল সম্পূর্ণ গৃহীত হয়। এটা শুধু এখানেই নয়, প্রায় যত জায়গাতেই গিয়েছি আমরা দেখেছি, তাঁর ঐকান্তিকতা বা একাগ্রতা, তাঁর আন্তরিকতা, তাঁর সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা আমাদের বাংলাদেশের স্বীকৃতি বা সাহায্য পেতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ওই সমস্ত দেশে তাজউদ্দীন সাহেব না গেলে এত সহজে আমরা স্বীকৃতি পেতাম কিনা এতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল ।

আর ব্যক্তিগত জীবনে আমি দেখেছি তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং সাদাসিধে ছিলেন। অতীতেও তিনি একই রকম ছিলেন। তাঁর এই সাদাসিধে থাকার অর্থ এই নয় যে, তিনি অগোছালো ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গোছালো ছিলেন এবং ওই সাধারণ জিনিসের ভেতরেই তাঁর পারিপাট্য ছিল । তিনি সাধারণ কাপড় পরতেন, কিন্তু তাঁর প্যান্টটা ইস্ত্রি থাকত সবসময়ই। তাঁর শার্টটা সবসময় পরিষ্কার ও ইস্ত্রি থাকত । তাঁর চুলটা খুব পরিপাটি করে আঁচড়ান থাকত। তাঁর সহজসরলতা শুধু আচার-আচরণ বা পোশাকে কেন, এটা তাঁর যে কোন কাজের ভেতরই দেখা যেত। তিনি যে লেখাগুলো লিখতেন, সেগুলো ছিল

মুক্তার মত লেখা। তাজউদ্দীন সাহেব অত্যন্ত অল্প পরিসরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে, অত্যন্ত জোরালোভাবে ব্যক্ত করে নিজের বক্তব্যগুলো লিখতেন । এবং তিনি যখনই কোন কিছু লিখতেন বা বলতেন—যে কোন বিষয়ে হোক—সেটা যার কাছে বলতেন বা লিখতেন তার পক্ষে খণ্ডানো খুবই দুঃসাধ্য ছিল। এমন পরিপাটিভাবে সমস্ত রকমের যুক্তি, সমস্ত রকমের ঘটনাবলী বিন্যাস করতেন যে, সেগুলো খণ্ডন করে অন্য মত পোষণ করা খুব দুরূহ ছিল ।

এখানে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একবার শেখ সাহেব কানাডা গিয়েছিলেন। কানাডা থেকে আসার সময় তাঁর সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বহু রকমের জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। কিন্তু ঢাকা বিমান বন্দর কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ জিনিসগুলো আটকে দিল । কারণ জিনিসগুলো ঠিক কাস্টমস্ আইনের মধ্যে আনা যায় না। আমি তখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছিলাম ।

তখন কাস্টমসের যাঁরা কর্তৃপক্ষ ছিলেন, তাঁরা আমার কাছে এসে বললেন, ‘আমরা তো আইনত বিনা শুল্কে এগুলো ছাড়তে পারি না, অথচ কিছু লোকজন আছে যারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে, এগুলো যদি না ছাড়ি তাহলে আমাদের সমূহ বিপদ হবে। এখন আমরা কী করব ?' আমি বললাম, “ঠিক আছে, জিনিসগুলো ছাড়বেন না, আমি এই বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করছি।'

তখন আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে পুরোপুরি পর্যালোচনা করে শেখ সাহেবের কাছে নোট লিখলাম এই যে, দেশের আইন ব্যক্তিবিশেষের উপর প্রযোজ্য এবং ব্যক্তিবিশেষের উপর প্রযোজ্য নয় এটি হতে পারে না, এবং যাঁরা যত বড় স্তরে তাঁদের উপর আইনের প্রয়োগ ঠিক তত বেশি করে হওয়া উচিত। তার যে সঙ্গীসাথী তাদের ব্যাপারে এটি সমানভাবে প্রয়োগ করা উচিত। তা না হলে কাজে ন্যায়-অন্যায় যদি কিছু ঘটে সেটা যে শুধু তাঁর কর্মীদের স্পর্শ করবে তা নয়, যিনি উচ্চপদস্থ বা উঁচু পদের অধিকারী তাঁকেও সেটা স্পর্শ করে। এই কথাটা লিখে আমি ফাইলটি অর্থমন্ত্রী মারফত শেখ সাহেবের কাছে পাঠালাম । আমি মনে করলাম তাজউদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে এটার পুরো সমর্থন হয়ত পাব না। কিন্তু দেখলাম, আমি যা লিখেছি তাজউদ্দীন সাহেব সেই কথাগুলো আরো সুন্দর করে গুছিয়ে, আরো জোরালো করে এবং আরো শক্ত করে লিখলেন—আমরা যারা উঁচু স্তরে আছি, আমরা শুধু আমাদের

নিজেদের ব্যাপারে নয়, আমাদের যে সব সঙ্গীসাথী আছে তারা কীভাবে চলে-বলে, তাদের কী আচার-আচরণ সেই ব্যাপারেও আমাদের খুবই সচেতন এবং সজাগ থাকতে হবে। শেখ সাহেব ফাইলটিকে অনুমোদন করে দিলেন, এবং যে সমস্ত জিনিসপত্র কানাডা থেকে তাঁর সফরসঙ্গীরা এনেছিলেন সেগুলো শুল্ক দিয়েই ছাড়িয়ে নিতে হল । এরকম ঘটনা বহু আছে যেখানে তাঁর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসতে পারে, কিন্তু তিনি কোন ভয় বা পরোয়া করেননি। যেটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছে, যেটা ভাল মনে করেছেন, সেটাতে তিনি সবসময়ই সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন ।

একটা কথা বলে অনেকেই তাজউদ্দীন সাহেবকে একটু দোষারোপ করত যে, উনি অত্যন্ত ভারতঘেঁষা । কথা প্রসঙ্গে আমিও একদিন তাঁকে বলেছিলাম, 'লোকে বলে আপনি অত্যন্ত ভারতঘেঁষা, কিন্তু এই বিষয়ে আপনি কী বলেন?' তখন তিনি বললেন, 'আমি এই কথাটা ভুলতে পারি না যে, আমাদের যখন অত্যন্ত বিপদের সময়, আমরা যখন চরম সঙ্কটের সম্মুখীন, তখন যখন কেউ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, তখন ভারতই আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল; পাকিস্তানিরা আমাদেরকে যখন পথের কুকুরের মত মারছিল, তখন ভারতই আমাদেরকে একটা নিরাপদ স্থান দিয়েছিল এবং আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারত সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি নিয়েছিল। এই ঝুঁকিটা শুধু যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তা নয়, তৎকালীন যে মহাশক্তি আমেরিকা তার বিরুদ্ধেও তখন ভারত আমাদের পক্ষ হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। এই কথাটা তো আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। কারণ এই কথাটা যদি আমি ভুলি তাহলে আমি অকৃতজ্ঞতার দোষে দোষী হব। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ভারতের নীতি আমাদের দেশের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কিংবা স্বার্থের পরিপন্থী হলেও সেখানে আমরা সেটা নির্বিচারে মেনে নেব। আমরা কোন দিনই জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কাজ হতে দেব না। আমাদের প্রয়োজনে আমরা ভারতের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করে ভারতকে বোঝানোর চেষ্টা করব, এবং আমার বিশ্বাস, আমাদের যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে ভারতকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝালে আমরা আমাদের যে আকাঙ্ক্ষার বস্তু সেটা ভারতের কাছ থেকে পাব।' এই একটা জিনিস তাজউদ্দীন সাহেবের সম্বন্ধে মনে রাখা ভাল ।

একবার ভারতের সাথে সরকারি পর্যায়ের কিছু আলাপ-আলোচনার জন্য আমাকে দিল্লী যেতে হয়েছিল। আমরা একটা নতুন দেশ আর ভারত প্রবল প্রতিপক্ষ, অথচ বাংলাদেশের স্বার্থ আমাদের রক্ষা করতে হবে। আমি ভারতে

যাবার আগে তাজউদ্দীন সাহেবকে বললাম, ‘এই রকম অবস্থানে এদের সাথে কী আলাপ করব?' তিনি বললেন, 'আমাদের যেটা সত্যিকার প্রয়োজন, আমাদের দেশের যেটা স্বার্থ সেটা আপনি অবশ্যই বলবেন। তাদের কাছে এভাবে উপস্থাপন করবেন যে, তোমরা একটা বিরাট দেশ, শক্তিশালী দেশ। আমরা একটা নতুন দেশ এবং তোমাদের কাছে আমরা অসীম কৃতজ্ঞ যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তোমরা সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছে। তোমরা পাশে বড় ভাইয়ের মত আছ, এখন তোমরা আমাদের প্রাপ্য যদি একটু বেশিও দাও তাতে তোমাদের বেশি কিছু আসে যায় না । কারণ, তোমরা বড় দেশ, তোমাদের বিরাট সঙ্গতি । কিন্তু আমরা এমন অবস্থায় আছি যে, আমরা যদি কিছু কম পাই তাহলে আমাদের পক্ষে তা খুব ক্ষতিকর হয় । এছাড়াও বলবার সুযোগ থাকে যে, আমরা পাশের একটা ছোট দেশ, তাই তোমরা আমাদেরকে পরোয়া করছ না, আমাদেরকে এক্সপ্লয়েট করছ—এটা তোমাদের মত বড় দেশের পক্ষে সম্মানজনক নয়। তোমরা বড় এবং তোমরা উদারতা দেখাবার মত ক্ষমতা রাখ । আমরা চাই তোমরা আমাদের সাথে সেই উদার ব্যবহারটাই করবে।'

আমি ভারতে গিয়ে অর্থ সচিব মি. কাউল ও অন্যান্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করলাম এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলাম। সবশেষে বললাম, আমার মন্ত্রীর তরফ থেকেও এই দিকনির্দেশনা ছিল। এরপর তারা কোন উচ্চবাচ্যই করল না, আমাদের প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়ে দিল। আমি দেখলাম উপস্থাপনের কত বিরাট মূল্য আছে। আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, তাজউদ্দীন সাহেবকে তারা কী শ্রদ্ধার চোখে দেখে!

আমি যখন কলকাতায় গেলাম সেখানে মি. গোলোক মজুমদার এবং মি. শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সাথে দেখা হয় । তাঁরা গল্প করছিলেন যে তাজউদ্দীন সাহেব যখন '৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে গিয়ে ভারত সরকারের সাহায্য চাইলেন, তখন তাঁদের উপর নাকি ভার পড়েছিল যে যাচাই করুন, ওরা যা বলছে, যা পরিচয় দিচ্ছে তা বাস্তবিকই ঠিক কিনা। তখন তাঁরা বেশ কিছুদিন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাজউদ্দীন সাহেবের কথাবার্তা, চালচলন, ব্যবহার, কী করেন, কীভাবে কাজ করেন, এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি সার্বক্ষণিক নজর রাখেন । সমস্ত ঘটনাবলীর সাথে তাঁকে মিলিয়ে দেখে বিচার-বিবেচনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দিল্লীতে সিদ্ধান্ত জানান যে, তিনি সত্যিই একজন নেতা এবং সত্যিই সেরকম একজন মানুষ তিনি যাঁর ওপর সম্পূর্ণভাবে ভরসা করা

যায়। এবং তখনই মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সরাসরি তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

গোলোক মজুমদার তাজউদ্দীন সাহেবের কথা বলতে গিয়ে একটি অত্যন্ত সুন্দর ব্যক্তিগত স্মৃতির উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মিসেস মজুমদার কিছু দিন আগে একটি বড় অপারেশনের পর মারা যান। তিনি রবীন্দ্রসংগীত খুবই পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথের নিজ কণ্ঠে গাওয়া কিছু গান এবং আবৃত্তির একটি রেকর্ড ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। স্ত্রীর সেই অতি পছন্দের জিনিসটি, যার সাথে তিনি নিজেও গভীর অনুভবে জড়িত ছিলেন, সেটি তিনি তাজউদ্দীন সাহেবকে গভীর মমতায় উপহার দেন। একটা রেকর্ড উপহার দেয়া হয়ত কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু এখানে মনস্তাত্ত্বিক যে বিষয়টি জড়িত, একজন মানুষের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা এবং স্নেহ-মমতা জড়িত থাকলে এমন একটি জিনিস উপহার দেয়া যায়, সেটিই আমি তাঁর কথায় উপলব্ধি করেছি।

আর ব্যক্তিগতভাবে তাজউদ্দীন সাহেব নিজে অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। একবার মনে আছে, আমরা জেদ্দায় কিছু কেনাকাটার জন্য দোকানে গিয়েছিলাম । সেখানে তিনি কয়েকটি টুকিটাকি জিনিসের সাথে দুটো হাওয়াই শার্ট কিনলেন। একটা আমাকে এবং অন্যটি তাঁর একান্ত সচিব আবু সাইদ চৌধুরীকে দিলেন। আমি কিছু বলতে চাইলে তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে কথাটিকে পাশ কাটিয়ে দিলেন । সেই শার্টটি আজও আমার কাছে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আছে । আমার দুঃখ হয়, আমি তাঁকে কোনদিন কিছু দিতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল একজন সচিবের পক্ষ থেকে মন্ত্রীকে উপহার দেয়া বোধ হয় সঙ্গত নয়। আর তাজউদ্দীন সাহেব যেহেতু তোষামোদ পছন্দ করতেন না এবং আমি নিজেও এই ব্যাপারে খুব সেনসিটিভ ছিলাম, তাই সমস্ত দিক চিন্তা করে আর কোনদিনই কিছু দেয়া হয়নি ।

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কাজ করে সরাসরিভাবে না হলেও তাঁর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে কিছু জানবার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। তাজউদ্দীন সাহেব মনেপ্রাণে চাইতেন দেশের সমস্ত মানুষের যেন উন্নতি হয়।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে তিনি মানুষের সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি চাইতেন, বাংলাদেশটা যেন সীমিত কিছু লোক, কয়েকটি পরিবার বা ক্ষুদ্র সীমিত স্বার্থের কুক্ষিগত না হয় । কারণ এই পথে যারা ধনী তারা নিতান্তই শোষণ করবে, এদের হাতে দরিদ্র ও শোষিতদের কোন ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণ হবে

না। পাকিস্তানের ২৪ বছরের অভিজ্ঞতার ফলেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, এই ধারণাটি তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে ছিল । ছোট শিল্প বা মাঝারি শিল্প ব্যক্তির হাতে থাকবে এবং সেখানে তারা তাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করবে—এতে বোধ হয় তাঁর কোন আপত্তি ছিল না ।

স্বাধীনতার পর বড় শিল্পগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। তিনি মনে করতেন রাষ্ট্রায়ত্ত করবার পর যে একটা সঠিক ব্যবস্থাপনা দরকার, শিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও নিবিড়ভাবে কাজ করবার মত কর্মীবাহিনী দরকার, সেটা সেই সময় বাংলাদেশে ছিল না। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে যে সমস্যা এবং বিপত্তি দেখা দেয় সেগুলো তাঁর সামনে সবসময় এসেছে এবং এই নিয়ে পরে তিনি বেশ চিন্তিতও ছিলেন। তবে তিনি মনে করতেন হয়ত এর একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে এবং ঘোষিত নীতি অনুযায়ী আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভবপর হবে।

তাজউদ্দীন সাহেব যেহেতু চাইতেন দেশের সম্পদ যেন মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে বন্দি না হয়ে যায়, সেই জন্যই তিনি চাইতেন সমাজের নিচের দিকের মানুষেরা স্বাবলম্বী এবং স্বাধীন হোক। মধ্যবিত্ত যারা তারা যেন সমাজের সমস্ত কিছুতে প্রাধান্য পায়। দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হোক। তাজউদ্দীন সাহেব ধারণা করতেন, আমরা হয়ত খুব বেশি ধনী হতে পারব না, কিন্তু আমরা যদি নিজেরা পরিশ্রমী হই, সৎভাবে জীবন যাপন করি এবং আমাদের আর্থিক দিকগুলোর যদি আমরাই ঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করি তাহলে খুব ধনী দেশ না হলেও মানসম্মানের সঙ্গে আমরা একটা দায়িত্ববান জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে পারব এবং সেদিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত । সত্যিকার অর্থেই তাজউদ্দিন সাহেব একজন দেশভক্ত মানুষ ছিলেন।

২৬ অক্টোবর ১৯৭৪ আমি অফিসে কাজ করছি, তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে ইন্টারকমে ডেকে বললেন, 'আমার রুমে আসেন। আমি গেলাম।' এর আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শেখ সাহেবের সঙ্গে তিনি আর থাকতে পারবেন না, এমন অবস্থায় একদিন বললেন যে, ‘আমি আমার পদত্যাগপত্রটা দাখিলই করে দেই। কারণ আমি দেখছি বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের দু'জনের মত এখন দ্বিমুখী, একটার সাথে আর একটার কোন সমন্বয় বা সামঞ্জস্যের কোন সম্ভাবনা আমি

আপাতত দেখছি না।' আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'দেখুন না, এমনও তো হতে পারে যে, শেখ সাহেব আপনার যে মত আছে সেটা আবার চিন্তা করে দেখতে পারেন । আপনারা দু'জন এদেশের স্বাধীনতার জন্য, বাংলাদেশের জন্যে এত বছর ধরে এত আত্মত্যাগ করলেন, এত কাজ করলেন, এত স্বার্থত্যাগ করলেন, এখন দু'জন দু'দিকে যাবেন, এটা দেশও তো ভালভাবে মানবে বলে মনে হয় না ।' সেই সময় তিনি তাঁর পদত্যাগপত্রটা বোধ হয় দেন নাই ।

সে দিন আমি যখন তাঁর রুমে গেলাম তিনি আমাকে একটা চিঠি দিলেন, সেই চিঠিতে বোধ হয় এই রকমই কথা ছিল যে শেখ সাহেবের পক্ষে তাজউদ্দীন সাহেবকে আর মন্ত্রিসভায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি প্রথম একটু হাসলেন। হেসে বললেন, 'এমন যে হবে আমার জানাই ছিল, বরং আপনি কিন্তু নিষেধ করছিলেন।' আমি চুপ করে গেলাম, আর কী বলব। তাঁর চোখে পানি এল । আমারও একই অবস্থা ।

তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমি বহুদিন কাজ করিনি, হয়ত দেড়-দু'বছর কাজ করেছি। কিন্তু এই সময়টুকুতেই আমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি এবং আমি মনে করি তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সেটা বোধ হয় একজন মন্ত্রী এবং একজন সচিবের যে প্রকৃত সম্বন্ধ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধটাই ছিল। যখনই কোন ইস্যু আসত, তখনই আমি আমার যা বক্তব্য সচিব হিসেবে সেটা নির্ভয়ে অকপটে প্রকাশ করতে পারতাম। সেই মতটা তাজউদ্দীন সাহেবের পছন্দ হোক বা না হোক তিনি আমাকে সরাসরি নাকচ করে দিতেন না। তিনি আমাকে ডাকতেন, ডেকে তিনি যে ভিন্নমত পোষণ করেন তার স্বপক্ষে যত রকমের যুক্তি, যত রকমের আরগুমেন্ট, উদাহরণ, সবগুলো তিনি আমার সামনে তুলে ধরতেন। এবং আমিও আমার যা বক্তব্য তার স্বপক্ষে যত যুক্তি সব পেশ করতাম। এবং এর ফলে হয়ত আমি তাঁর মত মেনে নিয়েছি অথবা তিনি আমার কথায় সায় দিয়েছেন। এবং সেটাই শেষ পর্যন্ত আমাদের মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত হিসেবে চালু হয়েছে।

তাজউদ্দীন সাহেবের পদত্যাগের পর আমি মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি দু-একবার বলতেন, 'এখন তো সরকারি কর্মচারিদের মধ্য থেকে কেউ আসে না, আপনি কেন আসেন।' আমি বলতাম যে, 'আমি তো আপনার কাছে অর্থ সচিব হিসেবে আসিনি। আপনি তাজউদ্দীন, আমি কফিল উদ্দিন মাহমুদ। আমি সেই হিসেবে আসি । আপনাকে আমার ভাল লাগে, আপনাকে আমি

শ্রদ্ধা করি, সেইজন্য আমি আসি। যদি আমি আপনার কাছে না আসি তবে আমি নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাব। যাঁর কাছ থেকে আমি সবসময়ই সুবিবেচনা পেয়েছি তিনি যেহেতু আজকে ক্ষমতায় নেই তাই আমি তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্বন্ধটাও রাখব না, এই জিনিসটা আমার নিজের মানবতার পক্ষে আমি গ্লানিকর বলে মনে করি ।' কিন্তু তারপরও তিনি আমাকে বলতেন, 'অনেকেই আমার কাছে আসতে ভয় পায়, আপনি এখানে না এলেই বোধ হয় ভাল । এখন যে দিনকাল পড়েছে, আপনি এলে শুধু শুধুই অসুবিধা হবে, নানা বিপদ-বিপত্তিতে পড়বেন।' আমি বলতাম, 'সেটা আমার উপরই ছেড়ে দিন। যদি আমার কোন বিপদ হয় সেটা আমি বুঝব।' এরপরেও আমি কয়েকবার গিয়েছি। কিন্তু দেখতাম আমাকে দেখলে তিনিই বেশ বিব্রত বোধ করেন। একদিন বললেন, 'দেখেন না, আমার দুয়ারের সামনে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, কে আসে কে যায় তারা সমস্ত খোঁজখবর রাখে, তাই আপনি কেন শুধু শুধুই ঝামেলায় পড়তে যাবেন ?' আমি তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে গেলে তিনি বিব্রত বোধ করবেন এই চিন্তায় আমি আস্তে আস্তে যাওয়াটা কমিয়ে দিলাম ।

আজ এত বছর হয়ে গেছে, এখনও তাঁর স্মৃতি আমার মনে জাগরূক । এই সমাজে তাজউদ্দীন আহমদের মত অনন্য চরিত্র অতীতেও ছিল বিরল, আর বর্তমানে তা আরো বেশি বিরল হয়ে গেছে। এখনও আমি নামাজ পড়ে তাঁর জন্য আল্লাহ্ কাছে দোয়া করি : হে আল্লাহ্, তুমি তাঁকে পরপারে শান্তি দিয়ে দিও, তাঁর দোষত্রুটি যদি কিছু থাকে মাফ করে দিও।

[23.8.1990]

কফিল উদ্দিন মাহমুদ : সরকারি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব।

কে. এফ. রুস্তামজী

আমি কে. এফ. রুস্তামজী। আমার বর্তমান বয়স ৮২ বছর। আমি আইপি ক্যাডারের একজন পুলিশ কর্মকর্তা। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত । ১৯৭১ সনে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মহাপরিচালক ছিলাম ।

বিএসএফ-এর মহাপরিদর্শক গোলোক মজুমদার জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং জনাব আমীর-উল ইসলামকে কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে নিয়ে আসেন । আমি দিল্লী থেকে এসে পৌছে এই বিমানবন্দরেই তাঁদের অভ্যর্থনা জানাই। সেখানেই তাঁদের সাথে আমার প্রথম দেখা। তাঁদের দু'জনকেই খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল । কারণ বহু অসুবিধার মধ্য দিয়ে তাঁদের অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল এবং সাথে নিজস্ব কিছুই ছিল না।

'৭১ সালের ৩১ মার্চ রাতে কলকাতার 'আসাম ভবনে' জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং জনাব আমীর-উল ইসলাম আমার অতিথি হিসেবে ছিলেন। এর পরের কয়েক দিনও আমরা সর্বক্ষণ একসাথে ছিলাম এবং দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছি। তাঁরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি, চট্টগ্রামের বিদ্রোহ এবং চট্টগ্রাম বেতার থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলেন । ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তানি আর্মি হত্যাযজ্ঞ শুরু করে । তাঁদের বর্ণনায় পূর্ব পাকিস্তানের ভয়াবহ নৃশংসতার পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে। প্রথম দিন থেকেই আমি এবং তাজউদ্দীন আহমদ একে অপরের বন্ধু হয়ে পড়ি । তাঁর দেশপ্রেম, প্রতিজ্ঞা এবং ভারতের ওপর বিশ্বাসের জন্য আমি তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল । জনাব তাজউদ্দীনের যে জিনিসটি আমাকে সবচাইতে প্রথম মুগ্ধ করে সেটি হল তাঁর নিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত একটি মন ।

তিনি ঢাকার রাজনীতি, তাঁর দলের দীর্ঘদিনের ত্যাগ-তিতিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার জন্য কী কী সাহায্য প্রয়োজন তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাঁর সাথে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু আমি দিল্লীকে অবহিত করেছিলাম এবং সেইসাথে তাঁর ওপর আমার গভীর বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের কথাও জানিয়েছিলাম। আমরা যারা বিএসএফ-এ ছিলাম তাদের সাথে শুরু থেকেই জনাব তাজউদ্দীন একটা দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

তিনি ছিলেন আগাগোড়া একজন সৎ মানুষ। তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়ের মাঝে সততার আগুন সবসময়ই জ্বলজ্বল করত। স্বাধীনতা যে আসবেই এ বিষয়ে তিনি ছিলেন স্থিরবিশ্বাসী, অবিচল। জনগণের অভ্যুত্থান এতই শক্তিশালী যে, কোন সামরিক স্বৈরাচারের পক্ষেই তা উপলব্ধি বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না—তাঁর এই আত্মবিশ্বাস আমাকে সবচাইতে বেশি নাড়া দিয়েছিল । দিল্লীর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে ভারতও বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সাহায্যের ঘোষণা অবশ্যই দেবে, এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম ।

আমার মনে আছে, মিসেস গান্ধীর সাথে আলোচনার পর জনাব তাজউদ্দীন সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। দিল্লীতে তাঁর এই আলোচনা, ব্যক্তিগত উপস্থিতি, যোগাযোগের একটা কূটনৈতিক গুরুত্ব ছিল। দেশের প্রতি ওঁর নিষ্ঠা ও গভীর আগ্রহ ভারতীয় নেতাদের মনে এমন একটা ছাপ রেখেছিল যা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পূর্ণ সহযোগিতা প্রাপ্তিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ।

বাংলাদেশ সরকার গঠনে জনাব তাজউদ্দীন প্রধান ভূমিকা পালন করেন । তিনি কলকাতায় তাঁর কার্যালয় স্থাপন করেন এবং সেখানে সমবেত বেসামরিক এবং সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত আলোচনা-বৈঠক করতেন। এমন লোক প্রচুর আছেন যাঁরা তাঁর কাছে সামান্য মতপার্থক্যের বিষয় নিয়েও হাজির হয়েছেন এবং ফিরেছেন সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি নিয়ে। কেননা তিনি সমস্যাগুলো বুঝতেন এবং যৌক্তিক সমাধান দিতে পারতেন। মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে এই বিষয়টির গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। আসলে তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন যাঁরা গণতান্ত্রিকভাবে মতভেদ দূর করতে চান। জনাব তাজউদ্দীন ছিলেন নিজ আদর্শের জন্য শহীদ হতে প্রস্তুত এমন একজন নির্মল চরিত্রের সৎ রাজনীতিবিদ । বিভিন্ন সময়ে মিসেস গান্ধীর সাথে জনাব তাজউদ্দীন ও তাঁর সংগ্রাম নিয়ে আমার আলোচনা হয়েছে । আমি প্রতিবারই লক্ষ্য করেছি যে, জনাব তাজউদ্দীনের ওপর মিসেস গান্ধীর ছিল গভীর বিশ্বাস।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর তিনি যখন প্রবাস থেকে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যাচ্ছেন তখন কলকাতা বিমানবন্দরে আবেগঘন বিদায় মুহূর্তে আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'আশা করি বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্ব চিরদিন বজায় থাকবে।' তিনি দুই সার্বভৌম দেশের মর্যাদায় বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন । এতে আমার মনে আশা জেগেছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন

ব্যক্তিরা আমাদের দুই দেশের সমস্যা নিয়ে ভাববেন এবং বন্ধুত্ব দৃঢ় হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের পর যখনই আমি বিমানে আসাম বা ত্রিপুরার পথে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যেতাম, আমি তাঁকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাতাম । তিনিও সাথে সাথেই আমার সে বার্তার জবাব দিতেন ।

তাজউদ্দীন যে দিন মৃত্যুবরণ করলেন সেই দিনটি আমার জীবনের অন্যতম শোকাবহ দুঃখের দিন ।

[5.1.1998]

কে.এফ. রুস্তামজী : **১৯৭১** সালে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর মহাপরিচালক।

খান সারওয়ার মুরশিদ

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার কখন প্রথম দেখা হয় তারিখটা বোধ হয় সঠিক বলতে পারব না। তবে বছরটা ১৯৪৮ এবং স্থান ফজলুল হক হল। ফজলুল হক হলের পুকুরের ধারে ছাত্রদের কোন একটা সভায় আমি তাঁকে প্রথম দেখি। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে জীবনের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য অপেক্ষা করছি। তারপর আবার তাঁর সাথে দেখা হল যখন আমি বিদেশে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে এলাম—'৫৬ সালের ডিসেম্বরে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় তাঁর সাথে আমার অনেকবারই দেখা হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা হয়নি । তাঁর সাথে কথা হয়েছে, সেটা সৌজন্যের স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল ।

তবে জানতাম তিনি একজন শিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী এবং তাঁর সাথে একটু কথা বললেই সেটা বোঝা যেত। তাজউদ্দীনকে খুব পরিশীলিত মনে হত, তাঁর চেহারার মধ্যে একটা শিক্ষিত মানুষের ব্যঞ্জনা ছিল, যেটা আমাকে আকর্ষণ করত। আর যথার্থই তাজউদ্দীন সাহেব মেধাবী ব্যক্তি ছিলেন, এর প্রমাণ তো জীবনে বহুবার পেয়েছি।

আমাদের সম্পর্কটা খুব নিকট হতে শুরু করল যখন এই পূর্ব অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তান বিরোধী হয়ে উঠেছে, এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদী মনোভাব চারদিকে বিস্তারলাভ করতে শুরু করেছে। এ ছাড়াও অবশ্যি আমার স্ত্রী রাজনীতিতে ছিলেন, সেই সূত্রে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা হত, তাঁর বাড়িতে যাবার কারণ ঘটত, সেভাবেই সম্পর্কটা গড়ে ওঠে।

শেখ সাহেব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি পাবার পর আমাদের সাথে যোগাযোগ করলেন। এই সময় আলাপ-আলোচনা চলাকালে আমাদের উপলব্ধি ঘটেছিল যে, তাজউদ্দীন সাহেব শেখ সাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও যোগ্য সহকর্মী ছিলেন এবং তাজউদ্দীন সাহেবের ওপর তিনি খুব নির্ভর করতেন। যখনই শেখ সাহেব আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন তাজউদ্দীন সাহেব প্রায় সবসময় ব্যতিক্রমহীনভাবে সেখানে উপস্থিত থেকেছেন। আমরা তখন সমস্যাকে ভাগাভাগি করেছি, একে অন্যের সাথে কথা বলেছি। এভাবে দেশের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, ভাবতে গিয়ে একদিকে যেমন নাকি শেখ মুজিবুর রহমানকে আমার ভাল করে জানবার সুযোগ হয়েছে, অন্যদিকে

তাজউদ্দীন সাহেবকেও খুব ভাল করে জানার সুযোগ হয়েছে ।

সেই সময়ে শেখ সাহেব এবং আওয়ামী লীগ প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যে, স্বাধীনতার যে স্বপ্ন তা দেশটাকে না ভেঙে একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে সাংবিধানিকভাবে পাওয়া যায় কিনা, অর্জন করা যায় কিনা। সেই লক্ষ্যে ৬-দফার নীতিগুলোকে সামনে রেখে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালিদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান তৈরি করার জন্য প্রচুর চিন্তাভাবনা হয়েছে এবং এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা বিভিন্ন দিন একটা জায়গায় মিলিত হতাম। শেখ সাহেব ছিলেন, তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন, খন্দকার মোশতাক, প্রফেসর রেহমান সোবহান, ড. কামাল হোসেন, প্রফেসর নূরুল ইসলাম, আমি, প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ— এবং দলের নেতৃস্থানীয় সব সদস্যই উপস্থিত থাকতেন কিনা সেটি এখন আমার মনে পড়ছে না, হয়ত কখনও থাকতেন কখনও থাকতেন না। ওখানে আমাদের একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দিনের পর দিন একটা বিরাট খসড়া দলিলের সমস্ত ধারাগুলো পরীক্ষা করেছি। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে কখনও মনে হত পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালিদের আকাঙ্ক্ষা, বাঙালিদের দাবি পূরণ করে একটা সংবিধান তৈরি করার চাইতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটা সংবিধান তৈরি করা অনেক সহজ হবে । এই সমস্ত কাজ, আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবকে আমার গভীরভাবে জানবার সুযোগ হল। তাঁর মেধা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, একটা সমস্যার যাকে বলে গভীরে চলে যাওয়া, অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ করবার যে ক্ষমতা, সেটা তাজউদ্দীনের মধ্যে অত্যন্ত প্রখরভাবে ছিল। আমার এক বিকেলের কথা মনে আছে, নারায়ণগঞ্জের পথে কোন এক জায়গায় আমাদের যে আলোচনা হচ্ছিল, সেই আলোচনার পরে ফেরার পথে গাড়িতে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম আমাকে বলেছিলেন, 'তাজউদ্দীন একই সঙ্গে এত বিষয়ের এতগুলো দিক কী করে দেখতে পায়: আশ্চর্য ওঁর মন তো!' আমি সম্মতি দিলাম, 'হ্যাঁ, তাঁর মন খুবই আশ্চর্য।' অর্থাৎ একইসাথে মনে অনেক চিন্তা ধারণ করা এবং সেগুলোকে বিবেচনার জন্য সামনে নিয়ে উপস্থিত করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাজউদ্দীনের। তারপর নূরুল ইসলাম সাহেব বলেছিলেন, এই মানুষটির তো অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত। এই মানুষটি আদর্শ প্রধানমন্ত্রী হতেন।

অনেক কথাই মনে পড়ে। তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে পরিচয়টা তো তিনি আমার স্ত্রীর রাজনৈতিক সাথী এই পর্যায়েই থেমে থাকেনি, এটা একটা অত্যন্ত

গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক, ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক হয়েছিল। এই মানুষটির বৈশিষ্ট্য ছিল লক্ষণীয়। তাঁর মধ্যে বিনয় ছিল, তিনি যে একজন পড়াশোনা করা মানুষ, চিন্তাশীল মানুষ সেটা খুব বোঝা যেত। তিনি প্রতিটি কথা মেপে বলতেন যখন সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হত। সব সময়ই যে সিরিয়াস কথা হত বা তিনি বলতেন, আর আমরাও যে সিরিয়াস কথা শুনতে চাইতাম সেটাও তো নয়। আমরাও অবান্তর কথা বলেছি, তিনিও কখনও কখনও হাসি-তামাসার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন যা কিনা মানবিক । কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা যে কোন বিষয়ে আলোচনার সময় খুব বিশ্লেষণমূলক আর খুব ধীরস্থির ।

কেউ কেউ বলেন যে, তাজউদ্দীন সাহেব রেগে গেলে ভয়ানক রেগে যেতেন— তেমন রেগে যাওয়া আমি কখনও দেখিনি। আমার কাছে তাঁকে বেশ ধীর মেজাজের মানুষ বলেই মনে হত। তিনি সমস্ত জিনিসের যে রেকর্ড রাখতেন সেটা আমি অনেক পরে জেনেছি । তাঁর দিনের সমস্ত কাজ এমনকি তাঁর যে চিন্তা যা তিনি মন থেকে করেন, মানুষের সামনে শুনিয়ে করেন না, সেগুলোকে তিনি পরিচ্ছন্নভাবে ডায়েরিতে লিখে রাখতেন। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যটা আমার কাছে খুবই অসাধারণ লক্ষণীয় বলে মনে হত। বেশির ভাগ আওয়ামী লীগ নেতাদের মনে হত বেশি কথা বলেন, চেঁচামেচি করেন, স্লোগানের অতিরিক্ত তাঁরা ভাবেন বলে মনে হত না। কিন্তু এই ভদ্রলোক খুবই ভাবতেন এবং পৃথিবী সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকেবহাল ছিলেন। তাঁর পৃথিবীটা শুধুই পূর্ব পাকিস্তান ছিল না, তাঁর পৃথিবীটা সত্যিই একটা বড় জায়গা ছিল। তিনি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন এবং খুব স্পষ্ট করে বলতেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা । এ সমস্ত কারণে তাঁকে আমার ভাল লাগত।

তারপর তো নির্বাচন এসে গেল । এর আগে সেই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনা ঘটল । এক ফ্রেঞ্চ মহিলা সাংবাদিক পৃথিবীকে প্রথমে জানাল এরকম একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে । বঙ্গোপসাগর দিয়ে মৃত মানুষ কীভাবে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে—লক্ষ লক্ষ মানুষ! সেটার আঘাত আমাদের মনে দারুণভাবে দাগ কাটল এবং সেই ঘটনার ফলে বাঙালির প্রাণ যে কত তুচ্ছ পাকিস্তান সরকারের কাছে, এর বাস্তবতা, রূঢ়তা আমরা যখন উপলব্ধি করলাম তখন বাঙালির মনে দারুণ আঘাত এল এবং মনের শেষ ভ্রান্তিটা যে একত্রে থাকা যাবে, একই দেশ, সেটা বোধ হয় আর থাকেনি । এটা মস্ত বড় একটা আঘাত। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্পর্কে বিশেষ কোন রকম অনুভূতি প্রকাশ করেনি, আর এই বিপদের সময় পূর্ব বাংলার বাঙালিদের জন্য তেমন কিছু

করেওনি। যা কিছু করেছে অতি বিলম্বে করেছে। এদিকে মানুষের মনের যে সিদ্ধান্ত তা কিন্তু হয়ে গেছে। নির্বাচনের ফলাফলেও তার প্রমাণ মিলেছে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে এমন একটা মানসিক শক্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে এটা আর উপেক্ষণীয় ছিল না। অর্থাৎ বাঙালিরা যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেভাবে পাকিস্তানের সীমাবদ্ধতা, পাকিস্তানের অবাস্তবতা, পাকিস্তানের কৃত্রিমতা উপলব্ধি করল, তার একটা বিশেষ পর্যায় কিন্তু ১৯৭০ সালের সেই শেষ দুটি মাস ।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় হল । গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে শাসনক্ষমতা দিতে হবে, কেন না নিখিল পাকিস্তানের ভিত্তিতে বাঙালিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং গণতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাঙালিদের হাতে আসবে—এই সম্ভাবনাটা কোনভাবেই পাকিস্তানের শাসকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না প্রথম থেকেই। সেই জন্যই পরবর্তীকালে মার্চ মাসে যে কথাবার্তাগুলো হল যে, কীভাবে পাকিস্তানের সংবিধানকে সংশোধন করা যায়, কতখানি দিলে পরে আমরা খুশি হব, কতখানি দিলে পরে তাদের ধারণায় পাকিস্তান অটুট থাকবে, এই যে আলোচনাগুলো হল এর পেছনে আমার মনে হয় না তাদের তেমন কিছু প্রত্যাশা ছিল বাঙালিদের কাছে। বাঙালিরা খুব নমনীয় হবে এটা কিন্তু তারা মনে করেনি। সময়ের দিকটা চিন্তা করলে ক'টা মাস—নভেম্বর ১৯৭০ থেকে মার্চ '৭১-এর মধ্যেই তো এ সমস্ত ভয়াবহ ঘটনা এবং সমস্ত ক্রুশিয়াল ঘটনাগুলো ঘটে গেল ।

অসহযোগের সময় যে নীতিগুলো শেখ সাহেব বলতেন, সেই নীতিগুলো স্থির করার ব্যাপারে তাজউদ্দীন সাহেবের বড় ভূমিকা ছিল। যে কথাগুলো শেখ সাহেব জনসমক্ষে বলতেন, জনসভায় বলতেন, যেগুলো এক ধরনের নীতি এই অর্থে যে, তখন দেশের প্রশাসনের ভারটা অসহযোগের কারণে আওয়ামী লীগের হাতে চলে এসেছে এবং আওয়ামী লীগের নেতা যা বলতেন সেটাই যেন একটি সরকারের ঘোষিত নীতি, সেই নীতি হিসেবে দেশকে চালিয়ে রাখা, সচল রাখা, দেশের প্রশাসনের যে কতকগুলো অপরিহার্য দায়িত্ব আছে, সমাজ জীবনকে চালু রাখতে হলে সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে নীতির প্রয়োগটা করতে হত সে প্রয়োগের জন্য তাজউদ্দীন সাহেবেরই সম্পূর্ণ ভূমিকা ছিল, ব্যবস্থাপনা তাঁর হাতেই ছিল। কী কী করতে হবে, ব্যাঙ্কগুলো কী করে চলবে, কর্মচারীরা কী করবে, সরকারি প্রশাসনের কোন্ কোন্ দিকগুলো চালু রাখতে হবে, মানুষের সমস্যাগুলো এই পরিস্থিতিতে কীভাবে মেটাতে হবে,

এসব বিষয়গুলো তাজউদ্দীন সাহেব ভাবতেন এবং প্রয়োগ করতেন। নীতি হিসেবে যেগুলো ঘোষিত হয়েছে এগুলো তিনি প্রয়োগ করতেন। এটা আমার খুব স্পষ্ট করে মনে আছে। নীতি প্রয়োগের দায়িত্বটা তাঁরই ছিল ।

একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করতাম যে, ৩২ নম্বরে যেন সরকার চলে এল এবং প্রশাসনের সমস্ত অঙ্গ এবং শাখা তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে ৩২ নম্বরে আসত । শেখ সাহেব তাজউদ্দীন সাহেব এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের বলতেন যে, আপনারা প্রতিটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কী করণীয় সেগুলো উদ্ভাবন করুন এবং সমাধান দিন। সেই সমাধানগুলো শেখ সাহেব ঘোষণা করতেন। অর্থাৎ কিছু সমস্যা তাঁরা আগেই আলোচনা করতেন এবং সেভাবে তাঁরা ঘোষণা দিতেন। আর কিছু সমস্যা এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। তার আলোকে শেখ সাহেব তাঁর সমস্ত সহকর্মীদের নিয়ে সেগুলোকে কীভাবে পরিচালনা করতে হবে, কীভাবে সমাধান দিতে হবে, কীভাবে চেষ্টা করলে এই পরিস্থিতিতে সমাজকে সক্রিয় রাখা যাবে—যতখানি সক্রিয় রাখা অসহযোগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ— সেইটি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে হত। যেমন শ্রমিকরা এল, ডাক্তাররা এল, আমলারা এল। ফলে আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড পুরো সিভিল সমাজ থেকে যা মতামত পেলেন যে, এই সমস্যা আছে, ওই সমস্যা আছে, তখন তাঁরা নির্দিষ্ট সমাধানটা বের করতেন এবং এই সমাধানগুলো বের করার ব্যাপারে তাজউদ্দীন সাহেবের একটা বড় ভূমিকা ছিল। অবশ্য তাঁরা গোটা হাইকমান্ড একত্রেই কাজ করতেন। তখন তাঁদের মধ্যে খুব সখ্য ছিল এবং একসঙ্গে কাজ করার একটা ইচ্ছা ছিল। কেউ হয়ত একটু কম কাজ করতেন, কেউ একটু বেশি কাজ করতেন। কিন্তু তাঁরা একে অন্যের সাথে খুব সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতেন। এটি আমার উপলব্ধি ।

তারপর এর আগে লাহোর বৈঠকে যোগ দিতে শেখ সাহেবের বিশেষ আমন্ত্রণে আমি তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি তাজউদ্দীন কেমন পরিশ্রমী ছিলেন। অনেক সভা, অনেক আলোচনা, অনেকের সাথে দেখাসাক্ষাতের পর রাতে ক্লান্ত হয়ে সবাই ঘুমিয়ে গেছেন। এদিকে সংবাদপত্রের জন্য একটা বিবৃতি তৈরি করে তার কপি করে, প্রুফ দেখে ঠিক করে রাখতে হবে। আমিও ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখি তাজউদ্দীন সাহেব তখনও সেই সংশোধনগুলো করছেন। অনেক গভীর রাত তখন । এই কাজটা এমন একজন বড় নেতার না করলেও চলত, অন্য কোন কর্মীকে দিয়ে করালেও

চলত, কিন্তু তিনি তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে এতটাই যত্নশীল ছিলেন যে কাজটা না করে তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না এবং না শেষ করে তিনি ঘুমাতেও যাননি। দায়িত্বশীল এবং পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন এটাই বলতে চাইছি আমি ।

'৭১ সালের মার্চের কত কথা যে মনে আছে সে তো বলে শেষ করা যাবে না। সেইসময় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন থাকতাম । বিশেষ করে ইয়াহিয়া খানের সাথে যে আলোচনা হচ্ছিল তা কীভাবে হচ্ছে, এতে কি কিছু আশা করা যেতে পারে, আমরা কি কিছু অগ্রগতি করছি না থেমে আছি, এই সব উদ্বেগের সময় তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে এলে কিছু আলো পাওয়া যেত। সে কারণেই তাঁর কাছে একটু বেশি আসা হত। এটা সম্ভবত ২২ বা ২৩ মার্চ। আমি তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে এলাম। তাঁকে বললাম, 'তাজউদ্দীন সাহেব, আলোচনা ভেঙে যাচ্ছে এটা পরিষ্কার, আমরা আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্র হাসিল করতে পারছি না, তাহলে কি কৌশল হিসেবে আমাদের নিজেদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ওদেরকে এমন একটা ভাব দেখানো যায় না যে, ঠিক আছে, আমরাও একটু ছাড় দিচ্ছি, তোমরাও ভেবে দেখ—এইভাবে একটু সময় ক্ষেপণ হলে আমরাও নিজেদের প্রস্তুতি নিতে পারি!' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, ‘আমরা এভাবে চলে এলেও তাদের কাছে কি এটা স্পষ্ট হবে না যে আমরা স্বাধীনতাই চাচ্ছি ?' এর বেশি কিছু বললেন না, শুধু রহস্যময় ভঙ্গিতে একটু হাসলেন। তাজউদ্দীন স্বভাবতই গম্ভীর লোক, কথা বলেন অবশ্যই, কিন্তু সে দিন তাঁকে আমার খুব আত্মমগ্ন মনে হয়েছিল। খুব চিন্তিত ছিলেন তিনি।

২৫ মার্চ রাতে আমরা তাজউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। তার আগে ৩২ নম্বরে গিয়েছিলাম। শেখ সাহেব বাড়ি থেকে যাবেন না। এই না যাবার ব্যাপারে তাজউদ্দীন ভাই খুবই দুঃখিত ছিলেন, তিনি বিচলিত ছিলেন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন। এক দিকে শত্রুর হাতে ধরা পড়লে চলবে না এই বোধটা তাঁর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, অন্যদিকে তিনি একেবারে ঠিক অদৃষ্টকে হাতের মুঠোয় নিয়ে একবস্ত্রে বেরিয়ে গেছেন রাস্তায় । তারপর যা ভাবনার রাস্তায় ভেবেছেন এবং ধাপে ধাপে তাঁর চিন্তাকে বিকশিত করেছেন যে, এরপর আমার কী করা উচিত, এরপর কীভাবে এগুনো উচিত ।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব, মনসুর আলি সাহেব এবং কামরুজ্জামান সাহেবের কথা। এঁরা প্রত্যেকেই অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। কঠিন অবস্থায় কাজ এবং দায়িত্ব পালন করার

মানুষ। তাঁরা সবাই হয়ত একই রকম ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা খুব স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু ইতিহাস তাজউদ্দীনের উপর বেশি দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল এবং তাজউদ্দীন একেবারে ঋষির মত সব ছেড়ে দিয়ে কাজ করেছেন, তাই তাজউদ্দীনের ছবিটাই আমার কাছে বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। যুদ্ধের সময়ের প্রায় আট মাস বলতে গেলে আমি তাঁর কাছেই ছিলাম । মুজিবনগরে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন নামে যে সংস্থাটি ছিল তার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এই পরিকল্পনা কমিশনে ছিলেন প্রফেসর মুজাফফর আহমদ, প্রফেসর আনিসুজ্জামান, প্রফেসর মুশাররফ হোসেন। স্বদেশ বোস কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। পরে চলে যান ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে। আর আনিসুজ্জামান যে একজন সদস্য এটাও আমি অনেক পরে জেনেছি।

সেখানে প্রধানত যে কাজটি আমরা করেছিলাম সেটা হল একটি পরিকল্পনা রচনা করা, যার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের শেষে অস্ত্রধারী তরুণরা যখন দেশে ফিরে যাবে অথবা যুদ্ধ থেকে নাগরিক জীবনে ফিরে যাবে, বাড়ি ফিরে আসবে, তখন তাদেরকে সমাজের সাথে কী করে সফলভাবে নিযুক্ত করা যায়। কারণ আদর্শবাদী যুবকরা অস্ত্রের যে ব্যবহার করেছে, ব্যবহারের অভিজ্ঞতাটা ওদের জন্য যেমন এক দিক দিয়ে মূল্যবান, অন্য দিক দিয়ে ওটা একটা প্রলোভনের ও উৎস। অস্ত্র একবার ব্যবহার করলে তার ব্যবহারের প্রবণতা আবার দেখা দিতে পারে, এবং এটা হবার সম্ভাবনা তখন বেশি থাকে যখন তাদের জন্য উপযুক্ত কোন কাজ না থাকে। এই সমস্ত যুবকদের পুনর্বাসনের জন্য চিন্তাভাবনার প্রয়োজন ছিল এবং সেইসব চিন্তাভাবনায় আমি অংশ নিয়েছি এবং সেই পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারেও আমার একটা ভূমিকা ছিল ।

আমার মনে আছে, যুব পুনর্বাসন, অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন নিয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করেছি। জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনাও সেই চিন্তারই একটা ফল। এই মানুষগুলোকে যদি আমরা একটি সুগঠিত সুশৃঙ্খল ফোর্সের সাথে যুক্ত করতে না পারি তা হলে এই যুবকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কী করে! আমরা সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভেবেছি, যারা জীবনের মূল্যবান একটি বছর হারিয়েছে এবং যে একটি বছরের অভিজ্ঞতা এমনই শ্যাটারিং এবং এমনই বিপ্লবকর ছিল যে ওদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা একটা কঠিন ব্যাপার ছিল, তাদের জন্য সাধারণ শিক্ষা এবং মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল— সেগুলো আমরা যেন দিতে পারি। জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে, সবাইকে তো

সেনাবাহিনীতে, মিলিশিয়াতে নেয়া যাবে না। এই সমস্যাগুলো আমরা আগে থেকেই অনুমান করেছিলাম । এছাড়া আমাদের সম্পদেরও সমস্যা ছিল, সময়ও খুব বেশি পাওয়া গেল না। আমরা যখন দেশে ফিরে এলাম, দেশের মধ্যে তখন ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত মিলিশিয়ার ধারণাটি বাস্তবায়িত হল না ।

তারপর কিছু কিছু অঞ্চল তখন মুক্তাঞ্চল ছিল, সেই মুক্তাঞ্চলেও যারা তরুণ তাদেরকে সংগঠিত করার একটা স্কীম নেয়া হয়েছিল । সেই প্রকল্প অনুযায়ী কাজ হয়েছিল। যারা শরণার্থী হয়ে এসেছিল নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, যারা যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে যায়নি কিন্তু যুদ্ধের প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত ছিল, এই মানুষগুলো নিষ্ক্রিয় থাকলে, তারাও তরুণ, তারা বিপথগামী হতে পারে, কাজ না থাকলে তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে আগাছার মত বাস করবে। সুতরাং ওদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, সংগঠিত করতে হবে, যাতে করে ওরা পরবর্তীতে দেশের কাজে আসে। তো এই ছেলেদের তৈরি করার কাজটার জন্য কিছু চিন্তাভাবনা এবং পরিকল্পনা হয়েছিল, সেটির সাথে আমি জড়িত ছিলাম ।

ওখানে এককভাবে কেউ কাজ করেননি, চিন্তাভাবনা করে সম্মিলিতভাবেই সব কিছু হত। অবশ্য কেউ কেউ বিশেষ দায়িত্ব পালন করতেন। আনুষ্ঠানিকভাবে আমার এই কাজ ছিল। আর একটি কাজ ছিল, বিদেশী সাংবাদিকদের এবং বিদেশ-প্রত্যাগতদের সঙ্গে, বিশেষত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে কৌতূহলী কনসার্নড় মানুষদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা । সেটা অনেকে যেমন করেছে আমিও করেছি।

এছাড়াও সরকার আমাকে কখনও কখনও বিভিন্ন কাজে পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক দায়িত্বও দিয়েছেন। যেমন, সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে ভারতের কয়েকটি জায়গায় যেতে হয়েছে। সেখানে তৎকালীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য সমাবেশের ব্যবস্থা, সেমিনারের ব্যবস্থা করেছে। সেখানে বাংলাদেশের কথাগুলো, বাংলাদেশ কেন সংগ্রাম করছে এবং সংগ্রাম করতে গিয়ে বাংলাদেশের কী কী সমস্যা হচ্ছে এসব কথা তুলে ধরার জন্য সরকার, প্রধানত তাজউদ্দীন, আমাকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছিলেন ।

আমার জন্য সবচাইতে স্পর্শকাতর এবং ঝুঁকিপূর্ণ যে কাজটি ছিল, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাংলাদেশের বাইরে, ভারতে এবং বৃহত্তর বিশ্বের ঘটনাগুলো

তীক্ষ্ণভাবে অনুসরণ করা। প্রধানমন্ত্রী খুব ব্যস্ত মানুষ ছিলেন এবং তিনি আমার উপরে কোন কোন ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতেন। কিছুদিন পরপর তিনি আমাকে বলতেন যে, এবার কিছু বলার সময় হয়েছে।

কী বলতে হবে তার নকশা বা খসড়া তিনি আমাকে দিতেন না। আমাকে তখন পরিস্থিতি বুঝে একটা খসড়া দাঁড় করাতে হত । প্রধানমন্ত্রীর কী এখন বলা উচিত, পরিস্থিতি কিভাবে বিকশিত হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে কী কী পরিবর্তন লক্ষ্য করছি, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কী, পাকিস্তানীদের অবস্থাটা কী, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেগুলো বাংলাদেশের ভেতরে কাজ করছে তাদের মতিগতি কী, তারা কী করছে বা করছে না—এইসব বিবেচনা করে আমি প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রায় নিয়মিত বক্তৃতার খসড়া তৈরি করে দিতাম ।

তিনি যখন খসড়া দেখে বলতেন, হ্যাঁ, এটাই আমার বক্তব্য, তখন সেই খসড়াকে আমি পরিমার্জিত করে একটা চূড়ান্ত রূপ দিতাম । সেটা তাঁর কাছে যেত, তারপর তিনি সেটা অনুমোদন করলে প্রফেসর আনিসুজ্জামান সাহেব সেটা বাংলায় অনুবাদ করতেন। কখনও কখনও আমরা দু'জনেও একত্রে চিন্তাভাবনা করেছি । একটা বাংলা খসড়া হয়েছে, একটা ইংরেজি। মূল খসড়া, বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণগুলো আমি লিখেছি, তারপর আনিসুজ্জামান সাহেব দক্ষতার সাথে সেগুলো অনুবাদ করেছেন । যেখানে তিনি বক্তৃতাগুলো বাংলাতেই পড়তেন, সেখানে কেন যে ইংরেজিতে আগে আমাকে দিয়ে লেখাতেন আমি এটা ঠিক কখনও বুঝিনি। কিন্তু তিনি চাইতেন আমি যেন লিখি ।

ফলে আমাকে তাঁর চোখ দিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে লিখতে হত, তিনি আমাকে কোন নির্দেশ দিতেন না। বলতেন না যে এটা লিখুন, এর ওপর জোর দিন। খসড়া তৈরি করে দেবার পর তিনি খুব যত্ন সহকারে ওটা পড়তেন। কখনও কখনও পরামর্শ দিতেন, তারপর সেটা চূড়ান্ত হলে বাংলায় অনুবাদ হত । তো বেশির ভাগ সময় তাঁর সঙ্গেই কাটাতে হত অথবা আমি যখন পরিকল্পনা সেলে বসে থাকতাম তখনও তাঁর কাজই করতে হত। এই কথাটা পরিকল্পনা সেলের কেউ জানতেন না। এটা আমার আর তাজউদ্দীনের মধ্যেই ছিল, শুধু প্রফেসর আনিসুজ্জামান জানতেন ।

আমার জন্য এটি একটি খুব চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা যে, একটি রাষ্ট্রের জননেতা যিনি সময় পান না, যাঁর নিজের একটা বক্তব্য আছে, যিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে

নিজে মৌলিক চিন্তা করেন, অথচ কোন্ কথাগুলো তাঁরই কথা সেটা আমাকে অনুমান করে লিখতে হত। এটা খুব মজার অভিজ্ঞতা আমার। আমার আনন্দ এখানেই যে আমি বেশির ভাগ সময় তাজউদ্দীনের মনকে বুঝতে পারতাম। কারণ তিনি আমাকে বলতেন, হ্যাঁ, আমি এ-ই বলতে চাই।

ফিরে আসি মুক্তিযুদ্ধের কথায়। যেহেতু তাজউদ্দীন সাহেবের বক্তৃতার খসড়া আমাকে তৈরি করতে হত তাই সময়ে সময়ে তাঁর সাথে আমার দেখা করার প্রয়োজন হত, অনেক বিষয়ে কথা বলতে হত এবং সেই সময়টা তিনি আমাকে দিতেন । এছাড়াও নির্দিষ্ট কোন কাজ ছাড়াই আমি তাঁর কাছে গেছি। তিনি কোন এজেন্ডা ছাড়াই আমার সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন যা পরে ভাষণ তৈরিতে সাহায্য করেছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে।

তাজউদ্দীন সাহেব একটা কাজ অত্যন্ত বিচক্ষণ প্রশাসকের মত করেছিলেন যে, কাকে কী দায়িত্ব দিয়েছেন সে দায়িত্ব সম্পর্কে অন্য কারো সাথে প্রয়োজন না হলে তিনি কথা বলতেন না। এর সুবিধা বা ভাল দিক ছিল, যুদ্ধের অবস্থায় বিভিন্ন রকম মানুষকে দিয়ে বিভিন্ন রকম কাজ করাতে হয় । সেখানে গোপনীয়তার একটা বড় প্রয়োজন ছিল । সবাই যদি সব কিছু জানে তা হলে তো এটা যুদ্ধকালের সরকার হল না। প্রত্যেকটি মানুষ অরক্ষিত হয়ে যেত। যেমন এই লোকটি একটি মিশন নিয়ে কাজ করছেন, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন মিশন দিয়েছেন—এটা যদি সবাই জানে, বিশেষ করে কোন অবাঞ্ছিত লোক যদি তা জানতে পারে তখন সমস্যা হতে পারত । আর তাজউদ্দীনের সে সংযম ছিল যে, সবাইকে সব কথা বলতে নেই। এই পরিমিতি একজন দক্ষ প্রশাসকের থাকতে হয় এবং তা তাজউদ্দীনের ছিল।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, যুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তাঁর খুব বড় দায়িত্ব ছিল এবং নানা ধরনের দায়িত্ব ছিল। সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে । তার মধ্যে একটি সমস্যার কথা আমার মনে পড়ে । একটা সময় ছিল যখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই অস্ত্রের জন্যে, অস্ত্রের স্বল্পতার জন্য অভিযোগ নিয়ে আসতেন। এখন আমাদের যে হোস্ট গভর্নমেন্ট, যে সরকার আমাদের সাহায্য করছে, স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে তাদের উপর নির্ভর করতে হত এবং তাদের কাছ থেকেই আমরা অস্ত্র পেতাম। বাইরে থেকে অস্ত্র পাওয়ার আর কোন উৎস আমাদের ছিল না ।

আমরা বাইরে থেকে পেতামও না, আর কেনার মত সঙ্গতিও আমাদের ছিল না। আমরা হয়ত ছিটেফোঁটা পেয়েছি নানাভাবে। নিজেরা অস্ত্র আমদানি করে আমাদের গেরিলাদের ও নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করব এমন সুযোগ বা পরিস্থিতি আমাদের ছিল না ।

তাঁরা যে সমস্ত অস্ত্র আমাদেরকে দিতেন সেটা একটা বিশেষ রাজনৈতিক সময় দেখেই দিতেন, এটাই আমার মনে হয়। আমরা চাইলেই তাঁরা অস্ত্র দিতেন না । আমরা যে ক্যালিবারের অস্ত্র চেয়েছি, যে ক্যাপাসিটির অস্ত্র চেয়েছি, যা প্রয়োজন ছিল, সেটা তাঁরা দিতেন না সবসময়। এবং তাঁদের নিজেদেরও এক ধরনের চিন্তাভাবনা ছিল যে কোন্ ধরনের জিনিস কোন্ পর্যায়ে দেবেন। এটাও একটি বিরাট সমস্যা ছিল তাজউদ্দীনের।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত এটা বলতে হয় যে যুদ্ধ কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী এককভাবে করেনি। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর খুব নিবিড়ভাবে নির্ভর করতে হয়েছে। এবং আমার কাছে পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক জেনারেল অরোরা নিজে যা বলেছেন এবং রেকর্ড আছে বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত দলিলের একটি খণ্ডে—মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর তাঁরা যথেষ্ট নির্ভর করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের জন্যই তাঁদের পক্ষে ঢাকায় এত তাড়াতাড়ি পৌছানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধে যে তাঁরাও অংশ নিচ্ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই । তাঁরাই দাতা, তাঁরা হসপিটালিটি দিয়েছেন, বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন দিচ্ছেন, তাঁদের ক্যালকুলেশানমতো যখন উপযোগী সময় এসেছে তখন তাঁরা সেই পরিমাণ জিনিস দিয়েছেন যা তাঁদের বিবেচনায় আমাদের পাওয়া উচিত । তাঁদের এই পলিসিটা সবসময়ই ছিল।

কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদ প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সহযোগীদের মধ্য থেকে নিয়মিত চাপের মুখে ছিলেন। সেটা প্রতি মুহূর্তে সমস্যা ছিল । আরো সমস্যা ছিল যেটা এখন হয়ত বোঝা একটু মুশকিল যে, একদিকে আমাদের অনেক শরণার্থী ছিল—একটা প্রবাসী সরকার, যে অন্য দেশের সাহায্য নিয়ে অন্যের ভূখণ্ডে থেকে কাজ করছিল, এমনিতেই এটা একটা বিরাট বড় অসুবিধা, তারপর নিজের সম্মান বজায় রেখে একটা আশ্রয়প্রার্থী ছোট দেশের সরকারকে একটা বড় দেশের সরকারের সাথে সারাক্ষণ নেগোশিয়েট করতে হত। এটি প্রতি মুহূর্তে নিপুণভাবে পথ অন্বেষণকারী তাজউদ্দীনের ওপর মস্ত বড় চাপ ছিল । এই সরকারকে বিরূপ করা চলবে

না, এই সরকারের সহযোগিতা নিতে হবে । অথচ একটা মুক্তিকামী দেশের সরকারের মর্যাদা বজায় রাখতে হবে । এটি একটি দুরূহ সমস্যা বটে এবং এইটি তাজউদ্দীন বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মোকাবেলা করেছেন । এটি তিনি করেছেন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে । এই বিষয়টি কিন্তু কেউ লক্ষ্য করেনি, কোন কাগজেও এটা আসেনি। কিন্তু এই সমস্যাটা গোটা ন'টি মাস তাজউদ্দীনকে সামলাতে হয়েছে ।

তাজউদ্দীনের মনের পেছনে যে শক্তিটা ছিল সেটা হল, বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের শক্তি। অর্থাৎ, আমরা অবস্থার কারণে একটা বিপর্যয়ের মুখে এসে এদের কাছে আশ্রয় চেয়েছি এবং এদের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছি, কিন্তু সত্যিকারভাবে আমরা মর্যাদাবান জাতি, আমাদের সেই চোখে দেখতে হবে। অবস্থার কারণে আমরা বিপন্ন হতে পারি, কিন্তু আমরা আমাদের মযার্দার স্বীকৃতি দাবি করব এবং এই মর্যাদা আমরা তখনই পাব যখন আমরা নিজেরা মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করব, আচরণ করব, ভেবেচিন্তে কাজ করব, কথা বলব। এটাই আমার উপলব্ধি তাজউদ্দিনের কাছ থেকে ।

আওয়ামী লীগের মধ্যে যাঁরা সরকারে ছিলেন তাঁদের মধ্যে দু'ধরনের টেনশান ছিল। একটা টেনশান ছিল যেটাকে আমি সঙ্গত এবং সুস্থ মনে করি যে, ওঁরা প্রায় সবাই সমপর্যায়ের লোক, হয়ত কোন কোন দিক থেকে কেউ মাথায় একটু বড়, বুদ্ধিতে একটু বড়, কিন্তু প্রায় সবাই সমসাময়িক, একসাথে কাজ করেছেন, একই নেতার অধীনে কাজ করেছেন—তাঁদের মধ্যে একটা ফিলিং এমন হতে পারে যে, তাজউদ্দীনকেই কেন প্রধানমন্ত্রী হতে হবে, কেন আমি নই । কিন্তু এটা নিয়ে চূড়ান্ত কোন সংঘাত বাধেনি। এবং চূড়ান্ত সংঘাত যে বাধেনি এই জন্য আমি নেতাদেরকে কৃতিত্ব দেব । সৈয়দ নজরুলকে তো দেবই, অন্যান্য নেতারাও এটা মেনে নিয়েছিলেন। সঙ্কটের মুহূর্তে তাঁরা তাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা ব্যক্তিগত মর্যাদা বা সম্মান বাড়াবার যে স্বাভাবিক প্রবণতা যা মানুষের মধ্যে থাকে তা যে সংযত করতে পেরেছিলেন এটা একটা কৃতিত্ব ।

অন্য টেনশানটা সর্বনাশা ধরনের ষড়যন্ত্র। যার উৎস ছিল খন্দকার মোশতাক। যার জন্য তাজউদ্দীন সরকারকে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়েছে। এ ব্যাপারে ভারত সরকারের পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা তাজউদ্দীন পেয়েছিলেন। যাঁরা ওখানে প্রবাসী সরকার চালাচ্ছেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এঁদের সকলেরই

খবর ভারত সরকার রাখতেন। হয়ত নিজস্ব অনুসন্ধান বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী, নানারকম ব্যবস্থার মাধ্যমে ওঁরা খবর রাখতেন । আমার তো মনে হয় নিঃসন্দেহে আমার করসপন্ডেন্সও তাঁরা দেখতেন। আমি বিলেতে চিঠি লিখছি, আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রতে লিখছি, আমি তাজউদ্দীনের সরকারের সাথে যুক্ত, এটা তাঁরা ভাল করেই জানেন—নইলে আমার মত একজন শরণার্থীর মেইল তাঁরা খুলে দেখবেন কেন ? যদি আমার মেইল ওঁরা খুলে দেখতে পারেন আমার মনে হয় প্রত্যেকটি মন্ত্রী সম্পর্কে তাঁরা মনিটর করেছেন, তাঁরা অনুসরণ করেছেন । এই অনুসরণ দরকার ছিল। কারণ কোন দেশই কোন আশ্রয়ী সরকারকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় না । তাঁদেরও নিজেদের ভালমন্দ এর সাথে যুক্ত ছিল । অনুসরণের কারণেই মোশতাকের ষড়যন্ত্রটা—আমেরিকার মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগটা ধরা পড়েছিল এবং আগেই এই সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমদকে তাঁরা সতর্ক করতে পেরেছিলেন, যে জন্য তাজউদ্দীন সাহেব সেই ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। তার যে প্ল্যান ছিল, অর্থাৎ বিদেশে গিয়ে মোশতাক কার্যত প্রবাসী সরকারকে অস্বীকার করে তার নিজস্ব লাইন নেবে এবং এমন দেশের সীমানার মধ্য থেকে কাজগুলো করবে যেখানে সে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে—তাজউদ্দীন সাহেব মোশতাকের এই ক্ষতিকর প্ল্যানকে নস্যাৎ করতে পেরেছিলেন ভারত সরকারের সাহায্যের কারণেই ।

ভারত সরকার একদিকে তার কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে কিন্তু মর্যাদার ওপর আঘাত করেনি। এসব ব্যাপারে তাজউদ্দীন সাহেব খুব ট্যাকটফুল ছিলেন, সব বুঝতেন, সব বুঝেশুনে তিনি একটা পরিমিতিবোধের সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মনোভাব নিয়ে সব গ্রহণ করতেন । সেটি বোধ হয় জেনারেল ওসমানীর ছিল না । সে জন্য হয়ত তাঁর অদ্ভুত আচরণের একটা ব্যাখ্যা আমরা পাই—যখন নাকি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করবে, এই অনুষ্ঠানটির আগে তিনি ছাড়া ছাড়া হয়ে বিলীন হয়ে গেলেন, সিলেটে চলে গেলেন ।

যুদ্ধ নিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কথা হয়েছে আমার। আমাদের নিয়মিত বাহিনীর অংশগ্রহণকে তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। কিন্তু এদিকে আমাদের রেগুলার আর্মি ওদিকে পরাক্রমশালী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিজনড্ আর্মি, এদের যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি গেরিলা যুদ্ধের উপরেই বেশি ভরসা রেখেছেন। দখলদার আর্মির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ আপসহীন থাকা, সম্পূর্ণ অসহযোগ পালন করা তাঁর স্ট্র্যাটেজির মূল কথা ছিল এবং এটা সফল হয়েছিল। তারপর পর্যায়ক্রমে কৃষক থেকে আরম্ভ করে

নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কিছু উচ্চবিত্ত সব মানুষদেরকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তুললেন এবং এই ব্যাপারে তিনি ক্যাবিনেটের পুরো সহযোগিতা পেয়েছেন। অন্যান্য যে সহযোগী দল ছিল তারাও তো একইভাবে চিন্তা করত।

কনভেনশনাল যুদ্ধ করতে গেলেই আমাদেরকে আরো বেশি পরনির্ভরশীল হতে হবে। আমাদের যে সম্পদ আছে তা হল প্রধানত জনগণের মনোবল এবং যেখানে শত্রু দুর্বল সেখানে শত্রুকে আঘাত করা। আর শত্রু যেন বাংলার মাটিতে কোথাও ঠাঁই বা আশ্রয় না পায় । আশ্রয় পায়নি বলেই তো আস্তে আস্তে এরা সীমান্ত এলাকা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে ভেতরে চলে এল। কয়েকটি জায়গা ছাড়া বাইরে বের হতে পারত না। মুক্তিবাহিনী তাদের লাইন অফ কমিউনিকেশান, মূল সাপ্লাই লাইনকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। তারপর গেরিলা তৎপরতার অন্যতম অংশ ছিল জাহাজ উড়িয়ে দেয়া। একসঙ্গে অতগুলো জাহাজ যে উড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের বন্দরগুলোতে, এটার পেছনে প্রশিক্ষণ ছিল, সতর্ক প্ল্যানিং ছিল এবং আমাদের ছেলেরা অপূর্ব কাজ করেছিল। সাফল্যের চরম পর্যায়ে এইসব ছেলেদের বিশেষত গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অভাবনীয় এবং সুশৃঙ্খল কর্মক্ষমতা এসে গিয়েছিল। এখানে ভারতীয় প্রশিক্ষণও কাজ করেছে। সবচাইতে বড় কথা, দেশের ভেতরে যে সহযোগিতাটা তারা পেয়েছে—অবশ্যই রাজাকাররা ছিল, আল-বদর, আল-শামস্ ছিল—কিন্তু দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যে সহযোগিতাটা দিয়েছিল তার ওপর তাজউদ্দীন নির্ভর করেছেন সবচাইতে বেশি। তাঁর সব আবেদন ছিল ভেতরের মানুষের কাছে, সেইটি একটি বড় ভূমিকা রেখেছিল।

যদিও প্রবাসী সরকারের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত হয়ত দেশের মানুষ ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি বা বুঝতে পারেনি। যেমন, মুক্তিযুদ্ধের সময়ও মার্চের মত সম্পূর্ণ অসহযোগ তাজউদ্দীন সাহেব চেয়েছিলেন। দেশের ভেতরে পাকিস্তান সরকারের কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারের কোন অঙ্গের সঙ্গে কোন সহযোগিতা কেউ করবে না। আমি তাঁর মুখে এটাও শুনেছি কখনও কখনও যে, প্রবাসী সরকারই যদি বাংলাদেশে বৈধ সরকার হয়ে থাকে তাহলে এই সরকারের কথাই প্রায়োরিটি পাবে, এতে যত মূল্যই লাগুক না কেন। আমি বুঝতে পারি তাঁর চিন্তার চরম সীমাটুকু। কারণ তিনি তো একটা যুদ্ধ জয় করার জন্য সংগ্রাম করছিলেন। অনেকেই অফিসে গেছে, কেউ সুখে ছিল না। কোন কোন শিক্ষায়তনে হয়ত পরীক্ষাও হয়েছে। কিন্তু তাজউদ্দীন সেটা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এই শত্রুর সাথে কোনভাবেই সহযোগিতা নয় এবং

কোনভাবেই যেন শত্রু বলতে না পারে, দেশের অবস্থা তো স্বাভাবিক। সে জন্যই তিনি মাঝে মাঝেই এমন কথা বলেছেন। বেতার ভাষণেও বলেছেন। যেগুলো হয়ত দেশের মানুষ পুরোপুরি বুঝতে পারেনি।

আমাদের উপরে বিরাট বড় চাপ ছিল। এক কোটি শরণার্থী। এ যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এটা ভারত সরকার যেমন বুঝেছিলেন, তেমনি তাজউদ্দীনের এতে কোন সন্দেহ ছিল না, এই ভার দীর্ঘদিন ভারত বহন করতে পারবে না। আমরা এখন ওয়েলকাম আছি, দু'দিন পরেই তা থাকব না। পরবর্তীকালে অনেকেই বলেছেন, যুদ্ধ যদি আরও বেশি দিন চলত তবে আমরা আরো অনেক কিছু শিখতে পারতাম। কিন্তু এটি সেই পরিস্থিতিতে হয়ত সম্ভব নাও হতে পারত। যুদ্ধে অনেক দ্বন্দ্ব দেখেছি, তবে মারাত্মক যে দ্বন্দ্ব সেটা আদর্শগত, যা পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র ছিল—সে ব্যাপারেই তাজউদ্দীন এবং অন্যান্য মন্ত্রী একযোগে কাজ করেছেন ষড়যন্ত্র রুখবার জন্য । ওই একমাত্র একটি লোক মোশতাকের শয়তানি ছাড়া সরকারে আর কোন দ্বন্দ্ব ছিল না ।

সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে তাজউদ্দীন একটা শান্তির সময়ের সরকারের মত প্রতি মুহূর্তে ক্যাবিনেট মিটিং করতে পারেননি। তাঁকে অনেক সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে নিতে হয়েছে। যখন শিলিগুড়িতে বিশেষ সভা ডাকা হল যেখানে তাজউদ্দীনকে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তাজউদ্দীনের জন্য খুব সঙ্কটপূর্ণ ছিল মুহূর্তটা এবং তাঁকে বোঝাতে হয়েছিল প্রাণপণ প্রচেষ্টায়। আমার যতটুকু জানা আছে, সেখানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দীনকে যথেষ্ট সমর্থন দিয়েছিলেন এবং সেই সমস্ত সমালোচনার জবাব দিতে সাহায্য করেছিলেন । এটা মানতেই হবে, প্রবাসী সরকার সম্পর্কে নানারকম সমালোচনা ছিল এবং সে সমালোচনাগুলো গণতান্ত্রিকভাবেই তাজউদ্দীনকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

শিলিগুড়ির সভার শেষে তাজউদ্দীনের সাথে আমার দেখা হয়েছে। তাঁকে খুব বিধ্বস্ত মনে হয়েছিল, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। একটা বড় রকমের সঙ্কট বা বাধা কাটিয়ে এসেছেন, আমার এটাই মনে হয়েছিল ।

বড় একটি সমস্যা ছিল। মুজিব বাহিনীর ব্যাপারে ভারত সরকারের ভূমিকা সেখানে বেশ অস্পষ্ট ছিল । চাণক্যনীতি গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা । এখানে ভারতের দিক থেকে যৌক্তিকতা হল যে তাঁরা জানেন না এই যুদ্ধের ফলাফল কী হবে, যদি কোন কারণে তাজউদ্দীনের সরকার ব্যর্থ হয় অথবা তাজউদ্দীন

সরকার দেশে ফিরে গিয়ে দেখে যে একটা বিকল্প সরকার হয়ে গেছে তখন সে অবস্থার মোকাবেলা কীভাবে করা যাবে! ভারত সরকারের আস্থাভাজন অথচ একটা বিকল্প শক্তির দরকার ছিল। সেই জন্য হয়ত তাঁরা বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছিলেন। তার ফলে দৈনন্দিন ভিত্তিতে তাজউদ্দীনকে খুবই সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

যে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছিল ভেতর থেকে তাতে মনে হচ্ছিল মুজিব বাহিনী আমাদের সরকারি যে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা, তাদের চাইতে উন্নততর প্রশিক্ষণ পেয়েছে, উন্নত অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে, তারা একটা প্রিভিলেড্ বাহিনী এবং তাদের প্রধান আনুগত্য প্রবাসী সরকারের প্রতি ছিল না, তাদের আনুগত্য ছিল তাদের গ্রুপের যিনি অধিনায়ক তাঁর প্রতি। তারা বাংলাদেশের আসল যোদ্ধা, প্রতিনিধি, এটাই তারা মানুষকে বোঝাতে চেয়েছে । এটা বলার মানে হচ্ছে কার্যত প্রবাসী সরকারের যে মর্যাদা, তার যে বৈধতা, সার্বভৌমত্ব, তাকে অস্বীকার করা। কারণ যুদ্ধটা ছিল ব্যাপক, বিশাল, বড় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত যে সরকার সে সরকারের অধীনে। কিন্তু মুজিব বাহিনী আলাদা অধিকারপ্রাপ্ত একটা দল হিসেবে নিজেদেরকে ভাবতে শুরু করল। ভেতরে গিয়ে বলতে শুরু করল, আমরা প্রবাসী সরকারকে চিনি না, আমরা তাজউদ্দীন সরকারকে চিনি না। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ।

যখন এই সমস্ত খবর আসতে শুরু করল তখন শুধু তাজউদ্দীন নয়, আমরা যারা নাকি একটু দূরের অথবা যারা নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলাম না, আমরাও খুব দুঃখিত এবং উদ্বিগ্ন বোধ করলাম । ভারতের প্রভাবশালী নাগরিক যাঁদের সাথে দেখা হত তাঁদের কাছে এইসব কথা আমরা তুলে ধরেছি। যখন জানতে পারলাম প্রয়াত মৈত্রেয়ী দেবী ইন্দিরা গান্ধীর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু তখন তাঁকে আমি বিষয়টি বুঝিয়ে বললাম। তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি আমাকে একটা স্মারকলিপি লিখে দিন। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমি দেখা করব। এই ব্যাপারেই কথা বলতে তাঁর কাছে আমি যাব।' তারপর আমি জানি না মৈত্রেয়ী দেবী কী করেছিলেন। আমি সে রাতেই একটা মেমোরেন্ডাম লিখে দিয়েছিলাম।

এই যে একটা বিভেদমূলক ব্যাপার চলছে, তাতে করে বাংলাদেশের বৈধ সরকার বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে, আর একটা ডিসিপ্লিনের ব্যাপার তো আছেই। তাছাড়া যুদ্ধের উদ্দেশ্যটাই নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। এদের সম্পর্কে ভারতের

নীতিটা কী? এটা তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য ধ্বংসাত্মক হচ্ছে। ভারত যদি আমাদের সরকারকে হসপিটালিটি দিয়েই থাকে, সমর্থন দিয়েই থাকে, তাহলে এই সরকারকে কেন তারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল করছে, এটা তাদের কী ধরনের চাল? এই মুজিব বাহিনীর বিষয়টি প্রতি মুহূর্তে তাজউদ্দীনের জন্য বিরক্তি এবং চিন্তার বিষয় ছিল।

দুটো ঘটনা মনে পড়ে। একদিন এক যুবক ধরা পড়ল তাজউদ্দীনের ঘরে, যাকে নাকি তাজউদ্দীনের রাজনৈতিক শত্রুরা পাঠিয়েছিল তাজউদ্দীনকে ঘায়েল করার জন্য, হত্যা করার জন্য । সেই যুবক সেখানে গিয়ে স্বীকার করে ফেলল, আমাকে এই কাজে পাঠানো হয়েছিল, আমি এখানে এসে মন বদলেছি। ছেলেটিকে তাজউদ্দীন ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাজউদ্দীন নিজের কথা এত কম বলতেন যে, এই ঘটনাকে সাংঘাতিক বড় কোন ঘটনা হিসেবে গুরুত্ব দিতে তিনি চাননি । একদিন যথারীতি আমি তাজউদ্দীনের কাছে গিয়েছি। তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে প্রথমেই গিয়ে আমরা তাঁর শোবার ঘর সংলগ্ন বসবার ঘরে বসতাম এবং দুটি ঘরের মধ্যে যে দেয়াল ছিল সেটা তেমন কিছু কঠিন দেয়াল ছিল না। শোবার ঘরে কী কথা হত না হত সবই শোনা যেত। আমি সে দিন সেই ঘরে ঢুকেই খুব উত্তপ্ত কথাবার্তা শুনতে পেলাম। বিষয়টি ছিল মুজিব বাহিনীকে কেন্দ্র করে। খুব তীব্রভাবে তিনি বলছিলেন, 'এই বিভেদের মধ্য দিয়ে তোমরা মুক্তিযুদ্ধকে বাধা দিতে চাও, কিন্তু এর ফলে কেউ উপকৃত হবে না। ইনাফ ইজ ইনাফ, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।' আমি মণিকে মুখ চুন করে বেরিয়ে যেতে দেখলাম ।

সেদিন স্পষ্টতই এই বিষয়ে মণির সাথে তাঁর শোডাউন মত হয়েছিল । তাজউদ্দীন সাহেব খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন মণিকে এবং মুখোমুখি জানতে চেয়েছিলেন যে, তোমরা কী করছ ? তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে পরে বললেন খুব বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে যে, 'এভাবে একটি সরকারের পাশাপাশি মুজিব বাহিনীর কার্যক্রম চলতে পারে না। এটা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এখানে বাংলাদেশের জনসাধারণের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে আমি এবং আমার সহকর্মীরা সমস্ত কিছু সংগঠিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছি, আর এখন বাংলাদেশের আর একটি দল যদি আমাদের দুর্বল করার চেষ্টা করে, হেয় প্রতিপন্ন করে, এটাকে আমরা অবশ্যই ভাল চোখে দেখতে পারি না। এটাকে আমরা মনে করি যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। আমার মনোভাব আমি মণিকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছি।'

এদিকে খন্দকার মোশতাক যখন বিভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট এবং অনেক দূর এগিয়ে গেছে তখন তাজউদ্দীন সাহেব ঘটনাটি জানতে পেরে পরিষ্কার বললেন, 'আমাদের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা অথবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি কোনটাই আলোচনার শর্ত হতে পারে না। জীবিত অবস্থায় সসম্মানে আমরা বঙ্গবন্ধুকে ফেরত চাই । এবং আমরা যুদ্ধে জয়লাভও করতে চাই। ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা এই দুটোই অর্জন করব।' এই কথাটি তাজউদ্দীন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং এই মনোবল তাঁর ছিল। এটাই তাঁর কৌশল ছিল। তিনি যুদ্ধের প্রতি গুরুত্ব শিথিল করতে রাজি ছিলেন না এবং কোন রকম আপস-আলোচনায় তিনি যেতে চাননি। খুব শান্তভাবে তিনি একটি কাজ করলেন, এটি যে একটি হাই ড্রামা আমাদের বুঝতেও দিলেন না।

খন্দকার মোশতাক যে প্ল্যানটি করেছিল যে, বিদেশের মাটিতে গিয়ে বন্ধুভাবাপন্ন দেশ অর্থাৎ ইরানে গিয়ে পক্ষ পরিবর্তন করবে, একটা আপস ফর্মুলা ঘোষণা করবে পাকিস্তানের সঙ্গে, যেভাবেই হোক এই খবর তাজউদ্দীনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ভারত সরকার এই বিষয়গুলো জেনে গিয়েছিল। আমাদের ভেতরে যে সূত্রগুলো ছিল তা থেকেও আন্দাজ পাওয়া গিয়েছিল। তাজউদ্দীন খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিলেন, বার্তা পাঠালেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে যে, খন্দকার মোশতাক নয়, আপনি যাবেন জাতিসংঘের অধিবেশনে। খন্দকার মোশতাক বাদ হয়ে গেল। এত সহিষ্ণু মানুষটি, সবার সাথে এত বিনীতভাবে কথা বলেন, কিন্তু প্রয়োজনের সময় কী রকম প্রখর তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব তাজউদ্দীন দেখাতে পারতেন আমার বেশ মনে আছে। তেমনি একটি ঘটনা হল খন্দকার মোশতাককে প্রতিহত করা ।

তাজউদ্দিনের ন'মাসের প্রবাসী জীবনে সঙ্কট কম বার আসেনি, বেশ অনেক বার এসেছে, তাঁর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে । তাঁর নেতৃত্বলাভের পরের কর্মকাণ্ড নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে, অনেক প্রতিরোধ, অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু তাজউদ্দীনের মধ্যে নমনীয়তার পাশাপাশি দৃঢ়তা ছিল বলেই তিনি পেরেছিলেন সেগুলো সামলাতে। তাজউদ্দীনের সাথে সৈয়দ নজরুলের অত্যন্ত সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল বলেই মনে হয়েছে। নয়ত আমরা এত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি যে, কোন না কোন ভাবেই প্রকাশ পেত দ্বন্দ্ব। তাঁর সাথে কোনরকমের দ্বন্দ্ব হয়েছে এটা আমার জানা নেই ।

তাজউদ্দীন সাহেব যেমন প্রতিটি ব্যাপারে জড়িত থাকতেন, তাঁকে মাথায়

একই সঙ্গে বিভিন্ন রকম চিন্তা নিয়ে চলতে হত। যেমন রণাঙ্গন থেকে খবর আসছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কোন্ দিকে যাচ্ছে তা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে, দিল্লীর সরকারের সাথে তাঁর সম্পর্ক ঠিক রাখতে হচ্ছে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হচ্ছে, প্রশাসন চালাতে হচ্ছে, অর্থাৎ সমস্ত কিছুর উপর সুপারভিশান চালাতে হচ্ছে। সুতরাং তিনি সবসময়ই কোন না কোন কিছুতে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু সৈয়দ নজরুল সাহেবকে আমার কাছে মোর রিল্যাক্সড্ মনে হত। এটা এমনও হতে পারে তাজউদ্দীনের উপর তিনিও খুব নির্ভর করতেন। নজরুল সাহেবের সাথে আমার দেখা হত, কুশল বিনিময় কথাবার্তা হত । আমি তাঁকে উৎকণ্ঠা-উদ্বেগমুক্তই দেখতাম । হতে পারে ওঁর স্বভাবটাই ওরকম ছিল ।

এখন আমি একটা অ্যানালিসিস দিচ্ছি, আমার বিশ্লেষণ হচ্ছে, তাজউদ্দীন সরকার গঠন করলেন, প্রবাসী সরকার—সেখানে তিনি একবার গৃহীত হয়েছেন। যদিও এই সমালোচনা তাঁর বিরুদ্ধে করা হয়েছে যে, কারো মতামত নিয়ে তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী করেননি, কিন্তু মতামত নেবার মত পরিস্থিতি বা সুযোগ কোনটাই সেই মুহূর্তে ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে তাজউদ্দীনের পক্ষেই এসেছিল, কারণ আওয়ামী লীগের সদস্যরা সম্ভবত এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, একবার যদি তাজউদ্দীন ভারত সরকারের কাছে গৃহীত হয়ে থাকেন এবং সরকারের কর্মকাণ্ড শুরু করে থাকেন, তাঁকে কোনরকমে স্থানচ্যুত করতে গেলে গোটা বাংলাদেশ আন্দোলন, গোটা বাংলাদেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টা বিঘ্নিত হবে । আমাদেরকে আশ্রয়দানকারী সরকার আমাদের সম্পর্কে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন এবং সংশয়ে পড়ে যাবে যে কাদের সঙ্গে ডিল করছি, এরা এত বিভক্ত যে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে সহ্য করতে পারছে না! শেষ পর্যন্ত নেতারা বুঝেছেন যে ক্ষতি হবে। এর ফলে তাজউদ্দীনের প্রধানমন্ত্রী হবার সঙ্কটটা সামলানো সহজ হয়েছে।

তাজউদ্দীন ভারত সরকার এবং ইন্দিরা গান্ধীর সাথে যোগাযোগের দায়িত্বে ছিলেন। যে ব্যক্তিটি তাঁকে সরিয়ে সামনে আসবে সেই ব্যক্তিটি ইন্দিরা গান্ধীর কতখানি কাছে পৌছতে পারবে সেটাও তো চিন্তায় ছিল। তাজউদ্দীনের সাথে ইন্দিরা সরকারের একটা ওয়েভলেংথ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল ততদিনে। এবং একটা অসংগঠিত পরিস্থিতি ভারত সরকারের কাছে উপস্থাপন করা ঠিক হবে না, এই অবস্থা বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলজনক ফলাফল বয়ে আনবে না, এইটিই শেষ পর্যন্ত কাজ করেছিল বলেই আমার বিশ্বাস ।

তারপর সিভিল সার্ভেন্ট যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে অ্যাকোমডেট করা, স্থান দেয়া, এই একটা সমস্যা ছিল । এর সমাধান তিনি দিয়েছিলেন। দেশের ভেতরে হয়ত কোন এক এমপি-র আত্মীয় কি পরিবার কোন এক সমস্যায় পড়েছেন, তাঁদেরকে হয় উদ্ধার করা অথবা স্থানীয়ভাবে তাঁদেরকে সাহায্য করা—এমন সাহায্যও প্রধানমন্ত্রীর কাছে চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে এসে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেশের ভেতরে থেকে যাওয়া একটি পরিবারের জন্যে প্রধানমন্ত্রী কী করতে পারেন সে রকম সাহায্যও তাঁর কাছে চাওয়া হয়েছে । এখন অসম্ভব শোনালেও সেই সময়ে এমন অনেক কিছুরই আবেদন আসত। তাদেরকেও দেখতে হত। এছাড়াও মোশতাকের গোপন সূত্র ছিল অর্থের, টাকাপয়সার । বিনা প্রয়োজনে সে টাকা দিত লোকদের, সেই টাকা কোথা থেকে আসত জানি না। এই অর্থ দিয়ে যারা তার পক্ষে কথা বলতে পারবে সেইসব লোককে সে বেশ খুশি রাখতে চেষ্টা করত। হয়ত যাদের সাথে মিলে সে ষড়যন্ত্র করত তাদের কাছ থেকে পাওয়া টাকাই হবে সেটা ।

যাই হোক, দেশের ভেতর যেসব সমস্যা ছিল ওই ৮ থিয়েটার রোডে বসে বসে তাজউদ্দীনকে তার সমাধান দিতে হত। তারপর কত রকম অসুবিধা, থাকার জায়গা নেই বা ভাল নয়, আর্থিক দিক দিয়ে সমস্যা, সব কিছু ওঁকে দেখতে হত । কেউ যখন ওঁর কাছে কোন আবেদন নিয়ে আসত তখন তাজউদ্দীনকেই একটা পন্থা, উপায় বের করে দিতে হত। নেহাত না পারলে বোঝাবার চেষ্টা তিনি করতেন। খুব নমনীয়ভাবে মোলায়েমভাবে বোঝাতেন। আবার কখনও খুব উত্তেজিত হতেন, কারণ মানুষ মাঝে মাঝে এত অসম্ভব অবাস্তব কথা নিয়ে আসত যে রেগে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। কতকগুলো অঘোষিত ক্যাম্প ছিল অমুক একজনের একটা পরিমণ্ডল, আর এক জনের আরেকটা পরিমণ্ডল স্থানীয় লোকদের নিয়ে। যেমন, পাবনার যাঁরা ছিলেন তাঁরা যেতেন পাবনার শক্তিশালী এমপি-র কাছে। ওই রকম অন্যদিকের এমপি তার দিকে আনত কিছু লোককে। তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক টেনশনের ব্যাপার ছিল, অমুক অমুক হলে আমি কেন হব না, পদমর্যাদার সমস্যা এগুলোও তাজউদ্দীনকে সামলাতে হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি মিটিয়ে দিতে পারতেন, আবার অনেক সময় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁকে অনেক বিরূপ কথাবার্তাও শুনতে হয়েছে। তাঁকে বকাঝকাও দিয়েছে, দোষীও করেছে।

আমার একটি কথা বিশেষভাবে মনে আছে, যে দিন ভারত আমাদেরকে স্বীকৃতি দিল, ৬ ডিসেম্বর ভারত যখন যুদ্ধের জন্য তৈরি, সে দিন তাজউদ্দীন

কিন্তু কেঁদে ফেলেছিলেন সাংবাদিকদের সামনে। তাজউদ্দীনের সাথে শেখ সাহেবের কী যে সম্পর্ক ছিল সেটা আমি বুঝতে পারিনি। সে দিন তাজউদ্দীন না কাঁদলে আমি খুশি হতাম হয়ত। সে দিন তাজউদ্দীন বললেন, 'বাংলাদেশের আজ জন্ম হল। পৃথিবীর একটি প্রধান রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। এবং এই রাষ্ট্রের যিনি সত্যিকার জনক তিনি এই দৃশ্যটি দেখবার জন্য উপস্থিত নেই। তিনি এই ঘটনাটিতে অংশ নেয়ার জন্য এখানে নেই । আজ তাঁর অনুপস্থিতি আমি অন্তরাত্মা দিয়ে উপলব্ধি করছি।' তাজউদ্দীনের চোখ দিয়ে বেশ খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ল। দেশে যুদ্ধ চলছে, এক অর্থে তাজউদ্দীন কিন্তু সেই যুদ্ধের জনকও । তাই বলছিলাম, প্রধানমন্ত্রীর চোখ দিয়ে জল পড়বে কেন। জল যদি থাকেই সেটা অনুভবে থাকবে। বুঝতে পারছি তাঁর আন্তরিকতা, নেতার প্রতি তাঁর আনুগত্য ভালবাসা। এটা পরিষ্কার, তাজউদ্দীন সৎ মানুষ ছিলেন, চোখের পানি চেপে রাখতে পারেননি।

তাজউদ্দীনের ডায়াবেটিস ছিল, তাই বেছে খাবার খেতে হত। তাঁর প্রতিদিনের রেশনে ছিল একটু সাদা ভাত, এক টুকরো মাছ, ডাল, সিদ্ধ সবজি। সকালের নাস্তা ছিল খুবই হালকা—এক পিস রুটি টোস্ট, সামান্য সবজি। আর যখন আমরা গেছি তখন ঠিক এক কাপ চা তিনি আমাদের দিতেন। এর বেশি কিছু তিনি দাবি করেননি। অবশ্য চাইলে যে এর চাইতে ভাল তিনি পেতেন না তা নয় । কিন্তু এমন খাবার তিনি গ্রহণ করতে চাননি যা কিনা তাঁর এই জীবনের সঙ্গে আর রণাঙ্গনে অথবা ধানের খেতে শীতের রাতে ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা যা খায় তার সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। এ রকম কোন খাবারই খেতেন না । তাঁর গোটা দুই শার্টের বেশি ছিল না। নিজের হাতে কাপড় ধুতেন যা আমি নিজের চোখে দেখেছি। উঠে গিয়ে বসে শার্টটা ধুয়ে আবার আলোচনা শুরু করতেন। সব চাইতে বড় কথা, জোহরা তাজউদ্দীনের সাথে নয় মাসে ক'বার দেখা হয়েছে তাঁর ? আমার তো মনে হয় না দু-একবারের বেশি দেখা হয়েছে। এটাও তো অসাধারণ এক ব্যাপার। তাঁর জন্য তখন তো স্ত্রী-পুত্র বলতে বাংলাদেশের যুদ্ধ । তিনি শপথ করেছিলেন যে, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন যাপন করবেন না।

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করতাম, যে সমস্ত মানুষ মুখ খুলে তাঁর কাছে কিছু চাইতে পারত না বা চাইবে না তাদের প্রতি তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি নিজে খুব কঠিন জীবনযাপন করেছেন। অন্যরাও অনেকেই খুব দুঃখে জীবনযাপন করেছেন । যারা শরণার্থী হয়ে গেছে সর্বস্তরে, তাদের মধ্যে

যাদেরকে তিনি চিনতেন তাদেরকে তিনি কাজ দিয়েছিলেন সরকারের জন্য, দেশের জন্য। তাদের অভাব-অসুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যখনই পেরেছেন নিজে গিয়ে সশরীরে হাজির হয়েছেন দুই-এক শ' টাকা নিয়ে । তখন কলকাতায় যারা ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা হাঁড়ির মধ্যে চাল-ডাল-নুন-কাঁচকলা-পেঁয়াজ দিয়ে একটা খিচুড়ি বানিয়ে দুই বেলা দুপুর এবং রাতে নিয়মিত খেত হঠাৎ করে তাদের হাতে একশ' দুশ' টাকা আসা, প্রধানমন্ত্রীর স্বয়ং ঘরে এসে পৌঁছে দিয়ে যাওয়া, বুঝতে পারা যায় এর তাৎপর্য কী হতে পারে ? কী উপলব্ধি ঘটায় ? তাজউদ্দীনের মানবিক গুণের কোন তুলনা নেই। ওঁর মানবিক গুণের কোন তুলনা আমি পাই না ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একটা ঈদ হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষের জন্য সেটা তো আর আনন্দের ঈদ ছিল না, আমাদের সবার মন তো ভারাক্রান্ত, তবু তো আমার ছোট্ট একটা সংসার ওখানে ছিল। যতদূর মনে পড়ে আমার, ঈদ উপলক্ষে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে আগের দিন রাতে তিনি আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে বললেন না কেন হঠাৎ করে প্রধানমন্ত্রী আমাদের সেই আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের নিচতলার ফ্ল্যাটে চলে এলেন। আমি যখন এদিকে তখন তিনি রান্নাঘরে গিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে কথা বললেন এবং হাতে ক'টা টাকা গুঁজে দিলেন। এই মানবিক টাচটা তুলনাহীন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি হয়ত অন্য আরো কারো কারো কথাও মনে করেছিলেন। যদিও আমাদের কারো মনে সেই যুদ্ধদিনে অনুভব ছিল না যে ঈদ বলে কিছু আছে। তিনি হয়ত ভাবলেন, এই মানুষগুলো তো আমার চারিদিকে আছে, এদের পরিবার আছে, আমার পরিবার থেকে আমি না হয় দূরে থাকছি। এই যে একটা অনুভূতি, শত ব্যস্ততার মাঝে মানুষটি নিজে চলে এলেন, এটি আমাদের জন্য খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল।

আমি বলব, দুষ্ট লোকের মতামতের প্রতি তিনি কখনই আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর নিজের খুব স্পষ্ট, খুব তীক্ষ্ণ এবং দৃঢ় মতামত ছিল । মতপার্থক্যের ব্যাপারে তিনি তাঁর পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট করে দিতেন এবং সেই পার্থক্যটা ন্যায়ের পক্ষে ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। এটা অহমিকার ব্যাপার নয়। বিশ্বাসের ব্যাপার । পরমতসহিষ্ণুতা তো গণতান্ত্রিক, সেই অর্থে তিনি গণতান্ত্রিক, কিন্তু অযৌক্তিক অপ্রয়োজনীয় যে কোন কিছুর সাথে তো আবার একমত হওয়া যায় না।

তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস ছিল, বোধ ছিল, যে কেউ এসেই তাঁকে মানিয়ে নিতে পারত না, তাঁকে বোঝাতে হত। এবং তাঁর সার্বিক কল্যাণের একটা বোধ ছিল বলেই, একটা দারুণ অঙ্গীকার ছিল বলেই তাঁর পথটা তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল । তা না হলে এত বিরোধিতা, অসাধু ষড়যন্ত্রমূলক কথাবার্তা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ এগুলো থেকে বেঁচে তিনি কী করে পরিচালিত করলেন সমস্ত মুক্তিযুদ্ধটা! সবার সঙ্গে সবসময় একমত হলে চলে! ঠিক আছে, তোমার মতটা আমার মতের সঙ্গে মিলছে না, ঠিক আছে তুমি তোমার মত নিয়ে থাক। কিন্তু যেহেতু আমি দায়িত্বে আছি তাই আমি আমার মতটা নিয়ে চলব, অবশ্যই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমি সবার সাথে যোগাযোগ করে চলব। তাঁর নিজস্ব মত ছিল, যে মতে তিনি অন্য মানুষকে আনবার চেষ্টা করতেন। এটা দুর্বলের সারেন্ডার না। যুক্তির মধ্য দিয়ে আসতে হবে। কার মন পরিষ্কার তিনি তা জানতেন ।

একটা অসাধারণ গুণ ছিল তাজউদ্দীন ভাইয়ের যা নাকি অনেকের মধ্যেই থাকে না । সেটা হল আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী খুব চট্ করে তিনি ধরে ফেলতে পারতেন । সে সব ব্যাপার তাঁর নীতিকে প্রভাবিত করত। সেগুলো উপলব্ধির ব্যাপারে যাঁরা ধীর ছিলেন, তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারতেন না, তাঁদের সাথে তাঁর একটা দূরত্ব থেকে যেত। এই দূরত্বটা কখনও কখনও তাজউদ্দীনের দুঃখের কারণ হয়েছে। তাঁকে অযথা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বোঝাতে হয়েছে যে এই অগ্রগতি দেখে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি এবং এটা এ রকম হওয়া প্রয়োজন । রেগে যেতেন কখনও কখনও ।

তিনি বলতেন, 'আমি স্লো বিল্ডার, ধীর নির্মাতা।' ওই যে পরিকল্পনা সেল সেট আপ করা হল, এর পেছনে শুধু যে ভবিষ্যৎ প্ল্যান করার মহৎ উদ্দেশ্যই ছিল তা নয়, জাঁদরেল জাঁদরেল অধ্যাপক, অর্থনীতিবিদ ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভবঘুরের মত, এঁদের ঠাঁই দেয়া, এঁদেরকে কাজ দেয়া, লিখবার সুযোগ দেয়া এটাও একটা কারণ ছিল। এবং কিছু চিন্তাভাবনা হোক এটাও ছিল ।

তাজউদ্দীন প্রশাসক হিসেবে আশা করতেন প্রতিটি মানুষ, যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে গেছে তারা নিজেদেরকে সৈনিক মনে করবে। তিনি সৎভাবে কাজ করার দায়িত্ব সবটুকুই ব্যক্তির উপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন । তিনি প্রতিদিন ডেকে কাউকে ধমকাতেন না । তিনি চাইতেন সব লোক সততার সাথে কাজ করুক। যেখানেই তিনি কিছুমাত্র অব্যবস্থা দেখেছেন সেখানেই তিনি শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করেছেন। এটাও আমি জানি যে, দুই-এক জায়গা থেকে মানুষ

সরিয়ে আনা আবার দু'এক জায়গায় সরিয়ে দেয়া, এটাও তিনি করেছেন। কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কভাবে বিচক্ষণতার সাথে কাজটি করতেন যাতে সেই মানুষটি মনে কষ্ট না পায়। তাঁর প্রতিটি মানুষের উপর বিশ্বাস ছিল যে, এই মানুষটি আমার মাথা নিচু করবে না, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পথে পরিচালিত হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর এই বিশ্বাসটি ফলপ্রসূ হয়েছিল।

তাজউদ্দীন সহজে আদর্শবাদ থেকে বিচ্যুত হওয়া মানতে চাইতেন না । তিনি সাধারণভাবে বিশ্বাস করতেন যে, পরনির্ভরশীলতার মাধ্যমে যে উন্নতি সে উন্নতিকে আদৌ উন্নতি হিসেবে দেখা যাবে কিনা, এবং সেই উন্নতির জন্য বড় মূল্য দিতে হবে কিনা। সাহায্য আমাদেরকে পরনির্ভরশীল করে রাখবে বা মাথা নত করে রাখবে এই চিন্তাটি তাজউদ্দীন সাহেব করতেন।

তাজউদ্দীনকে সোশালিস্ট বলা যাবে না। তিনি মিশ্র অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন, আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ, অঙ্গীকারাবদ্ধ, সুতরাং সেই সমাজতন্ত্র করতে পারব না যেখানে ভোটারকে অগ্রাহ্য করা যায়। তিনি মানুষের সমতার কথা ভাবতেন। আবার এটাও পরিষ্কার বুঝতেন, সংসদীয় পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক স্বার্থে একটি অংশ সমতা চাইতে পারে না ।

তাজউদ্দীনের একটি অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। সাধারণত কেউ একটু বড় পজিশনে গেলে বা মন্ত্রী হলেই দেখা যায় লোকজন তাঁর চারিদিকে ঘিরে থাকে । কিন্তু তিনি কোন একটা পদ্ধতি ম্যানেজ করেছিলেন যে লোকজনকে তাঁর থেকে একটু দূরে রাখতে পারতেন, কাজ করার জন্য। কাজের সময়টুকু তিনি বের করে নিতেন। তারপর তাঁর যে চারিত্রিক সরলতা ও সততা, নিবিষ্টভাবে কাজ করতে পারার যোগ্যতা, আমার ধারণা এসব কারণেই ব্যুরোক্রেসি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করত।

দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা বাইরে থেকেই টের পাচ্ছিলাম শেখ সাহেবের সাথে তাজউদ্দীনের সম্পর্কে একটা চিড় ধরেছে। কিন্তু নিজে থেকে তিনি আমাদের কখনও কিছু বলেননি। কিন্তু শেষের দিকে বুঝতে পারছিলাম সম্পর্কটা এমন হয়ে গেছে যে, তাজউদ্দীন ক্যাবিনেটের বাইরে আসতে চাইছিলেন। তাঁর সেই সময়কার কথাবার্তায় আমরা কেউ কেউ ভেবেছি যে, হি ওয়াজ আস্কিং টু বি স্যান্ড্। নিজে মুখের ওপর পদত্যাগ না করে তিনি চাইছিলেন তাঁকে স্যাক করা হোক। তা না হলে তিনি এত বুদ্ধিমান ব্যক্তি,

এত খোলাখুলি কথা বলবেন কেন! এরপর পদত্যাগের ঘটনা ঘটল এবং তখন তিনি বলতেন, 'আমি মন্ত্রী ছিলাম শেখ সাহেবের আনুকূল্যে, কিন্তু আমি এমপি আমার নিজ যোগ্যতায়। আমি জনপ্রতিনিধি, আমি সংসদে যাব এবং কথা বলতে পারব। মন্ত্রী হিসেবে সেই অধিকারটা আমার ছিল না । কথা বলবার স্বাধীনতা আমি আংশিকভাবে ব্যবহার করেছি এতদিন, এখন স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারব।'

এর পরে একটা সময় আমি দেখতে পেলাম তাজউদ্দীন সাহেব খুব একা হয়ে গেলেন। নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন। আমার একদিনের কথা মনে আছে, তিনি আমার বাসায় এলেন। আমি এবং আমার স্ত্রী বাসায় ছিলাম । তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুরশিদ সাহেব, বলুন তো আমার কি কোন প্রয়োজন নেই?' আমার খুব কষ্ট হল । তাজউদ্দীন সাহেবের মুখে এই কথা শুনতে হবে এমন ভাবনা আমার কোন দিনই ছিল না। তিনি যে কোথাও বিলং করছেন না এটা তিনি বুঝতে পারছেন। এবং তাঁর যে কোন ভূমিকা নেই সেটা তিনি মিস্ করছেন। বঙ্গবন্ধু-তাজউদ্দীন এক সাথে রইলেন না, এত বড় একটা ক্ষতি হল, এত বড় একটা বিপর্যয়ের দিকে আমরা এগুচ্ছি, এই রকম কোন ভাবনা দলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যেত না। কামাল হোসেন হয়ত খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে দলের মধ্যে বিভক্তি দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না ।

তাজউদ্দীনের সেই দুঃখের দিনগুলোতে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় একত্রে হাঁটার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমরা কাছাকাছি বাড়িতে থাকতাম । তাই বিকেলে প্রায়ই দেখা হোত । আমার বাসায় কখনও এসেছেন, বসেছেন, কথা বলেছেন। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত থাকতেন । শেখ সাহেবের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকতেন, চিন্তিত থাকতেন । শেখ সাহেবের চারিদিকে যারা আছে সেই সম্পর্কে তিনি সংশয় এবং আশঙ্কা প্রকাশ করতেন। তাজউদ্দীন দেখতেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একেবারে ছায়াসঙ্গী হয়ে গেছে খন্দকার মোশতাক, বিষধর সরীসৃপটি । তাজউদ্দীন এটা দেখে খুবই বিচলিত হতেন। কারণ খন্দকার মোশতাকের আসল চেহারাটা আর কেউ না চিনুক, মুক্তিযুদ্ধের ওই নয় মাসে তাজউদ্দীন খুব ভাল করে চিনেছিলেন । তাই তাজউদ্দীন বলতেন, 'একদিন মুজিব ভাই তাঁর এই ভুলের প্রমাণটা পাবেন।' এই কথাটি তাজউদ্দীন আমাকে একাধিকবার বলেছেন । তবে তাজউদ্দীন কিন্তু সহজে নিন্দা করতেন না, খুব

চাপা লোক ছিলেন ।

আমি তাঁকে বলতাম যে, 'আপনি এত জানেন, এত বোঝেন, কেন আপনি চুপ করে আছেন ?' তিনি বলতেন, 'আমি যত চেষ্টাই করি না কেন, সব ধ্বংস না হয়ে গেলে কাউকে কিছু বোঝান যায় না।' তাজউদ্দীনের শেষ দিকে একটা যেন প্যারালিসিস অব দা উইল হচ্ছিল। ধ্বংস আসছে, কিন্তু ঠেকিয়ে রাখার কোন উপায় তাঁর জানা ছিল না –যেমন একটা ট্র্যাজেডি যখন গতিশীলতা অর্জন করে তখন তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না ।

তাজউদ্দীন বলেছিলেন, "আমরা মুজিব ভাইয়ের একটা ইমেজ গড়েছি, উচ্চ আসনে তাঁকে বসিয়েছি, ঠিক যেমন প্রতিমা গড়ার সময় কত রকম করে তাকে সাজানো হয়, কত কিছু দিয়ে তাকে সুন্দর করা হয়। আমরাও তেমনি তাঁকে সাজিয়েছি এবং তাঁর সেই সৌন্দর্যটাকেই অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই । কিন্তু তিনি নিজেই নিজের চেহারাটা খামচে, আঁচড়ে রক্তাক্ত করে ফেলছেন । এ ক্ষেত্রে আমার কিছুই করণীয় নেই, আমি কিছুই করতে পারছি না ।'

তাজউদ্দীন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু সরকার উদ্বিগ্ন। কী জানি, তাজউদ্দীন আবার কী করে বসে! তাজউদ্দীনের পেছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে, তাজউদ্দীনকে নজরে রাখা হয়—সেই তাজউদ্দীন যে তাজউদ্দীন বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে বাস্তবে, **১৯৭১** সালে যে যুদ্ধটা হয়েছে সেই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংগঠক তাজউদ্দীন। আমার মনে হয়েছে, তাজউদ্দীন ওয়াজ নট দেয়ার এনি মোর—দেহটা আছে, খোলসটা আছে, মনটা নেই। কোথায় যেন একটা মানুষের উপস্থিতিকে মনে হয় অনুপস্থিতি। মাঝে মাঝে এই

কথাগুলো মনে হয়। তাজউদ্দীনের সেই দিনগুলো আজও খুব কষ্ট দেয় আমাকে । জানি না আমি আমার অনুভূতিটাকে প্রকাশ করতে পারলাম কিনা, শেষ দিকে আমার এরকমই মনে হত ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি তাজউদ্দীনের ভালবাসাটা ছিল বড়ই খাঁটি। তাজউদ্দীন খুব গভীরভাবে বিশ্বস্ত ছিলেন তাঁর প্রতি। তাঁর অকল্যাণ হবে ভেবে তাজউদ্দীন অনেক কিছু সহ্য করেছেন। শেখ সাহেবের মনকে গুছিয়ে দিতেন যিনি, তিনি তো তাজউদ্দীন। এই দু'জনের জন্যই আমরা স্বাধীন হতে পেরেছি। আর এই দু'জনের দূরত্বটা তাঁদের জীবনের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি তো বটেই, এই দেশের জন্যও সেটা এক চরম ট্র্যাজেডি, অপূরণীয় ক্ষতি ।

[3.12.1996/4.11.1996/8.10.1996]

খান সারওয়ার মুরশিদ : শিক্ষাবিদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, রাষ্ট্রদূত। কমনওয়েলথ-এর সহকারী মহাসচিব।

গোলোক মজুমদার

তখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল। নির্বাচনে সবক'টি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানো সত্ত্বেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভুট্টো সাহেবের পরামর্শে আওয়ামী লীগকে সমস্ত পাকিস্তানের বৃহত্তম বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে মেনে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। কারণ তাহলে আওয়ামী লীগই হবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার গঠনের একমাত্র অধিকারী। শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁরই কোন সহকর্মীকে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের কল্পনার অতীত । তাই শুরু হল নানা রকমের টালবাহানা এবং নির্বাচনী রায়কে এড়িয়ে যাবার কূট অভিসন্ধি। সমস্ত আলাপ-আলোচনায় শেখ সাহেব এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একটিমাত্র দাবি, নির্বাচনী রায়কে কার্যকর করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নেতৃবৃন্দকে এবং তাবৎ বাঙালি জনসাধারণকে বরাবরই অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখেছেন। বাঙালি জনসমাজ তাঁদের অত্যাচারে জর্জরিত। বাণিজ্য, শিল্প, অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা, সর্বক্ষেত্রেই বাঙালিরা বঞ্চিত। এমনকি বাংলা ভাষার ওপর তাঁদের বলাৎকার, বাঙালি সংস্কৃতি তাঁদের চক্ষুশূল। রবীন্দ্র সাহিত্য ও সঙ্গীতের কণ্ঠরোধে তাঁদের নিত্যনতুন প্রচেষ্টা । শেখ সাহেবের বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত বাঙালির এই দাবি তাঁদের কাছে অন্যায় এবং অসহ্য বলে মনে হল । বাঙালিরাও জানিয়ে দিলেন, সে ক্ষেত্রে তাঁদের পাকিস্তান থেকে বিদায় নিতে হবে। ভুট্টো সাহেব ঢাকা থেকে নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন, নিষ্ক্রান্ত হলেন ইয়াহিয়া খানও ।

যাবার সময় নির্দেশ দিয়ে গেলেন দুর্বিনীত বাঙালিদের শায়েস্তা করতে । শুরু হয়ে গেল পশ্চিমা সশস্ত্র বাহিনীর তাণ্ডব। রাজধানী ঢাকায়, জেলা ও মহকুমা শহরে, রেল স্টেশনে, বন্দর ও বিমান ঘাঁটিতে, এমনকি গ্রামেগঞ্জে ত্রস্ত, বিহ্বল বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র লালসামত্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, শাসক সম্প্রদায় এবং তাদের সাহায্যপুষ্ট অবাঙালি আনসার ও মুজাহিদ দল । আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার, পুলিশ বাহিনীর কিছু অংশ তাদের নিরস্ত্র করার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াল এবং ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানাল । শেখ সাহেবের পূর্বঘোষিত

নির্দেশে তখন সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান বন্ধ, দেশব্যাপী হরতাল এবং জনজীবন অচল। ভারতের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের এই অভূতপূর্ব ঘটনাবলীর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কর্মীরা এবং অন্যান্য কয়েকটি সংস্থা। গণবিক্ষোভ ও সন্ত্রাসের ঢেউ সীমান্ত ছাড়িয়ে ভারতে আছড়ে পড়তে পারে বলে এই সতর্কতা।

১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ । খবর এল, আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোনও নেতা, হয়ত বা শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং, কুষ্টিয়ার মেহেরপুর অঞ্চলে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শোনামাত্র তাঁর সাথে কথা বলতে রওনা হয়ে গেলাম । সন্ধ্যার মুখে উপস্থিত হলাম নদীয়া জেলার টুঙ্গি সীমান্ত চৌকিতে। সঙ্গী কর্নেল চক্রবর্তীর চেষ্টায় মেহেরপুরের তৎকালীন মহকুমা শাসক তৌফিক এবং পুলিশ অধিনায়ক মাহবুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল । তাঁরা জানালেন, শেখ সাহেবকে দেখা যায়নি, তবে অন্য দুইজন নেতা এখানে আত্মগোপন করতে এসেছেন এবং মুসলিম লীগ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাঁদের প্রাণে বাঁচা কঠিন। অনেক অনুরোধ ও আশ্বাসের পর তাঁরা আমাকে ওই দুই নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন । একজন হলেন তাজউদ্দীন আহমদ এবং তাঁর সঙ্গীর নাম আমীর-উল ইসলাম। তাঁদের পরনে ছিল ময়লা গেঞ্জি ও লুঙ্গি। ক্লান্ত মুখে চার-পাঁচ দিনের দাড়িগোঁফ, পায়ে রাবারের ছেঁড়া চটি। একেবারে কৃষকের সাজ। অনাহারে- অর্ধাহারে শরীর দুর্বল, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ।

তাজউদ্দীন সাহেব জানালেন, সামরিক বাহিনীর চরম আঘাতের ঠিক আগে শেখ সাহেবের নির্দেশমত তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। কথা ছিল শেখ মুজিবও তাঁদের সঙ্গে আসবেন, কিন্তু পূর্বনির্ধারিত স্থানে ও সময়ে তাঁর দেখা মেলেনি । বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন সেনাবাহিনী পথেঘাটে বেরিয়ে পড়ল তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে ও আমীর-উল ইসলামের হাঁটা শুরু করতে হয়। শেখ সাহেবের কোন খবর তিনি আর পাননি এবং তাঁর জন্য তিনি উদ্বিগ্ন। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, দেশের ভেতরে প্রতি পদক্ষেপে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিপদ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত, কিন্তু ভারতে আশ্রয় নিতে তিনি আগ্রহী নন, কেননা শেখ সাহেবের সুস্পষ্ট নির্দেশ যে ভারতই বাঙালির শেষ সম্বল, সুতরাং এমনকিছু যেন না করা হয় যাতে ভারত ব্রিত বোধ করে ।

সার্বিক অবস্থার বিশদ পর্যালোচনা করে যখন তাঁকে বোঝানো গেল যে পূর্ব পাকিস্তানে থাকা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়, যোগ্য নেতার অভাবে গণবিক্ষোভ স্তিমিত হয়ে যাবে এবং তিনি এলে ভারত কোনভাবেই বিব্রত হবে না, তখন তিনি স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে যান। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে আসেন এবং আমাদের সঙ্গে কলকাতা রওনা হন । পথে কিছু আনসার ও মুসলিম লীগ সদস্য অন্ধকারে তাঁকে আক্রমণের চেষ্টা করে কিন্তু সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সতর্কতার ফলে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দমদম বিমানবন্দরে সেই রাতেই ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মহা-পরিচালক কে. এফ. রুস্তামজী এসে পৌছালে তাজউদ্দীন ও আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি তাঁদের আসাম ভবনে বিশেষ নিরাপত্তার মধ্যে থাকার ব্যবস্থা করেন ।

স্নানের পর রুস্তামজী সাহেবের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে প্রায় শেষরাতে তাঁরা সামান্য আহার করলেন। এই সময়ে তাজউদ্দীন সাহেব জানালেন, পূর্ববাংলায় স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সমস্ত বিলাসব্যসন, খানাপিনা পরিত্যাগ করার সংকল্প নিয়েছেন। তারপর শুরু হল কথাবার্তা। অত্যন্ত সরল করে এবং সহজ ভাষায় তাজউদ্দীন সাহেব পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিলেন এবং জানালেন বাঙালির জাতীয় জীবন পর্যুদস্ত করতে ইয়াহিয়া, টিক্কা খান ও ভুট্টো চক্র বদ্ধপরিকর। পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলার স্থান এবং কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব তাঁর ব্যাখায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সকালের দিকে তাঁরা বিশ্রাম করতে গেলেন ।

ইতোমধ্যে রুস্তামজী সাহেব দিল্লীর সঙ্গে কথা বললেন এবং স্থির হল তাঁদের দিল্লী যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করবেন। পরের দু'দিন দফায় দফায় রুস্তামজী সাহেব তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন। মোটামুটি স্থির হল, পূর্ব পাকিস্তানের নাম বদলে রাখা হবে বাংলাদেশ, পতাকা হবে সবুজ জমিতে সোনালি রেখায় চিত্রিত বাংলাদেশের মানচিত্রসহ লাল সূর্য, জাতীয় সঙ্গীত হবে রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি এবং সরকার হবে ধর্মনিরপেক্ষ গণপ্রজাতন্ত্র । স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মূল বক্তব্যগুলো তিনি (তাজউদ্দীন আহমদ) ঠিক করে দিলে আমীর-উল ইসলাম এবং কলকাতার প্রখ্যাত ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরী তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যে ঘোষণাপত্র রচনার কাজে হাত দেন। সেদিন ছিল কলকাতা শহরে হরতাল । বিশেষ অনুরোধে দোকান খুলিয়ে তাজউদ্দীন

সাহেব ও আমীর-উল ইসলামের জন্য জামাকাপড়, সুটকেস, জুতামোজা ও সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনা হয়। ওষুধপত্রের বিকল্প ব্যবস্থা করা হয় যেহেতু তাঁর অভ্যস্ত ওষুধ ভারতে অচল ।

তাজউদ্দীন সাহেবের ইচ্ছামত তাঁকে পুনরায় টুঙ্গি সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখান থেকে তিনি সহকর্মীদের কিছু নির্দেশ পাঠান এবং ভারতের মনোভাব সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করেন । কলকাতায় ফিরে তাঁকে দিল্লী যাবার প্রস্তুতি সেরে নিতে হয়। মধ্যরাতে বিশেষ বিমানে তাঁদের নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করি। শ্রান্তিতে তাঁরা সেই বিশাল বিমানের মেঝেতে শুয়ে পড়েন এবং ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যান। রাত আড়াইটার সময় যখন আমরা দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে পৌছাই তখন নিরাপত্তার স্বার্থে অন্যান্য সমস্ত বিমানের জন্য বিমানবন্দর বন্ধ ছিল। বিশেষ মোটরযোগে বিদেশী গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে অনেক ঘোরাপথে তাঁদের গুপ্ত বাসস্থানে নিয়ে আসা হয়।

পরদিন তাজউদ্দীন আহমদের প্রকৃত পরিচয় এবং আওয়ামী লীগে তাঁর প্রতিপত্তি যাচাই করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যেই পূর্ববাংলা থেকে যাঁরা দিল্লী এসে পৌঁছেছিলেন এমন কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা এবং ব্যক্তিবর্গকে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে নিয়ে আসা হয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে এঁদের প্রথম দর্শন এবং কথাবার্তায় দিল্লীর কর্তারা নিশ্চিত হন যে, তাজউদ্দীন সাহেব শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী। তাঁর অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম এবং সকল দায়িত্ব নেয়ার অধিকারী একমাত্র তাজউদ্দীন আহমদ। তারপর তিনি বিদেশ সচিব, রাজ্য সচিব, দেশরক্ষা সচিব, বহু সংস্থার প্রধান, প্রধানমন্ত্রীর সচিব ও উপদেষ্টা এবং অবশেষে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে বলেন । প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় স্থির হয়, আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে একটি সরকার গঠন করতে হবে । প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী এবং সমরপ্রধান নিয়োগ করতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সুযোগমত ওই দেশেরই কোন স্থানে প্রকাশ্য সভায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গ্রহণ, সরকার গঠন, মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য যুবশক্তিকে যোগদান করতে আহ্বান প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও প্রচারের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রথম থেকেই তাজউদ্দীন

সাহেব স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি করতে থাকেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, যথাসময়ে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ঠিকই দেয়া হবে এবং আশ্রয়দানই বস্তুত স্বীকৃতিদান ।

ইতোমধ্যে আমি কলকাতা ফিরে তাঁদের থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেরে ফেলি এবং টেলিফোনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জেলার সঙ্গে প্রয়োজনমত যোগাযোগের গোপন ব্যবস্থা করাই। দিল্লী থেকে ফিরে তাজউদ্দীন সাহেব যুবনেতাদের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী গঠন করেন এবং ভারতীয় সীমান্তসংলগ্ন অঞ্চলে তাদের জন্য কয়েকটি সামরিক শিক্ষার ও অভিযানের ঘাঁটি স্থাপন করান । সামরিক বাহিনী এবং ইপিআর-এর দলত্যাগী অফিসারবৃন্দ এইসব ঘাঁটির ভার নেন। এরই মধ্যে তিনি বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের ভারতে আনিয়ে নেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি, খন্দকার মোশতাক আহমদ, কামরুজ্জামান প্রমুখ। অনেক এমএনএ এবং নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও সমাগম হয় । এদিকে ত্রিপুরার পথে কর্নেল ওসমানী এবং ধুবড়ির পথে মওলানা ভাসানী এসে পড়েন । আব্দুস সামাদ আজাদ, মণি সিংহ, অধ্যাপক ইউসুফ আলি, আইনবিদ নূরুল আলম প্রমুখদের প্রায়ই দেখা যেত।

ইতোমধ্যে সমস্ত এমএনএদের উদ্বুদ্ধ করে তাজউদ্দীন সাহেব সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, মন্ত্রিসভার সদস্য, জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় অনুমোদন করিয়ে নিলে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার (তাজউদ্দীন সাহেব এর নামকরণ করেন মুজিবনগর) আমবাগানে শত শত দেশবাসীর সামনে এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের সাক্ষাতে বাংলাদেশের জাতীয় সরকার শপথ গ্রহণ করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর নির্দেশে কলকাতার পাকিস্তানি ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলি তাঁর আনুগত্য পরিবর্তন করেন এবং সেই অফিসেই বাংলাদেশের প্রথম কূটনৈতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কত সূক্ষ্মতার সঙ্গে, ধীরস্থিরভাবে তাজউদ্দীন সাহেবকে যে এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে হয় তা সহজেই অনুমেয়। নির্বাসনে গঠিত সরকার চালাতে যে অর্থের প্রয়োজন তার ব্যবস্থাও তিনি করেন। প্রবাসী বাঙালিরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে সেই অর্থ সরাসরি সরকারের তহবিলে জমা করার ব্যবস্থা তিনি সহজেই পাকা করেন। পাকিস্তানি রাজকোষের টাকাও তাঁর চেষ্টায় ঠিকমত আসতে থাকে। বিদেশী মন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি প্রায়ই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ করতেন এবং অনেক সময়ই তাঁকে হাসিমুখে

প্রাণ বিপন্ন করে এগিয়ে যেতে দেখা যেত ।

মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের চাপ তাঁর ওপর প্রবল হলেও তিনি তার কাছে নতিস্বীকার করেননি। কেননা তিনি নিশ্চিত জানতেন, অধিকসংখ্যক মন্ত্রী অধিকসংখ্যক সমস্যারই সৃষ্টি করবে। সকলেই আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। ভারতের প্রতি তাঁর বন্ধুত্বের মনোভাব বিষিয়ে দিতে অনেকেই সচেষ্ট ছিলেন। কেন আরও অর্থ সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না, কেন আরও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আসছে না, কেন ভারত প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের হয়ে যুদ্ধ করছে না ? এক কোটি শরণার্থীর ভার আমাদের গরীব দেশের পক্ষে কী ভয়ানক তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারতেন, আর আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে যে কোন রকমের অসাবধানতা বা অপ্রাসঙ্গিক দ্রুততার ফল কত মারাত্মক হতে পারে তা তাঁর অজানা ছিল না। তিনি ছিলেন সহনশীলতার প্রতিমূর্তি। তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, স্থির লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অটল, অনড় ।

একবার তাঁকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের কোন হদিস যদি তিনি দিতে পারেন তাহলে তাঁদের আনবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দেন, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারের যে ভাগ্য, তাঁর পরিবার সেই ভাগ্যেরই অংশীদার হবে, তাদের জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না । তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বাংলাদেশ প্রকৃত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি সহজ ও সরলভাবে দিন কাটাবেন, গার্হস্থ্য জীবন পরিহার করবেন । শেষদিন পর্যন্ত তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাঁর পরিবার এক সময় কলকাতায় এসে পৌঁছেছে, তিনি কোনদিন তাঁদের দেখতে যাননি। একদিন তাঁর একমাত্র শিশুপুত্র অত্যন্ত অসুস্থ। বাঁচার আশা খুব কম। ঘোরের মধ্যে বাবাকে ডাকছে । ডাক্তার পরামর্শ দিলেন বাবাকে আনিয়ে নিতে । প্রতিজ্ঞায় অটল তাজউদ্দীন সাহেব যেতে অস্বীকার করলেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে ডেকে পাঠান হল। অনেক বুঝিয়ে বলার পর তিনি যেতে রাজি হলেন। পুত্রের শিয়রে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে নীরব প্রার্থনার পর নিঃশব্দে ফিরে এলেন। বিধাতার অসীম করুণা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভার ন্যস্ত হয়েছিল এমন একজন নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ বীরের হাতে।

কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্রমাগত গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং বিদেশী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন। তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর সহজ ও সরল যুক্তির জোরে তাঁদের ক্রিয়াকলাপ

নিয়ন্ত্রণে রাখেন । কয়েকজন যুবনেতা বিক্ষুব্ধ হয়ে মুক্তিবাহিনীর বিকল্প হিসেবে মুজিব বাহিনী গঠন করেন এবং কিছু দিশেহারা ভারতীয় আমলার সাহায্যে অধিকতর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র তাঁরা যোগাড়ে সমর্থ হন। তাঁদের একজন তাজউদ্দীন সাহেবের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে পিস্তল হাতে অতর্কিতে তাঁর ঘরে ঢোকেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েন । তাজউদ্দীন সাহেব তাঁকে ক্ষমা করে নিজের বিশ্বস্ত অনুগামী করে তুলতে সমর্থ হন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন নিঃসঙ্গ সেনানায়ক। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং কর্নেল ওসমানী সাধারণত তাঁকে সমর্থন করেছেন, তবে কেউই তাঁর মত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন বলে মনে হয়নি । ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সকলেরই প্রখর দৃষ্টি ছিল, শুধুমাত্র তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। স্বাতন্ত্র্য এবং নীতিবোধ তাঁকে অনন্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এমনকি মওলানা ভাসানী পর্যন্ত একদিন বলেছিলেন, ‘আওয়ামী লীগের মধ্যে মানুষের মত মানুষ ওই তাজউদ্দীন।'

এদিকে আওয়ামী লীগের ভেতরের এক অংশ এবং বাইরের শক্তির সহযোগিতায় প্রবল চেষ্টা চলছিল আওয়ামী লীগের প্রতিপত্তি খর্ব করে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের। তাজউদ্দীন সাহেব এই অপচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেন। ভাসানী সাহেব তাঁকে সমর্থন জানান এই বলে যে, 'বাংলাদেশের জনগণ যাদের একজনকেও নির্বাচিত করেনি, তারা কোন্ দাবিতে মন্ত্রীর পদ অধিকার করবে ?' শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর ইঙ্গিতে এই অভিসন্ধির শেষ হয়, তিনি তাজউদ্দীন সাহেবের যুক্তিতে সায় দেন। শুভ বুদ্ধির জয় হয় ।

বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর যে দিন মন্ত্রীরা ঢাকায় ফিরে যান সে দিন রুস্তামজী সাহেবের সঙ্গে দমদম বিমানবন্দরে আমিও যাই তাঁদের বিদায় জানাতে । নানা কথার পর রুস্তামজী সাহেব বলেন, ‘আমরা আশা করব ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রীর বন্ধন চিরদিন অটুট থাকবে।' সঙ্গে সঙ্গে তাজউদ্দিন সাহেব জবাব দেন, ‘হ্যাঁ, স্বাধীন বাংলাদেশের উপর যদি চাপ সৃষ্টি না করা হয়, বাংলাদেশের কাজকর্মে যদি কোনও প্রভাব বিস্তার না করা হয় তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন ভারতের মৈত্রী চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে।' যে রুস্তামজী চেষ্টায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ এবং যাঁর সঙ্গে তাঁর এত মধুর সম্পর্ক, স্বদেশের স্বার্থে তাঁকেও স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে দৃঢ় মনোভাব জানাতে তাজউদ্দীন সাহেব মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করলেন না। অথচ বাংলাদেশে প্রচার করা হল তিনি ভারতের দালাল।

মিথ্যা কি চিরদিন সত্যের কণ্ঠরোধ করে রাখবে ?

যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ কোথায় অনুমান করা যাচ্ছে না সেই সময় একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলাম, নববর্ষ ঢাকাতে উদযাপন করব। স্বাধীনতার পর নববর্ষের দিন ঢাকা সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি কেক, মিষ্টি, চা প্রভৃতি খাইয়ে আমাকে এবং আমার কন্যা জয়ন্তীকে আপ্যায়ন করেন । আমাকে আমার সেই আগের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর কোমল স্নেহার্দ্র ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। আমার দুই কন্যার বিবাহে তাঁর পরিবারের সাহচর্য লাভ করি। জীবনে যখন চরম আঘাত আসে, ঈশ্বর আমার পত্নীকে তাঁর চরণে স্থান দেন, তখনও তাজউদ্দীন সাহেব ছুটে এসে সমবেদনা জানিয়ে যান। এ তাঁর মহত্ত্বেরই পরিচয়।

তাজউদ্দীন সাহেব মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়েছেন । প্রধান প্রধান শক্তিদ্বয় তাঁকে নানা প্রলোভন দেখিয়েছে। সামরিক বাহিনীও তাঁর ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু তাঁর সুস্পষ্ট উত্তর ছিল, শেখ সাহেবের নেতৃত্বে যে কোন পরিবর্তনের প্রয়াসে তিনি যুক্ত হতে প্রস্তুত, তাঁকে বাদ দিয়ে কোন পরিবর্তনের কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না। সমস্ত প্রলোভন তিনি হেলায় প্রত্যাখান করেন। এর জন্য চরম মূল্য দিতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না ।

মনে হয় তাঁর নীতিবোধ ও নেতৃত্বকে মর্যাদা দেবার ক্ষমতা তখন বাংলাদেশের ছিল না। গভীর মানবিকতা, উজ্জ্বল আদর্শবাদ, নিপুণ কর্মপ্রণালী, মূল্যবোধের মাহাত্ম্য, অকপট আচরণ, সারল্য ও সহনশীলতা তাঁর নির্লোভ নিরাসক্ত হৃদয়কে এক অপূর্ব মহিমায় ভাস্বর করে তুলেছিল। তাঁর প্রতিভার ও চরিত্র গরিমার দীপ্তিতে যাঁরা ম্লান হয়ে পড়েছেন তাঁরাই ঈর্ষা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁর চরিত্রহননের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রভাতসূর্যের আলোর মতই সত্য দিকদিগন্তে ছড়িয়ে সমস্ত কুয়াশা, সকল অন্ধকার দূর করে দেবে। দেশবাসীও এই দেশভক্ত সন্তানকে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে স্মরণের অমরতায় ।

[২.৭.১৯৯৫]

গোলোক মজুমদার : ১৯৭১ সালে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের আইজি। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ।

বাহাউদ্দিন চৌধুরী

চল্লিশের দশকটা আমাদের জাতীয় জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল । কেননা একদিকে যেমন মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের যে প্রভাব সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল— দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি—তেমনি ভারতবর্ষে একটি বৃটিশবিরোধী আন্দোলন সেই সময় খুব জোরদার হয়েছিল । এর ফলেই দেখা যায় ১৯৪০ সালেই লাহোর প্রস্তাব পাস হয়েছিল। এই লাহোর প্রস্তাব বাঙালি মধ্যবিত্তদেরকে খুব আন্দোলিত করেছিল।

তাজউদ্দীন সাহেব আমার সামান্য বড় হবেন। আমার স্কুল জীবন যখন প্রায় শেষ, সেই সময় তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়, সেটা ১৯৪৬ সালের কথা। আমরা প্রধানত জনাব কামরুদ্দিনের নেতৃত্বে ঢাকা শহরে যারা ছাত্র রাজনীতি এবং জাতীয় রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম তার মধ্যে তাজউদ্দীন প্রধানতম একজন কর্মী ছিলেন। সেই সময় তিনি মুসলিম লীগের সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন এবং মাঝখানে আমার মনে হয় কিছুদিন লেখাপড়াও স্থগিত রেখেছিলেন রাজনীতির কারণেই। আমাদের মধ্যে তিনি খুব ভোকাল ছিলেন না, একটু ইনট্রোভার্ট টাইপের মানুষ ছিলেন। যার ফলে সেই সময় মঞ্চে তাঁকে খুব একটা দেখা না গেলেও আমাদের ভেতরে যে সমস্ত চিন্তা ও চেতনার জগৎ ছিল তাতে তাজউদ্দীন সবসময় প্রধানতম ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন আমি বক্তা ছিলাম, বক্তৃতাতে আমাকে সবাই চিনত । অলি আহাদ সাহেবকে সবাই চিনতেন, বক্তৃতা দিতে পারতেন। তাজউদ্দীন সাহেব কখনো মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দেয়া পছন্দ করতেন না। কিন্তু বিভিন্ন আলোচনা সভায় বা কর্মী সভায় তিনিই ছিলেন আমাদের কেন্দ্রবিন্দু। তখনকার ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু আমাদের চাইতে অনেক অগ্রসর চিন্তার লোক ছিলেন এবং অনেক বেশি পড়াশোনা করতেন।

সেই সময় চল্লিশের দশকেই বলতে গেলে বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানদের একটা উত্থানের সময়—যে কারণে আমরা মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলাম। এই অংশের পাকিস্তান আন্দোলনের একটা ভিন্নরূপ ছিল, যেটা সারা ভারতবর্ষে ছিল না। সেটা হল এখানে লড়াইটা বলতে গেলে সাম্প্রদায়িক না হয়ে একটা শ্রেণী সংগ্রামে রূপ নিয়েছিল এবং সেই আদিকালে তাজউদ্দীন আমাদের মধ্যে মার্কসিস্ট লিটারেচার সম্পর্কে সবচাইতে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বইপত্র পড়তেন, বলতে গেলে আমাদের শিক্ষকের

ভূমিকা পালন করেছেন । বাইরে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি না থাকলেও কর্মীদের মধ্যে তাঁর একটা শ্রদ্ধার স্থান ছিল এবং তিনি খুব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময়ে যে সমস্ত লেখালেখির কাজ হত, বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশ করা হত, সেসব ক্ষেত্রে তাজউদ্দীন সর্বদা প্রধানতম ভূমিকা পালন করতেন। যেহেতু আমারও সেইসময় লেখার প্রতি একটা ঝোঁক ছিল, আমি কিছু লেখালেখি করতাম। কাজেই এসব লেখালেখির ক্ষেত্রে আমাকে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে হয়েছে।

তৎকালীন মুসলিম লীগের রাজনীতিতে একটা ফিউডাল এবং অ্যান্টি-ফিউডাল দ্বন্দ্ব ছিল। প্রধানত ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে যে দলটি ছিল তার বিরুদ্ধে হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, আবুল হাশিমের নেতৃত্বে আর একটি গ্রুপ কাজ করছিল। এবং আবুল হাশিম সাহেবের নেতৃত্বে ইসলামী সমাজতন্ত্র নামে একটা তথ্য বা তত্ত্ব তিনি প্রচার করাব চেষ্টা করেছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের কথা বলে । সেই সময়ে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করা হয়েছিল এবং এই পুস্তিকা রচনার ব্যাপারে তাজউদ্দীন খুব একটা বড় ভূমিকা পালন করেন। কামরুদ্দিন আহমদ, তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমিও সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছি ।

পাকিস্তান হওয়ার পরে হয়ত মুসলিম লীগের অনেক বড় নেতাও চিন্তা করেননি যে পরবর্তীকালে পাকিস্তানের বা পূর্ব পাকিস্তানের সমাজব্যবস্থা কী হবে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী হবে, রাষ্ট্রীয় কাঠামো কী হবে—সেই সময়ে আমরা এসব চিন্তা করতাম। আমরা তখন কলেজে পড়ি কিন্তু আমরা কোন উপসংহারে আসতে পারিনি । আমাদের চিন্তার এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যমণি ছিলেন তাজউদ্দীন । আমরা মনে করতাম যে, যেভাবে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব চলছে তাতে ভবিষ্যতে আমাদের যে সমাজ-কাঠামো আসবে, তাতে আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা তা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা—এই সন্দেহেই আমরা সবসময় দোদুল্যমান ছিলাম। পাকিস্তানের আন্দোলনের সময়েও আমরা ঠিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ কথাটা হয়ত উচ্চারণ করিনি, কিন্তু আমাদের যে রাষ্ট্রীয় সীমানা, আমাদের যে আলাদা একটা সত্তা, পশ্চিমাদের চেয়ে আলাদা একটা সত্তা আছে, এটা কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটা অনুভূতির মত ছিল । এবং এর প্রবক্তাই বলা হোক বা এক্সপোনেন্ট, তা ছিলেন তাজউদ্দীনই। এই বিষয়ে কামরুদ্দিন সাহেবেরও একটা ভূমিকা ছিল।

তখন হয়ত আমাদের মনের মধ্যে খুব একটা স্পষ্ট রূপ নেয়নি, তবে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, আমাদের সঙ্গে যাঁরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আছেন তাঁদের সাথে প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজন যাঁরা আছেন তাঁদের একটা মানসিক দ্বন্দ্ব চলছিল। যেমন ছেচল্লিশেই আমার মনে হয় ঢাকার নবাববাড়ি থেকে মুসলিম লীগের অফিস পুরনো শহরে চকবাজারের কাছে ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে নিয়ে আসা হয় । আমার যেটুকু খেয়াল আছে, তাজউদ্দীন সাহেব ওখানেই ছিলেন বেশ কিছুদিন—প্রায় সার্বক্ষণিকই নিজের সময় দেয়ার জন্য । আমার মনে আছে, সেই সময়ই তিনি কিছুদিন লেখাপড়া স্থগিত রেখেছিলেন পুরো সময় রাজনীতিতে দেয়ার জন্য । এই যে নবাববাড়ি থেকে অফিস চলে এল ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে এবং এই যে একটা সামন্তবাদী রাজনীতি থেকে একটা মধ্যবিত্তের রাজনীতিতে নিয়ে আসা, যদিও তখন আমরা ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র ছিলাম, এখানে আমাদের একটি বড় ভূমিকা ছিল, তাজউদ্দীন তাতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন । পরবর্তীকালে যে আন্দোলনসমূহ ছিল সেইসব আন্দোলনে তাজউদ্দীন সবসময় একটা প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। কারণ যে থিংকিং পার্ট, চিন্তার যে জগৎ, কামরুদ্দিন আর তাজউদ্দীন এই দু'জনই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন। কামরুদ্দিন সাহেব সাংসারিক লোক ছিলেন, বিয়েশাদি করেছিলেন, সংসার ছিল, প্র্যাকটিস করতেন। তাই তাজউদ্দীন সাহেবই প্রধানত বেশির ভাগ সময় ব্যয় করতে পেরেছেন চিন্তা এবং লেখালেখির কাজে ।

তখন থেকেই কিন্তু এই যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো হবে, তাতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে একটা বণ্টনব্যবস্থার ব্যাপারে, মালিকানার ব্যাপারে চিন্তাটা তাঁর মধ্যে ছিল । তিনি কিন্তু কখনো মার্কসিস্ট রাজনীতিতে আসেননি। কিন্তু একটা সামন্তবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে একটা গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর। যেটাকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বলা যেতে পারে, এটি পুরোপুরি ছিল তাঁর মধ্যে—যা ছিল মুসলিম নেতাদের চেয়ে একেবারে ভিন্ন। আমি একটা কথায় জোর দিতে চাই, মুসলিম লীগের রাজনীতি তখন যাঁরা করতেন তাঁরা কিন্তু সমাজ-কাঠামো নিয়ে চিন্তাভাবনা তেমন করেননি। তাঁরা ক্ষমতার পরিবর্তনটাই প্রধান করে দেখতেন । কিন্তু তাজউদ্দীন সেইখানে বোধ হয় এককভাবে সমাজের চেহারা কী হবে, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছাড়াও এর অর্থনৈতিক কাঠামোটা কী হবে, সাধারণ মানুষের অবস্থাটা কী হবে, কৃষকের অবস্থাটা কী হবে, এই নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে যে ভূস্বামীদের নেতৃত্ব, তাদের

সঙ্গে যে আমাদের একটা বিরোধ বাধতে পারে, এইরকম একটা চিন্তা তাঁর মধ্যে ছিল ।

সে ক্ষেত্রে আমার মতে একটি কথা বলতে পারি যে, তৎকালীন বাঙালি মুসলিম রাজনীতিতে যে র‍্যাডিক্যাল ধারণা এসেছে, র‍্যাডিক্যাল চিন্তার জগতে প্রথম সূচনাকারী কামরুদ্দিন আহমদ এবং তাজউদ্দীন আহমদ, এই দু'জনই পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করেছেন ।

এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাজউদ্দীন কিন্তু হঠাৎ করে কেরিয়ার করার চিন্তাভাবনা নিয়ে রাজনীতিতে আসেননি। তাজউদ্দীন সম্পূর্ণভাবে দেশসেবার জন্যে, মানুষের সেবা করার জন্যে রাজনীতিতে এসেছিলেন, এবং বাল্যকাল থেকেই, স্কুল জীবন থেকেই তাঁর এই চিন্তাটা ছিল। তিনি প্রখর ধীসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন, কিন্তু ছাত্র হিসেবে তাঁর অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারকে তিনি কখনো পারস্যু করেননি। কাজেই দেখা যাবে তাঁর অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারের মাঝে গ্যাপ আছে।

তাজউদ্দীন কোন জিনিস অর্ধেক করা পছন্দ করতেন না । খুব থরো ছিলেন তিনি, যেটা সাধারণত তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে দেখা যেত না। তিনি কোন একটা জিনিসের গভীরে যাওয়া পছন্দ করতেন। তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে যে বাহুল্য ছিল, তাজউদ্দীন তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক মানুষ ছিলেন। আর যেহেতু তিনি নিজে কখনো লাইমলাইটে আসা পছন্দ করতেন না, আত্মপ্রচার চাননি, তাই মঞ্চে অধিকাংশ সময় তাঁকে দেখা যায়নি । কিন্তু সেই চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে, যখন তিনি স্কুলে ছিলেন, সেই সময় থেকে রাজনীতিতে তিনি সবসময় একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছেন। হয়ত অনেক জায়গায় তাঁর নাম উল্লেখ নেই, যেহেতু তিনি মঞ্চে আসেননি সেইসময়, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের যে অভিজ্ঞতা, তা থেকে আমি এটা বলতে পারি । তিনি স্কুল শেষ করেছেন, আমারও স্কুল ছাড়িছাড়ি অবস্থা, সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়।

চল্লিশের দশকে লীলা রায় (লীলা নাগ), যিনি খুব বিখ্যাত নেত্রী ছিলেন, সেই আমলে ঢাকায় বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর পাশাপাশি আমরা, তাজউদ্দীন ভাই, যদিও মুসলিম লীগ করতাম, কিন্তু আমরা দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন তৈরি করেছিলাম । তাজউদ্দীন সম্পর্কে যেটা বিশেষভাবে বলতে চাই যে, মুসলিম লীগ রাজনীতিতে থেকেই তাঁর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব

ছিল, যেটা পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, কিন্তু সেই সময়ও এটা তাঁর মধ্যে ছিল এবং যার ফলে বিভিন্ন জায়গায় একটা যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা তিনি করেছেন।

তৎকালীন কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, বিভিন্ন ফরোয়ার্ড ব্লক, নেতাজী সুভাষ বসুর ফরোয়ার্ড ব্লক, তখন ঢাকায় খুব অ্যাকটিভ ছিল। আরএসপি নামে আর একটা পার্টি ছিল, এই যে এদের সঙ্গে যোগাযোগটা আদানপ্রদানটা মুসলিম লীগ কর্মীদের মধ্যে, এ কাজে তাজউদ্দীনই একমাত্র উপযুক্ত ছিলেন, তাদের সঙ্গে ইনটেলেকচুয়াল যোগাযোগ করার মত—যার ফলে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় তাজউদ্দীন অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। আমার যেটা মনে হয়, তাজউদ্দীন সাহেব সেই সময়ই মুসলিম লীগের বাইরে ইস্ট পাকিস্তান ইকনমিক ফ্রীডম লীগ নামে একটা পার্টির কথা চিন্তা করছিলেন। '৪৮-এর পর তিনি আর মুসলিম লীগের সাথে ছিলেন না। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি দরিদ্র শ্রেণীর ভাগ্য উন্নয়ন এবং সমাজে তাদের একটা উন্নয়নমূলক অংশগ্রহণের কথা চিন্তা করতেন। পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো—গণতন্ত্রও থাকবে, সমাজতন্ত্রও থাকবে—এই রকম একটা ব্যবস্থা '৭২-এর সংবিধানে আমরা দেখেছি । কিন্তু তাজউদ্দীনের মধ্যে এই চিন্তাটা চল্লিশের দশকের শেষের দিকেই ছিল, যখন তিনি অত্যন্ত অল্প বয়সের যুবক মাত্র ।

স্কুল এবং কলেজ ছাত্রজীবনেই তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার যোগাযোগটা বেশি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমরা ফজলুল হক হলে থাকলেও তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে যোগাযোগ হয়েছে, কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠতা আর হয়নি । কারণ আমরা দু'জন তখন দুই রকম রাজনীতিতে ছিলাম। আমি কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হই। তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। তিনি আমার নাম দিয়েছিলেন 'লিট্‌ল্ লেনিন'। এটা '৪৮-'৪৯ সালের কথা। বামপন্থীদের দিকে তাজউদ্দীন সাহেবের সবসময় একটা সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তিনি কখনই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেননি।

'৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় আমি ঢাকায় একটি খবরের কাগজে চাকরি করতাম। আমি তখন আর ঠিক সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত না। সরকারি চাকরিতে যোগ দেই '৫৬ সালে। তারপর যখন '৬৪ সালে আওয়ামী লীগ রিভাইভ করল তখন সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসি। সেই সময় আবার বহু বছর পর তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়।

তখন আবার তাঁকে দেখলাম ৬-দফা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও একটি প্রধান ভূমিকা পালন করতে। দফাগুলোকে লেখা, এটাকে ভাষা দেয়া, ছাপানো ইত্যাদিতে তাজউদ্দীনের ভূমিকাই প্রধান ছিল। কারণ তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে তিনি সবচাইতে শিক্ষিত লোক ছিলেন। এই কথাতে অনেকেই মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারেন, কিন্তু কথাটা খুব সত্যি ।

যেহেতু আমি কিছুকাল সাংবাদিক ছিলাম, তাই এই লেখালেখির অনেকটা কাজ আমার উপরে ছিল—যার ফলে তাজউদ্দীন সাহেবের এই দিকটি সম্পর্কে আমি খুব ভাল জানি । যেমন প্রুফ রিডিংয়ে তিনি প্রায় ওস্তাদ হয়ে গিয়েছিলেন, যেহেতু তাঁকে অধিকাংশ পাবলিকেশন্স দেখতে হত, তাই প্রেস সম্পর্কে তাঁর ভাল অভিজ্ঞতা ছিল।

আওয়ামী লীগের মধ্যেও ৬-দফা নিয়ে মতভেদ ছিল। সালাম খান, যিনি আওয়ামী লীগের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি পরে দল থেকে বেরিয়ে গেলেন ৮-দফা করে। এমনকি যাঁরা রয়ে গেলেন যেমন, খন্দকার মোশতাক, মিজানুর রহমান চৌধুরী তাঁরা কিন্তু মনে মনে ৬-দফার পক্ষে ছিলেন না । তাঁরা হয়ত ব্যক্তিগত কেরিয়ারের জন্য দলে থেকে গেলেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর পরেই ৬- দফা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা তাজউদ্দীনের ছিল ।

শুরুতেই ৬-দফা কিন্তু ৬-দফা আকারে ছিল না। প্রথমে এটিতে প্রায় ১৩টি দফা ছিল। এই দফাগুলো নিয়ে আমরা সমাজের বিভিন্ন মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছি—অর্থনীতিবিদদের সাথে আলাপ করেছি, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করেছি। যেমন প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, ড. আখলাকুর রহমান, ড. এম. এন. হুদার সাথে, বুরোক্রেটদের মধ্যে রুহুল কুদ্দুস এবং আরো কয়েকজনের সাথে আলোচনা হয়েছে। এই সব আলোচনার মুখপাত্র ছিলেন তাজউদ্দীন । তারপর পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এই দফাগুলো নিয়ে আলোচনায় বসার আগে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দফাগুলোকে ছোট করার দায়িত্ব দিলেন । তখন ৬-দফা হিসেবে এটি বেরিয়ে এল। '৬৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বৈঠক শেষে যে কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানেই এই ৬-দফাকে গ্রহণ করা হয় । এবং ৬-দফার এক্সপোনেন্ট হিসেবেই তাজউদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়, বঙ্গবন্ধু সভাপতি হন ।

তারপর ৬-দফার আন্দোলন চলতে থাকে এবং আন্দোলনের এই যে সামনের দিকে এগিয়ে চলা—এখানে একটি কথা বলতে পারি যে, হয়ত ওয়ার্কিং কমিটি

বা অন্যান্য আলোচনায় সরাসরি আলোচিত হয়নি, কিন্তু যাঁরা বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন সাহেবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁরা জানতেন যে, আমরা স্বাধীনতার দিকেই ধাবিত হচ্ছি। আমাদের মনে এতে কোন সন্দেহ ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে স্বাধীন হতে হবে এতে কোন দ্বিধা ছিল না ।

এই সময়টাতে যেহেতু তাজউদ্দীন সাহেব সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, প্রধান দায়িত্ব তো তাঁকেই পালন করতে হয়েছে। আমি আবারও জোর দিয়ে বলছি, যেহেতু তিনি লাইমলাইটে আসেননি, বঙ্গবন্ধুকেই সামনে রেখেছেন, বঙ্গবন্ধুর

একটা ইমেজ তৈরি হয়েছিল, তাই তাঁর একজন সহযোগী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এ ব্যাপারে আমার যতটুকু জ্ঞান বা ধারণা, বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীনের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর একটা ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। জীবনের প্রথম অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না হলেও এই ৬-দফার আন্দোলনের সময় বা আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের সময় থেকে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বলতে গেলে দুই দেহ কিন্তু এক প্রাণ ছিলেন দু'জনে। ষাটের দশকের এই সময়ের যে চিন্তা, রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা, এর প্রধানতম দায়িত্ব তাজউদ্দীনই পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিধর, যা শুনতেন তিনি তা ধারণ করতে পারতেন। এমনকি বঙ্গবন্ধু যখন বক্তৃতা দিতে যেতেন মাঠে, তখনও তাজউদ্দীনের সাথে আলোচনা করতেন কী বলবেন না বলবেন ইত্যাদি বিষয়ে। এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে যখন তাজউদ্দীন উপস্থিত থাকতেন সমস্ত রেজুলেশন তিনিই লিখতেন সবসময় ।

এভাবেই তৈরি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলার পথ। মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে আমি তাজউদ্দীনকে 'দ্যগল অফ বেঙ্গল' বলে অভিহিত করতে চাই। এই বিষয়ে আমি পত্রিকাতে একটি কলামও লিখেছিলাম। কারণ প্রবাসে সরকার গঠনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হচ্ছে তাজউদ্দীনের। এখানে আমি আমার মত বলছি, অত্যন্ত সচেতনভাবে । তাজউদ্দীনকে এখানে আমি একক কৃতিত্ব দিতে চাই।

এই যে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যে, প্রবাসে গিয়ে একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে—যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দ্যগল লন্ডনে গিয়ে একটা ফরাসী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ফরাসী প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লন্ডনে থেকে—তেমনি বঙ্গবন্ধু তখন অনুপস্থিত ছিলেন, তিনি পাকিস্তানি জেলে বন্দি, এই সময়ে প্রবাসে সরকার গঠন করা, মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করা, ভারতীয় সহায়তা নেয়া, সেই ব্যাপারে একক কৃতিত্ব তাজউদ্দীনের । এ

কারণেই আমি তাজউদ্দীনকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সিপাহসালার বা প্রধান সেনাপতি বলতে চাই । আর একটি কৃতিত্ব দিতে চাই যে, তিনি রামায়ণে বর্ণিত ভরতের ভূমিকাই পালন করেছেন। ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে রেখে দেশ শাসন করছিলেন, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তেমনি তাজউদ্দীন তাঁর প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা, ভালবাসা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে সমস্ত শাসন পরিচালনা করেছেন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। এবং বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের পরে জানুয়ারিতে নির্দ্বিধায় তাঁকে আসন ছেড়ে দিয়েছেন। এবং তাঁর সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড হতেও তাঁর মনে কোন দ্বিধা আসেনি। এই যে মহত্ত্ব, ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত আর নেই। একমাত্র পৌরাণিক কাহিনী রামায়ণে আছে ভরতের ইতিহাস, এ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই ।

এই যে এইভাবে আত্মত্যাগ করে পাশে এসে দাঁড়ানো, এটা কিন্তু তাজউদ্দীনের প্রথম জীবন থেকেই ছিল। নিজেকে লাইমলাইটে না আনা, নিজেকে প্রকাশ না করা, যার ফলে তাঁর সম্পর্কে লেখা এবং জানা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। পরবর্তীকালে দেখেছি কিছু কিছু লোক তাজউদ্দীনকে তাঁর মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার গঠনের জন্য কৃতিত্ব না দিয়ে ভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলেছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি ছিলেন। তিনি জানতেন না যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশ যে স্বাধীন হয়েছে এটা তিনি লন্ডনে গিয়ে প্রথম শোনেন। বিবিসি-র সিরাজুর রহমানের কাছে তাঁর টেপ করা সাক্ষাৎকারে আমি এটা শুনেছি ।

পরবর্তীতে তাজউদ্দীন ক্যাবিনেট থেকে চলে গেছেন, হয়ত মতবিরোধ বা অন্য কোন কারণে, সে তথ্য আমার জানা নেই । কিন্তু একটা জিনিস আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি যে, তাজউদ্দীনের মত দুর্লভ লয়্যালটি যা বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন, তাঁদের মাঝে কী এমন হল, কেন তাজউদ্দীন দূরে চলে গেলেন, এটা খুবই রহস্যের মত মনে হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই বোধ হয় তাঁদের মতবিরোধটা চলছিল ।

'৭২ বা '৭৩ সালের কথা, আমি তখন সরকারের তথ্য সচিব। এক বিয়েতে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা, আমাকে দেখেই খুব রেগে বললেন, 'মুজিব ভাইকে একটু বোঝাও, তিনি যেভাবে দেশ চালাচ্ছেন তাতে দেশটারও কিন্তু ক্ষতি হবে।' আমি বললাম, 'আমি কি আপনার চাইতে বেশি বোঝাব ?' তখন তিনি বললেন, "তিনি তো তোমাদের মত আমলাদের কথা বেশি শোনেন।'

তাজউদ্দীনের এই কথাটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব সত্যি। এমনকি শেখ মণি পর্যন্ত কাগজে একটা হেডলাইন দিয়েছিল যে, মোনায়েমের আমলা দিয়ে মুজিবের শাসন চলবে না ।

যাঁরা বঙ্গবন্ধুর সাথে রাজনীতি করেছেন, রাজনীতিতে একনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের চাইতে কিন্তু পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু এই আমলাদের উপর খুব নির্ভরশীল হয়ে গেলেন । যে সমস্ত ব্যুরোক্র্যাট পাকিস্তান আমলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে ছিলেন তাঁদেরকেই পুনরায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ পজিশনই দিলেন, দিতে আরম্ভ করলেন।

যার ফলে প্রশাসনে তেমন কোন গুণগত পরিবর্তন আর হল না । ওই পাকিস্তানের প্রশাসনটাই রয়ে গেল ।

তাজউদ্দীন সাহেব অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ের আর একটি ঘটনার কথা মনে আছে । আমাকে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তাজউদ্দীন তোমার বন্ধু, সে একরোখা, আমার কথা শুনবে না । তুমি একটু যাও, যেয়ে দেখ টিভি স্টেশন সম্প্রসারণের জন্য টাকা বরাদ্দ দেবে কিনা।'

তাজউদ্দীন সাহেব নীতির বিষয়ে খুব কড়া ছিলেন, বঙ্গবন্ধুকেও তিনি অনেক সময় না করে দিয়েছেন, বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমার এখনও মনে আছে, টিভি স্টেশনের সম্প্রসারণের ব্যাপারে আমরা একটা প্রস্তাব করেছিলাম। তাজউদ্দীন এটাতে রাজি ছিলেন না। আমি তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে গেলে তিনি আমাকে খুব ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন, আমাদের মত একটা গরিব দেশে টেলিভিশনের মত একটি বিলাসী মাধ্যমের জন্য নতুন করে টাকা খরচ করার মত টাকা আমাদের নেই। আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় এটি ঠিক হবে না। আমি তাজউদ্দীন সাহেবের যুক্তিতে সম্মত হয়ে ফিরে এলাম। এমনকি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী এবং তথ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাজউদ্দীন সাহেবের এই সিদ্ধান্ত ওভাররাইড করেননি ।

তাজউদ্দীন সাহেব ফাইলে চমৎকার নোট লিখতেন । আমার মনে হয় এমন সুন্দর নোট বাংলা ভাষায় আর হয় না ।

তাজউদ্দীন ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। এই ইতিহাস নিশ্চয়ই তাজউদ্দীনকে একদিন যথার্থ সম্মান দেবে ।

[26.10.1990]

বাহাউদ্দিন চৌধুরী : সাংবাদিক এবং সরকারি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব।

নূরুল ইসলাম

বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এলেন তখন আমার কিছু বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর সাথে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়। তিনি আমাকে বললেন. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নীতি নির্ধারণী উপায় খুঁজে বের করা এবং বিভিন্ন প্রস্তাবনা রচনার জন্য আপনি আমাদের সাথে কাজ করুন। আমি তখন করাচি থাকতাম, কিন্তু ঢাকায় ঘন ঘন আসা হত। ইতোমধ্যে এখানে একটা ইনফর্মাল গ্রুপ হয়ে গেছে। ড. কামাল হোসেন, প্রফেসর রেহমান সোবহান, আমি এবং অনেকে সেই গ্রুপের সদস্য। কিন্তু আমাদের সাথে সব সময় বসতেন তাজউদ্দীন সাহেব, তাঁকে সাথে নিয়েই আমাদের সমস্ত কাজ চলত। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা, পর্যালোচনা হত তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে। আবার আমরা বঙ্গবন্ধুর সাথেও বসতাম ৬-দফার খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার জন্য, তখনও সেই সভাতে তাজউদ্দীন সাহেব ব্যতিক্রমহীনভাবে উপস্থিত থাকতেন। মাঝেমধ্যে থাকতেন সৈয়দ সাহেব (সৈয়দ নজরুল ইসলাম), কামরুজ্জামান, মনসুর আলি, মোশতাক । কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব সবসময় থাকতেন ।

এই সমস্ত আলোচনায় বিভিন্ন দিক বা বিষয় নিয়ে কথা বলায় তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ । চমৎকার ছিল তাঁর কাজের ধরন, নিজে বুঝতে পারার এবং অন্যকে বোঝাবার ক্ষমতা। তাই আমাদের আলোচনা-পর্যালোচনা তাজউদ্দীন সাহেবের সাথেই বেশি হত। এইভাবেই ওই সমস্ত মিটিংয়ের মাধ্যমেই তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার পরিচয়। এর আগে আমি তাঁর নাম শুনেছি, কিন্তু তাঁকে চিনতাম না। তাঁর সাথে কাজ করতে গিয়েই বুঝলাম তিনি ছিলেন সবচাইতে কর্মদক্ষ এবং নিবেদিত মনের মানুষ। অত্যন্ত পেশাদারী দক্ষতার সাথে তিনি কাজ করতেন। যখন আমাদের কোন কিছুর বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতেন, তথ্য দিয়ে তার বিশ্লেষণ করতেন ।

'৭১-এর মার্চ মাসে অসহযোগ চলাকালীন সময় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেশবাসীর জন্য যত নির্দেশ যেত তার মধ্যে অর্থনৈতিক নির্দেশগুলোর খসড়া তৈরি হত আমার বাড়িতে । আমি তখন ধানমন্ডির ৮ নম্বর সড়কে মুসা সাহেবের বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতাম। রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে তাজউদ্দীন সাহেব আমার বাসায় চলে আসতেন। ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামও একই সময় উপস্থিত থাকতেন। এদিকে আমি এবং অধ্যাপক

রেহমান সোবহান দৈনন্দিন সমস্ত অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে মনিটর করে ঠিক করে রাখতাম কী কী বলা দরকার, আজকের দিনে কী কী ঘটেছে ইত্যাদি। তাজউদ্দীন সাহেবের দায়িত্ব ছিল সমস্ত বিষয়গুলোকে কো-অর্ডিনেট করা । তারপর সেগুলোকে চূড়ান্ত করার পর রাত বারোটার আগে সেই নির্দেশগুলো খবরের কাগজে পাঠিয়ে দেয়া হত। প্রতিদিন খবরের কাগজে নির্দেশ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করতেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ।

এই কাজগুলো করতে গিয়েই বুঝলাম তাজউদ্দীন সাহেব কী ধরনের মানুষ। সাংঘাতিক পরিশ্রম করতে পারতেন। অসম্ভব রকমের ধৈর্য ছিল তাঁর। অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখেছি তাঁর মধ্যে। তাঁর সাথে খুব সহজে আলোচনা করা যেত। দিনের পর দিন তাঁর সাথে বিতর্ক করেছি আমরা । তিনি সব সময় অন্যকে কথা বলবার সুযোগ দিতেন। মতের মিল না হলে বলতেন, 'আপনি বলে শেষ করেন, তারপর আমি বলছি কেন হবে না।' ওই সময়ই বোঝা যেত তাঁর পাণ্ডিত্য। তাজউদ্দীন সাহেব সাংঘাতিক ভাল বাংলা লিখতেন। খুবই সুন্দর ছিল তাঁর লেখা। আমার খুব ভাল লাগত দেখতে তিনি কীভাবে সমস্ত আরগুমেন্টগুলো সাজিয়ে লিখতেন। যেমন আরগুমেন্টগুলো লেখার পর সেগুলোর সমাধান দেয়া, তারপর বিভিন্ন সুপারিশ লিখে ফেলা । তাঁর ভেতরের এই বিষয়গুলোকে আমি বলব অত্যন্ত এক্সট্রাঅর্ডিনারি অ্যাবিলিটি। মিটিং হচ্ছে, কথাবার্তা শেষ, তারপর ১, ২, ৩, ৪ এইভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে আরগুমেন্টগুলো লিখে ফেলা । আমি তো বলবো তাজউদ্দীন সাহেবকে জানেন এমন যে কেউ স্বীকার করবেন তাঁর এই গুণের কথা। আমি তাঁর গ্রেট অ্যাডমায়ার ছিলাম ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তাজউদ্দীন সাহেব অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী, আর আমি সে সময় প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। তখন আমাদের রোজ দেখা হত। আমরা তখন ভীষণ ঘনিষ্ঠ। তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখতেন, মর্যাদা দিতেন, অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করতেন। আমরা আড্ডা জমাতাম, কথা বলতাম । সে সময়েও দেখেছি, অফিসের কাজেও তিনি ছিলেন আমার দেখা সবচাইতে তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি। এবং রাজনৈতিক জগতেও তিনি ছিলেন সম্ভবত সবচাইতে বুদ্ধিমান এবং ক্ষুরধার বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব । তিনি ছিলেন অত্যন্ত চমৎকার একজন মানুষ। আলোচ্য বিষয় বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন পরিষ্কার বোধসম্পন্ন। আমি আবার বলি, নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উঁচু দরের মানুষ, এতে আমার মনে কোন প্রশ্ন নেই ।

একটা বিষয়ের সমস্ত দিক অত্যন্ত পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার এবং বোঝার ক্ষমতা ছিল তাঁর । ক্যাবিনেটে কৌশল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমরা তো অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথেও কাজকর্ম করতাম। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেবের বিশ্লেষণ, তাঁর প্রতিক্রিয়া সবসময় খুব ভাল এবং সুচিন্তিত ছিল।

আমি শুরুতেই বলেছি, তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার পরিচয় '৬৯ সালে। ১৯৭১-এ আমি মুজিবনগরে খুব বেশিদিন ছিলাম না । প্রফেসর আনিসুর রহমান, প্রফেসর রেহমান সোবহান, আমি বিদেশে ছিলাম, সেখানে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লবি করেছিলাম। বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল ।

আমার সাথে তাজউদ্দীন সাহেবের আসল কাজ শুরু হল স্বাধীনতার পর । তখন প্রতিদিন তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ ছিল, কাজ ছিল। এই দেশের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি দেশ গড়ে উঠবে এই ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু দেশের দায়িত্বে তো তিনি একা ছিলেন না, এবং ক্যাবিনেটে সবাই একই রকম ধারণার মানুষ ছিল না—এক কথায় হারমোনিয়াস ছিল না । তাঁর শত্রুও ছিল, মিত্রও ছিল । বিপক্ষের লোকেরা বেশি শক্তিশালী ছিল, কাজেই তাঁর কার্যকর ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখা সম্ভব ছিল না ।

দেশের প্রয়োজনে যা করা দরকার কিন্তু তেমন হচ্ছে না, বা করতে পারছেন না, এবং কেন পারছেন না এর কারণগুলো তিনি প্রায় সময়ই বলতেন । তিনি বলতেন কিছু কিছু মানুষের কথা যে, ওরা আমার বিরুদ্ধে লেগে আছে, কাজ করতে দিচ্ছে না। তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে খন্দকার মোশতাকের সম্পর্ক কোনকালেই ভাল ছিল না। তাজউদ্দীন সাহেব খুব সরাসরি এবং খোলামেলা কথা বলতেন, ডিপ্লোম্যাসি করতেন না । রাজনীতিবিদদের বোধ হয় লুকিয়ে ছাপিয়ে কথা বলা, পেছন দিয়ে কথা বলা এগুলো বলতে হয় । কিন্তু তিনি খুব সৎ এবং সহজ মানুষ ছিলেন, রাজনীতিবিদদের এমন সহজ খোলাখুলি আচরণে স্বাভাবিকভাবে শত্রু তো তৈরি হয়েই যাবে ।

যেমন, কোন একটি মিটিংয়ে হয়ত আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে গেলাম, সেখানে তাজউদ্দীন সাহেবই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পরিষ্কার বুঝতেন যে আমি বা আমরা কী বলছি। তিনি প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে হোক সব সময় যুক্তি দিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু অন্যান্য অনেকেই বিষয়গুলোকে ঠিক সেভাবে

আলোচনায় আনতে পারতেন না। ফলে তাজউদ্দীন সাহেব মাঝে মাঝেই বলে ফেলতেন, আপনারা কিছু বোঝেন না, বুঝতে চেষ্টা করেন না—যা হয়ত খুবই আনডিপ্লোম্যাটিক । আসলে তাজউদ্দীন সাহেব খুব স্পষ্টবাদী মানুষ ছিলেন, কেউ যাতে রুষ্ট না হয় তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলাটা তাঁর স্বভাব ছিল না, যদিও তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতেন ।

সত্যি কথা বলতে আমি তো রাজনীতিবিদ নই, তাই তাঁর স্ট্রেটফরোয়ার্ড বক্তব্যে আমার কাজ করতে সুবিধাই হত । তাজউদ্দীন সাহেব আমাদের দেশের প্রচলিত ধারার রাজনীতিবিদদের মত ছিলেন না, খুবই স্ট্রেটফরোয়ার্ড ছিলেন। রাজনীতিতে অনেক সময় হয়ত সত্যি কথা বলতে নেই । ডিপ্লোম্যাসি করে কথা বলে সবাই। কিন্তু আমি দেখেছি তাজউদ্দীন সাহেব সবসময় একেবারে সোজা কথা বলতেন ।

তাজউদ্দীন সাহেব খুব দুঃখ করে বলতেন, 'বঙ্গবন্ধু কোন দিনও আমার কাছ থেকে শোনেননি কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ হল, কীভাবে কী করলাম।' বলতেন, 'আমি যে একটা মানুষ আছি, কোন দিনও ডেকে বললেন না, আচ্ছা বল দেখি তাজউদ্দীন, কী হয়েছিল সেই ৭১-এ। আমাকে সেই সম্পর্কে সমস্ত খুলে বল, এক দিনে না হয় কয়েক দিনে বল । কীভাবে সেখানে তুমি গেলে, কীভাবে কাজ করলে, আমাকে বল।' এটা বোধ হয় তাঁদের মান-অভিমানের কোন ব্যাপার ছিল ।

দেশ স্বাধীন হবার কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝতে পারছিলাম এই দু'জনের সম্পর্কটা যেন টেন্সড্ এবং আমি মনে করি তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে শত্রুতা করে কেউ বোধ হয় বঙ্গবন্ধুকে কান-কথা বলত। কিন্তু আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, তাজউদ্দীন সাহেব সম্পূর্ণভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্য নিবেদিত ছিলেন এবং অকৃত্রিম ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্য তাঁর ভালবাসা। এর মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না । আমার কাছে কোন দিনই মনে হয়নি তিনি বঙ্গবন্ধুর সবচাইতে ভালটা চাচ্ছেন না। তাজউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুর ভালটাই সবসময় চাইতেন। বঙ্গবন্ধুর বিন্দুমাত্র ক্ষতি বা খারাপ তিনি চাচ্ছেন এটা আমার কোন দিনই মনে হয়নি। তাঁর কার্যকলাপেও দেখিনি। বঙ্গবন্ধুর ভাল চেয়েই বিশ্বাস করে হয়ত তিনি কিছু বলেছেন, কিন্তু কেউ হয়ত উল্টো কথা বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে বুঝিয়ে এসেছেন। সেই সময়ের সমস্ত ঘটনা দেখে আমার যেটুকু ধারণা, শেখ মণি তাজউদ্দীন সাহেবের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এই বিষয়ে আমি প্রমাণ করতে পারব না, কারণ আমার সাথে শেখ মণির কোন সম্পর্ক ছিল না, সে আদৌ কিছু বলেছে কিনা তাও জানি না, কিন্তু এটা আমার একটা ধারণা, হয়ত আমার ভুলও হতে পারে যে, কান-কথা বলায় মোশতাকের চাইতে শেখ মণির ভূমিকা বেশি ছিল। এছাড়াও অন্য কেউ, কোন মন্ত্রীও থাকতে পারেন। '৭৩-এর শুরু থেকে এই টেনশনটা শুরু হয় যে, তাজউদ্দীন সাহেব মনে করতেন প্রায় সময়ই আর তাঁর কথা শোনা হয় না। বঙ্গবন্ধুর যেন তাঁর প্রতি আগ্রহ কম । এই ভুল বোঝাবুঝিতে তাঁদের কী হল তা তো আমরা দেখেছি, কিন্তু বাংলাদেশের জন্য তা হল সবচাইতে বড় ট্র্যাজেডি। আমার মনে আছে, যে দিন বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে এলেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে, সে দিনের সেই বিশাল জনসমুদ্রে তাঁর সাথে আমি সরাসরি দেখা করতে পারিনি। তাই ১২ তারিখে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে আমি ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডের যে বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের সময় বেগম মুজিব ছিলেন সে বাড়িতে গেলাম। বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হলে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তিনি বললেন, ‘আগামীকাল সকাল দশটার সময় আসেন। আপনার সাথে জরুরী কথা আছে।' আমি পরদিন সকাল দশটায় গিয়ে দেখি তাজউদ্দীন সাহেব, নজরুল সাহেবসহ তিন-চারজন মন্ত্রী সেখানে আছেন। এছাড়া অন্যান্য মানুষজন তো আছেই। বঙ্গবন্ধু তাঁর বেডরুমে বসে বিভিন্নজনকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিচ্ছেন । অর্থাৎ তিনি বাংলাদেশ সরকার গঠন করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, ‘প্রফেসর সাহেব, বসেন। আপনি আজ থেকে প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। প্ল্যানিং কমিশনের কী কার্যক্রম হবে কে মেম্বার হবে এই সব লিখে পরশু দিন সেক্রেটারিয়েটে নিয়ে আসেন।' এক কথায় বঙ্গবন্ধু প্ল্যানিং কমিশনের সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, একটু পরেই বঙ্গবন্ধু মতিউল ইসলামকে ডাকলেন। তারপর তাজউদ্দীন সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তাজউদ্দীন, মতিউল ইসলাম তোমার অর্থ সচিব। ও খুব ভাল মানুষ। আমি চিনি তাকে, তোমার জন্য খুব ভাল হবে।' তাজউদ্দীন সাহেব হাঁ করে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর সাথে আলাপ করা হয়নি, কিছুই বলা হয়নি, হঠাৎ করেই এই নিয়োগ দেয়া হল । বেচারা তাজউদ্দীন সাহেব জানতেন পর্যন্ত না যে এই মানুষটি কে!

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মত। আমরা অনেক কথাবার্তা বলতাম। আমি বুঝতাম তিনি এই বিষয়টি কোন দিনও ভোলেননি। এছাড়াও আর একটি বিষয় ছিল, মতিউল ইসলাম সাহেবের সাথে বঙ্গবন্ধু

সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন—যা তাজউদ্দীন সাহেবের মত সিনিয়র এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর পক্ষে মেনে নেওয়াটা খুব সহজ ছিল না। আমি বুঝতাম হি ইজ ভেরি আনহ্যাপি, কিন্তু তিনি কোন দিনই পরিষ্কার করে কিছু বলেননি বা এই বিষয়ে অভিযোগ আকারেও কিছু বলতেন না। বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাজউদ্দীন সাহেবের প্রশ্নাতীত এবং অতুলনীয় ভালবাসা ছিল, যে কারণে বুঝতে পারতাম বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রচণ্ড অভিমান ছিল তাঁর। তিনি কিন্তু এই ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও মতিউল ইসলামকে কোন রকম দোষারোপ বা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি। তাঁর অভিমানটা ছিল বঙ্গবন্ধুর উপর। তাজউদ্দীন সাহেব মনে করতেন, বঙ্গবন্ধুর উচিত মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে সরাসরি সচিবের সাথে দেখা করার বিষয়টিকে উৎসাহিত না করা।

তাজউদ্দীন সাহেব আসলেই যে একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ ছিলেন তার একটি উদাহরণ দেই । মতিউল ইসলাম সাহেব অনেক সময় বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতেন যা আমাদের মতামতের চাইতে ভিন্ন হত। হি ওয়াজ আ প্রাইভেট সেক্টর ম্যান, আর আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাচ্ছি, কাজেই মৌলিক পার্থক্য ছিল । কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব দ্বিমত হলেও সব সময় আগ্রহ সহকারে মতিউল ইসলামের মতামত শুনতেন, জিজ্ঞাসা করতেন। মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কখনই তাঁকে বাধা দিতেন না, রাগ করতেন না, বা এমন ধরনের কোন আচরণই করতেন না। মতিউল ইসলাম সাহেব অত্যন্ত সৎ এবং ভাল মানুষ । তিনি কারো বিরুদ্ধে অগোচরে কোন কথা বলতেন না। যা বলতেন সরাসরি, এই গুণটি ছিল তাঁর। আমি দেখেছি এসব কারণেই তাজউদ্দীন সাহেব তাঁকে কিছু দিনের মধ্যেই পছন্দ করতে শুরু করেন ।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তৎপরতায় জোরালো সমর্থন এবং ভূমিকার কারণে তাজউদ্দীন সাহেব আমেরিকার প্রতি ভয়ানকভাবে সন্দিহান ছিলেন। তাঁর এই আচরণ খুবই স্বাভাবিক, কারণ আমরা প্রাণপণে স্বাধীনতা সংগ্রাম করছি আর ওই দিকে আমেরিকা আমাদের বিরুদ্ধে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে দিল। তারা আমাদের যুদ্ধকে সাবোটাজ করার জন্য খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ করেছে। এসব সন্দেহ থেকেই তিনি বলেছিলেন, আমরা আমেরিকার সাহায্য নেব না । তাঁর মনোভাবটা অত্যন্ত কঠোর ছিল আমেরিকার ব্যাপারে, কিন্তু তিনি যখন রাষ্ট্র চালাতে গেলেন, আমি মনে করি তখন তিনি দেখলেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আর আমার (তাঁর) ব্যক্তিগত

অনুভূতি তো এক জিনিস নয়। মানবিক অনুভূতি দিয়ে রাষ্ট্র চালান যায় না । কাজেই তিনি তাঁর ভাবনা-চিন্তা রেকনসাইল করেছিলেন। এখানেই তাজউদ্দীন ছিলেন অন্য সবার চাইতে আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী মানুষ । ভীষণ গ্র্যাগম্যাটিক ছিলেন তিনি ।

ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা বলি । আমরা তখনও বিশ্বব্যাংকের সদস্য হইনি । ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা ভারতে এসেছেন। সেখান থেকে খবর এল তিনি ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় আসবেন । এদিকে তাজউদ্দীন সাহেব তখন দিল্লীতে গিয়েছিলেন। আমরা আশা করছিলাম রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে দু'জনেই যখন একই জায়গায় আছেন তখন নিশ্চয়ই দেখা-সাক্ষাৎ হবে ।

কিন্তু পরে আমার কিছু পরিচিত ভারতীয়দের কাছ থেকে খবর পেলাম দু'জনের দেখা হয়নি। ম্যাকনামারা দেখা করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব বলেছেন, আমি এখন ব্যস্ত । দিল্লীতে একটি সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো হয়, সেখানে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে ম্যাকনামারা এবং তাজউদ্দীন সাহেবের আসন ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয়েছিল যেন তাঁরা পাশাপাশি বসতে পারেন। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর সাথে তো কথা বলেনইনি, এমনকি ঘুরেও তাকাননি ।

এদিকে আমি তো ঢাকা থেকে জানতে পারছি না যে ওঁদের দু'জনের দেখা হচ্ছে না । তাই ভাবছি ব্যাপার কী ? সরাসরি বিশ্বব্যাংক ম্যাকনামার খবর পাঠাচ্ছে যে তিনি আসবেন, কিন্তু অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে কোন খবর আসছে না। অথচ তিনি সেখানে উপস্থিত আছেন। ব্যাংক আলাদা করে খবর পাঠাচ্ছে, অথচ তাজউদ্দীন সাহেব কোন খবর পাঠাচ্ছেন না, আমি বেশ উদ্বিগ্ন যেহেতু আমাকে সমস্ত কিছু ম্যানেজ করতে হবে।

ম্যাকনামারা যে দিন ঢাকায় আসবেন তার আগের দিন তাজউদ্দীন সাহেব দিল্লী থেকে ঢাকায় ফিরলেন। দুপুরে বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীন সাহেব এবং আমি একসাথে বসলাম ম্যাকনারাকে কে রিসিভ করবে, মিটিং কার কার সাথে হবে, ডিনার লাঞ্চ কোথায় হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করে ঠিক করার জন্য। ম্যাকনামারা আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন, সেইসূত্রে তিনি আমার সাথেও প্রাইভেট লাঞ্চ খেতে চান এমন খবর পাঠিয়েছিলেন। তাই এই প্রস্তাবসহ আমি মোটামুটিভাবে তৈরি করা প্রোগ্রাম সম্বন্ধে এক এক করে

বিস্তারিত বললাম। আমি বললাম, 'ম্যাকনামারাকে রিসিভ করবেন বঙ্গবন্ধু।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তাজউদ্দীন, তুমি কী বল ?' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'মুজিব ভাই, আপনার এয়ারপোর্ট যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না ।' আমি বললাম, 'আপনি আপত্তি করছেন, কিন্তু অন্য অনেক জায়গায় তো এমনই হয়।' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'অন্য জায়গায় যা হয় এখানে সেটা চলবে না, চীফ অফ প্রটোকল যাবে।' আমি বললাম, ''বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট যখন পাকিস্তানে যেতেন তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কিংবা যিনি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান যিনি থাকতেন তিনি যেতেন। আর আপনি চীফ অফ প্রটোকল পাঠিয়ে দেবেন ?' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, ''ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যাবে। আপনিও যাবেন না।' বঙ্গবন্ধু সব শুনছিলেন। বললেন, ''ঠিক আছে, তাজউদ্দীন যা বলছে তাই করেন।' তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার সম্পর্কটা খুব সুন্দর ছিল । তাই আমি ঠাট্টা করে বললাম, ''ঠিক আছে, রিসিভ করতে না হয় গেলাম না। কিন্তু লাঞ্চ খেতে দেবেন, না তাও দেবেন না ?' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'না, আপনি লাঞ্চ খেতে পারবেন না। কেন ম্যাকনামারা আপনাকে গোপনে লাঞ্চ দেবে ? সবাই মিলে একটা পার্টি হতে পারে।'

পরদিন ম্যাকনামারা এলেন। প্রথম মিটিংয়ে বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীন সাহেব, ম্যাকনামারা এবং আমি। প্রাথমিক আলোচনার পর বিস্তারিত আলোচনার জন্য ম্যাকনামারা, তাজউদ্দীন সাহেব এবং আমি যখন বসলাম তখন ম্যাকনামারা জানতে চাইলেন বাংলাদেশের জন্য কোথায় কী ধরনের সাহায্য দরকার ।

তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আমাদের যা দরকার তা আপনি দিতে পারবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে।' ম্যাকনামারা বললেন, 'মিস্টার মিনিস্টার, আপনি বলুন, আমরা চেষ্টা করব দিতে।' তখন তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, ''মিস্টার ম্যাকনামারা, আমার গরু এবং দড়ি দরকার। যুদ্ধের সময় গরু সব হারিয়ে গেছে। এখানে ওখানে চলে গেছে, মরে গেছে। পাকিস্তান যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, চাষীরা এদিক সেদিক পালিয়ে গেছে, তখন গরু হারিয়ে গেছে। এখন যুদ্ধ শেষ, চাষী ফিরেছে কিন্তু গরু নাই, তাই চাষ করবে কীভাবে ? কাজেই আমাদের অগ্রাধিকার চাহিদা হল গরু।' ম্যাকনামারার চোখ-মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আর আমাদের সমস্ত দড়ি তো পাকিস্তানিরা নষ্ট করে ফেলেছে, এখন গরু পেলে গরু বাঁধতে দড়ি প্রয়োজন। গরু এবং দড়ি প্রয়োজন খুব তাড়াতাড়ি, না হলে সামনে জমিতে চাষ হবে না।'

আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমি একবার জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাই, এদিকে ওদিকে তাকাই, তারপর বললাম, 'আমাদের এই প্রয়োজনের পাশাপাশি আরো অন্যান্য প্রয়োজনও আছে।' এই বলে কোনভাবে মিটিং শেষ করলাম । মিটিং শেষে আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে বললাম, 'আপনি এমন কেন বললেন ?' তিনি বললেন, ‘কেন, গরু ছাড়া কি চাষ হয় ?' মহা চটে ছিলেন । বললেন, ‘এই লোকটি তো আমেরিকার ডিফেন্স সেক্রেটারি ছিলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে আমেরিকা। আমাদেরকে স্যাবোটাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে।' আমি যুক্তি দিলাম, ‘সপ্তম নৌবহর মার্কিন সরকার পাঠিয়েছিল, সে পাঠায় নাই।' যাই হোক, ম্যাকনামারার মুখ লাল হল বটে কিন্তু পরে ফলাফল ভাল হয়েছিল।

আজ আমি এই ঘটনা বলছি মুক্তিযুদ্ধের ২৭ বছর পর। জানি না সে দিন হয়ত তাজউদ্দীন সাহেবের জায়গায় আমি থাকলেও একই রকম ভাবতাম, কারণ আমরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছি আর ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলতে সবরকম সহযোগিতা করছে। আসলে তাজউদ্দীন সাহেব সাংঘাতিক দেশপ্রেমিক মানুষ ছিলেন। তিনি বুঝতেন আমরা বড় দেশকে কিছু করতে পারব না । সেই ক্ষমতা আমাদের নেই । কিন্তু আমাদের আত্মসম্মানবোধ আছে, আমরা কারো দয়া চাই না, এই জিনিসটি তিনি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, আর কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। পরবর্তীতে আমি দেখেছি, তাঁর সাথে বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন মিটিংয়ে আমি গেছি, দেশের স্বার্থে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ । তাজউদ্দীন সাহেব অত্যন্ত নির্ভুলভাবে খুব অল্প কথায় সমস্ত বিষয় তুলে আনতে পারতেন। তাঁর এই বিশেষত্বটি ছিল। আমি আগেই বলেছি, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন এবং রাজনীতিবিদরা সাধারণত যে ধরনের কথাবার্তা বলেন তিনি তেমন বলতেন না । তাঁর এই পরিষ্কার এবং স্ট্রেট কথার ফলে সবাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে সহজেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আসা সম্ভব হত ।

এটা ঠিক, শুধু ম্যাকনামারাই নয়, যে কোন বিদেশী যাঁরাই তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কথা বলেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর সম্পর্কে অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন । তাঁর ক্যাপাসিটি সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। আর একটা জিনিস ছিল তাঁর, যেখানে কোন ভুল হচ্ছে তিনি সেই ভুলটা স্বীকার করতেন। বুঝতে পারতেন সঙ্গে সঙ্গে ।

আর একটি কথা, তাজউদ্দীন ভারতঘেঁষা কিছু লোকের এমন একটি প্রচারণা ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন একজন মানুষ। যুদ্ধের পর প্রথম ছয় মাসে আমি দেখেছি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার কারণেই হয়ত তাঁর মনোভাব আমেরিকাবিরোধী, কিন্তু তার পরেই তিনি সম্পূর্ণ প্র্যাগম্যাটিক । ভারতকে খাতির করব, রাশিয়াকে খাতির করব, আমেরিকানদেরকে খাতির করব না—এই মনোভাব তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাঁর মনোভাব ছিল, যুদ্ধের সময় কার সাহায্য নিয়েছি, কার সাহায্য পাইনি, বা এমন সাহায্য দেশের স্বার্থে সবাই নেয় তার মানে এই নয় যে সাহায্যের বদলে ওরা যা বলবে আমরা তাই করব, এটি হবে না। তাজউদ্দীন সাহেব সম্পর্কে এই ভারতঘেঁষা কথাটি যারা বলেছে তারা সম্পূর্ণ বাজে কথা বলেছে। তিনি কোন দিনই কারো প্রতি নতজানু ছিলেন না । তাঁর কোন রকম দুর্বলতা ছিল না। কোন দেশের প্রতি তাঁর যা কিছু দুর্বলতা ছিল তা ছিল তাঁর নিজের দেশ বাংলাদেশের জন্য। তিনি ছিলেন প্রো-বাংলাদেশ । আমি তাঁর সাথে কাজ করতে গিয়ে এমন প্রমাণ পাইনি যে তিনি ভারতের সাথে খাতির করে সমঝোতা করেছেন। আমি প্রায় ৩ বছর তাঁর সাথে কাজ করেছি, আমার অভিজ্ঞতায় এটি নেই যে, ভারত আমার বন্ধু দেশ, কাজেই ছেড়ে দাও । অথবা ভারতের সাথে আলোচনার সময় শক্ত না থেকে নরম থাকতে হবে। এমন তিনি কখনোই করেননি বা বলেননি।

তাজউদ্দীন সাহেবের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল । ভারত যুদ্ধের দিনে আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে, সেই জন্য তিনি কৃতজ্ঞ । কিন্তু দেশের স্বার্থে পাট বিক্রি করতে হবে, ফার্টিলাইজার লাগবে এমন সব কথাবার্তার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা ভারতীয়দের সাথে ঝগড়া পর্যন্ত করেছি। তাজউদ্দীন সাহেব কোন দিন নরম হতে বলেননি ।

আমরা একবার ভারতে গেলাম একটা ডেলিগেশান নিয়ে, আর এদিকে এনায়েতউল্লা খান হলিডেতে হেডলাইন দিয়ে লিখে ফেললেন, বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন গেছে ভারতের আশীর্বাদ নিয়ে আসতে এবং প্ল্যান তৈরি করার আগে দিকনির্দেশনা নিতে। এই কথাগুলো ছিল সম্পূর্ণ জঘন্য ও মিথ্যা অপপ্রচার । আমাদের মনোভাব ছিল, আমরা স্বাধীন দেশ, কথাবার্তা-আলোচনায় আমরা স্বাধীনভাবে কথা বলব। আমাদের দেশের স্বার্থের বিষয়ে কোন খাতির নেই। যেমন পাট নিয়ে আলোচনার সময় আমরা সরাসরি ভারতকে বলেছি, তোমাদের পাট উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। তোমাদের খরচ

বেশি, তোমরা উৎপাদন কেন করছ ? আমরা তোমাদের কাছে পাট বিক্রি করব। আমি রীতিমত ফাইট করেছি ওদের সাথে । আগে ভারত কিছু কিছু পাট উৎপাদন করত, বাকিটা নিত বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে । কিন্তু পাক-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তান পরবর্তীতে ভারতে পাট বিক্রি বন্ধ করে দেবার ফলে ভারত বেশ জোরেসোরে পাট উৎপাদন শুরু করে। আমরা চেয়েছিলাম ওরা বাড়তি পাট উৎপাদনটা বন্ধ করে আবার আগের মত আমাদের কাছ থেকে পাট ক্রয় করুক। তাজউদ্দীন সাহেবের কথা ছিল, বিপদে সাহায্য করেছ ভাল কথা, আমরা বন্ধু থাকব, কিন্তু তাই বলে আমার দেশের স্বার্থের ক্ষতি হয় এমন কোন সুবিধা আমি তোমাকে দেব না ।

আর একটি ঘটনা, দেশ স্বাধীন হবার পর আমেরিকান কনসাল জেনারেল ঢাকায় রয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর কূটনৈতিক স্টেটাস নেই—কারণ ওঁর দেশ তো আমাদেরকে স্বীকার করে না। তাজউদ্দীন সাহবের জায়গায় অন্য কেউ হলে বলত, চলে যাও, তুমি এখানে কী করছ ? কিন্তু দেশের স্বার্থে তাজউদ্দীন সাহেব তাঁকে কিছু করলেন না, বরঞ্চ তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন । পরবর্তীতে তাঁকে সম্পূর্ণ কূটনৈতিক মর্যাদা দেয়া হয়। আমি এ কথাটি এজন্য বলছি, তখন তো সাংঘাতিক আমেরিকাবিরোধী মনোভাব ছিল মানুষের ।

'৭২ সালে বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট (দক্ষিণ এশিয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত) পিটার কারগিল ঢাকায় এলেন । তখনও বিশ্বব্যাংকের কোন প্রতিনিধি ঢাকায় ছিল না। আমরা কারগিলকে বুঝালাম, বাংলাদেশের এই অবস্থায় তোমরা এমন একজন প্রতিনিধি দাও যিনি কোন বড় দেশের মানুষ হবেন না এবং যাঁকে নিরপেক্ষ ভাবা যাবে। নরওয়েজিয়ান ইয়ুস্ট ফালান্ড আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু ছিলেন, আমি তাঁর কথা বললাম । কারগিল বললেন, দেখি কী করা যায়। এরপর নরওয়েতে ফালান্ড-এর ইন্টারভিউ নেয়ার পর আমাদেরকে জানানো হল ব্যাংক ফালান্ডকে তাদের প্রতিনিধি করতে রাজি আছে। আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে সমস্ত বিষয়গুলো বললাম । ফালান্ড ঢাকায় এলেন । আমাদের সাথে বিশ্বব্যাংকের তিনিই ছিলেন যোগাযোগের মাধ্যম। তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে তাঁর অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হি স্টার্টেড ফাইটিং ফর বাংলাদেশ রাদার দ্যান ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইন্টারেস্টস্। বাংলাদেশের জন্য তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে তাঁর এত ভাল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়েছিল যে বাংলাদেশ থেকে চলে যাবার পরও তিনি তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা করেছেন, যোগাযোগ রেখেছিলেন। তাজউদ্দীন সাহেবের

একটা ব্যাপার ছিল, তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মানুষকে হ্যান্ডল করতে পারতেন। যেহেতু তিনি অসম্ভব রকমের বুদ্ধিমান, শিক্ষিত এবং যোগ্য মানুষ ছিলেন তাই তাঁর জন্য খুব সহজ ছিল বিদেশীদের হ্যান্ডল করা। তাঁর মত দক্ষ মানুষ বাংলাদেশে খুব কমই ছিল ।

বন্ধু হিসেবে তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, অসম্ভব রকমের ভাল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সিম্পল এবং ভীষণ ভদ্র। নিজেকে জাহির করা, যে কোন ধরনের শো অফ্ করা এসবের মধ্যে তিনি কখনোই ছিলেন না। অত্যন্ত ভাল একজন মানুষ ছিলেন তিনি ।

মনে আছে '৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথমবার বিশ্বব্যাংকের মিটিংয়ে যোগ দিতে আমরা ওয়াশিংটন গেলাম । তখন তো আমাদের টাকাপয়সা খুব কম ছিল । তার মধ্য দিয়েই সব কিছু ব্যবস্থা করতে হত। তাজউদ্দীন সাহেব নিজেও কোন রকম আড়ম্বর পছন্দ করতেন না । একদিন আমাকে বললেন, ‘ভাই, চলুন কোথাও হাঁটতে যাই।' হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'চলুন, সস্তায় কোথাও খাব।' আমি একটা সস্তা রেস্তোরায় তাঁকে নিয়ে গেলাম। তারপর তো বিশ্বের আরো অনেক দেশে গিয়েছি, পাশাপাশি থেকেছি। তিনি সব সময় একই রকম সিম্পল ।

মনে আছে, একবার ক্যাবিনেট মিটিং শেষ করে তাজউদ্দীন সাহেব এবং আমি হেঁটে আমাদের বিল্ডিংয়ে ফিরছিলাম। আমার অফিসকক্ষ নিচতলায় আর তাঁর অফিসকক্ষ ঠিক আমার উপরে। এদিকে প্রত্যেক বিল্ডিংয়ের গেটের সামনের দিকে পুলিশ থাকত। পুলিশ তাজউদ্দীন সাহেবকে ঢুকতে দিল না, বলল, ‘আপনার আইডেনটিটি কার্ড দেখান।' আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ‘আরে ভাই কর কী, আমাদের অর্থমন্ত্রী!' পুলিশ বেচারা ‘সরি' বলতে বলতে অস্থির । তাজউদ্দীন সাহেবের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি একটু হেসে আবার আমার সাথে কথা বলতে বলতে ভেতরে ঢুকলেন ।

আমি এই বিষয়টির উল্লেখ করলাম এ কারণে যে, তাঁর মত একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী অথচ কী স্বাভাবিক আচরণ তাঁর। অন্য যে কোন মন্ত্রী হলে তাঁর সাথে নিরাপত্তা অফিসার থাকত, একান্ত সচিবসহ আরো দু'চার জন মানুষ থাকত এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব একেবারেই সাধারণভাবে চলতেন।

আমার মনে আছে, তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে শেষের দিনগুলোতে যখন দেখা হত তখন তাঁকে অসম্ভব রকমের হতাশ মনে হত । গভীর দুঃখের সাথে বলতেন, 'আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে কিছুই করতে পারছি না। দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে।' কিছু না করতে পারার কষ্টে তাঁর মনটা যেন হাহাকার করত। আমি তাঁকে অনেক কিছু বলে বোঝাবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু তাঁকে মনে হত হি ওয়াজ ভেরি হার্ট। বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল সেটাই ছিল তাজউদ্দীনের মর্মপীড়ার কারণ।

তাজউদ্দীন সাহেব বলতেন, কীভাবে বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্তগুলো অন্যান্য ফ্যাক্টরদের সুবিধা দিচ্ছে, যার ফলে এমন কিছু লোক টেক ওভার করছে যাদের দিয়ে দেশের মঙ্গল হতে পারে না ।

সেই সময় আসলে কমবেশি আমরা অনেকেই এই বিষয়গুলো অনুভব করতাম, বুঝতে পারতাম। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব যেহেতু দেশের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তিনি বুঝতে পারতেন অনেক বেশি। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে আমাকে ক্যাবিনেটের বহু মিটিংয়ে যোগ দিতে হয়েছে। '৭২-এর দিকে দেখতাম তাজউদ্দীন সাহেবের জ্ঞান এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সুন্দর একটা প্রভাব ছিল। তিনি সাংঘাতিক প্রভাবশালী মন্ত্রী । কিন্তু '৭৩ থেকে লক্ষ্য করতাম সব কিছু যেন অন্য রকম হতে শুরু করেছে। ঠিক যেভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তেমনিভাবে যেন অনেক কিছুই করতে পারা যাচ্ছে না। শেষের দিকে তো আমি নিজেই আগ্রহ হারিয়ে ৭৫-এর জানুয়ারিতে বিদেশে চলে গেলাম ।

যে দিন তাজউদ্দীন সাহেব পদত্যাগ করবেন সে দিন তিনি নিচতলায় আমার রুমে বসে গল্প করছিলেন। তাঁর মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন দেখিনি । প্রতিদিনের মতই স্বাভাবিক ছিলেন তিনি । তাঁর একান্ত সচিব আবু সাইদ চৌধুরী যখন তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল তখনও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি একটু পরে কী হতে যাচ্ছে । তিনি কিছুদিন ধরে প্রায়ই বলতেন, 'আমি থাকব না, আমি যাচ্ছি।' কিন্তু ঠিক সে দিনই তিনি চলে যাবেন এই বিষয়ে কিছুই বলেননি ।

তাজউদ্দীন সাহেবের পদত্যাগের বেশ কিছু দিন পর আমি তাঁর সাথে দেখা করতে ধানমন্ডির বাসায় গিয়েছিলাম। অনেক কথার ফাঁকে তিনি বললেন,

'এসেছেন তো আমার কাছে, কিন্তু বাইরে থেকে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। খাতায় আপনার নাম লেখা হয়েছে।' আমার মনে আছে, আমি বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলাম, 'তাজউদ্দীন সাহেব আমার বন্ধু মানুষ, আমি কিন্তু তাঁর বাসায় যাই, দেখা করি।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আপনি কেন বলছেন এই কথা ?' আমি বললাম, 'না আবার কে কখন আপনার কাছে কী রিপোর্ট করে, তাই আগেই বলে রাখছি।' বঙ্গবন্ধু হেসে ফেললেন ।

তাজউদ্দীন সাহেব দেশ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমি তাঁকে কথায় কথায় বলেছিলাম, 'দেশটার কী হবে, কীভাবে উদ্ধার হবে!' তাঁর উত্তর ছিল, 'আমার তো কিছু বলার নেই। আমি তো ছেড়েই দিয়েছি। তারা এখন দেখুক, করাক, যা করার করুক ।'

শেষের দিকে তো তিনি এমনও বলতেন যে, সরকার তাঁকে বিনা দোষে জেলেটেলেও ঢোকাতে পারে। আমি ভাবতাম তিনি রাগ করে, অভিমান করে এসব কথা বলছেন। তাই বলতাম, 'এসব বাজে কথা, কিছুই করবে না।' তাজউদ্দীন সাহেব হাসতেন ।

আজ চিন্তা করি, সত্যিই তিনি ছিলেন একেবারেই ব্যতিক্রমী মানুষ। সরকারে রইলেন না, সোজা বাড়ি চলে গেলেন। আমাদের দেশগুলোতে যেমন হয়, দল ত্যাগ, দল বদল, নতুন দল গঠন এসব তাঁর চরিত্রেই ছিল না। নিজের দলের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল যেমন গভীর তেমনি এটাও সত্যি, বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা ছিল কল্পনাতীত।

আমি আগেও উল্লেখ করেছি, বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন সাহেবের মধ্যে যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিণাম ছিল বাংলাদেশের সবচাইতে বড় ট্র্যাজেডি। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যরকম হত যদি এই দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য, দূরত্ব বা বিচ্ছেদ না ঘটত। এই দু'জন ছিলেন পারফেক্ট কম্বিনেশান। এমন যদি হত, দু'জন মিলে কাজ করতেন, আলোচনা করতেন, সিদ্ধান্ত নিতেন তবে নিঃসন্দেহে আজকের বাংলাদেশ দীর্ঘ সংগ্রাম আর মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার চেতনার বাংলাদেশ হত। কিন্তু এই দেশের দুর্ভাগ্য, দু'জনের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হল, তাজউদ্দিন সাহেব চলে গেলেন, দেশের সর্বনাশ আরম্ভ হল ।

[16.5.1998/১৭.৫.১৯৯৯]

নূরুল ইসলাম : অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক । প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ।

মতিউল ইসলাম

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার প্রথম দেখা এক ঝলকের। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের তিন তারিখে আমি শেখ সাহেবের সাথে তাঁর ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে উপস্থিত সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে তাজউদ্দীন সাহেব এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন ।

এরপর ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। তার পরদিন ১৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে জরুরী বার্তা পেয়ে আমি তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি জানালেন, আমাকে অর্থ সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ।

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারির সেই এক ঝলকের দেখা ছাড়া আমার আর কোন যোগাযোগ, পরিচয় কিছুই ছিল না এবং প্রধানমন্ত্রী যখন আমাকে এই নিযুক্তির কথা বললেন তখন আমার মনে হল, তিনি এই বিষয়ে তাঁর অর্থমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে হয়ত সময় পাননি ।

আমার প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, মন্ত্রীর নিবিড় সহযোগিতা, সক্রিয় সমর্থন, বিশ্বাস এবং আস্থা যদি তাঁর সচিবের উপর না থাকে তবে কোন সচিবই ফলপ্রসূভাবে কাজ করতে পারেন না। আমার এই ধারণার পেছনে আরো জোরালোভাবে হয়ত কাজ করেছিল একটা নতুন দেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি । সেই সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টর ছিল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ।

অর্থনৈতিক সেক্টরকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে প্রতি মুহূর্তে দ্রুত এবং কার্যকর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তার কথা আমার চিন্তায় বিশেষভাবে ছিল।

তখন সরকারি কোষাগার খালি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শূন্য (বাংলাদেশ সরকারের নামে ভারত সরকার যে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তাদের বম্বে রিজার্ভ ব্যাংকে জমা রেখেছে এটি বাদ দিয়ে)। পাকিস্তান সরকার ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত এই অংশের (বাংলাদেশের) রপ্তানি আয়ের সম্পূর্ণ অংশ সরিয়ে

নিয়েছিল ।

আমদানি-নির্ভর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করা, শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাঁচামালের অভাব দেখা দেয়ার আগেই এর ব্যবস্থা করা, তারপর সরকার চালাবার যাবতীয় খরচ, নতুন মন্ত্রণালয় এবং শাখা, বিদেশে দূতাবাস খোলা, ১ জুলাই ১৯৭২ থেকে শুরু হতে যাওয়া নতুন অর্থ-বছরের জন্য বাজেট তৈরি করার প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়গুলো তখন দিগন্তবিস্তৃত হয়ে ছিল। এই অবস্থায় আমি অর্থ সচিব হিসেবে কাজে যোগ দেবার আগেই অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা করতে ১৭ জানুয়ারি তাঁর হেয়ার রোডের বাড়িতে গেলাম ।

সেখানে তখন তাঁর দেখা পাওয়ার জন্য বহুসংখ্যক দর্শনার্থী অপেক্ষা করছিলেন। আমি আমার পরিচয় দিয়ে কিছু জরুরী সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতামত এবং নির্দেশনার কথা বললাম । আমরা আলোচনা শুরু করতেই একজন মহিলা বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে সেই ঘরে এসে বললেন, রাজাকার ভেবে ভুলক্রমে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছেন—তাজউদ্দীন সাহেব যেন তাঁর স্বামীকে বাঁচান, উদ্ধার করে দেন। তাজউদ্দীন সাহেব সেই মুহূর্তে আই.জি. পুলিশকে ফোন করলেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধারের নির্দেশ দিলেন । এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায় না । অফিসেই দেখা করব ভেবে আমি চলে এলাম ।

এরপর থেকে প্রায় দু'বছর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার কাজ করবার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর কাজের ধরন সম্পর্কে প্রথমেই যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমার নজরে পড়েছিল তা হচ্ছে, যদিও তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন পরিপূর্ণভাবে একজন রাজনীতিবিদ কিন্তু প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয় যখন সামনে আসত তখন তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে পারতেন।

মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা সরাসরি অংশ নিয়েছেন অথবা দেশের ভেতরে থেকেছেন এই যে দুটো ভাগ এই বিষয়ে তাজউদ্দীন সাহেবের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। এই দু'ভাগের মধ্যে তিনি কখনই বিভেদ সৃষ্টি করতে চাননি এবং আমি শুনেছি তাজউদ্দীন সাহেব ২২ ডিসেম্বর '৭১-এ ঢাকায় ফিরেই ২৩ তারিখে সচিবালয়ে সর্বস্তরের কর্মচারিদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আগে আপনারা পাকিস্তানের জন্য

কাজ করেছেন, এখন থেকে বাংলাদেশ সরকারের জন্য কাজ করবেন। এখন আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করব।' তিনি কোন সময় এমন কোন মনোভাব দেখাননি যাতে কোন বিভেদ সৃষ্টি হয় । তবে এটা ঠিক, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন, ঢাকাতেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পদেই ছিলেন। যেমন সেক্রেটারি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস, সংস্থাপন সচিব নূরুল কাদের খান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব হোসেন তওফিক ইমাম এবং এস. এ. করিম, খন্দকার আসাদুজ্জামান, পুলিশের আইজি খালেক। আবার মুক্তিযুদ্ধের সময় সরকারে কাজ করেছে বলে কাউকে পদোন্নতি দেয়া বা বিশেষ সুবিধা দেয়া—এ জাতীয় কোন কাজের জন্য বা এ জাতীয় কোন কথা তিনি কখনও বলেননি ।

যেমন একটি উদাহরণ দেই : এক ভদ্রলোক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টস্ অফিসার। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বাংলাদেশ সরকারে যোগ দিয়েছিলেন এবং সরকারের চীফ অ্যাকাউন্টস্ অফিসার ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশে ফিরে তিনি বললেন, তাঁকে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের পদ দিতে হবে। আমি বললাম, ‘দুঃখিত, এই পদের জন্য যেমন যোগ্যতার প্রয়োজন সে অনুযায়ী এই পদে আপনাকে নিয়োগ দেয়া যায় না।' এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই বহাল রইল ।

তাজউদ্দীন সাহেব কোনদিনও কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে আমাদেরকে কিছু করার জন্য অনুরোধ করতেন না। এমন বলতেন না যে, এই লোক প্রবাসে আমাদের সরকারে ছিল, একে একটু দেখবেন। অর্থাৎ তিনি কোনদিনই এ দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাননি। তাঁর সাথে আমার দু'বছরের কাজের সময়ে একটিমাত্র ঘটনা ছাড়া আর কোন উদাহরণ নেই। ঘটনাটি ছিল বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত। এই পদে নিয়োগ দেবার জন্য আমি ফাইল নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি সম্পূর্ণ ফাইলটি পড়লেন। আমার সুপারিশ দেখে বললেন, এই অফিসার পাকিস্তানিদের সহযোগী ছিলেন কিনা সেটি কি আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি ? আমি সাথে সাথে বললাম, আমার সুপারিশ এই ব্যক্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং আমি মনে করি এই কাজের জন্য এই ব্যক্তি উপযুক্ত। আর তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে খোঁজ রাখা আমার আয়ত্তের বাইরে। তবে এ বিষয়ে জানা যদি প্রয়োজনীয় হয় তা অর্থমন্ত্রী করতে পারেন। এই কথার পর তাজউদ্দিন সাহেব আর কিছু না বলে সেই নিয়োগপত্র অনুমোদন করে দিলেন।

এই ঘটনার আগেও আমরা ৬টি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করেছি। কিন্তু কখনই তিনি সেই বিষয়ে কিছু বলেননি। কোন প্রশ্নই তোলেননি যে তাঁর অতীত কী ছিল। পরবর্তীকালে সমস্ত ব্যাংকগুলোর জেনারেল ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবার আগে প্রধানমন্ত্রী বললেন, এই কেসগুলো যেন তাঁর কাছে পাঠান হয়। সাধারণভাবে এই নিয়োগগুলো যদিও আমাদেরই করবার কথা, কিন্তু যেহেতু প্রধানমন্ত্রী বললেন তাঁর কাছে পাঠাতে, তাই অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে সেই কেসগুলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠান হল । বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং আমি মিলে যে সুপারিশগুলো করেছিলাম তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর কোন কিছুই রদবদল করলেন না। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফাইলগুলো পাঠিয়ে দিলেন ।

ওই পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী আমাকে বললেন, 'আমি সব অনুমোদন করেছি, শুধু একটি ছাড়া।'

আমি বললাম, 'কোটি, স্যার ?'

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'তোমরা সুপারিশ করেছ, কিন্তু অনুমোদন দেয়া বোধ হয় ঠিক হবে না—এটি নূরুল আমিন সাহেবের ছেলে আনোয়ারুল আমিনের বিষয়টি।' তাজউদ্দীন সাহেব কিন্তু আনওয়ারুল আমিনকে চিনতেন এবং জানতেন যে তিনি নূরুল আমিন সাহেবের ছেলে। নূরুল আমিন সাহেব তখন পাকিস্তানের ভাইস প্রেসিডেন্ট, কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব কোন সময়ই এসব ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতেন না বা তুলতেও চাননি । তারপর হাফিজুল ইসলাম ছিলেন ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের জিএম। তিনি শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলায় রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়ে সাক্ষি দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ হবার পর পাকিস্তানের ব্যাংকগুলো যখন বাংলাদেশের ব্যাংক হল তখন সেই হাফিজুল ইসলামও স্বাভাবিকভাবেই ওই ব্যাংকের জিএম হলেন। শেখ সাহেব ফিরে আসবার পর ওই লোককে চাকরি থেকে সরিয়ে দিলেন। তাজউদ্দীন সাহেব জানতেন ওই লোকের কথা, কিন্তু কিছু বলেননি বা নাক গলাননি, অর্থাৎ তাজউদ্দীন সাহেবের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ।

আর একটি ঘটনার কথা মনে আছে: নূরুল কাদের খান তখন সংস্থাপন সচিব। এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। ১৯৭১ সালের ১৪ আগস্ট যাঁরা পাকিস্তানি খেতাব পেয়েছিলেন—সেতারে পাকিস্তান, সেতারে কায়দে আযম, প্রভৃতি—তাঁদের সবাইকে এক দিনের নোটিশে চাকরি থেকে সরিয়ে

দেয়া হল । প্রধানমন্ত্রী ফাইলে সই করে দিলেন এবং নূরুল কাদের অর্ডার ইস্যু করে দিলেন । এই তালিকায় বেশ অনেক সিনিয়র অফিসার ছিলেন, যেমন ওয়ালিউল ইসলাম, ওয়াজেদ আলি খান। এই অর্ডারটি তাজউদ্দীন সাহেব দেখেছিলেন খবরের কাগজে। আমি অফিসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি দেখেছেন এই অর্ডারটি ?' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, দেখেছেন এবং এর ফলে তিনি বিচলিত বোধ করছেন। গতরাতে এই বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, 'এটা আপনি কী করেছেন এবং কেন করেছেন ?' প্রধানমন্ত্রী জ্ঞানী মানুষ, তিনি বললেন, 'দেখ আমি করে ফেলেছি, এখন এটাকে কোন পদ্ধতিতে না ফেলে তো উঠিয়ে নেয়া যায় না।' তখন তাজউদ্দীন সাহেব বলেছেন, 'ঠিক আছে, চাকরি থেকে যাদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে কেসগুলোকে আবার পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা নেয়া হোক। একটা কমিটি গঠন করা হোক, সেখানে অভিযুক্ত সবাই তার কেস নিয়ে যাবে। সেই কমিটি যদি বলে, এরা পাকিস্তানিদের সহায়তাকারী অথবা প্রতি বছরের মত চাকরি জীবনের কৃতিত্বের ফলস্বরূপ তাঁরা খেতাব পেয়েছেন, তবে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। অর্থাৎ কেউ দোষী হলে শাস্তি পাবে।' এরপর ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে এক সদস্যের কমিটি হলে তাঁর কাছে চাকরিচ্যুত সবাই তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ পেলেন এক এক করে সবার সাথে কথা বলে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই রিপোর্ট ড. কামাল হোসেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে সবাই চাকরিতে পুনর্বহাল হয়েছিলেন।

তাজউদ্দীন সাহেব কখনই অফিসারের পরিচয়ের দিকটি বড় করে দেখতেন না। যোগ্যতার বিষয়টিই ছিল তাঁর মূল বিবেচনা। যোগ্যতা আছে আসুন, নয়ত না । আবার যদি সত্যিই কেউ অন্যায় করে থাকে তবে তার আইন অনুযায়ী বিচার হবে। আমি বলতে চাইছি, উনি অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন । সেই সময় পাকিস্তানের সাথে সহায়তাকারী অনেকেই কারাগারে বন্দি ছিলেন। তখন আমাদের একটা অর্ডার ছিল, যাঁরা কারাগারে আছেন তাঁদের অ্যাকাউন্টগুলো আমরা ফ্রিজ করিনি, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বেশি তাঁরা ব্যাংক থেকে তুলতে পারবেন না। ডা. মালেকের ভাই আমার পূর্বপরিচিত ছিল, আমার কাছে এসে বলল, ডা. মালেকের কেসটা তো কোর্টে যাচ্ছে, সে কারণে বিশ হাজার টাকার দরকার। আমি সাথে সাথে

তাকে একটা দরখাস্ত লিখতে বললাম এবং টাকা তুলবার অনুমতি দিয়ে দিলাম কাউকে কিছু না জিজ্ঞাসা করে। পরে সে দিনই বিকেলের দিকে বা পর দিন আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে বিষয়টি বললাম । তিনি শুনে বললেন, ‘ভাল করেছেন, দিয়ে দিয়েছেন, ঠিক আছে।' যে বিষয়গুলো স্বাভাবিক নিয়মে হয়ে যাবার কথা সেসব বিষয় নিয়ে আসলে তিনি মাথা ঘামাতেন না। আর তাঁর মধ্যে এই জিনিস ছিল না যে অমুক আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কিংবা পাকিস্তানিদের সহায়তাকারী, তাই আমি তাকে নাজেহাল করব, অসুবিধা সৃষ্টি করব—এই ধরনের মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। আর একটি ঘটনা, আখতারউদ্দিন নামে আমার এক সহপাঠী যিনি ডা. মালেকের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী ছিলেন, তিনিও তখন জেলে । একদিন তাঁর স্ত্রী আমার বাসায় এসে কাঁদতে কাঁদতে জানাল, আখতারউদ্দিন খুবই অসুস্থ, তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, হাসপাতালে নিতে হবে। আমি সাথে সাথে স্বরাষ্ট্র সচিব এবং স্বাস্থ্য সচিবকে অফিশিয়ালি ঘটনাটি লিখে জরুরী ব্যবস্থা নিতে নোট পাঠালাম । এবং পরদিনই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে পরে বিষয়টি বলেছি। তিনি বলেছেন, 'ঠিক আছে, এতে অসুবিধা কী, এগুলো তো মানবিক ব্যাপার।' আসলে তাজউদ্দীন সাহেব অন্য কাউকে কষ্ট দেয়া বা অসুবিধা সৃষ্টি করার বিষয়গুলোকে কখনই উৎসাহ দিতেন না ।

তা ছাড়া আমি আমার কথা বলতে পারি, তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর অফিসারদেরকে, বিশেষভাবে আমাকে, কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

তাজউদ্দীন সাহেব চমৎকার বাংলা লিখতেন এবং তাঁর হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। এদিকে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সচিবালয়ের সমস্ত ফাইলপত্র বাংলায় লিখতে হবে। এর ফলে আমার খুব অসুবিধা হল। কারণ আমার বাংলা লেখা মোটেও ভাল না, আর সবচাইতে বড় সমস্যা ছিল, আমার চিন্তাটাকে সুস্পষ্ট এবং জোরালোভাবে বাংলায় লিখতে গেলে প্রয়োজনীয় সঠিক শব্দের জন্য আমার অনেক সময় লেগে যেত । এ কারণে বিভিন্ন কেস ফাইলপত্র দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে আমি প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর কাছে আমার নোটগুলো ইংরেজিতে লিখবার জন্য অনুমতি চেয়েছিলাম । এবং খুব দ্রুতই আমি এই অনুমতিও পেয়েছিলাম । তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়ে আমি প্রায় দু'বছর কাজ করেছি। এই সময়টিতে আমি সব সময় ইংরেজিতে নোট লিখতাম, অর্থমন্ত্রী লিখতেন বাংলায় ।

তাজউদ্দীন সাহেব এক অর্থে শিল্পীও ছিলেন । তিনি গভীর উৎসাহের সাথে খেটে সেই সময়ে ছাপা হওয়া কাগজের মুদ্রার প্রতিটি ডিজাইনকে আরো উন্নত করেছিলেন। বাংলাদেশের টাকার '৳' প্রতীকটি তাঁর নিজ হাতের কাজ।

অনেকেই বলে, তাজউদ্দীন সাহেব পশ্চিমা দেশগুলোর সাহায্য বা সহযোগিতা চাননি বা নেয়া পছন্দ করতেন না। এটা কিন্তু আমি শুনেছি। অথচ অর্থ সচিব হিসেবে আমি কিন্তু কোনদিনও তাঁর এই মনোভাবের কোন ইঙ্গিত পাইনি। তিনি খুব প্র্যাগম্যাটিক ছিলেন। আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে ভীষণ সজাগ ছিলেন এবং সেইসাথে সুচিন্তিত বাস্তবসম্মত কর্মপদ্ধতিরও মানুষ ছিলেন। তিনি বুঝতেন পশ্চিমের সাহায্য ছাড়া আমাদের চলবে না, সাহায্য আমাদের নিতেই হবে। একটি বিষয়ে তিনি পাকিস্তান সরকারের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে আমার সুপারিশ নিয়েছিলেন। যেমন একটি ঘটনার কথা বলি: জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের প্রতিনিধি যিনি এখানে ছিলেন, উমব্রিখ্ তাঁর নাম। সুইস নাগরিক । তিনি রিলিফের তদারকি করতেন। তিনি একই সঙ্গে সম্ভবত সুইস কোম্পানি সিবা-গেইগীরও প্রতিনিধি ছিলেন। আমি অর্থ সচিব হিসেবে যোগ দেয়ার দিন সাতেক পর একদিন তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে ডাকলেন। গিয়ে দেখি দু'জন বিদেশী ভদ্রলোক বসা। তিনি তাঁদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এঁরা সিবা গেইগী থেকে এসেছেন। সিবা গেইগী আমাদেরকে কীটনাশক দিয়েছিল, অর্থাৎ সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তানকে । পাকিস্তান সরকারের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে বিতরণের জন্য এখানে ওই কীটনাশক এসেছিল বাকিতে। এখন এঁরা এসেছেন বাংলাদেশ সরকারের কাছে, যাতে করে সরকার সেই কীটনাশকের টাকা শোধ দেয়ার দায়িত্ব নেয় । এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমরা পাকিস্তান সরকারের দায়িত্ব নেব কি নেব না।' আমি তখন বললাম, 'দেখুন, এটা পলিসি ম্যাটার । তবে যদি কেউ সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটে কোন কিছু দেয় সেটা পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই ছিল। অর্থাৎ আমাদের জন্যই দেয়া হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে আমরা এই দায়িত্ব নিতে পারি।' তিনি বিষয়টি মেনে নিলেন এবং বললেন, 'আমরা পাকিস্তান সরকারের একমাত্র সেই সমস্ত দায়িত্বই নেব যা সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য আনা হয়েছিল বা ব্যবহার করা হয়েছে।' এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় তাজউদ্দীন সাহেব কতখানি প্র্যাগম্যাটিক ছিলেন। তিনি বলতে পারতেন, আমরা পাকিস্তানের দায়িত্ব নেব না। আমরা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ পেয়েছি, আমরা কেন পাকিস্তানের দায়িত্ব নেব! কিন্তু তিনি তা

বলেননি কিংবা সেই মনোভাব দেখাননি। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যা হওয়া উচিত তিনি তাই করেছেন । একজন পরিপক্ক দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদের যা করা উচিত তিনি তাই করেছেন ।

তারপর বিশ্বব্যাংকের সদস্যপদ পাবার বিষয়টি। বিশ্বব্যাংক প্রধান বাংলাদেশে এলেন খুব স্বল্প সময়ের জন্য । অর্থমন্ত্রী আমাকে নির্দেশ দিলেন আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের সদস্য পদ নেয়ার জন্য তৈরি হতে। আমি মোটামুটিভাবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলাম। সদস্য পদে আবেদনের নিয়ম হল, প্রথম আইএমএফ-এর সদস্য হতে হয়, তারপর বিশ্বব্যাংকের । এই কাজে তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর জ্ঞান, মেধা, সহযোগিতা দিয়ে সব সময় সহায়তা দিয়েছেন । এবং এই বিষয়ে তিনি তো বেশ আগ্রহী ছিলেন বলেই মনে হয়েছে। জুলাই-আগস্টের দিকে আমরা সদস্য হলাম। সদস্য হবার পর নিয়ম হল সাধারণভাবে অর্থমন্ত্রী হবেন বাংলাদেশের গভর্নর। অর্থ সচিব বা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হবেন বিকল্প গভর্নর। এই বিষয় আমার জানা ছিল, তাই আমি মন্ত্রীর কাছে ফাইল পাঠালাম যে আপনি আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের গভর্নর হবেন, অর্থ সচিব হবেন বিশ্বব্যাংকের বিকল্প গভর্নর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হবেন আইএমএফ-এর বিকল্প গভর্নর। অর্থমন্ত্রী ফাইল সই করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে প্রফেসর ড. নূরুল ইসলাম সাহেবের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল তিনি কোন একটির গভর্নর হবেন। তখন ঠিক হল অর্থমন্ত্রী হবেন আইএমএফ-এর গভর্নর আর ডেপুটি চীফ প্ল্যানিং কমিশন ড. নূরুল ইসলাম হবেন বিশ্বব্যাংকের গভর্নর। তারপর আমরা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সদস্য হলাম, সেখানে তাজউদ্দীন সাহেব গভর্নর এবং আমি বিকল্প গভর্নর ।

আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের সদস্য পদ লাভের পর বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় যোগ দিতে সেপ্টেম্বর মাসে আমরা ওয়াশিংটনে গেলাম। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সাথে আমাদের অর্থমন্ত্রীর প্রথম যে মিটিং হল সেটি অত্যন্ত চমৎকার এবং অত্যন্ত সফল হয়েছিল। ব্যাংক প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারাকে মনে হল অত্যন্ত খুশি। কারণ বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী পশ্চিমের সাহায্য নিতে চান না, বিশ্বব্যাংকের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব এমন ধরনের ভুল ধারণা ম্যাকনামারাকে দেয়া হয়েছিল আগে থেকেই। তাই তাজউদ্দীন সাহেবের খোলাখুলি, সুচিন্তিত এবং বাস্তবসম্মত মতামত ও আলোচনায় ম্যাকনামারা বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়েছিলেন, এটা আমাদের কারোরই দৃষ্টি এড়ায়নি।

ম্যাকনামারার চেহারা, অভিব্যক্তিতেই ফুটে উঠেছিল তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে তাঁর আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। এমনকি মিটিং শেষ হবার পর আমরা ম্যাকনামারার অন্যান্য সহযোগীদের কাছ থেকে শুনেছি যে, অর্থমন্ত্রীর সাথে কথা বলে এবং মিটিং থেকে যে ফলাফল বেরিয়ে এসেছে তাতে বিশ্বব্যাংক প্রধান অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

ওই সময় আমরা ওয়াশিংটনে থাকতে একটা প্রশ্ন উঠল, আইএমএফ থেকে আমরা বিশেষ আর্থিক সুবিধা নেব কিনা। এই সুবিধাটা ছিল এমন, যদি কোন নতুন দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অসুবিধা বা ঘাটতি দেখা দেয় তবে সেই ঘাটতি পুষিয়ে নিতে আইএমএফ-এর এই টাকাটা ব্যবহার করা যাবে। এটা হল '৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা যখন আমরা বিশ্বব্যাংকের সাথে কথা বলছি । এদিকে '৭২-এর জানুয়ারিতে আমাদের সরকারি কোষাগার ছিল ফাঁকা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল শূন্য। কিন্তু '৭২-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়াল শূন্য থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলারে । আন্তর্জাতিক বাজার অনুযায়ী আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার এই রিজার্ভকে সন্তোষজনক এবং উপযুক্ত বলে ধারণা করা হত। আমরা প্রাথমিক সমস্যা কাটিয়ে ভাল অবস্থানে আছি, তাই এই অবস্থায় আইএমএফ-এর ঋণ নেব কি নেব না এই সমস্ত চিন্তাভাবনা যখন চলছে তখন আইএমএফ থেকে বলল, তোমরাই একমাত্র ব্যতিক্রমী দেশ যারা ঋণ নিতে চাচ্ছ না। এই পর্যায়ে সমস্ত বির্তকের অবসান ঘটিয়ে তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, সম্পূর্ণ শর্তহীনভাবে এই ঋণ আমরা নেব ।

লোকে যে বলত তাজউদ্দীন সাহেব পশ্চিমের ঋণ নিতে চাইতেন না এটা বোধ হয় ঠিক নয় । তাঁর যেটা মূল ভাবনা ছিল যে, শর্তযুক্ত ঋণ আমরা নেব না। সহজ ঋণ নিতে পারি।

তাজউদ্দীন সাহেবকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছিল আমার । তাঁর ছিল একটি অতি মহৎ হৃদয়। তবে তিনি মাঝে মাঝে খুব রেগে যেতেন। আমি তাঁকে বুঝতে পারতাম বলেই রাগের সেই মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করতাম, চুপ থাকতাম। কারণ এই সময়টুকু পার হলেই তিনি আবার সেই যুক্তির মানুষ। এমনকি নিজের কোন কাজে ভুল হলে সাথে সাথে সেটা সংশোধন করে নেয়ার মত মন ছিল তাঁর ।

যেমন ব্যাংকের একজন এমডি-র অভিযোগের ভিত্তিতে তাজউদ্দীন সাহেব

এক অফিসারকে সাসপেন্ড করার জন্য অর্ডার লিখে ফাইলটি আমার কাছে দিলেন।

আমি অর্থমন্ত্রীর এই মতের সাথে একমত ছিলাম না। তাই রাগের মুহূর্তে আর কিছু না বলে ফাইলটি নিয়ে প্রায় দুই সপ্তাহের জন্য আমার কাছে রেখে দিলাম। তারপর একদিন বুঝিয়ে বলতেই তিনি অর্ডারটি সংশোধন করে দিলেন। আমি আদেশটি পালন করিনি এইজন্য যে আমি জানতাম তাঁর মনটি কেমন । উত্তেজিত হয়েই তিনি সাসপেন্ডের আদেশ দিয়েছেন। আমি যদি তাজউদ্দীন সাহেবের লেখা অর্ডারের ফাইলটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাই তবে তিনি সাথে সাথে সই করে দেবেন। কিন্তু তা করা ভুল হত এবং তাজউদ্দীন সাহেব নিজেই পরে আক্ষেপ করতেন। তাই আমি ফাইলটি ধরে রাখার দায়িত্ব এবং ঝুঁকি নিয়েছিলাম। আমার এখনও মনে আছে, দুই সপ্তাহ পর যখন আমি সাসপেন্ডের বিষয়টি বুঝিয়ে বলে ফাইলটি তাঁর কাছে দিলাম তখন তিনি পরিষ্কার বাংলায় লিখলেন: অর্থ সচিব কি মনে করেন যে আমি অন্যায় আদেশ দিয়েছিলাম ? শুধু এটুকু লিখেই তিনি তাঁর আদেশটি ফিরিয়ে নিলেন। এখানে আমার কাছে তাঁর বড় মনের পরিচয়টিই ফুটে উঠেছিল। তিনি একটি আদেশ করেছেন যেটা ঠিক নয় এবং সেটি সংশোধনে তাঁর কোন কার্পণ্য ছিল না ।

তবে কিছু কিছু বিষয়ে তিনি ভীষণ শক্ত ছিলেন। হয়ত আমি সুপারিশ করেছি, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও সুপারিশ করেছেন, কিন্তু তিনি মানেননি। একটি ঘটনা আমার মনে আছে। বাংলাদেশ হয়ে যাবার পর একটি অর্ডার হয়েছিল—সিভিল সার্ভেন্টরা মাসে ৫০০ টাকার বেশি পাবে না। পরে এটাকে এক হাজার, পরবর্তীতে দুই হাজার টাকা করা হয় । এই সময়ে আমি অর্থ সচিব হিসেবে কাজে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালের ফাইলগুলো দেখছিলাম। সেখানে দেখলাম একটি ফাইলে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত লেখা আছে, যে টাকাটা অফিসারদেরকে কম বেতন দিয়ে সরকারের তহবিলে জমা পড়ছে সেই টাকা সাময়িকভাবে ধার নেয়া হচ্ছে এবং এর পরিবর্তে সবাইকে সেভিংস সার্টিফিকেট দেয়া হবে, যা সবাই একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর জমা দিয়ে নগদ টাকা তুলে নিতে পারবেন। এই সিদ্ধান্তই ছিল ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেই সিদ্ধান্তে তাজউদ্দীন সাহেবের সই করা ছিল । আমি সেই ফাইল দেখলাম এবং আমার কাছে মনে হল এটা খুবই যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এই ফাইলের ভিত্তিতে একটি অর্ডার ইস্যু করে দিলাম, যাদের বেতন কাটা হয়েছিল তারা এই-এইভাবে টাকাটা ফেরত নিতে পারে ।

এই অর্ডারটি ইস্যুর কয়েকদিন পরেই একদিন ক্যাবিনেট মিটিং হচ্ছে, মিটিংয়ে রুহুল কুদ্দুস সাহেব, তওফিক ইমাম এবং আমি ছিলাম । তাজউদ্দীন সাহেব এই প্রসঙ্গ তুললেন এবং বললেন, এটা কেন করা হল। আরো বললেন, এসব কর্মকাণ্ড আমাদের স্বাধীনতার মনোভাব, সরকারের আদর্শ নষ্ট করে দিচ্ছে। এটা আমাদের পলিসি যে আমরা টাকা কাটব কিন্তু টাকা দেব না। সেখানে কিভাবে ব্যুরোক্রেসি সিদ্ধান্ত দেয় যে টাকাটা কোন্ উপায়ে ফেরত দেয়া হবে? ব্যুরোক্রেসি বলে আসলে তিনি আমাকে বোঝাচ্ছিলেন কিন্তু নাম নিচ্ছিলেন না । আমি তো জানি আমি কিসের ভিত্তিতে অর্ডারটি ইস্যু করেছি, আর তো কেউ জানেও না। তাই তখন আমি আস্তে করে ক্যাবিনেট রুম ছেড়ে আমার রুমে গিয়ে ফাইলটা নিয়ে এলাম। ফাইলটা খুলে আমি প্রধানমন্ত্রীর সামনে দিলাম । সেটা পড়ে তিনি বললেন, 'আরে তাজউদ্দীন, এই তো তোমার অর্ডার তো আছে।' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'অর্ডার থাকলে ওটা ভুল । বর্তমান অবস্থায় আমি এর সাথে একমত না, এটা বাতিল করতে হবে।' অর্ডারটি বাতিল হল। এই ক্ষেত্রে দেখলাম তিনি কিছুতেই কোন কথা মানলেন না। অন্যান্য বিষয়ে দ্বিমত হলে তাঁকে যুক্তি দিয়ে বললে বোঝান যেত, কিন্তু এই বিষয়ে কিছুতেই মানলেন না । বললেন, এই অর্ডার দেয়াটি ভুল হয়েছিল। হতে পারে সেই সময়ে বর্তমানের অবস্থাটি ঠিক বোঝা যায়নি । তাই অর্ডারটি বাতিল করতেই হবে । এই যে অর্ডারটি বাতিল হল, আমি অর্ডারটি ইস্যু করেছিলাম তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কোন পরামর্শ না করে, কিন্তু আমার সাথে এ কারণে কোন মনোমালিন্য বা অসঙ্গত ব্যবহার কিছুই কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব করেননি। তিনি একদম স্বাভাবিক ছিলেন, যেন কোন কিছুই ঘটেনি।

শেখ সাহেবের সাথে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি লক্ষ্য করতাম, সবসময় তাজউদ্দীন সাহেব তাঁকে পূর্ণ সমর্থন দিতেন। শেখ সাহেব যদি বলতেন কোন কিছু করতে হবে, সেটা তাজউদ্দীন সাহেব যেভাবেই হোক অবশ্যই করতেন । এটা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয়ে বলছি, রাজনৈতিক বিষয় আমি জানি না ।

যেমন, প্রধানমন্ত্রী কনজিউমার্স করপোরেশন করতে চাইলেন প্রতি থানায়। এমনকি আরো নিচু স্তরেও কনজিউমার্স করপোরেশন করবেন। সেখানে সরকারি দোকান হবে এবং সেই দোকানে সরকার জিনিস বিক্রি করবে সস্তায়। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বললাম, 'স্যার, সমস্ত দেশে লাখ লাখ দোকান আছে। সেখানে সরকারি একটা দোকান কিছুই করতে পারবে না। বরঞ্চ এতে

মারাত্মক বেশি রকমের প্রশাসনিক খরচ হবে। করতে চান আপনি একটি পাইলট স্কীম করেন, সমস্ত জেলা শহরগুলোতে। যদি এটা সফল হয় তবে সাব-ডিভিশনে, তারপর থানায়। একবারে থানায় গেলে তো আপনাকে বিরাট খরচের যোগান দিতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'না এটা আমার প্রস্তাব। আমি এটা করতে চাই।' তাজউদ্দীন সাহেব কিন্তু আমাকে সমর্থন করলেন না। তিনি বললেন, 'নেতা যখন বলছেন তখন আমাদের করতেই হবে।' তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পূর্ণ সমর্থন দিলেন । পরবর্তীতে অবশ্য এই প্রকল্পটি ফলপ্রসূ হয়নি।

তাজউদ্দীন সাহেবের আর একটি গুণ ছিল। ক্যাবিনেট মিটিংয়ে ক্যাবিনেট পেপারগুলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমিই উপস্থাপন করতাম । এবং এই মিটিংয়ে তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে আমার মতামত বলবার সুযোগ দিতেন । এমনকি আমার মতামত তাঁর প্রস্তাবের বিপক্ষে হলেও তিনি বলতেন, 'আপনি আপনার কথা বলেন।' কারণ তিনি আবার অর্থমন্ত্রী ছাড়াও পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন। কতকগুলো প্রস্তাব হয়ত এসেছে পরিকল্পনা কমিশন থেকে । তখন তিনি সমর্থন দিচ্ছেন অথবা সংশোধন করছেন বা অনুমোদন করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে। কিন্তু অর্থ সচিব হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি থেকে আমি মনে করেছি ঠিক হয়নি বা ঠিক হবে যে বিষয়গুলো, সেটা আমি সব সময় বলেছি । তাজউদ্দীন সাহেব কোনদিনই বলতেন না, কেন আপনি বলছেন উল্টো কথা, এটা আমার প্রস্তাব—বা এই জাতীয় কথা। বরং অন্য দু'চারজন মন্ত্রী বলেছেন, আপনি কেন বলেন এইসব কথা ? আমি জবাব দিয়েছি, আপনারা তাজউদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আমি এখানে কথা বলবার জন্য অনুমতি নিয়েছি । আর অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গিটা জানানো তো আমাদের দায়িত্ব। তারপর ক্যাবিনেট কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটা নেবে। এই সমস্ত কারণের জন্যই বলছি, আমি সত্যি খুব আনন্দের সাথে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দু'বছর কাজ করেছি । আমি সত্যিই মনে করি তিনি ম্যান উইদ আ গোল্ডেন হার্ট—একজন সুবর্ণ হৃদয়ের মানুষ ।

শেখ সাহেবের সাথে শেষের দিকে তাজউদ্দীন সাহেবের যে সম্পর্কে চিড় ধরল সেটা সত্যিই খুব দুর্ভাগ্যজনক। এই দু'জনের মাঝে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার পেছনে আমি সেই সমস্ত লোকদের দায়ী করব যারা সব সময় এই দুই পক্ষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। এই সমস্ত লোকেরা সব সময় শেখ সাহেবকে বলত এক কথা আর অন্য দিকে বলত অন্য কথা। আর

একই মানুষ সম্পর্কে বারবার একই কথা বলতে থাকলে হয়ত সেসব কথা বিশ্বাসও করতে শুরু করে দেয় মানুষ তাজউদ্দীন সাহেব পদত্যাগ করবার পর আমি ওয়াশিংটন থেকে ঢাকায় এলাম । শেখ সাহেবের সাথে আগে থেকেই আমার সুন্দর সম্পর্ক ছিল । সে কারণেই আমি সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে তাঁর ৩২ নম্বরের বাড়িতে গেলাম । সেখান থেকেই সোজা তাজউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে এলাম। তাজউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক লোকজন ছিল। এর মধ্যে তিনি আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন এবং ভেতরে নিয়ে বসালেন । অনেক কথা হল । সব শেষে আমি বললাম, 'স্যার, আমি তো জানি প্রধানমন্ত্রী আপনার নেতা এবং আপনি তাঁকে কত সম্মান করেন। আপনি তাঁকে সবসময় সমর্থন দিয়েছেন, কোন সময়ই আপনি তাঁর মতের বিরুদ্ধে যাননি। এখন আপনাদের দু'জনের মধ্যে এই যে দূরত্ব, তা কি কোনক্রমে দূর করা যায় না ? কোনভাবে জোড়া দেয়া কি একদমই সম্ভব না ?'

তাজউদ্দীন সাহেব পরিষ্কার বললেন, 'না।'

আমি আর কিছু বললাম না, চলে এলাম। বুঝলাম মতপার্থক্যটা এত বেশি যে ওখানে আর তিনি সমঝোতা করতে রাজি নন ।

এই মতপার্থক্যটা বোধ হয় বাকশাল থেকেই হয়েছে। আমি তো বিদেশে চলে গেলাম '৭৩-এর অক্টোবর মাসে। এর আগে অবশ্য দু'একটি বিষয়ে বুঝতে পারতাম কিছু কিছু। যেমন দু'একটি অর্ডার তিনি পছন্দ করেননি। তিনি বলছেন না মুখে, কিন্তু আমি আন্দাজ করতে পেরেছি তিনি প্রধানমন্ত্রীর অর্ডারটি পছন্দ করছেন না। একটি উদাহরণ দিচ্ছি, স্বাধীনতার পরপরই তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, যাঁরা মুজিবনগরে ছিলেন আমরা তাঁদেরকে একটা কিংবা দুটো ইনক্রিমেন্ট দেব। আমি সেইভাবে লিখে ফাইল তৈরি করলাম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এটা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, না, আমার টাকাপয়সা নেই, আমি দেব না ।

অর্থমন্ত্রী বলছেন, অর্থ সচিব বলছেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলছেন, না, আমি দেব না। আশ্চর্যের বিষয়, এক বছর পর অর্থমন্ত্রীকে, অর্থ মন্ত্রণালয়কে না জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ সেই একই অর্ডারটি ইস্যু করলেন। এটা তাজউদ্দীন সাহেব পছন্দ করলেন না। তাঁর মনের ভাবটা এমন ছিল যে, এই অর্ডারটি কার্যকর করতে এক বছর আগে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম, তখন সবকিছু

আমাদের অনুকূলে ছিল এবং আমরা পরিস্থিতি সামলাতে পারতাম । আর এই এক বছরে সব কিছু তো অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন কে মুজিবনগর, কে কোথায়, সব এলোমেলো। অথচ তিনি এক বছর পর অর্ডারটি দিলেন, আমাদেরকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলেন না। যাই হোক, আদেশটি কার্যকর করা হল। তখন দেখলাম তাজউদ্দীন সাহেব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কষ্ট পেয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে অর্ডারটি দিয়ে দিলেন।

আর একটি অর্ডার প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন—যারা পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে গিয়েছিল তাদের যে পোষ্য বাংলাদেশে ছিল তাদেরকে টাকা দিতে হবে। এই বিষয়টিও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে পরামর্শ করেননি। পরে আমি অর্থ সচিব হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপত্তি করেছিলাম যে এটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমি আদেশ দিয়েছি, তোমরা কার্যকর কর। এটাও এইভাবে অর্থমন্ত্রীকে না জানিয়ে করাটি তাজউদ্দীন সাহেব পছন্দ করেননি। তাজউদ্দীন সাহেব অবশ্য চাইতেন না বাইরে এসব জিনিস প্রকাশ পাক। তাই মুখে কিছু বলতেন না, কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারতাম তিনি এইভাবে কাজ করাটা পছন্দ করছেন না। আজ বলছি, আমার কারণে যেন প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয় আমি সব সময় সেই চেষ্টাই করেছি। এবং শেষ পর্যন্ত আমি আমার এই চেষ্টা বজায় রাখতে পেরেছিলাম ।

আর একটি কথা—গুজব ছিল, তাজউদ্দীন সাহেব ভারত ঘেষা, সম্ভব হলে তিনি দেশ বিক্রি করে দিচ্ছেন। আসলে কিন্তু এই গুজবের কোন ভিত্তি ছিল না । একটি ঘটনার কথা বলি। বাংলাদেশ থেকে বিদেশের যে কোন দেশে যেতে হলে পি ফর্ম প্রথা চালু ছিল। একমাত্র ভারত ভ্রমণের জন্য এই পি ফর্মের দরকার ছিল না। আমি একবার সিদ্ধান্ত নিলাম, ভারতও তো বিদেশী দেশ, তাই ভারত ভ্রমণের জন্যও পি ফর্ম চালু করা যায় । আমি সেই অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দিলাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ।

আমি ঠিক পুরোপুরি ধারণা করতে পারিনি এর ফলে যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে তা বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে কী প্রভাব ফেলবে। এই ঘটনাটি খুব দ্রুত অর্থমন্ত্রীর নজরে এল। তিনি আমাকে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানালেন এভাবে : "ইসলাম সাহেব, এই অর্ডার ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ ছুরির মত আঘাত করবে । সময় খুবই অপরিপক্ক, অবিলম্বে এই অর্ডারটি

বাতিল করতে হবে।' অর্ডারটি সাথে সাথে বাতিল হল । একমাত্র এই ঘটনা ছাড়া তিনি আর কখনই ভারত সম্পর্কে কিছু বলেননি। আর এই অর্ডারটি ইস্যু করার আগে আসলে আমারই উচিত ছিল অর্থমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করা, যা আমি করিনি। পরবর্তীতে কয়েক মাস পর ভারত ভ্রমণের জন্য যখন আবার পি ফর্ম প্রথা চালু হল তখন অর্থমন্ত্রীও কোন রকম আপত্তি জানালেন না বা ভারতের দিক দিয়েও কোন প্রতিবাদ বা আপত্তি আসেনি ।

'৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমি কলকাতা গেলাম । সেখানে ভারতের মিন্ট মাস্টার এল আমার সাথে দেখা করতে যে, আমরা তাদের মিন্ট-এ (টাকশাল) মুদ্রা ছাপব কিনা। এই বিষয়ে আলোচনায় আমি তাকে না করে দিলাম। কারণ আরো কয়েকটি দেশের সাথে আমি এ ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছিলাম । ফিরে এসে তাজউদ্দীন সাহেবকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তিনি বললেন না যে, ইন্ডিয়া থেকেই করতে হবে বা কেন ইন্ডিয়া থেকে করবেন না। পরবর্তীতে আমরা পূর্ব জার্মানি থেকে কয়েন তৈরি করলাম । স্বাধীনতার পর আস্তে আস্তে পাকিস্তানি মুদ্রা বাজার থেকে তুলে নেয়া হল । নোট ছাপাবার ব্যাপারেও তাজউদ্দীন সাহেব কোনদিনও কোন দেশের পক্ষে সুপারিশ করেননি । আমরা টেন্ডার কল করতাম, সবচাইতে কম দর যারা দিত তাদেরকেই কাজ করতে দেয়া হত। বেশির ভাগ সময় ইংল্যান্ডের একটি কোম্পানি ছিল, ওরাই সর্বনিম্ন দরে কাজটি পেত। এদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঠিক আগে বা সেই সময় পাকিস্তান তাদের এক টাকার নোট বাজেয়াপ্ত করে উঠিয়ে নেবে শোনা যাচ্ছিল। বাংলাদেশ সরকার তখন ভারতের সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে এক টাকার নোটে ৬০/৭০ কোটি টাকা ছাপাতে দিয়েছিলেন । সেই টাকার নোট আমরা পেলাম বাংলাদেশ হবার কয়েক মাস পর ।

আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিলাম বাংলাদেশী নোটটা আমরা আস্তে আস্তে ছাড়ব । এই নোটটিতে মুক্তিযুদ্ধকালের অর্থ সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামানের স্বাক্ষর মুদ্রিত ছিল। আমরা দুই মাস সময় দিলাম পাকিস্তানি নোট তুলে নেবার জন্য। এর কিছুদিনের মধ্যেই বাজারে প্রচণ্ড গুজব শুরু হল, ভারতের সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে এক টাকার নোট ছাপানো হয়েছে আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য। ভারত ডুপ্লিকেট নোট ছাড়ছে বাজারে এবং কোটি কোটি টাকা সরিয়ে নিচ্ছে। এটা এখনই বন্ধ করতে হবে। খবরের কাগজেও এই ধরনের কথাবার্তা উঠতে শুরু করল । একদিন একটি কাগজে একই নম্বরের

দুটো নোট পাশাপাশি ছাপল । তাজউদ্দিন সাহেব কাগজটি আমাকে দেখালেন। আমি বললাম, 'দেখুন, একই নোটের ছবি দু'বার ছাপালে তো নম্বর একই উঠবে ।' তিনি তখন বললেন, 'এই বিষয়ে কী করা যায় ?' আমি বললাম, 'আপনি দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব । এই বিষয়টি নিয়ে যেহেতু আপনার ব্রিতকর অবস্থা হচ্ছে তাই আমরা ভারতে ছাপানো এই টাকাটা উঠিয়ে নেব।' ইতোমধ্যে লন্ডন থেকে এক টাকার নোট ছাপা হয়ে এসেছে, তাই আমরা অর্ডার ইস্যু করে দিলাম, নতুন নোট ছাড়া হবে এবং আগামী দু'মাস সময়ে ভারতে ছাপানো নোট তুলে নেয়া হবে । যেইমাত্র এই অর্ডারটি ইস্যু করা হল অমনি আবার বাজারে হৈচৈ যে, এই তো দু'মাস সময় দেয়া হল, এই দু'মাসেই ভারত থেকে কোটি কোটি টাকা চলে আসবে । ওখানে এক টাকার নোট প্রিন্ট তো হচ্ছেই! আরো কত কী কথাবার্তা। আমি এই গুজবে তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছিলাম না, কারণ আমি তো জানি এসব কথা সত্য নয় । কিন্তু এইসব গুজব, কথাবার্তা এমন অবস্থায় এল যে তাজউদ্দীন সাহেব একটা বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের জানা আছে আমরা কত কোটি টাকার এক টাকার নোট বাজারে ছেড়েছি। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সম্পূর্ণ টাকা বাজার থেকে তুলে নেবার পর যদি এক টাকাও বেশি আমরা পাই, তবে আমি পদত্যাগ করব। এই বিবৃতি তিনি সংসদে দিলেন, না বাইরে দিলেন সেটা আমার ঠিক খেয়াল নেই । যাই হোক, এই বিবৃতির পর সব দিক ঠাণ্ডা হল ।

এদিকে যখন আর মাত্র দিন দশেক বাকি আছে দু'মাসের, তখন প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডাকলেন । বললেন, 'বর্ডার এলাকা থেকে আমার কাছে কর্মীরা আসছে, তারা বলছে কোটি কোটি টাকার নোট নাকি ইন্ডিয়া থেকে বর্ডার দিয়ে ভেতরে আসছে। এটা তো এখনই বন্ধ করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্ক ছিল খুবই আন্তরিক। তাই আমি বলেই ফেললাম, 'স্যার, যারা আপনাকে এইসব বলছে তাদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন তারা কি তাদের জীবনে এক টাকার নোটে এক কোটি টাকা দেখেছে? কারণ, স্যার, আমার চাকরিজীবনের এক সময়ে আমি মুন্সিগঞ্জে ট্রেজারি অফিসার ছিলাম। সেখানে আমাদের একটি স্ট্রং রুম ছিল, বাক্সভর্তি টাকা থাকত ১, ৫, ১০, ৫০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত । স্ট্রং রুমটি যে পরিমাণ বড় ছিল তাতেও কিন্তু ৪০/৫০ লক্ষ টাকার বেশি জায়গা হত না। স্ট্যাক করে টাকা রাখা হত, স্ট্যাক ধরে টাকা গুনতে হত, টাকা গুনে শেষ করা

যেত না। মুন্সিগঞ্জের সাব ট্রেজারির সিলিং ছিল ৪০/৫০ লক্ষ টাকা। সেখানে সব ধরনের নোট ছিল, কিন্তু তাতেও স্ট্রং রুমে গাদাগাদি অবস্থা ছিল। আর আপনি বলছেন ওরা বলছে এক টাকার নোট আসছে কোটি কোটি টাকার ? তাই, স্যার, আমি বলছি ওরা কি জীবনে দেখেছে এক টাকার নোটে কোটি টাকা ?'

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'তুমি কী বল ?'

আমি বললাম, 'আমরা যা করেছি তা সঠিক । আর দশ দিন বাকি আছে, সময়কে এগিয়ে যেতে দিন । '

তারপর দশ দিন শেষ হল । বাংলাদেশ ব্যাংক জমা হওয়া টাকার হিসাব দিল। সেখানে মোট ছাপানো টাকার চাইতে জমা পড়েছে কম টাকা। তাজউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। আমি এই ক্ষেত্রে একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি, অন্য যে কেউ হলে হয়ত হুজুগে কান দিত বা নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখাত। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব একদম শান্ত ছিলেন, ভীষণ শান্ত। কোন সময় কোন উচ্চবাচ্য করেননি। আমি আমার সম্পূর্ণ সমর্থন তাঁকে দিয়েছি ।

এদিকে এই সময়টায় ভারতের পার্লামেন্টে বাংলাদেশের এই নোট ছাপানো নিয়ে প্রশ্ন ওঠে যে, ব্যাপারটা কী, আমরা নোট ছাপিয়ে কি অন্যায় করেছি, ইত্যাদি। ওই সময়টাতেই আমি দিল্লী গেলাম অর্থ সচিবদের একটা বৈঠকে। ভারতের অর্থ সচিব এম. জি. কাউল আমার কাছে জানতে চাইলেন এই বিষয়ের ব্যাপারে। আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। সেইসাথে এটার যে সমাধান বা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে তাও বললাম । এই ঘটনাগুলো যে সম্পূর্ণই হুজুগ ছিল সে সম্পর্কে ভারতের অর্থ সচিব একই মত প্রকাশ করলেন ।

আর একটি হাস্যকর মজার ঘটনা, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের বার্ষিক মিটিং হবে ম্যানিলায়। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব, আমি এবং অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব আবু সাইদ চৌধুরী সেই বৈঠকে যোগ দেব। ঢাকা থেকে থাই এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ব্যাংকক, সেখান থেকে আমাদের ম্যানিলা যাবার কথা। আমরা রওনা দেবার একদিন আগে হঠাৎ করে থাই জানাল ওদের সেই ফ্লাইটটি বাতিল হয়ে গেছে। এদিকে সেই সময় তো ব্যাংককে যাবার আর কোন ফ্লাইট নেই, কী করা যাবে ? থাই এয়ারলাইন্স বলল, ঠিক আছে আপনারা

দিল্লী যান, সেখান থেকে প্যানঅ্যামের ফ্লাইটে ব্যাংকক যেতে পারবেন। সেখান থেকে ফিলিপিন এয়ারে ম্যানিলা ।

যেহেতু এই মিটিংয়ে যোগ দিতেই হবে তাই আমরা দিল্লী গেলাম। বিকেলে আমরা দিল্লী পৌছলাম। ডি. পি. ধর এয়ারপোর্টে আমাদের রিসিভ করলেন। রাতটা ভারত সরকারের অতিথি হিসেবে হোটেলে থাকতে হবে, ভোর পাঁচটায় ফ্লাইট । রাত চারটায় হোটেলের রুমে ফোন বাজল । ভারতের প্রটোকল অফিসার জানাল, 'আপনারা ঘুমিয়ে থাকুন, ফ্লাইটটা যেতে দেরি হবে। আমরা পরে আপনাদেরকে সময়টা জানাব।' সময় অনুযায়ী আমরা তৈরি হয়ে এয়ারপোর্টে গেলাম । ভিআইপি রুমে বসে আছি। আমাদের কেউ ডাকেটাকে না অনেকক্ষণ, এমন সময় দেখলাম মাঝবয়সী প্রটোকল অফিসারকে । তাকে জিজ্ঞাসা করতেই বলে, 'অসুবিধা নেই, প্লেনের সময় হলেই ডাকব।' আরো কিছুক্ষণ পর ভিআইপি রুম থেকে অনেকটা পথ গাড়ি দিয়ে প্লেনের কাছাকাছি গিয়ে দেখি, প্লেনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এমন কি সিঁড়িটাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "সিঁড়িটা তো নিয়ে যাচ্ছে!' প্রটোকল অফিসার বলে, 'না, ওটা কিছু না।' আমরা বললাম, 'প্লেন তো চলছে!' তখন অফিসারটির মাথায় হাত । লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে প্যানঅ্যামের অফিসারের কাছে গিয়ে বলল, 'প্লেন কীভাবে যাচ্ছে ? আমাদের ভিআইপি যাত্রীরা রয়ে গেছে!

অফিসারটি বলে, "আমরা বারবার ডেকেছি, কেউ আসেনি, তাই প্লেন চলে যাচ্ছে।'

প্রটোকল অফিসার বলে, 'জানেন, কারা আছেন যাত্রী হিসেবে ? বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী, অর্থ সচিব। প্লেনকে অবশ্যই থামাতে হবে। এটা খুবই জরুরী।'

তখন অফিসার বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে কন্ট্রোল টাওয়ারে বলল, ভিআইপি যাত্রীরা রয়ে গেছেন, তাঁদের মালপত্রও চলে গেছে, এখন তাঁদের নিতে হবে। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বলল, আমাদের গাড়ি যেন প্লেনকে পেছন থেকে অনুসরণ করে, টেক অফের ঠিক আগ মুহূর্তে প্লেন থামবে। প্লেন তো থামল, কিন্তু উঠব কীভাবে, এত উঁচু ৭৪৭ প্লেন, সিঁড়ি তো নিয়ে গেছে। এবার আনল মাল তোলার লিফট। তিন জন মিলে কোন রকমে দাঁড়ান গেল । নিচ থেকে হাতল ঘুরিয়ে আমাদেরকে উপরে তোলা হচ্ছে। নিচে দেখতে পাচ্ছি আমাদের হাইকমিশনার মল্লিক সাহেব এবং অন্যান্যরা দাঁড়ানো। তাঁরা

ছোট হয়ে আসছেন। ৭৪৭-এর ইঞ্জিনের সামনে দিয়ে যেতেই গরম বাতাস, সে যে কী অবস্থা! যাই হোক দরজার সামনে পৌছে দরজায় টোকা দিতে বলা হয়েছিল। টোকা দিতেই যেই ভেতর থেকে দরজা খুলতে গেল আমরা দেখলাম দরজা তো বাইরে খুলবে, সেই ধাক্কায় আমরা নিচে পড়ে যাব । ওরা বিষয়টি বুঝতে পেরে লিফটা একটু নিচে নামল । দরজা খোলা হলে আমাদের তিনজনকে টেনে টেনে ভেতরে ঢোকান হল, নিচে দাঁড়ানো সবাই আমাদের অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে কাহিল ।

তাজউদ্দীন সাহেব কথা বলতে পছন্দ করতেন। কথা বলতে শুরু করলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন বিরতি ছাড়াই কথা চালিয়ে যেতে পারতেন। কাজ না থাকলে আমরাও বসে শুনতাম তাঁর সেইসব নানা ধরনের কথা। মনে আছে, একবার আমরা দু'জন দিল্লী গেলাম। এয়ারপোর্ট ছেড়ে খানিকটা পথ এগিয়ে যেতেই একটা বাড়ি দেখিয়ে তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দিল্লীতে এলে এই বাড়িতেই আমার থাকা হত। একবার মিসেস গান্ধী নিজে এসে এই বাড়িতে দেখা করে গেছেন।'

একবার কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব মনের দুঃখেই হোক আর যে কারণেই হোক, বললেন, 'আমরা কি ভুলই করলাম নাকি! স্বাধীনতার পর উচিত ছিল বেশ কিছু অপরাধীকে মেরে ফেলা। তা হলে হয়ত আমরা অনেক ভাল থাকতাম।'

বিজয়লাভের পর সপ্তাহের সাত দিনই আমাদের কাজ করতে হত। কয়েক মাস পর সাপ্তাহিক ছুটি দেয়া হয়। মনে আছে, একবার বাজেটের সময় সকালবেলা অফিসে গিয়েছি, ফিরেছি পরদিন ভোরে আজানের সময় ।

তাজউদ্দীন সাহেব যখন আমাকে সরকারের নীতি জানালেন যে, ব্যাংকগুলো জাতীয়করণ করা হবে এবং এই বিষয়ে কাগজপত্র তৈরি করতে কিছু নির্দেশনা দিলেন তখন আমরা কয়েকদিন খেটে সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করে নিয়ে এলাম। সে সময় এদেশের দুটি ব্যাংক ছিল: ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশন আর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক । আর বাকি সব ছিল পাকিস্তানি ব্যাংক । যেমন হাবিব ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংক, কমার্স ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, এমন প্রায় দশটা ব্যাংক। বড় ছিল চারটা : ইউনাইটেড ব্যাংক, হাবিব ব্যাংক, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক আর ন্যাশনাল ব্যাংক। বাকিগুলো ছিল এক-দুই শাখার। আমরা তখন চিন্তাভাবনা করে দেখলাম যে ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশন আর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল

ব্যাংক এই নামেই আলাদা দুটি ব্যাংক রাখা যায়। আর যে বাকি দশটা ব্যাংক ছিল সেগুলোকে এক সাথে করে ছয়টা ব্যাংক করা যায় । আমি ব্যাংকগুলোর নাম দিয়েছিলাম ইংরেজি নাম—'পিপল্স ব্যাংক' এমন ধরনের সব নাম । এই প্রস্তাব ক্যাবিনেটে যাবার পরে একমাত্র বদলে গেল ব্যাংকের নামগুলো, আর বাদবাকি প্রস্তাব ঠিকই রইল। তাজউদ্দীন সাহেব দিয়েছিলেন কয়েকটি নাম। দিনাজপুরের ইউসুফ আলি সাহেবও বললেন একটি নাম । এইভাবে সেখানেই ব্যাংকের নামগুলো ঠিক হল ।

এই মিটিংটা হল ২৩ মার্চ। ২৬ মার্চ ব্যাংকগুলো জাতীয়করণ করা হয় । তখন আমি অর্থমন্ত্রীকে বললাম, 'স্যার, এখন ব্যাংকগুলোর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পদে নিয়োগ দেয়া হবে এবং এইজন্য যাদের নামের সুপারিশ করব আমি চাই না এই সুপারিশের কেসটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাক। কারণ প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের এখতিয়ার আছে, সেই অনুযায়ী এতে রাজনৈতিক লোকজনের জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকবে। কারণ চারিদিক দিয়ে লোকজন কিছু না কিছু স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। ব্যাংক ভাল বুঝবে এমন লোকেরই এই মুহূর্তে প্রয়োজন। আপনিও স্যার এর মধ্যে আসবেন না, আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। আর প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফাইল গেলে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি যদি দেরি করেন বা অন্য কোন কিছু কিন্তু হাতে কোনভাবেই সময় নেই। যেহেতু ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়েছে, আইন অনুযায়ী ২৬ তারিখেই সব নিয়োগ দিতে হবে । আর ব্যাংকের উপর যদি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয় তবে সমস্ত বাংলাদেশের সমস্যা হবে।' তাজউদ্দীন সাহেব আমার কথা মেনে নিলেন । আমি তখন ছয়টা ব্যাংকে ছয়জনকে নিয়োগ দিলাম । এই ছয়জনকে আমি খুব ভালভাবেই জানতাম। যাঁরা সবচাইতে ভাল কাজ করতে পারবেন তাঁদেরকেই কাজ দেব, এই চিন্তাই আমার মাথায় ছিল। যিনি পারবেন না তাঁকে কাজ দেব না, এর মধ্যে কোন সমঝোতা নেই। আমি নিয়োগপত্রে সই করে দিলাম। কিছুদিন পর প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট গেল (অবশ্যই যাঁরা এই পদের জন্য আগ্রহী ছিলেন হয়ত তাঁদের কাছ থেকেই) যে, মতিউল ইসলাম সাহেব সব নিজে করেছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করে নাই ।

তাজউদ্দীন সাহেবের সই আমি ইচ্ছা করেই রাখিনি, কারণ তাহলে তাঁকে আটকাবে, তুমি কেন আমাকে দেখালে না ? সাধারণ নিয়ম তাই। সে কারণেই তাজউদ্দীন সাহেব রাজি হওয়াতেই আমি সই করে দিয়েছি। তাজউদ্দীন সাহেবের কাছেও অভিযোগ এসেছে। রুলস্ অফ বিজনেসকে তোয়াক্কা

না করে মতিউল ইসলাম সমস্ত ব্যাংকের এমডিদেরকে নিয়োগ করেছে। তাজউদ্দীন সাহেবের উত্তর ছিল, ‘‘আচ্ছা, মতিউল ইসলাম সাহেব এমন কাজ করল, কিন্তু ব্যাংকগুলো তো চলছে ভালই। আমি তাঁকে ডেকে বলে দেব। আমি অবশ্যই বিষয়টি জানতে চাইব।'

প্রধানমন্ত্রীও আমাকে ডাকলেন, ‘তুমি কী এটা করেছ ?'

বললাম, 'জি, স্যার।’

প্রধানমন্ত্রী বললেন, ‘কেন করেছ ?’

বললাম, 'স্যার, আমি দুঃখিত, ভুল করেছি। আমি খুব তাড়াতাড়িতে ছিলাম, কোন সময়ই ছিল না আপনার সাথে আলাপের । কারণ ২৩ মার্চ ব্যাংকের বিষয়ে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত হয়েছে । আমাকে দুই দিনের মধ্যে সমস্ত কিছু করতে হয়েছে, না হলে ২৬ তারিখে কিছুতেই সব কাজ শেষ করা যেত না। মারাত্মক সমস্যা দেখা দিত। স্যার, আমি সত্যিই দুঃখিত। আপনি যদি মনে করেন কাউকে বদলাবেন, বদলে দিন।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন, ‘না আমি বদলাতে চাচ্ছি না, কিন্তু এর পরে আর যেন এমন না হয় ।'

তাজউদ্দীন সাহেবের একটা ব্যাপার ছিল তা হল, তিনি আমাকে ভীষণ বিশ্বাস করতেন। শুরু থেকেই বিশ্বাস করতেন। আমি অর্থ সচিব হিসেবে যোগ দেয়ার অল্প কিছুদিন পরেই আমার পূর্বপরিচিত মহবুব আনাম (আবুল মনসুর সাহেবের ছেলে) একদিন আমার বাসায় প্রায় দৌড়ে এসে বলল, ‘স্যার, তাজউদ্দীন সাহেব আমাদের বাসায় এসেছিলেন, তিনি আপনার ভীষণ প্রশংসা করলেন। বললেন, আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত অফিসার, আপনাকে সাথে পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। আমি এই কথা বলতেই ছুটে এসেছি।' এই কথা শুনে আমার ভীষণ ভাল লাগল যে তাজউদ্দীন সাহেব ভাবেন আমি একজন ভাল অফিসার এবং তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন। তাজউদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে এটি আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক পুরস্কারপ্রাপ্তি। আমার প্রতি তাজউদ্দীন সাহেবের এমন মনোভাবই আমি সবসময় দেখেছি। তবে মানুষজন অনবরত এত মিথ্যা কথা বলত যে, মাঝেমধ্যে তিনি রেগে যেতেন। কিন্তু যেহেতু আমি তাঁকে বুঝতাম তাই চুপ করে থাকতাম, কিছু বলতাম না । পরে যখন বোঝা যেত উনি ঠাণ্ডা

হয়েছেন তখন আমি আস্তে আস্তে বলতাম বিষয়টি । তিনি সব সময় আমার কথা শুনতেন।

অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন সাহেব শেষবার যখন বিশ্বব্যাংকের মিটিংয়ে যোগ দিতে ওয়াশিংটনে গেলেন, আমি তখন বিশ্বব্যাংকে কাজ করছি।

প্রায় এক বছর পর তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে তাঁর হোটেল রুমে আমার দেখা । অন্যান্য কথার মধ্যে হঠাৎ তিনি বললেন, যে ঢাকাকে আমি ছেড়ে এসেছি সেখানে আমার কিছু ভাল বন্ধু রেখে আসা উচিত ছিল । আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না, কিন্তু একটু পরেই তাঁর কাছ থেকে যা শুনলাম তা ছিল আমার কাছে অবিশ্বাস্য ।

সেটা হল, একবার কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলন উপলক্ষে লন্ডনে থাকাকালীন সময়ে জনতা ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক খায়রুল কবির সাহেব আমাকে বললেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাঙালিদের টাকাপয়সা দেশে পাঠাবার ক্ষেত্রে সমস্যা এবং সম্ভাবনার উপর একটা পরীক্ষামূলক কাজ করতে জনতা ব্যাংককে অনুমতি দেবার জন্য। কারণ এই টাকা বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ভাল একটি উৎস হবে। একই সাথে তিনি এই কাজটি সম্পাদনের জন্য আইসিবি-এর প্রধান মমতাজ ইকবালের নাম প্রস্তাব করলেন। আমি জানতাম মমতাজ ইকবাল সেই সময় তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যাপারে লন্ডনে ছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে অর্থমন্ত্রীর সম্মতিসাপেক্ষে তাঁকে আমি আমার সম্মতি জানালাম ।

কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলন শেষে প্যানঅ্যাম-এর ফ্লাইটে ওয়াশিংটন যাবার জন্য আমরা যখন লন্ডন এয়ারপোর্টের পিকক লাউঞ্জে বসে আছি সেই সময় খায়রুল কবির সাহেব সেই রেমিটেন্সের বিষয়ে কাজটির জন্য ইকবালের নিয়োগের একটি দরখাস্ত নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, অর্থমন্ত্রীর মৌখিক সম্মতি তিনি নিয়েছেন। এই কথা শুনে আমি সব সময়ের মত দরখাস্তটির মার্জিনের একপাশে লিখলাম: অর্থমন্ত্রীর সাথে আলোচনাসাপেক্ষে তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মমতাজ ইকবালের এই কাজের জন্য পাঁচ শ' পাউন্ড মঞ্জুর করা হল। প্লেনে বসে আমি তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে বিষয়টির উল্লেখ করলে তিনি তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন ।

ঘটনাটি এই পর্যন্তই । এরপর আমি বিশ্বব্যাংকে যোগ দেয়ার পর ঢাকায়

দুর্নীতি দমন বিভাগের প্রধান আমার সই করা ইকবালের দরখাস্তের সেই কাগজটি অর্থমন্ত্রীর কাছে নিয়ে এসে বলেছেন, ইকবাল আমার বন্ধু, তাঁকে সুবিধা দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি এই দরখাস্তে মন্ত্রীর নামে মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছি। এই নিয়োগের বিষয়ে মন্ত্রীর সাথে আমার কোন আলোচনাও হয়নি এবং তিনি কোন সম্মতিও দেননি। তাই মন্ত্রীর অনুমতি পেলে তিনি আমার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন। এইটুকু শুনে আমি হতভম্বের মত তাজউদ্দীন সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলাম, এরপর তিনি কী করলেন সেটা জানতে। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তিনি দুর্নীতি দমন বিভাগের প্রধানকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই মুহূর্তে যদি এই বিষয়টি বন্ধ করে না দেয়া হয় তবে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলে ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে তাঁকে সাসপেন্ড করাবেন। তাজউদ্দিন সাহেবের একটি ফোন কল যে দুর্নীতি দমন বিভাগের প্রধানের চাকরি জীবনের অবসান ঘটাতে পারত এতে আমার কোন সন্দেহই ছিল না । কিন্তু তিনি হয়ত বুঝতে পারেননি তাজউদ্দিন সাহেবের মহানুভবতার কাছে তিনি ঋণী হয়ে রইলেন ।

তাজউদ্দীন সাহেব আমার মন্ত্রী ছিলেন, এ কারণে সেই রাতে এই ঘটনা শোনার পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। তাজউদ্দীন সাহেবের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং মানবিক গুণাবলী ছিল অতুলনীয়। তিনি সত্যিই ছিলেন একজন সুবর্ণ হৃদয়ের মানুষ। চিরদিন তাঁর জন্য আমার শ্রদ্ধা জমা থাকবে ।

[১০.২.১৯৯৯]

মতিউল ইসলাম : সরকারি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অর্থ সচিব।

মতিউর রহমান

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আমি মেহেরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলাম। সেই সময় বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা সবাই অসহযোগ করেছি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই রাতে মেহেরপুরের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই এলাহী চৌধুরী রাত বারোটার পর আমাদের ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে, এবং জানালেন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই মেহেরপুর মহকুমায় তিনি একটি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবেন। এখানে যাঁরা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন তাঁদের মতামত জানতে চাইলেন এবং বললেন যে, আপনারা কী করবেন ? আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই আমি বললাম, আমি অবশ্যই এই প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকব এবং সবরকম সহযোগিতা করব ।

তারপর থেকেই মেহেরপুরে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। আমরা সবাই প্রতিরোধ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হয়ে যাই। সেই সময় আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয় স্থানীয়ভাবে মুক্তিবাহিনীর যে প্রশিক্ষণ হবে সেটার দেখাশোনা করা এবং এদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা। সেখানে যে মহকুমা আনসার অ্যাডজুটেন্ট ছিলেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি এবং জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রশিক্ষণের কাজ চালিয়ে যাই। মহকুমা প্রশাসক জনাব তৌফিক-ই এলাহী চৌধুরী মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবার জন্য দক্ষিণ অঞ্চলের সামরিক কমান্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তিনি খুবই সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন । এর মধ্যেই আমরা একটি কন্ট্রোল সেন্টার গড়ে তুলেছিলাম। এসডিও সাহেবের বাসাতেই সেই কন্ট্রোল সেন্টার ছিল। সেখানে আমরা ফার্স্ট অফিসার, সেকেন্ড অফিসার এভাবে এবং মহকুমা পর্যায়ে অন্যান্য যাঁরা কর্মকর্তা ছিলেন তাঁরা পালাক্রমে ডিউটি করতাম । মাঝে মাঝে এসডিও সাহেবও আমাদের সাথে বৈঠক করতেন।

এর মধ্যে মার্চ মাসের শেষের দিকে একদিন আমরা কানাঘুষা শুনলাম যে, মেহেরপুরের পাশ দিয়েই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ দু-একজন সঙ্গী সঙ্গে নিয়ে সম্ভবত কুষ্টিয়ার ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছেন । এই সংবাদ আমাদের

মনে অনেকটা আশার সঞ্চার করে। আমরা মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকলাম। এর মধ্যে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাবার ফলে আবু ওসমান চৌধুরী পশ্চাদপসারণ করে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে মেহেরপুর চলে আসেন। ১০ এপ্রিল রাতে আমরা তাজউদ্দীন সাহেবের একটা বক্তৃতা শুনি রেডিও মারফত, তাতে জানা যায় যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। কয়েকদিন পর এসডিও সাহেব বললেন, ১৭ এপ্রিল তারিখে বৈদ্যনাথতলায় বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং সেখানে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে।

এই কাজেও আমরা সহযোগিতা করি এবং ১৭ এপ্রিল সকালবেলা বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে আমরা জমায়েত হই (তখনও বৈদ্যনাথতলার 'মুজিবনগর' নামকরণ হয়নি)। এখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব বক্তৃতা করেন, তাজউদ্দীন সাহেবও বক্তৃতা করেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল ওসমানী, জনাব কামরুজ্জামান, জনাব মনসুর আলি, জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হল ।

এদিকে আমার এক ভাই সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মরত ছিল, মুস্তাফিজুর রহমান নাম (পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ, স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বীর বিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত)। এপ্রিল মাসের ৬/৭ তারিখে দেখি সে হঠাৎ আমার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত, সঙ্গে ক্যাপ্টেন ওহাব ও ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন। ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজ ও ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে মেহেরপুরে আসার পথে যশোর ক্যান্টনমেন্টের কাছে ক্যাপ্টেন ওহাবের সাথে দেখা হলে এই তিনজন একসাথে মেহেরপুরে আসে। ওরা দু-তিন দিন বিশ্রাম নেয়ার পর ওদেরকে বললাম, 'মেজর ওসমান চুয়াডাঙ্গায় মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করেছে, তোমরাও ইচ্ছা করলে তাঁর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে পার।' আমি আমার এসডিও তৌফিক-ই এলাহীর সাথে এই বিষয়ে কথা বললাম। তিনি খুব আগ্রহ দেখালেন এবং বললেন যে, 'ওদেরকে নিয়ে আসুন, কথা বলি।' এরপর ওরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে চলে গেল। ১৭ এপ্রিলের অনুষ্ঠানে ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজ, ওহাব ও সালাউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর বাংলাদেশ সরকার কলকাতায় ফিরে যান । এরপর মেহেরপুর হানাদার বাহিনী কর্তৃক দখল হয়ে যাবে এই

আশঙ্কা করে আমরা মেজর ওসমানসহ পশ্চাদপসারণ করে বেনাপোলে গিয়ে আমাদের ক্যাম্প করলাম ।

সম্ভবত ২৪ এপ্রিল সকালবেলা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব বেনাপোল পরিদর্শন করতে এলেন। তিনি একজন বৃটিশ এমপিকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেখানে ঘণ্টাখানেক থাকলেন, সমস্ত ট্রুপস্ দেখলেন। তিনি সেই বৃটিশ এমপিকে নিয়ে এসেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ দেখাবার জন্য। সেই সময় আশপাশের বহু ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব চলে যাবার ১৫/২০ মিনিট পরেই পাকিস্তানি বাহিনী তিন দিক দিয়ে সেখানে আক্রমণ শুরু করে এবং বৃষ্টির মত গুলি বর্ষিত হতে থাকে । ওই যুদ্ধে ইপিআর- এর একজন সৈনিক মুজিবুর রহমান অত্যন্ত বীরত্ব এবং সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে বহু পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যকে খতম করে এক পর্যায়ে হানাদার বাহিনীর গুলিতে নিহত হন। ধারণা করা যায়, তাজউদ্দীন সাহেব এসেছেন এই খবর পেয়েই পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে ধরবার জন্য ওই আক্রমণটা চালায়। ওই অপারেশনের পর আমরা আর ওখানে থাকতে পারলাম না এবং আমরা পিছু হটে ভারতের বনগাঁর কাছাকাছি গেলাম। আমি বনগাঁয়ে আশ্রয় নিলাম ।

এরপর একদিন নূরুল কাদের সাহেব, যিনি আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন, বনগাঁয় ক্যাম্প পরিদর্শনে এলে আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এখানে কী করছ ?' আমি বললাম, ‘এখানে আমাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে স্টাফ অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাই বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত কর্মচারী-কর্মকর্তা চলে আসছেন তাঁদের একটা জরিপ করছি এবং তা মেজর ওসমানের কাছে জমা দিচ্ছি। নূরুল কাদের সাহেব বললেন, 'মুজিবনগরে সচিবালয় খোলা হয়েছে, তুমি সেখানে চলে এস।' তাঁর কথামত আমি মে মাসের প্রথম দিকে গিয়ে মুজিবনগর সচিবালয়ে যোগদান করি। আমাকে আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে পোস্টিং দেয়া হয় এবং আমি ডেপুটি সেক্রেটারি জনাব কামালউদ্দীন আহমদের অধীনে কাজকর্ম শুরু করি। এই কাজ করতে থাকাকালীন সম্ভবত আগস্ট মাসের এক সকালে ক্যাবিনেট সচিব হোসেন তওফিক ইমাম হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর ঘরে যেতেই তিনি বললেন যে, ‘প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের একান্ত সচিব ড. ফারুক আজিজ খান অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তাই তিনি কাজ করতে পারছেন না, এখন আপনাকে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিবের

দায়িত্ব নিতে হবে।' আমি সাগ্রহে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করি ।

মুজিবনগর সচিবালয়েই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সাহেব থাকতেন। যে রুমটা তাঁর অফিস ছিল আমরা তার সামনে বসতাম। এই রুমে তাঁর সামরিক লিয়াজোঁ অফিসার নূরুল ইসলাম বসতেন, পিএ আলাউল হক সাহেব, ডি.ডি. রায় এবং আমি বসতাম । প্রধানমন্ত্রী যে কক্ষে বসতেন তার ঠিক পেছনের ঘরেই তাঁর থাকবার জায়গা ছিল। এভাবেই অফিস চলত। তাজউদ্দীন সাহেব খুব স্বল্পভাষী ছিলেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও বলতেন না এবং একটু উত্তেজিত হলেই তিনি নখ খুঁটতেন। তাঁর মেজাজটা একটু তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি যে স্নেহ করতেন সেই বহিঃপ্রকাশও কম করতেন। কিন্তু পরে বোঝা যেত তিনি আসলে নারকেলের মত, অর্থাৎ বাইরের দিকটা কঠিন কিন্তু ভেতরটা শাঁস এবং পানিতে ভরা কোমল ।

আমি কাজে যোগ দেবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে রুমে ডাকলেন এবং একান্তভাবেই বললেন যে, 'আমাকে তো বিএসএফ-এর মেস থেকেই খাবার দেয়, কিন্তু আমি এই ধরনের খাবারে অভ্যস্ত না। আর আমার তো একটু ডায়াবেটিস আছে, তাই আমাকে খাবারটা বেছে খেতে হয়। আপনি কি এমন কাউকে আনতে পারেন, যে আমাকে একটু রান্না করে খাওয়াতে পারবে?' আমি বললাম, “নিশ্চয়ই পারব।' মেহেরপুরে আমার অর্ডারলি হিসেবে কাজ করত, তাকে আমি এখানেও সঙ্গে রেখেছিলাম । বাড়ি গোপালগঞ্জে, মকফুর রহমান ওর নাম। ওকে আমি প্রধানমন্ত্রীর সামনে হাজির করলাম। বললাম, ‘এই-ই আপনাকে খাবার তৈরি করে দিতে পারবে।' তখন থেকে মকফুর প্রধানমন্ত্রীকে খাবার তৈরি করে খাওয়াত । কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁর অন্যান্য অনেক ব্যক্তিগত কাজ নিজের হাতেই করতেন, যেমন নিজের কাপড়চোপড় তিনি নিজ হাতেই ধুয়ে ফেলতেন। কোনরকম ইতস্তত করতেন না। প্রচুর খাটতে পারতেন, সময়ের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন ।

মুজিবনগরের অনেক টুকিটাকি ঘটনা আছে। যেমন একবার আমাদের সচিবালয়ে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে সংস্থাপন সচিব নূরুল কাদেরের মনোমালিন্য হয়। যার ফলে এই বিষয়টি মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঠিক ভালভাবে কাজ করতে পারছিলাম না। তখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবই এটার মীমাংসা করে দেন যার ফলে বিষয়টি আর বেশিদূর গড়ায়নি ।

একদিন সকালে আমি অফিসে গিয়ে আমার প্রতিদিনের রুটিনমত প্রধানমন্ত্রীর ডেস্ক ক্যালেন্ডারে যে সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো লেখা থাকত তা দেখতে গিয়ে দেখি প্রধানমন্ত্রী সেখানে নেই। আমি তাঁর শোবার ঘরে উঁকি দিলাম, দেখলাম তিনি সেখানেও নেই। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি তখন ভাবলাম পিওন মকফুর রহমান হয়ত বলতে পারবে প্রধানমন্ত্রী কোথায়। মকফুরও মুজিবনগর কমপ্লেক্সেই থাকত। সেখানে গিয়ে আমি দেখি প্রধানমন্ত্রী মকফুরের মাথার কাছে বসে আছেন। আমাকে দেখেই প্রধানমন্ত্রী একটু থতমত খেয়ে গেলেন এবং বললেন, 'সকালে মকফুর আমার কাছে আসেনি, তাই ওর খোঁজ নেয়ার জন্য এসে দেখি যে ওর প্রচণ্ড জ্বর, তাই আমি ওকে দেখছিলাম।' আমি বললাম, 'স্যার, আপনি যান, আমি ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি।'

এর মধ্যে একদিন আমাদের সচিবালয়ে একটি লোককে অস্ত্রসহ ধরে ফেলা হয়। আমি লোকটিকে দেখেছিলাম—বয়স ত্রিশের মত হবে। বিএসএফ লোকটিকে ধরে। পরে কানাঘুষা শোনা যায়, লোকটি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে হত্যার উদ্দেশ্যে এসেছিল।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর পরিবারের সঙ্গে কখনও থাকেননি। একটা ফ্ল্যাটবাড়ির বিভিন্ন ফ্ল্যাটে অন্যান্য মন্ত্রীরা পরিবারসহ থাকতেন। সেখানে একটি ফ্ল্যাটে তাজউদ্দীন সাহেবের পরিবারও থাকতেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিও ওই বাড়িতেই থাকতেন, তাই মাঝেমধ্যে তাঁর ফ্ল্যাটে ক্যাবিনেট মিটিং হত । আমিও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দু'- একবার সেখানে গেছি এবং দেখেছি, তিনি তাঁর পরিবার যে ফ্ল্যাটে থাকতেন সেখানে ঢোকেননি ।

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখে আমি সকালে অফিসে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো কী আছে দেখতে গিয়ে ডেস্ক ক্যালেন্ডারে দেখি ১৩ তারিখের ঘরে দুটো নাম লেখা, মেজর তাহের এবং ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজ ।

প্রধানমন্ত্রী যখন অফিসে ঢুকলেন তখন আমি একটু সাহস করে বললাম, 'স্যার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম।'

তিনি বললেন, 'বলুন ।'

আমি বললাম, 'আপনার ডেস্ক ক্যালেন্ডারে ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজের নাম দেখছি, আমি বুঝতে পারছি না এই নাম কেন লেখা, তাই আমার কৌতূহল হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'মুস্তাফিজ সম্পর্কেই কেন আপনি জিজ্ঞাসা করছেন ?' আমি তখন বললাম, ‘স্যার, মুস্তাফিজ আমার আপন ছোট ভাই।'

এই কথা বলতেই দেখলাম যে তাঁর মুখটা একটু কালো হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী বললেন, ‘১৩ তারিখ রাতে যুদ্ধ করতে গিয়ে মুস্তাফিজ এবং তাহের আহত হয়েছে। তারা এখন কৃষ্ণনগর হাসপাতালে আছে। আমি যতদূর জানি, ভয়ের কিছু নেই, বর্তমানে ভালই আছে। আমি আগামী ২০ তারিখ ঈদের দিন সেখানে যাব । ২০ তারিখে ওদেরকে দেখে আসব । আপনি পরদিন ২১ তারিখেই সমস্ত খবর জানতে পারবেন।'

২১ তারিখ সকালে আমি অফিসে গেছি, প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা হতেই তিনি বললেন, ‘মুস্তাফিজকে আমি দেখে এসেছি, ভাল আছে, ৪/৫ দিন পর আপনার বাসায় চলে আসবে।' আরো বললেন, ‘ওর ভাগ্য খুব ভাল, ওর কোমরে যে বেল্টটা ছিল গুলি সে দিক দিয়ে ঢুকেই পেটে গেছে। কিন্তু ওর ভাইটাল কোন অর্গান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আমি ফটোগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, ওর কিছু ছবি তুলে এনেছি, সেগুলো প্রিন্ট হলে আপনাকে দিয়ে দেব।' কয়েকদিন পরেই তিনি নিজেই আমাকে মুস্তাফিজের ছবিগুলো দিলেন ।

এখানেই দেখা যায় যে তাঁর কতখানি মহত্ত্ব। তাঁর একজন ব্যক্তিগত স্টাফের বা অফিসারের ভাই আহত হয়েছে, আর তিনি ঈদের দিনেও তাঁর নিজ পরিবারের সাথে মিলিত না হয়ে সেই আহত সামরিক কর্মকর্তাদের দেখার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। তাজউদ্দীন সাহেব প্রায়ই বাইরে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে বা ক্যাম্প আছে সেসব জায়গায় চলে যেতেন ।

তারপর বড় সমস্যা ছিল খন্দকার মোশতাকের ষড়যন্ত্র। নানা রকম ষড়যন্ত্রের কথা জানা ছিল, তবে এতটা আমার জানা ছিল না। যখন জুলাই মাসে শিলিগুড়িতে একটা আস্থা ভোটের ব্যাপারে মিটিং হয়েছিল তখন আমরা সব জানলাম। সেখানে অবশ্য আমি যাইনি। সংস্থাপন সচিব নূরুল কাদের সাহেব গিয়েছিলেন। আর সেখানে অন্তত মোশতাক যে ষড়যন্ত্র করছে তা জানা গিয়েছিল। অন্যান্য বিতর্কিত নামগুলো বলতে চাই না। তারপর মোশতাকের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি আরো পরিষ্কার হল যখন তার জাতিসংঘে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হল এবং কাজ সীমিত করে দেয়া হল । আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়টা ছিল হোসেন আলির দূতাবাসেই, আর বাদবাকি সচিবালয়টা থিয়েটার রোডে, ফলে একটা দূরত্ব ছিল ।

প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত মোশতাকের ষড়যন্ত্র কিছুটা অনুমান করেছিলেন আগ থেকেই । শিলিগুড়িতে আস্থা ভোটের বিষয়ে মোশতাক, জহিরুল কাইয়ুম এরা যে অন্যভাবে একটা চেষ্টা নিচ্ছে এটা তিনি বুঝেছিলেন। কারণ মোশতাক কখনই তাজউদ্দীন সাহেব প্রধানমন্ত্রী থাকুন এটা মেনে নিতে পারছিল না।

এদিকে আমি অগাস্ট থেকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কাজে যোগ দিয়েছিলাম, তারপর ড. ফারুক আজিজ খান সুস্থ হয়ে এলেও প্রধানমন্ত্রী আমাকে ছাড়েননি। বলেছিলেন, 'আপনিও থেকে যান।' ড. ফারুক আজিজ খান রংপুর কারমাইকেল কলেজে আমার শিক্ষক ছিলেন, কাজেই আমার তাঁর সাথে কাজ করতে কোন অসুবিধাই হয়নি ।

দেশ স্বাধীন হবার পর ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা চলে যাবার আগে বললেন, 'আমি তো ঢাকায় চলে যাচ্ছি, আপনি এখানে যা কিছু আমাদের আছে সমস্ত জাহাজে তুলে দিয়ে দেশে চলে আসবেন।' আমি সেই অনুযায়ী সমস্ত মালপত্র জাহাজে তুলে দেবার ব্যবস্থা করে সড়কপথে মেহেরপুর-রাজশাহী হয়ে ঢাকায় আসি ।

এরপর একদিন সচিবালয়ের লিফটে তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয় । তিনি আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন । তারপর আমি যখন বগুড়ায় এসডিও তখন ১৯৭৪ সালের প্রথমদিকে একবার তাজউদ্দীন সাহেব বগুড়ায় এলেন। সেখানে সারিয়াকান্দি বলে একটি থানা আছে সেখান দিয়ে তিনি আসবেন। ডেপুটি কমিশনার সাহেব আমাকে বললেন, 'আপনি অর্থমন্ত্রীকে রিসিভ করার জন্য আমার সাথে যাবেন।' ডিসি সাহেব এবং আমি দু'জনেই সারিয়াকান্দি গেলাম। হেলিকপ্টার থেকে তিনি নামলেন, আমাদের সাথে তাঁর দেখা হল । সঙ্গে সেই মকফুর ছিল ।

তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে বললেন, 'কি মতিউর রহমান, আপনি এখানে ?' আমি বললাম, 'স্যার, আমি এখানকার এসডিও।'

তিনি বললেন, 'ও আচ্ছা।' তারপর মকফুরের দিকে তাকিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, 'দেখ মকফুর, মতিউর রহমান এখানকার এসডিও, তোমার সাহেব, তুমি গিয়ে তাঁর সাথে দেখা ক'রো ।'

এরপর সেখানকার ডাকবাংলায় স্থানীয় এমপি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি বসে কথাবার্তা বলছিলেন। সেখানে ইলেকট্রিসিটি ছিল না, তাই মকফুর

ভেতরে তালপাখা দিয়ে তাঁদের বাতাস করছিল । যাই হোক, কিছুক্ষণ পর মকফুর অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় বাইরে বের হয়ে আমাকে বলল, 'স্যার, এখানে আসার পর মিনিস্টার সাহেব তো আপনার সাথে দেখা করতে বলেছিলেন, এখন আমি দেখা তো করতে এলাম, কিন্তু এখানকার স্থানীয় এমপিরা তো আপনার বিরুদ্ধে খুব কথা বলছে, বলছে যে, সহযোগিতা পাই না, ইত্যাদি অনেক কথা । প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আপনাকে নিয়েই কথা। তবে স্যার (অর্থমন্ত্রী) ওসব কথায় কান দেননি। তিনি জবাবে বলেছেন, মতিউর রহমানকে আমি চিনি। তারপর আর কথা বাড়েনি ।'

বগুড়া থেকে ওই বছরই আমি ঢাকায় বদলি হয়ে আসি। আমাদের সার্ভিসেই কাজী লুৎফুল হক নামে একজন তাজউদ্দীন সাহেবের বন্ধু ছিলেন । ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব ছিলেন। আমি লুৎফুল হক সাহেবের সাথে অনেক জায়গায় কাজ করেছি । আমি আর লুৎফুল হক সাহেব ১৯৭৪ সালে একই অফিসে কাজ করতাম, জুট প্রাইস স্টেবিলাইজেশন কর্পোরেশনে । তিনি সেক্রেটারি ছিলেন, আমি ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলাম । আমরা কিছুদিন ধরেই শুনতে পাচ্ছিলাম তাজউদ্দীন সাহেব পদত্যাগ করতে পারেন । ২৬ তারিখে (২৬ অক্টোবর ১৯৭৪) পদত্যাগের খবরটা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। লুৎফুল হক সাহেব আর আমি ঠিক করলাম আজকে আমরা তাজউদ্দীন সাহেবের বাসায় যাব। বিকেলে আমরা গেলাম। দেখলাম সেখানে কিছু লোক ঘোরাফেরা করছে ।

আমাদের খবর শুনেই তাজউদ্দীন সাহেব বের হয়ে এলেন এবং বেশ রাগ করে বললেন, আপনারা এখানে এসেছেন কেন ?'

আমরা বললাম, “আপনি যখন কর্মরত অবস্থায় ছিলেন তখন তো আমরা আসিনি, আজ আমাদের আপনার কাছে আসতেই হয়।'

তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আপনাদের চাকরি চলে যাবে। এখানে সব এনএসআই এবং এসবি-র লোক ঘোরাফেরা করছে।'

আমরা বললাম, ‘আজ আপনার সাথে দেখা করতে এসে যদি আমাদের চাকরি যায় যাক, তাতে পরোয়া করি না।'

আমরা যখন কথাবার্তা বলছি সেই সময় অন্তত আমি একটু উত্তেজিতই ছিলাম। আমি কথায় কথায় বলেই ফেললাম, ‘বঙ্গবন্ধুর অবদানের চেয়ে

আপনার অবদান তো কম নয়!'

আমার এই কথা শুনে তাজউদ্দীন সাহেব আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন । বললেন, ‘এ কথা কখনও বলবেন না। বঙ্গবন্ধুর অবদান আমার চেয়ে অনেক বেশি। এ কথা বলতে পারি, শেষ পর্যন্ত আমিই বঙ্গবন্ধুর সাথে থাকব। বর্তমানে সাময়িক এক বিভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু এটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বঙ্গবন্ধু না হলে এ দেশটা স্বাধীন হত না। আমরা এই স্বাধীনতার কাজে সহযোগিতা করেছি। বঙ্গবন্ধুর অবদান আর আমার অবদানের তুলনা করাটা আপনার ঠিক নয়, মতিউর রহমান ।'

এই দিনই কথাপ্রসঙ্গে তাজউদ্দীন সাহেব আরও একটি কথা বলেছিলেন যে, 'বঙ্গবন্ধু তো ১৯৭১-এর নয় মাস দেশে ছিলেন না, তাই আমরা কীভাবে, কত রকম করে দেশটা স্বাধীন করলাম সেই বিষয়গুলো তিনি জানতেন না। ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি তারিখে বিমানবন্দর থেকে ফেরার পথে আমার সাথে কথা হয়েছিল তিনি সমস্ত শুনবেন। মুজিব ভাই বলেছিলেন, ঠিক আছে, তোমরা কীভাবে দেশ স্বাধীন করলে আমি সমস্ত শুনব । কিন্তু ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সেই সমস্ত কথা শোনার জন্য সেই সময়টুকু তিনি আর দেননি বা দিতে পারেননি। এবং আর কোনদিনই তিনি জিজ্ঞাসা করেননি যে, তাজউদ্দীন, আমি যে নয় মাস ছিলাম না, দেশটা কীভাবে স্বাধীন হল? এই যে তিনি জানতে চাইলেন না, শুনলেন না, এই দুঃখটা আমার চিরদিন থাকবে। মুজিব ভাই যদি জানতে পারতেন কীভাবে দেশটা স্বাধীন হল, এই যুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করেছিল এবং অন্যান্য বিষয়গুলো যদি তাঁকে অবহিত করতে পারতাম তাহলে হয়ত তাঁর অনেক ধারণা পরিবর্তন হত।'

এরপর আর আমার তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা হয়নি। দেখা হয়েছে তাঁর মৃতদেহের সাথে। নভেম্বরের ৩ তারিখে হত্যাকাণ্ডের পর ৪ তারিখে আমরা কানাঘুষা শুনতে পাচ্ছি যে, চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। ৫ তারিখে শুনলাম তাজউদ্দীন সাহেবের মরদেহ তাঁর বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে। আমি তখন ধানমন্ডির ২৭ নম্বর রোডে থাকতাম । তাজউদ্দীন সাহেবের সাত মসজিদ রোডের বাসাটা আমার চেনা ছিল, সেখানে গিয়ে দেখি যে বহু লোকজনের ভিড় । বাসার নিচতলাতে তাজউদ্দীন সাহেবের মরদেহ খাটিয়ায় রাখা, নিচে বরফের চাঁই। আমি ঘণ্টা দুয়েক সেখানে ছিলাম ।

আমি থাকা অবস্থায় শুনেছিলাম তাজউদ্দীন সাহেবসহ অন্যান্য নেতাদের

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাশে শেরে বাংলার কবরের কাছাকাছি সমাহিত করা হবে। সেখানে কবর খোঁড়াও হয়েছিল, কিন্তু খালেদ মোশাররফ সেখানে কবর দিতে দেয়নি ।

আমার এক বন্ধু শাহরিয়ার জেড. আর. ইকবাল তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ঢাকা সদর মহকুমার এসডিও ছিলেন স্বাধীনতার পর শাহরিয়ার আমাকে কথায় কথায় একবার বলেছিল যে, ১৫ অগাস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পর মোশতাক ক্ষমতায় আসার কথা শুনে সে তাজউদ্দীন সাহেবকে টেলিফোন করেছিল। বলেছিল, 'স্যার, আপনার তো বাসায় থাকা ঠিক না, আপনি বাসা থেকে চলে যান।' উত্তরে তাজউদ্দীন সাহেব বলেছিলেন যে, 'আর বের হতে চাই না, কারণ আমাকে ভয়ানকভাবে ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা আছে। এখন যদি বের হয়ে গিয়ে আবার ওই পথে যাই তাহলে ওই মিথ্যা অপবাদের সীল স্থায়ীভাবে আমার গায়ে জুড়ে যাবে, আমি তাই আর বের হতে চাচ্ছি না।'

যাই হোক, তাজউদ্দীন সাহেবের কথায় ফিরে আসি। ১৯৭১-এ তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি তিনি খুব গোছালো স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি প্রতিটি কাজে খুব গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেন । দলীয় লোকজনদের সাথে কথা বলবার সময় তিনি আমাদেরকে সামনে রাখতেন না।

টাকাপয়সার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন প্রচণ্ড মেথডিক্যাল। কিছু টাকা সব সময় তাঁর শোবার ঘরের স্টিলের আলমিরাতে থাকত। কিন্তু তিনি নিজে কখনও সেই আলমিরাটি খোলেননি। দুটো চাবি দিয়ে সেই আলমিরাটি খুলতে হত। একটি চাবি থাকত আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেবের কাছে (যিনি স্বাধীনতার পর স্পীকার এবং পরে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন), তিনিও এই থিয়েটার রোডেই থাকতেন। আর অন্য চাবিটি থাকত তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে । অর্থাৎ ডাবল লকে আলমিরাটা খোলা হত । আমি নিজে বেশ কয়েক দিন সামনে থেকেছি। আলমিরা খুলে টাকার নোটগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিতরণের জন্য বের করা হত । যেমন, বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে, ইয়ুথ ক্যাম্পসহ নানা কাজে এখান থেকে টাকা দেয়া হত। মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেব রিসিট দিয়ে টাকা দিয়ে দিতেন এবং এই সমস্ত খরচ লিখে রাখা হত।

তাজউদ্দীন সাহেবের হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং কোন ফাইল তিনি

টেবিলে জমিয়ে রাখতেন না। প্রায় প্রতিদিনেরটাই প্রতিদিন দেখে ফেলতেন। আমরা মুজিবনগর থেকে ফেরার সময় সমস্ত ফাইলপত্র নিয়ে এসেছিলাম। সচিবালয়ে আমার রুমেই অনেক ফাইল ট্রাঙ্কে রাখা ছিল। কিন্তু আমি এসডিও হয়ে বগুড়ায় চলে গেলাম, তারপর ফিরে এসে আর সেই ফাইলগুলো পাইনি।

তাজউদ্দীন সাহেবের নিজ হাতে বাংলায় লেখা একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ফাইলের কথা স্পষ্ট মনে আছে (যদিও সেই সিদ্ধান্তটি অন্তত আমার মনঃপূত ছিল না)। **১৯৭১**-এ আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অফিসারদের সিনিয়রিটির বিষয়ে কথাবার্তা বলেছিলাম । আমরা মুক্তিযোদ্ধা, আমরা এখানে আনুগত্য রক্ষার শপথে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ সরকারে যোগদান করেছি, কাজেই আমাদের চাইতে সিনিয়রিটি যারা পাকিস্তানে কাজ করেছে তাদের হতে পারে না এমন চিন্তা থেকে একটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল । কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব লিখলেন, না, বাংলাদেশের ভেতরে প্রশাসনে বহু মানুষ আছে যারা দেশের ভেতরে থেকেই বাংলাদেশের হয়ে কাজ করেছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত এখন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে, তাই বর্তমানে এটি করা যাবে না।

[26.9.2000]

মতিউর রহমান : সরকারি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব।

মোহাম্মদ নূরুল কাদের

আমার নাম মোহাম্মদ নূরুল কাদের খান। নিজেকে 'নূরুল কাদের' বলে ১৯৭১ থেকে পরিচয় দিয়ে আসছি, 'খান'টা এখন আর ব্যবহার করি না ।

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার প্রথম পরিচয় টেলিফোনের মাধ্যমে । ৯ এপ্রিল ১৯৭১ সালে চুয়াডাঙ্গা রেস্ট হাউস থেকে তাঁর সাথে আমার ফোনে কথা হয়। দীর্ঘ সময়, প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ।

আমি সেই সময় পাবনায় ডিসি ছিলাম। পাবনাই প্রথম স্বাধীন হয় ভূখণ্ড হিসেবে। এপ্রিলের তিন তারিখে পাবনায় আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলি। এখানে পাক বাহিনী সংখ্যায় ছিল প্রায় দুই কোম্পানি। আমরা পাবনায় ১৭টি খণ্ডযুদ্ধ করেছিলাম। এতে পাক বাহিনীর দুই কোম্পানিই প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। শেষ যুদ্ধটা হয়েছিল মুলাডুলিতে ২ এপ্রিল। মুলাডুলি থেকে পাবনার দূরত্ব প্রায় ৮/১০ মাইল। আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাতে মার্চ করে ফিরেছিলাম। সর্বস্তরের মানুষ এসে একসাথে হয়েছিল, স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত চারদিক, সে দিন যেন ছিল চূড়ান্ত বিজয়—বাঙালি, বাংলাদেশের আর মুক্তিযোদ্ধাদের । এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, জিয়াউর রহমান সাহেব চট্টগ্রাম থেকে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন আমরা এই এলাকাতে সেই সম্পর্কে কিছুই জানতাম না ।

পাবনায় ইপিআর ছিল না । আনসার ও পুলিশ ছিল । পুলিশ সুপার ছিলেন চৌধুরী আব্দুল গাফফার, যিনি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন, 'আমি সাঁজোয়া বাহিনীর লোক, আমি ইউনিফর্মধারী এবং চাকরি করি।' তাঁর নেতিবাচক মনোভাব সত্ত্বেও দেশের পরিস্থিতি দেখে আমি কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস থেকে একটা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এবং ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছিলাম ভেতরে ভেতরে। অন্যান্য জায়গায় যেখানে আর্মি এবং ইপিআর-এর সদস্যরা নেতৃত্ব দিয়েছিল, পাবনায় এর বিপরীত হল । এখানে সিভিলিয়ানদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে উঠল। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় । এখানে সাধারণ মানুষ, গ্রামের মানুষ প্রতিরোধ গড়েছে ।

যুদ্ধে জয়ী হয়ে মুলাডুলি থেকে আমরা পাবনায় ফিরে এলাম। মুখে জয় বাংলা স্লোগান, মনে প্রচণ্ড উল্লাস । রাত তখন প্রায় ১১টা, আমার সাথে আব্দুর রব (বগা মিয়া) সাহেব ছিলেন। আমরা সবাই একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নিলাম,

পরদিন আমরা এখান থেকে বাংলাদেশ সরকারের আদেশ জারি করে এই সরকারের কর্মকাণ্ড আরম্ভ করব এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন করা হবে। এই সিদ্ধান্তমত রাত ১২টার দিকে একটি লোক খুঁজে বের করা হল, যে রাবার স্ট্যাম্প তৈরি করে। অনেক প্রস্তাব এসেছিল, তার মধ্য থেকে গোল করে বাংলাদেশ সরকার লেখা স্ট্যাম্প তৈরি হল । পরদিন এই রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে ট্রেজারি ব্যাংক খোলার আদেশ দিয়ে প্রশাসন চালু হল। এটা ৩ এপ্রিল হবে। শেখ মুজিব সাহেবের পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ ঘোষণার ফলে ব্যাংক এবং সমস্ত সরকারি কার্যক্রম বন্ধ ছিল । আমাদের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হল যে, যেহেতু আর এখানে পাকিস্তানিরা নেই, এলাকাটা মুক্ত, অতএব এখানে তো অসহযোগের আর প্রয়োজন নেই। আমরা তখন শেখ মুজিবের নামে বাংলাদেশ সরকারের কর্মকাণ্ড এবং বাংলাদেশ সরকারের নামে প্রচারণা শুরু করলাম। ২১ বার রাইফেলের গুলি ফুটিয়ে সরকারের পতাকা উত্তোলন করা হল । বগা ভাই পতাকা উত্তোলন করলেন । আমজাদ সাহেব পাবনা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন । কিন্তু তিনি কোন চর এলাকায় থাকায় সেদিন শহরে ছিলেন না । বগা ভাই সবসময় আমাদের সাথে ছিলেন। পতাকা উত্তোলনের সময় আমরা সব পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম—পুলিশ, আনসার এবং মুক্তিবাহিনীতে যারা যোগ দিয়েছিল সবাই। বকুল, ইকবাল, কাদরী, ওয়াজউদ্দিন, আমজাদ এরা সবাই বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিল এবং আওয়ামী লীগের জন্য অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ছিল ।

আমরা অফিস, কাচারি সব খুললাম। কাজ চলতে শুরু করল। পাক বাহিনী নগরবাড়ি দিয়ে যাতে না আসতে পারে সেজন্য আমরা রাস্তায় ট্রেঞ্চ করে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলাম। কিন্তু ওরা আরো উজানে গিয়ে, গ্রাম ধরে হেঁটে হেঁটে ক্রল করে আসতে শুরু করেছে। তারপর আট তারিখে পাবনার পতন হল । তখন আমি চুয়াডাঙ্গায় গেলাম । তখনও আমরা স্থির জানি না ভারতে আশ্রয় পাব কিনা । আট তারিখে চুয়াডাঙ্গায় বম্বিং হয় এবং চারদিক থেকে পাক বাহিনী ধেয়ে আসছে। ভারতের বর্ডারকে যদি দেয়াল ধরি তা হলে আমাদের পিঠ তখন দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। চারদিক থেকে পাক বাহিনী আসছে। আমি ওদের অবস্থান দেখার জন্য গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সাথে মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই এলাহী চৌধুরী ছিল। তৌফিকের কাছ থেকে খবর পেলাম, তাজউদ্দিন সাহেব সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। তাঁর সাথে যোগাযোগ করা তখন খুবই জরুরী হয়ে

দাঁড়িয়েছে। যোগাযোগ করতেই হবে, তাই আমরা সীমান্তের দিকে গেলাম । বর্ডার আউটপোস্টের কাছেই গাড়ি থামিয়ে একটু হেঁটে সামনে যেতেই এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা, তিনি একজন কর্নেল, খুবই বন্ধু মনোভাবাপন্ন। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট কোন পলিসি সম্বন্ধে জানেন না । তিনি চা খাওয়ালেন । প্রায় ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পর আমরা বললাম, 'দেখুন, আমাদের কিছু নেতৃবৃন্দ ওপারে গেছেন, আমরা তাঁদের সাথে যোগাযোগ করে কথা বলতে চাই । দেখা না হলেও ফোনে যোগাযোগ করে দেয়া হোক।' তিনি শুধু বললেন, 'আচ্ছা দেখি কী করা যায়। চেষ্টা করব। আপনাদের কোথায় পাওয়া যাবে?' আমি চুয়াডাঙ্গা রেস্ট হাউসের ফোন নম্বরটা দিলাম। ঠিক হল রাত দশটার পর আমি অপেক্ষা করব ।

রাত এগারোটার দিকে ফোন এল । আমিই ফোন ধরলাম। 'নূরুল কাদের সাহেব আছেন ?' বলতেই আমি বললাম, 'বলছি।' ওপাশ থেকে শোনা গেল, "আপনি একটু ধরুন। অনেকক্ষণ লাগল, প্রায় ১৫ মিনিট পর তাজউদ্দীন সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বললেন, 'আমি তাজউদ্দীন কথা বলছি।' আমি সালাম দিয়ে আমার নাম বলতেই বললেন, 'আমি আপনাকে জানি, আপনার কথা শুনেছি। আপনি পাবনায় যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন সেই জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমার ব্যক্তিগত অভিনন্দন এবং সবার পক্ষ থেকেও অভিনন্দন গ্রহণ করুন । আমি শুনেছি আপনি পাবনায় বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছেন।'

আমি বললাম, 'না স্যার, বেয়াদবি মাফ করবেন। আমি আদৌ পাবনায় বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করিনি। সেখানে একটা পতাকা তোলা হয়েছে এবং আমরা বাংলাদেশ সরকার রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে শেখ সাহেবের নির্দেশে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেটা তুলে নিয়ে ব্যাংক খুলেছি, এই যা।' তাজউদ্দীন সাহেব এই কাজের প্রশংসা করে জানতে চাইলেন চারিদিকের অবস্থা, পরিস্থিতি সম্পর্কে ।

আমি পাবনায় নাপাম বোমা বর্ষণের ঘটনা এবং আমরা যে চতুর্দিক দিয়ে বেষ্টিত হয়ে গেছি, আমাদের আর কোন উপায় নেই, তা বললাম । আমাদের সাথে সমস্ত লোক আছে; আনসার, ইপিআর, পুলিশ সব মিলিয়ে হাজারের ওপর । এখন যদি আমরা কোনভাবে আক্রান্ত হই এবং পরাভূত হই তাহলে আমরা সবাই দেশদ্রোহী হিসেবে বিবেচিত হব। আমি বারবার বাংলাদেশ

সরকার ঘোষণা করার বিষয়টির উপর জোর দিলাম ।

তিনি তখন বললেন, "দেখুন, আমাদের মধ্যে একটা হাইয়ারার্কি আছে। আমাদের রাজনৈতিক দলের ডিসিপ্লিনের ব্যাপার আছে। আমাদের যে সমস্ত লোকজন আছেন তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন, কে কোথায় আছেন আমরা বস্তুত কিছুই জানি না । এই অবস্থায় আমার পক্ষে তো এককভাবে কোন কিছু করা সম্ভব নয় ।'

আমি বললাম, 'স্যার, সরকারের ঘোষণা তাড়াতাড়ি না হলে আমাদের সবার মনোবল সাংঘাতিকভাবে ভেঙে যাবে। আমরা একটা স্বাধীনতা যুদ্ধ করছি, কিন্তু কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা শুনছি না। স্যার, খুব তাড়াতাড়ি এটা করতেই হবে।'

ডা. আসহাবুল হক আমার পাশে ছিলেন, তিনিও তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কথা বললেন। ফোন রেখে দেয়ার আগে তাজউদ্দীন সাহেব আমার সাথে আবার কথা বললেন। বললেন, 'আপনার কথা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। এই মুহূর্তে কোন কথা দিচ্ছি না, তবে আমরা চেষ্টা করছি, আলাপ-আলোচনা করছি।' আমি আবার বলেই ফেললাম, 'ক্ষমা করবেন স্যার, আপনার সাথে কথা বলেছি এই প্রেরণা থেকেই আমরা কিন্তু এখানে একটা ঘোষণা দিয়ে দেব। আমার আর কোন উপায় নেই।'

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, আমার যখন পরে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, তখন দেখেছি তিনি খুবই ডিসিপ্লিনড্ মানুষ এবং গণতন্ত্রমনা । তাই সেই মুহূর্তে আমি তাঁর কাছ থেকে যা চাইছিলাম তা স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। তিনি সব সময় সুস্থিরভাবে সবার মতামত শুনতেন, এককভাবে সবাইকে পাশ কাটিয়ে কাজ করার মত মনোভাব তাঁর ছিল না। সে কারণেই হয়ত তিনি ওই মুহূর্তে আমার কাছে কোন সিদ্ধান্ত জানাচ্ছিলেন না ।

আমাদের ভাগ্যটা সত্যিই সুপ্রসন্ন, পরদিন ১০ এপ্রিল রাত ১০টার পরেই রেডিওতে সরকার গঠনের ঘোষণা এবং তাজউদ্দীন সাহেবের জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রচারিত হল । আমরা পরদিন সকালে বাংলাদেশ সরকার গঠন হয়েছে এই ঘোষণা দিয়ে ঢোল পিটিয়ে দিলাম। কখনও সঙ্গে ডা. আসহাবুল হক আবার কখনও তৌফিক-ই এলাহী চৌধুরী, এইভাবে আমরা সব জায়গায় গিয়ে

গিয়ে বললাম, বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা হয়েছে। আমরা সেই সরকারের পক্ষ থেকে এসেছি, আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি, আদেশ দিচ্ছি, আজ থেকে এই ব্যাংক, এই অফিস, আপনারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য দিন। আমরা খুব সহজ ভাষায় বললাম, আমরা এখন যুদ্ধে লিপ্ত । আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা চাই ।

যুদ্ধ করতে আমাদের রসদ, অর্থ এবং অন্যান্য আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন। এই চিন্তা থেকেই আমি পাবনা থেকে ট্রেনভর্তি খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম । এখন টাকাপয়সার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত ব্যাংককে বললাম, আপনাদের আমরা ট্রাঙ্ক এনে দেব অথবা আপনারা ট্রাঙ্ক, তালা কিনে নিন। প্রতি ট্রাঙ্কে খুব গুছিয়ে টাকাপয়সা গুনে রাখবেন এবং লক করে দেবেন। ব্যাংকের নাম লিখে চারটি কপি তৈরি করবেন। এই কপিতে ব্যাংকের ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টেন্ট এবং ক্যাশিয়ার ব্যাংকের পক্ষ থেকে সই করবেন, আসহাবুল হক সাহেব জনপ্রতিনিধি হিসেবে সই করবেন এবং আমার পক্ষ থেকে একজন সই করবেন। এই বলে অর্ডার সই করে ছেড়ে দিলাম। আমরা ট্রাক দিলাম এবং বললাম এখন থেকে ব্যাংকটা মোবাইল হয়ে যাবে। এদিকে চুয়াডাঙ্গার অবস্থা তখন আন্ডার অ্যাটাক । আমরা মেহেরপুরের দিকে চলে গেলাম।

এরই মধ্যে শুনলাম এখানে দুইজন আর্মি অফিসার এসেছে। একজন ক্যাপ্টেন হাফিজ, অন্যজন সালাউদ্দিন। এরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আরো দু'একজনসহ পালিয়ে এসেছে। যুদ্ধে যাবার বিষয়ে তাদের সাথে কথাবার্তা বলছি, এমন সময় একজন এসে বলল, ডাকবাংলোয় দুইজন লোক এসেছেন, এসডিও সাহেবের অফিসের কাউকে ডাকছেন। তৌফিককে খোঁজ করলাম, তৌফিক সেই মুহূর্তে ছিল না। আমি তৌফিকের জন্য চিরকুট রেখে গেলাম, ও ফিরে এলেই যেন ওখানে চলে আসে। আমি গিয়ে দেখি ডাকবাংলার বাইরে একটি জীপ দাঁড়িয়ে আছে । দেখলাম জীপটা ভারতীয় । ভেতরে দু'জন ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তাঁদের পোশাক স্বাভাবিক। ধারণা করা যায় উচ্চপদস্থ হবেন। আমি মেহেরপুরের এসডিও কিনা জানতে চাইলেন, আমি বললাম আমি পাবনার ডিসি। তাঁরা ঠিক খুলে পরিচয় দিতে চাইলেন না। বললেন, 'বুঝতেই পারছেন আমরা ভারতীয়, দেখলাম পথঘাট খোলা আছে, লোকজন সব জয় বাংলা বলছে, তাই চলে এলাম ।'

ঠিক ওই মুহূর্তে তাঁরা পরিচয় না দিতে চাইলেও আমি যখন বললাম এপ্রিলের

৮ তারিখে ভারতীয় একজন কর্নেলের সাথে আমার যোগযোগ হয়েছিল এবং তাঁর মাধ্যমেই আমি তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে খবর পাঠাই এবং ৯ তারিখে ফোনে কথা বলেছি, তখন তাঁরা পরিচয় দিলেন। তাঁদের একজন গোলোক মজুমদার । তাঁকে বললাম তাজউদ্দীন সাহেবকে আমার সংগ্রামী সালাম পৌঁছে দিতে এবং অভিনন্দন তাঁর সাথের সবাইকে। আর একটি বিশেষ অনুরোধ, আমরা চাই একটা খোলা ময়দানে সরকার ঘোষণা করা হোক। এই এলাকাটা এখনও মুক্ত আছে।

এখানে একটি কাকতালীয় ব্যাপার ঘটল, মনে হল তাঁরাও যেন মুক্ত এলাকায় ঘোষণার বিষয়ে নিরাপত্তা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতেই এসেছেন। খোলাখুলি অনেক আলোচনা হল। ইতোমধ্যে তৌফিকও বোধ হয় এসে আমার সাথে যোগ দিয়েছে। আমরা বললাম, ‘আমাদের সাথে হাজারখানেকের মত লোক আছে, মাটিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করব আমরা। আকাশপথেও ওরা আসতে পারবে না। কারণ তাতে আকাশসীমা লঙ্ঘন করা হবে। অতএব আপনারা যদি আকাশে দুই-একটা জঙ্গী বিমান রাখেন তাহলে মনে হয় না পাকিস্তান ফোর্স সাহস পাবে বিমান বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে।' অনেকক্ষণ আলোচনার পর গোলোক মজুমদার বললেন, “ঠিক আছে, আমরা আপনার অনুরোধ পৌছে দেব।' এখানে যেহেতু সামনাসামনি কথা হচ্ছিল তাই বুঝতে পেরেছিলাম তাঁরা মোটামুটি রাজি। আমি, তৌফিক, মাহবুব চারিদিকে খবরাখবর রাখতে শুরু করেছি।

১৭ এপ্রিল ঘোষণার আগের দিন স্থলপথে যেন কোন পাক বাহিনী না আসতে পারে সে দায়িত্ব আমি নিলাম। আমি, হাফিজ, সালাউদ্দিন এবং অন্যান্য সমস্ত লোকজন এলাকাটাকে বেষ্টনীর মত করে গার্ড দিচ্ছিলাম। পরদিন যখন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান চলছে তখন কয়েকজন দৌড়ে এসে আমাকে বলল, ‘আপনাকে ঘোষণাস্থলে ডাকছে।'

আমি সভাস্থলে গেলাম। সেখানেই আমি প্রথমবারের মত তাজউদ্দীন সাহেবকে সামনাসামনি দেখলাম । তাঁর চেহারায় খুব উদ্বেগের ছাপ ছিল । তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর সমস্ত মন-চিত্ত বিশাল দায়িত্বের কারণে ভারাক্রান্ত । তিনি বোধ হয় খুব স্বস্তি বোধ করছিলেন না। অন্যান্য কয়েকজনের আচরণ এবং চেহারাতেও দেখলাম গম্ভীর ছাপ। সৈয়দ নজরুল সাহেব আমার আত্মীয় হন। মনসুর আলি সাহেব খুব মাই ডিয়ার লোক ছিলেন। তাঁকে পাবনা থেকে

চিনি। কামরুজ্জামান সাহেবকে আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন থেকে চিনি। তিনি আমাকে আমার ডাকনাম ধরে ডাকেন। ওসমানী সাহেবের সাথে আমার পরিচয় ১৯৫৩ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে । সেই থেকে ভাল সম্পর্ক । এখানে সবার সাথে দেখা হল, একটু কোলাকুলি, একটু অশ্রু। প্রায় সবাই পরিবার-বাড়িঘরবিচ্ছিন্ন, কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা তখন কোন বড় কিছু না, কারণ সামনে তখন দেশের মুক্তির প্রশ্ন, স্বাধীনতার যুদ্ধ । এর কাছে দুঃখকষ্ট, শোক কোন কিছুই বেশি গুরুত্বের ছিল না । এমন একটা পরিবেশে আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে দেখি—নম্র, ভদ্র, স্বল্পভাষী, আস্তে কথা বলেন। সবাই আমাকে দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও তাজউদ্দিন সাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ এবং প্রধানমন্ত্রীসুলভ আচরণে আমার সাথে হাত মেলালেন। একটু হেসে বললেন, ‘আপনিই নূরুল কাদের? আমার মনে হয় আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

আমি বললাম, ‘আপনার সাথে কোথায় যাব, স্যার ?' বললেন, ‘সেটা সময় হলে বুঝতে পারবেন।'

কথাবার্তার এক পর্যায়ে আমি বললাম, ‘স্যার, আমার একটা সমস্যা আছে, আমি ছেলেদের দায়িত্ব নিয়েছি, তারা অস্ত্র ধারণ করেছে, তাদেরকে কীভাবে ফেলে যাই!'

তাজউদ্দিন সাহেব বুঝিয়ে বললেন তাদের কর্তব্য এবং আমার করণীয়। আমি রাজি হলাম, কিন্তু বললাম, ‘আমার কয়েকটি শর্ত আছে, স্যার । যখন আমি অস্ত্র ধারণ করেছিলাম তখন জানতাম এই সেনাবাহিনী নাগালের বাইরে যেতে পারবে না । আমি দেশকে মুক্ত করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছি। বেঁচে থাকার আশায় নয় । অতএব, যে অস্ত্র আমি ধারণ করেছি তা ত্যাগ করব না। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার প্রয়োজন অনুভব করলেই আমি যুদ্ধে যাব। আর যখন দেশ মুক্ত হবে তখন আমি আমার দায়িত্ব নিজেই নেব।' এই সমস্ত আবেগের কথাবার্তা আর কি । এটা ১৭ এপ্রিলের ঘটনা।

১৮ এপ্রিল কামরুজ্জামান সাহেব ফোন করলেন। ডাকনাম ধরে বললেন, 'ঝিলু, কী খবর ? তুমি কবে আসছ ?’

আমি বললাম, ‘কোথায় ?'

তিনি বললেন, ‘কেন, কলকাতায় । কলকাতায় এলেই আমাদেরকে পাবে ।'

আমি বললাম, 'দেখি কী করা যায়।'

হেনা ভাই বললেন, "তুমি এই সব কী আরম্ভ করলে, একদম সোজা চলে এস।' আমি বললাম, "ঠিক আছে ।'

১৯ তারিখ আমি জীপ চালিয়ে যখন সীমান্তে এসে পৌঁছি তখন পড়ন্ত বিকেল, চারদিকে সন্ধ্যার ছায়া, রক্তিম সূর্য ডুবে যাবার অপেক্ষায় । বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করবে এই বিশ্বাসে অস্ত্রধারণ করেছিল এমন চারটি ছেলেও ছিল আমার সাথে। আমরা জীপ থেকে নামলাম । সূর্যকে দেখছি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে বাংলাদেশে । দুটো ছেলে কেঁদে চিৎকার করে বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে গেল। এই চিৎকারের সাথে যেন মিশে ছিল দুটো জিনিস : এক, সীমান্তরক্ষী বাহিনী অস্ত্র রেখে যেতে বলেছে; দুই, যেন শেষ সূর্য ডুবছে। ওদের চিৎকারটা এমন ছিল যে, স্বাধীনতার সূর্য ডুবতে দেব না। হাজার ডেকেও তাদের ফেরাতে পারিনি। কিছুদিন পরে খবর পেয়েছিলাম তারা যুদ্ধে শহীদ হয়েছে।

যাই হোক, সে দিন তারা দু'জন যখন বাংলাদেশে ফিরে গেল তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মন খুব বিষণ্ন হয়ে গেল । আবেগের তাড়নায় মনে হল তারা যা করেছে আমাদেরও তো তাই করা উচিত। আবেগ ঝেড়ে ফেললাম। কাজ করতে হবে, অনেক কাজ। সরকারের আদেশ আছে আমার জন্য । সীমান্ত অতিক্রম করলাম। আমি জীপ চালাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল অফুরন্ত পথ। পথ ফুরাচ্ছে না। মনটা ছিল ভারাক্রান্ত । দেশ পেছনে রয়ে গেছে। সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কোনদিন এই মাটিতে ফিরতে পারব কিনা জানি না। যুদ্ধের সমাপ্তি কবে হবে, দেশ স্বাধীন হবে কিনা, কিছুই জানি না। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা দেশে যাচ্ছি। আমাদের কারো কাছে জীবনধারণের কোন উপায় বলতে কিছুই ছিল না। খাবার, টাকাপয়সা কিছুই না। এত অনিশ্চয়তা, অনিশ্চিত পরিস্থিতি । সমস্ত পথ কিছুক্ষণ পরপর পানিতে চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি থামাতে হয়েছে, চোখ মুছতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যখন কৃষ্ণনগরে পৌছলাম রাত তখন প্রায় নয়টার মত। আমাদের জীপ দেখে বহু লোক এসে ঘিরে দাঁড়াল। বাংলাদেশের গাড়ি, দেখলেই চেনা যায়।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখা ভাল, সেই যে টাকাপয়সা ট্রাঙ্ক করে ট্রাকে তোলা হয়েছিল হিসেবের লিস্টসহ, সেগুলো কিন্তু ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। কৃষ্ণনগরে আমাদের জীপটাকে ঘিরে তখন জয় বাংলা স্লোগান চলছে। কিছু

লোক এগিয়ে এসে বলল, "আমরা সহায়ক সমিতির লোক। বাংলাদেশের লোকদের সাহায্য করবার জন্য আমরা সহায়ক সমিতি করেছি।' এখানে বগা ভাই এবং আমাদের সাথের প্রায় এক-দেড়শ ছেলের সাথে দেখা হল । সহায়ক সমিতির একজন আমাকে সেখানকার ডিসি-র বাংলোতে নিয়ে গেল ।

রাত এগারোটা/সাড়ে এগারোটায় সাঁতারু ব্রজেন দাস এসে হাজির হলেন—সে আর এক ইতিহাস । ব্রজেন দাস আমার খোঁজে গিয়েছিলেন কারণ তিনি শুনেছেন যে আমি মারা গেছি। বিবিসি থেকে আমার নাম ধরে বলেছিল মারা যাবার সংবাদ। তাই জলজ্যান্ত আমাকে দেখে ব্রজেন তো খুব খুশি। ব্রজেন দাসই আমাদেরকে কলকাতায় নিয়ে যান।

কলকাতায় পৌছে ঠিকানা খুঁজে বের করা খুবই কষ্টকর ছিল। শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম ২ লর্ড সিনহা রোড । আমাকে ভেতরের একটা রুমে নিয়ে গেল, সেখানে তাজউদ্দীন সাহেব, নজরুল সাহেব এবং ওসমানী সাহেব ছিলেন। আমাকে দেখেই তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আসুন, নূরুল কাদের সাহেব, বসুন।' ওসমানী সাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ ইংরেজিতে বললেন, 'হাউ আর ইউ, মাই বয় ?'

ওসমানী সাহেবকে দেখেই আবেগে আক্রান্ত আমি উত্তেজিতভাবে বলেই ফেললাম, 'স্যার, আপনি তো এখানে আছেন, আর যুদ্ধক্ষেত্রে ছেলেরা আহত হচ্ছে, চিকিৎসা পাচ্ছে না, রসদ নেই, প্রাথমিক চিকিৎসা নেই—কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?'

তিনি বললেন, 'আমরা চিন্তাভাবনা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু করবার জন্য ।'

এই কথায় আমার মন ভরল না । আমার কাছে তখন অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা এবং সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সহজে দূর করতে পারা একমাত্র লক্ষ্য। মনসুর ভাইয়ের সাথে, হেনা ভাইয়ের সাথে কথা হল। মনসুর ভাইকে তো সরাসরি বলেই ফেললাম, 'এখন তো সরকার হয়ে গেছে, আপনি সরকারের প্রতিনিধি, মন্ত্রী হিসেবে আমাদের সাথে থাকেন। আমরা যুদ্ধ করব।'

তাজউদ্দীন সাহেবকে বললাম, 'আপনারা আমাদের সরকার গঠন করেছেন, এখন প্রশাসনিক একটা সরকার, প্রশাসনিক একটা অবকাঠামো প্রয়োজন, না হলে লক্ষ্যে কীভাবে পৌছাবো আমরা!' অভিমানী মা যেমন রাগ করে ছেলেকে

ভর্ৎসনা করেন, আমার ওই কথা শুনে তাজউদ্দীন সাহেব ঠিক সেইভাবে বললেন, 'কিসের সরকার, কোন কিছুর ঠিক নেই, কিসের সরকার, অ্যাঁ? এত অধৈর্য হলে হবে নাকি!' আমি তখন বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। সময় লেগেছে বুঝতে । তবে ইতোমধ্যে আমি জেনে গেছি তাজউদ্দীন সাহেব কী অবস্থায়, কোন্ পরিস্থিতিতে সরকারের ঘোষণা দিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই কিভাবে নাজুক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তা আবার সামাল দিয়েছেন । তাই তিনি হয়ত ভাবছেন, কি জানি নূরুল কাদের এবং অন্যান্যদের কথা শুনে আবার একটা প্রশাসনিক সরকার বসিয়ে আর এক ঝামেলা না হয় ।

তাজউদ্দীন সাহেব বারবার সংগঠিত হবার উপর জোর দিচ্ছিলেন। বলছিলেন, 'কোন তথ্য নেই, ডাটা নেই—কোন খবরই নেই, আগে তো সংগঠিত হতে হবে!' আমি সেই সূত্র ধরে বললাম, 'স্যার, আপনি সংগঠিত হবার কথা বলছেন, কিন্তু ভেবে দেখুন কীভাবে হবেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য, কাজকর্ম, যোগাযোগ স্থাপনের জন্য মেকানিজম দরকার। আপনার কথামত সবাইকে একসাথে করে দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে।'

তাজউদ্দীন সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'বুঝলাম। কিন্তু আজকের দিনটা যাক । কাল আমি বলব।'

আমি বুঝলাম, তিনি সমস্ত জিনিস পরিষ্কার ভাবছেন, বুঝছেন, কিন্তু অন্যান্যদের সাথে আলোচনা না করে কিছু করতে পারছেন না। আমি পরে জেনেছি, সেদিন সন্ধ্যায় তাঁদের একটি মিটিং হয়, সেখানে তাজউদ্দীন সাহেব এটা তোলেন যে, আমাদের একটা প্রশাসনিক দিক যদি আমরা উন্মোচন না করি তাহলে দ্রুত সংগঠিত হতে পারব না, ইত্যাদি । সিদ্ধান্ত হল, একটি কাঠামো তৈরি করা হবে । কীভাবে হবে সেই আলোচনাও হয়। তখন তাজউদ্দীন সাহেব বলেন, 'আমার কাছে নূরুল কাদের সম্পর্কে রিপোর্ট আছে, এই জন্যই ১৭ এপ্রিল নূরুল কাদেরকে এখানে আসতে বলেছিলাম। আমি নূরুল কাদেরের সাথে আলাপ করেছি, বয়সে নবীন হলেও আমার মনে হয় সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে শৃঙ্খলার সাথে সমস্ত কাজ করতে পেরে সে অধিকার লাভ করেছে এবং সে যে দায়িত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত এ থেকেই তা সহজে অনুমান করা যায়।'

পুরো ঘটনাটাই আমি পরে কামরুজ্জামান ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছিলাম । তিনি বললেন, ''নূরুল কাদের, তুমি তো তাজউদ্দীন সাহেবের মোটামুটি খুব বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি।'

আমি বললাম, 'হেনা ভাই, তাজউদ্দীন সাহেব আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন, আর আমার সাথে তাঁর প্রথম দেখা তো ১৭ তারিখে।' তখন তিনি ঠাট্টা করে বললেন, "ঝিলু, তুমিই আমাদের সরকারের প্রথম। ভাল।'

এদিকে আমাদের কর্মকাণ্ড শুরু করবার জন্য ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়িটা ঠিক হল। তাজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'নূরুল কাদের, আপনি একটি অর্ডার লিখে নিয়ে আসেন।' তখন আমাদের কাগজ নেই, কলম নেই, টাইপরাইটার কিছুই নেই। একটা লোক এসে বলল, 'স্যার, আমি ব্যবস্থা করছি।' আমি বললাম, 'আপনি কে ?' তখন সে বলল, 'স্যার, আমি ওয়াপদার অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলাম। আমি শর্টহ্যান্ডের কাজও জানি।' সে ছুটে গিয়ে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে এক দিস্তা কাগজ নিয়ে এল। লেখা হল : গতকালের ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের অনুসরণে নূরুল কাদেরকে একটি প্রশাসনিক কাঠামো প্রণয়ন করার দায়িত্বে নিয়োগ করা হল । ডেজিগনেশান দেয়া হল 'সচিব, সাধারণ প্রশাসন' । তাজউদ্দীন সাহেব সই করলেন এবং এইভাবে বাংলাদেশের প্রশাসনিক সরকারের জন্ম হল ।

আসাদুজ্জামান তখন কলকাতায়। ওয়ালি, কমল, কামালকে পেলাম । তৌফিকও ছিল। তওফিক ইমাম তখন আগরতলায়। প্রথম ক্যাবিনেট সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হল রাশিদুল হাসানকে। রাশিদুল হাসান রাজশাহীর ডিসি ছিলেন ।

এখন আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, কী কাজের চাপ ছিল তখন । থাকার কোন জায়গা ছিল না । টেবিলের উপরই দু'ঘণ্টা কাত হয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে নিতাম । কাজের কোন শুরু বা শেষ ছিল না। কারো প্রাথমিক চিকিৎসা লাগবে; কেউ স্টেশনে শুয়ে আছে, তার থাকার ব্যবস্থা করা; কেউ মারা গেছে, তার মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে যোগ দেয়া, মন্ত্রিসভার আলোচনার একটি সারমর্ম লেখা—সব আর হয়ে উঠছিল না ।

যাই হোক, এর মধ্যে আসাদুজ্জামানের সাথে ২৮/২৯ তারিখে দেখা। মনসুর আলি সাহেবকে আসাদের কথা বললাম, 'সে সিএসপি অফিসার, টাঙ্গাইল বাড়ি, খুব ভাল মানুষ, তাঁকেই আপনার মন্ত্রণালয়ের সচিব করে নেন।' তারপর তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হল। প্রথম ট্রেজারি করা হল হোসেন আলি সাহেবের অফিসের উপরতলার একদিকে একটা রুম এবং নিচতলায় আর

একটা রুম নিয়ে। এই রুমে রাখালচন্দ্র মিজি বসত। সে পাবনায় আমারই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। তাকে ট্রেজারি অফিসার করা হল ।

এক পর্যায়ে সাদাত এলে তাকে মনসুর সাহেবের একান্ত সচিব করা হল । ধীরে ধীরে কামাল, ওয়ালি, কমল সিদ্দিকী এই রকমভাবে আমরা গুছিয়ে নিলাম সরকার। এরপর শুরু হল তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নির্দিষ্টভাবে কাজের পর্ব। আমি প্রায়ই বিভিন্ন প্রশ্নাদি করি, তো একদিন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "নূরুল কাদের সাহেব, আমি তো সরকার সম্বন্ধে বেশি কিছু জানিটানি না, তাই মনে হয় আপনার ওপর যথেষ্ট নির্ভর করতে হবে।' আমাকে একটুখানি সন্তোষ দেবার মত করে বললেন, 'অবশ্য আমি চেষ্টা করছি কিছু সিনিয়র লোকজনকে নিয়ে আসতে। খবরটবর পাঠানোর চেষ্টা করছি। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকেই কাজ করতে হবে।' আমি বললাম, "স্যার, আমার জানপ্রাণ হাজির।' খুব ভাল মুডে ছিলেন তিনি, বললেন, 'আপনার সাথে কথা হোক, আপনি আমাকে আমাদের সরকারের প্রশাসনিক দিকটা বুঝতে সাহায্য করুন, আমি আপনাকে রাজনীতি শেখাব।' আমি বললাম, 'স্যার, আপনাকে কী শেখাতে পারব জানি না, কিন্তু আমি যদি আপনার কাছ থেকে রাজনীতির দীক্ষা পাই তাহলে আমি ধন্য হয়ে যাব।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, আমি যখন দেশ স্বাধীন হবার পর চাকরি ছাড়লাম তখন আমার ইস্তফা চিঠির ড্রাফটা তাজউদ্দীন সাহেব করে দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'নূরুল কাদের, আমি তোমাকে (ততদিনে তিনি 'তুমি' বলেন খুব ঠকিয়েছি।' আমি বললাম, 'কী রকম?' বললেন, 'তুমি তো আমাকে সরকার শিখিয়েছ, আমি তো তোমাকে রাজনীতি শেখাইনি।' আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'এখনই তো শেখাবেন। আমি তো চাকরি ছাড়লাম, এখনই তো শিখব।' তিনিও হেসে বললেন, 'আচ্ছা।' এরকম সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর সাথে আমার ।

তাজউদ্দীন সাহেবকে আমি কখনও উত্তেজিত হতে দেখিনি। এই যে আট মাস এক সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তবে দু'তিনটি ঘটনায় উনি উত্তেজিত হয়েছেন। প্রচণ্ড রেগেছেন, বিষণ্ন হয়েছেন । দুটো ঘটনার কথা আমার খুব মনে আছে—যে দিন মুজিব বাহিনী গঠনের খবরটা পেলেন, আর শিলিগুড়িতে আওয়ামী লীগের মিটিংয়ের আগে জহুর আহমদ চৌধুরীর সাথে উত্তেজিত আলাপ ।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার, সেটা হল, আমি কী করে জানতাম এই সমস্ত ঘটনা। আমি যে রুমটায় বসতাম, তা ছিল তাজউদ্দীন সাহেবের অফিস এবং শোবার ঘরের লাগোয়া। আমার ডানদিকে যে দরজাটা ছিল সেটা তাঁর বেডরুমের দরজা। এই দরজা সকাল ন'টার দিকে বন্ধ হয়ে যেত। ঠিক আমার পেছনে যে দরজাটা ছিল ওটা তাঁর অফিসের দরজা। অর্থাৎ তাঁর ছোট্ট অফিসের তিনটা দরজা ছিল। একটা শোবার ঘর থেকে অফিসে ঢোকার, একটা ছিল বাইরে থেকে ঢোকার, আর একটা দরজা ছিল আমি যেখানে বসতাম ঠিক আমার পিঠে খুলত। এই দরজাটা বন্ধ থাকত না, একটু খোলা থাকত। আমি একবার তাজউদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এই দরজাটা খোলা রাখেন কেন ?' বললেন, 'একাধিক কারণে। একটা তো সাক্ষি রাখা দরকার, অনেক কিছুরই সাক্ষি রাখতে হয়। দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তার দরকার আছে। বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা আছে তারা তো আছেই, এখানে তুমি আছ।' তিনি আমার উপর নির্ভর করছেন, আমার খুব ভাল লাগল।

একদিন সেই দরজাটা ভেজানো ছিল, কানে এল তাজউদ্দীন সাহেব বলছেন, 'আপনি কি মনে করেন একসঙ্গে দুটি বাংলাদেশ হবে ? আপনাদের যদি আপত্তি থাকে আমার নেতৃত্বে বা প্রধানমন্ত্রী হওয়াতে তা হলে কাউন্সিল মিটিং ডাকুন, আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনুন। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। অতএব গণতান্ত্রিকভাবে আমার বিরোধিতা যদি করতে পারেন তবে তা সরাসরি করুন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই অফিস থেকে যে আদেশ জারি করা হবে সেটা সবাই মানতে বাধ্য।' ভীষণ জোরে উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা। সম্ভবত জহুর আহমদ চৌধুরী আগরতলা থেকে কোন ধরনের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। যে মানুষটি তাঁর অসীম ধৈর্যের সাথে নিজেকে সংযত রাখেন সেই মানুষটি জহুর সাহেবের সাথে আকস্মিক আবেগপূর্ণ আচরণ করলেন । এই ঘটনার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাজউদ্দীন সাহেব কোন কাজ করতে পারছিলেন না।

শেখ মণি এবং কয়েকজন মিলে জহুর ভাইয়ের মাধ্যমে একটা প্যারালেল সরকার ধরনের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। এই ঘটনাটি একটু আগেই আমি শুনেছি, তাই সাহসে ভর করে তাজউদ্দীন সাহেবকে বললাম, 'স্যার, আপনারা একটু অন্য পথ ধরেন না।' বললেন, ''কী রকম ?' 'স্যার, মনে করুন, আমি যদি অসুস্থ হয়ে ক'দিন না থাকি তাহলে আপনার কিছু তো অসুবিধা হবে, আসাদুজ্জামান না থাকলে মনসুর সাহেবের অসুবিধা হবে, ঠিক তেমনি কিছু

লোককে অন্য কাজে নিয়োগ দিয়ে ওই জায়গা থেকে সরিয়ে নিলে ওদেরও অসুবিধা হবে, জোর কমে যাবে।'

আমার ধারণা হল তাজউদ্দীন সাহেব এতে সায় দিলেন। আমি কথাটাকে কেন্দ্র করে কাজে নেমে গেলাম। আমি কলকাতার বাইরে চলে গিয়ে লোকজনদের বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দিতে শুরু করলাম। ড. মল্লিককে বললাম, "আপনি এখানে বসে কী করছেন, চলুন, প্রচুর কাজ রয়েছে ।' এম. আর. সিদ্দিকীকেও সাথে নিয়ে এলাম । মনে হল শেখ মণিদের পায়ের তলা থেকে মাটি খসে গেল । ড. মল্লিক, এম. আর. সিদ্দিকীসহ অনেককেই সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নানা দিকে পাঠিয়ে দেয়া হল ।

এদিকে রাশিদুল হাসানকে ক্যাবিনেট সচিব হিসেবে নিয়োগের পর একদিন সে বলল, "আমি তো পরিবার রেখে এসেছি, আমাকে একবার গিয়ে তাদের দেখে আসতে হবে।' আমি নিজে তাকে ফারাক্কা সেতু পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তিনচারজন মুক্তিযোদ্ধা ছেলেকে সাথে দিলাম ভেতরে নিয়ে যেতে এবং বললাম, "এরাই তোমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে, তুমি ওদের সাথে নদী পার হয়ে রাজশাহী যাও।' রাশিদুল হাসান ভেতরে গিয়ে রেডিওতে ঘোষণা দিয়ে ফেলল, মুক্তিযুদ্ধ নামে কিছুই নেই। সব একদম বাজে কথা। রাশিদুল এমন এক কাজ করে ফেলল যে, আমি তাজউদ্দীন সাহেবের সামনে ভীষণ লজ্জা পেলাম। তিনি শুধু বললেন, 'আমার ধারণা ছিল আপনার কলিগদের আপনি ভাল করেই চিনবেন।'

আমি যখন আগরতলা গিয়েছিলাম তখন তওফিক ইমাম বলেছিল, 'ঝিলু ভাই, তোমার ওখানে আমার জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা কর।' এখন রাশিদুলের এই ঘটনার পর আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে তওফিকের কথা বললাম । তওফিক চলে এল । আমাদের যে 'ইয়ুথ ক্যাম্প' হয়েছিল ছেলেদের ট্রেনিংয়ের জন্য, আমাকে তার সেক্রেটারি করা হয়েছিল। এর ফলে আমাকে ক্যাম্পে ক্যাম্পে যেতে হত। জোন তৈরি হয়ে গেছে, ১১টা জোনাল অফিস। সেখানেও যেতে হত। তারপর অন্যান্য কাজ তো ছিলই। তাই তওফিক এসে কাজে যোগ দেয়ায় ক্যাবিনেটের সাথে আমার কাজের চাপটা একটু কমে গেল ।

এর মধ্যে তো আরও ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। যেমন অস্ত্র দেয়া বা ট্রেনিং দেয়া নিয়ে। কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণি সিংহ একবার আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, তাঁর দলের ছেলেদের আলাদা করে অস্ত্র দেয়া হোক। কিন্তু এদিকে

ক্যাবিনেটে আলোচনা হয়ে আছে, শুধু যারা আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র লীগপন্থী তাদের ট্রেনিং দেয়া হবে । মস্ত বড় একটা প্রশ্ন ছিল, যারা আওয়ামী লীগপন্থী নন বা অন্য দল করেন তাঁদের হাতে অস্ত্র গেলে দেশটা স্বাধীন হলে সেই অস্ত্রের কী হবে ? আমি তাজউদ্দীন সাহেবের মনোভাব জানতাম। তিনি সবসময় বলতেন, এই যুদ্ধ সার্বজনীন। এ কারণেই আমি মণি সিংকে বললাম, 'বাংলাদেশের যে কোন লোক, যে দেশের জন্য রক্ত দিতে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাকেই আমরা ট্রেনিং দেব। এই যুদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু এটি সার্বজনীন যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এই যুদ্ধে প্রতিটি বাঙালির অধিকার আছে।'

আমার সমস্ত কথা শুনে তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'বলে তো এসেছ, কিন্তু এটা কি সরকারের সবাই মেনে নেবেন ?' আমি বললাম, 'স্যার, আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এমন একজনকে পেয়েছি যিনি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। নিশ্চয়ই তিনি ক্যাবিনেটকে মানিয়ে নিতে পারবেন।' এরপর বোধ হয় ন্যাপ সভাপতি মোজাফফর সাহেব তাঁর সাথে দেখা করেছেন। তারপর যে ক্যাবিনেট মিটিং হল সেখানে তাজউদ্দীন সাহেব খুব জোরের সাথে বললেন, 'এই যুদ্ধ আমাদের সবার যুদ্ধ। যুদ্ধে যদি শুধু আমাদের ছেলেদের মধ্যেই অস্ত্র এবং ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিকে দেশের জন্য কাজ করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছি। মুক্তিযুদ্ধ একটা সার্বজনীনতা লাভ করেছে, এই মুহূর্তে যদি আমরা সে দিকে খেয়াল না রেখে দুটো ধারার সৃষ্টি করি তাহলে মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশপ্রেমের যে অন্তর্নিহিত শক্তি তাকে খর্ব করা হবে, বিভক্ত হয়ে যাবে এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য যে একাত্মতার প্রয়োজন তা নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থহানি হয় এমন কিছু করা ঠিক হবে না।' শেষ পর্যন্ত তাজউদ্দীন সাহেব মানিয়ে নিতে পারলেন, তাঁর সরল যুক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রবল একাগ্রতার কারণে ।

ছোটবেলায় দেখেছি, আমের মৌসুমে মা আমের মোরব্বা বানান। সব কাজের মেয়েরা এক হয়ে রুটি বেলার পিঁড়ির উপর আমের টুকরাটাকে কেঁচতো । মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দিন সাহেবের অবস্থা দেখে আমার সেই ঘটনাটা মনে হয়েছে। প্রতি মুহূর্তেই তাজউদ্দিন সাহেবকে যেন সবাই কুপিয়েছে। কোন কাজই সুন্দরভাবে মসৃণভাবে হতে দেয়নি। মন্ত্রীরা বিভক্ত ছিল অনেকগুলো ভাগে। তাজউদ্দীন সাহেবকে সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়েছে। ধৈর্য, সহনশীলতার সাথে মূল লক্ষ্যপথে এগিয়ে গিয়েছেন

তিনি। তাঁর একটাই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য: যুদ্ধে জয়লাভ করা, জয়ী হওয়া । দেশ থেকে যারা শরণার্থী হয়ে এসেছে তাদের সাথে নিয়ে দেশে ফেরা। যারা পাক বাহিনী দ্বারা নির্যাতিত তাদের নির্যাতন থেকে মুক্ত করা । একটা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি করা।

এমন কতদিন হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বাথরুমে জলচৌকিতে বসে শার্ট ধুচ্ছেন, কাপড় ধুচ্ছেন, আমি হয়ত দরজার পাশে টুলের উপর বসে বা চেয়ারে বসে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। আমি ফাইল পড়ে শুনাচ্ছি, তিনি বলছেন, এটা কর, ওটা কর । আমরা পরামর্শ করছি, আবার তিনি শুনছেন ।

এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা এমনিভাবে আলোচনা চলতো। একটা দেশের প্রাইম মিনিস্টার নিজ হাতে কাপড় ধুচ্ছেন, একই সাথে কাজ চলছে—তাজউদ্দীন সাহেব আসলে এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন!

আমি একটা জিনিস পুরো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লক্ষ্য করেছি, তাজউদ্দীন সাহেব সবসময় বলতেন, ‘আমি যে দায়িত্বে অর্পিত হয়েছি', 'আমার উপর যে দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে'—অর্থাৎ তিনি কখনও বলতে চাননি যে আমি এটা করছি। তিনি বলতেন, আমি একটা নিমিত্ত মাত্র। শেখ সাহেবের প্রতি ওঁর যে শ্রদ্ধা, যে ডেডিকেশান এবং বিশ্বস্ততা ছিল তা বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা থেকে জানবার এবং বুঝবার সুযোগ হয়েছিল। আমার মনে হত তিনি কখনও 'আমি' বলতেন না এইজন্য যে তাঁর মনোভাব ছিল, এটা মুজিব ভাইয়ের কাজ, আমি তাঁর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করছি মাত্র। আমি আদিষ্ট হয়ে কাজ করছি, এই ভাবটা সবসময় তাঁর মধ্যে ছিল ।

আমি যখন আগরতলা গিয়েছিলাম তখন কাজের চাপটা একটু কমে গেল । আমি ইয়ুথ ক্যাম্পের সাথে কীভাবে জড়িয়ে গেলাম এর পেছনের ইতিহাসটা একটু বলে রাখি। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হোসেন আলি সাহেব আমাকে বাংলাদেশ মিশনে ডেকে নিলেন । ড. ত্রিগুণা সেন আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন শ্রীমতি গান্ধীর নির্দেশে বিস্তারিতভাবে বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে তিনি আগরতলায় গিয়েছিলেন । এখন ইয়ুথ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং কীভাবে দেয়া হবে, অস্ত্র কাকে দেবে, কতটা দেবে, কোন্ পর্যায়ে দেবে, কী পদ্ধতিতে দেবে, এসব নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ভারতের সীমানায় অস্ত্র দেয়া হবে এটা তো চাট্টিখানি কথা

নয়, ভারতের নিজেরও তো অনেক ধরনের সমস্যা আছে । তারপর আছে, কতজন মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দেয়া হবে । ড. সেন একটা ধারণা দিলেন যে, দুই-তিন শ করে যুবককে একত্রিত করে ট্রেনিং দেয়া হবে, তারপর একটা পর্যায়ে বড় বাহিনী হবে ।

আমি এটুকু শুনে বললাম, 'কত বছর আপনারা আমাদেরকে রাখবেন ? এটা হয় না, কারণ আমাদের যদি এক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার প্রয়োজন হয়, আর আপনি যদি তিন শ করে ট্রেনিং দেন, তাহলে এক লক্ষ ট্রেনিং পেতে পেতে প্রথম ট্রেনিংপ্রাপ্তরা বুড়ো হয়ে যাবে। তাই এটা সম্ভব না।'

ড. সেন আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন । বললেন, "কী বলতে চান আপনি ?'

আমি বললাম, 'এটা ধীরেসুস্থে করার মত কাজ না। আমাদেরকে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।'

সন্ধ্যায় আলোচনার জন্য এক বাড়িতে বসার কথা জানিয়ে আমার কাছে ফোন এল । আমি ঠিকানামত গেলাম। গিয়ে দেখি হেনা ভাই (কামরুজ্জামান সাহেব), প্রফেসর ইউসুফ আলি, ড. ত্রিগুণা সেন এবং ভারতীয় দু'তিনজন আছেন। অনেক আলাপ-আলোচনা হল । দু'পক্ষই কথা বললাম । আমি খুব ধারালোভাবেই বলে ফেললাম, 'আমাদেরকে সাহায্য যদি করতেই হয়, এমনভাবে সাহায্য করুন যেটা আমাদের কাজে লাগে । তিনশ-পাঁচশ করে ট্রেনিং দেবেন, এটা কি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা নাকি ?

পরদিন তাজউদ্দীন সাহেব ডেকে বললেন, 'নূরুল কাদের, কথাবার্তা একটু সামলে বলা দরকার। আপনাকে নিয়ে আমার নানারকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় । সবাই বলে আপনার নূরুল কাদের এই বলেছে সেই বলেছে, বিভিন্ন রকম অভিযোগ।' আমাকে তিনি কিছু ধমক দিলেন, আবার বোঝালেনও। আসলে তাজউদ্দীন সাহেব জানতেন আমি খুব সহজেই রেগে যাই, তখন কথা বেশি বলে ফেলি এবং তা কাটা কাটা কথা । তাই তিনি যতটুকু পারতেন উপদেশের মাধ্যমে আমাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতেন।

এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পর এক সন্ধ্যায় তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে বললেন, 'এখনই দমদম বিমানবন্দরে যেতে হবে।' সেই রাতেই আমি দিল্লী গেলাম । ড. ত্রিগুণা সেন আমাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর

কাছে নিয়ে গেলেন। বেশ অনেকটা সময় কথাবার্তা হল, তিনি নিজ হাতে টি পট থেকে কাপে চা ঢেলে দিলেন । সবশেষে বললেন, 'আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইয়োর স্পিরিটস্ হুইচ ইজ টু বি আওয়ার কনসিডারেশন।' কলকাতায় ফিরে এলাম। আমাকে ইয়ুথ ক্যাম্পের সেক্রেটারির দায়িত্ব দেয়া হল । ভারতীয় দিক থেকে অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল টি. এন. লুথারা আমার সঙ্গে রইলেন ।

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা বিভক্ত ছিলেন অনেকগুলো ভাগে। খন্দকার মোশতাকের দিক থেকে হুমকি ছিল প্রতি পদে। মুজিব বাহিনী ছিল আর এক দিকে । তারপর কত রকম যে রেষারেষি। একসময় তাজউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হল আস্থা প্রমাণের জন্য। এই উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে সম্মেলন ডাকা হল । তাজউদ্দীন সাহেব সত্যের পথে ছিলেন, সবাই তাঁর পক্ষেই রায় দিল । সম্ভবত মূল সম্মেলনের পর নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে প্রায় দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রী হওয়া নয়। আমার উদ্দেশ্য দেশ স্বাধীন করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষিত স্বাধীনতা অর্জন করার লক্ষ্যে আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, আমি কেবল সেই দায়িত্বই পালন করছি। এক্ষেত্রে আমাকে যে ভূমিকাই দেয়া হোক আমি আমার দায়িত্ব পালন করবই।'

সেখানে আমলাদের ভূমিকা নিয়েও কথা উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'একটা যুদ্ধে যে মশালচি তারও একটা ভূমিকা থাকে। যে যোদ্ধাদের জন্য রান্না করে সেও তার অবদান রাখছে । পেছন লাইনে দাঁড়িয়ে যে সেবা করে তারও ভূমিকা আছে। অতএব শুধু বন্দুক ফোটালেই যুদ্ধ হয়, তা কিন্তু না। এই বন্দুক ফোটানোর সময়টা খুব সংক্ষিপ্ত সময়। এই সময়টাকে মঞ্চস্থ করতে যে প্রস্তুতি, যে সমর্থন প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে আজ যাঁদের আমলা বলে গালি দেয়া হয় তাঁদেরও কিন্তু খানিকটা মূল ভূমিকা রয়েছে। কাজেই মুক্তিযোদ্ধা বলে যখন কাউকে সম্মান করা হবে তখন একদিকে যাঁরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন তাঁরা যেমন সম্মান-মর্যাদা পাবার অধিকারী, তেমনি আজকের এই আমলারা যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগান দিয়েছেন তাঁরাও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মান পাবার অধিকারী হবেন।' এই ছিলেন আমাদের তাজউদ্দীন সাহেব। তাই বলছিলাম তাজউদ্দীন সাহেবকে নানা ধরনের বাধার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলি । ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। ১৭ তারিখ সকালবেলা প্রধানমন্ত্রী আমাকে তাঁর

অফিসরুমে ডেকে নিলেন । বললেন, ‘‘কাল সকালে তুমি ঢাকা যাবে । তুমি প্রশাসন নিয়ে যাচ্ছ। তাই তোমাকে সব সময় খুব বেশি রকম শান্ত থাকতে হবে। তোমার মধ্যে কোন উগ্রতা যেন স্থান না পায়। তুমি স্বাধীন বাংলাদেশে যাচ্ছ, সেখানে তোমাকে সরকারের নীতি-আদর্শ তুলে ধরতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইউ মাস্ট অলওয়েজ রিমেমবার, অ্যাট নো পয়েন্ট দ্য ক্রেডিট শুড বি গিভেন টু এনিবডি আদার দ্যান শেখ মুজিবুর রহমান। এটা আমার আদেশ। একটা জিনিস মনে রেখ, এই যে যুদ্ধপ্রচেষ্টা, যত আন্দোলন-সংগ্রাম, সমস্ত কিছুই হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে অগ্রভাগে রেখে, তাঁরই আদর্শে, তাঁরই নির্দেশে। আমিও আমার কর্তব্য পালন করেছি তাঁকে সামনে রেখেই আদিষ্ট হয়ে । অতএব যখন সরকারের নীতি-আদর্শের কথা বলবে, মনে রেখ, তাঁর সম্মান, কৃতিত্ব থাকবে সবচাইতে উপরে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পতাকা বহন করে নিয়ে যাবে তুমি। আমরা সে দায়িত্ব তোমাকে দিচ্ছি। এ কাজে ইতিহাস তোমাকে সম্মান দেবে। তুমি যাও ।’

মনে আছে, ৮ জানুয়ারি ১৯৭২, বঙ্গভবনে তাজউদ্দীন সাহেবের টেবিলের পাশে বসে আমি কাজ করছি, টেলিফোন বেজে উঠল। আমি রিসিভার তুলতেই অপারেটারের কণ্ঠস্বর, ‘প্রধানমন্ত্রীকে দিন, লন্ডন থেকে কল, বঙ্গবন্ধু। আমি চিৎকার করে উঠলাম, ওই পাশ থেকে ভেসে এল, ‘তাজউদ্দীন ?' আমি দ্রুত রিসিভারটা তাজউদ্দীন সাহেবকে দিলাম । তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে, অত বড় একজন মানুষ, যুদ্ধবিজয়ী প্রধানমন্ত্রী— দরদর করে চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। ঠিকমত কথাও বলতে পারছেন না । জানি না হয়ত ওপাশেও একই অবস্থা। কথা শেষ করে আমাকে রিসিভারটা দিয়ে বললেন, ‘কলটা ভাবীর বাসায় ট্র্যান্সফার করে দাও।' আমি তাই করলাম । তিনি বোধ হয় নিজেকে সংযত করার জন্য চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। আমি তাঁর ইমোশান দেখে হতবাক হয়ে বসে আছি। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'ডাকো না, সবাইকে ডাকো!' তারপর হৈচৈ পড়ে গেল । আলোচনা হচ্ছে, কথাবার্তা হচ্ছে, কীভাবে অভ্যর্থনা জানানো হবে, কীভাবে কী করা হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা করার বিষয় নিয়ে এই মিটিংগুলোতে আমি লক্ষ্য করেছি, মনে জমা করে রাখা যে একটা আক্রোশ বা চাপা দিয়ে রাখা মনের যে ভাব সেটা অনেকের মধ্যেই প্রকাশ পেল এবং আমি আরো খেয়াল করলাম, এই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে তাজউদ্দীন সাহেব প্রথমবারের মত কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন । অভ্যর্থনা জানানোর বিষয়টিকে ছাপিয়ে বঙ্গবন্ধু ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রী হবেন,

না রাষ্ট্রপতিই থাকবেন সে বিষয়টিই বারবার আলোচিত হতে লাগল। রাত তখন গভীর । মিটিং চলছে । আমি এক পর্যায়ে বলেই ফেললাম, 'আমাদের হাতে সময় নেই, অভ্যর্থনার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এইসব আলোচনা তো পরেও করা সম্ভব । আর তিনি (বঙ্গবন্ধু) ফিরে আসুন, তাঁরও তো মতামত আছে।'

তাজউদ্দীন সাহেব আমার হাতটা খপ্ করে ধরে প্রায় জোর করে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন । প্রচণ্ড ধমক দিলেন । আমি এভাবে কোনদিন তাঁর কাছ থেকে বকা খাইনি ।

তিনি শান্ত হলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্যার, আমি কি ভুল করেছি ?' বললেন, 'তুমি ভুল বলনি, কিন্তু ওরা ভুল বুঝবে।'

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন। তার পরদিন তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, "হি হ্যাজ ডিজায়ার্ড টু বি দা প্রাইম মিনিস্টার এবং আমি তাঁকে তা দিয়ে দিচ্ছি।' আমার এখনও চোখে ভাসে, ১২ জানুয়ারি '৭২ বঙ্গভবনের দরবার হলের ডান দিকের বসবার সারিতে তাজউদ্দীন সাহেব বসা। উৎফুল্ল মানুষটি।

তাজউদ্দীন সাহেবের মৃত্যুসংবাদটা আমি বিদেশে যাবার পথে প্লেনের মধ্যে খবরের কাগজে পড়ি। আমার বাবা তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই সংবাদে আমার মনে হয়েছিল আমি সম্পূর্ণভাবে এতিম হয়ে গেলাম। তিনি আমার জন্য ছিলেন যেন রাজনৈতিক পিতা, অন্তরে আরো কী ছিলেন বোঝাতে পারি না। কামরুজ্জামান সাহেব, নজরুল সাহেবের সাথে পরিচয় ছোটবেলা থেকে, মনসুর সাহেবও আগে থেকে পরিচিত। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে যে রাজনৈতিক শিক্ষা, দর্শন, ধ্যানধারণা পেয়েছি তা আর কারো কাছ থেকেই পাইনি। আমি যেন তাঁর কাছ থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলাম ।

[২৯.০৯.১৯৯৬]

মোহাম্মদ নূরুল কাদের : মোহাম্মদ নূরুল কাদের খান। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব, পরে ব্যবসায়ী। ১৯৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন ।

ম. ওয়াহিদুজ্জমান

তাজউদ্দীনের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৪১ সালে। সেই বছর আমি ঢাকা মুসলিম বয়েজ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে ভর্তি হই ক্লাস নাইনে। তাজউদ্দীন নাগরী সেন্ট নিকোলাস ইন্সটিটিউশান থেকে এসে এই স্কুলেই ক্লাস এইটে ভর্তি হয়। আমরা ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলে একই রুমে থাকতাম ।

পড়াশোনায় সে ছিল এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি ব্রিলিয়ান্ট। তার ছিল প্রখর স্মরণশক্তি। তার যা পড়াশোনা সে তা ক্লাসেই পড়ে আসত। এর বাইরে তাকে আমি ক্লাসের বই নিয়ে খুব বেশি পড়তে দেখিনি। যেমন, সন্ধ্যায় রিডিং রুমে এক টেবিলেই আমরা দু'জন পড়তে বসতাম । তাজউদ্দীন বই নিয়ে চার-পাঁচ মিনিট পড়েই বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু রাত দশটায় বেল না বাজা পর্যন্ত আমাদেরকে রিডিং রুমেই থাকতে হত । আর পরীক্ষার সময় দেখা যেত প্রতিটি বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে তাজউদ্দীন ।

অদ্ভুত রকমের মেধা ছিল তার । আমি আমার এই জীবনে এমন মেধাসম্পন্ন জ্ঞানী ছাত্র আর দেখিনি । একবারের বেশি কোন বই পড়তে হয়নি তার । শুধু একবার চোখ বুলালেই বুঝে ফেলত সব ।

স্কুলের প্রতিটি শিক্ষক তাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। মনে আছে, ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে আমাদের স্কুল থেকে আমরা আহসান উল্লাহ স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং দেখতে গেলাম (বর্তমান বুয়েট)। ফিরে আসার পর সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার বললেন, 'তোমরা আজ যা দেখে এলে সেই বিষয়ে কিছু লিখে আমাকে দেখাও ।' আমরা সবাই ইংরেজিতে লিখলাম। তাজউদ্দীন ইংরেজিতে যা লিখল তা পড়ে স্যার বললেন, "ইংরেজিতে এমএ পাশ করে কোন শিক্ষকও এমন লিখতে পারবেন কিনা ভাবতে হবে।' আমরা সবাই তার ওই লেখাটা পড়লাম ।

আমাদের স্কুলের শিক্ষকদের সাথে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, এ সমস্ত নানা বিষয় নিয়ে তাজউদ্দীনের তর্ক হত। শিক্ষকরা তার সম্পর্কে বলতেন, অদ্ভুত রকমের মেরিটোরিয়াস ছেলে ।

হোস্টেলে আমাদের সব কিছু ছিল আর্মির নিয়মের মত। নামাজ পড়া ছিল বাধ্যতামূলক । নামাজ না পড়লে খাবার দেয়া হত না। সব কিছুতেই ছিল

বেশ কড়াকড়ি। কিন্তু আমাদের প্রধান শিক্ষক এবং হোস্টেল সুপার একমাত্র তাজউদ্দীনকেই অনুমোদন দিয়ে দিতেন দিনে হোক রাতে হোক বাইরে যাবার। আমাদের হোস্টেল সুপার ছিলেন অম্বর আলি সাহেব। অত্যন্ত কড়া মানুষ । তিনি আমাদেরকে ইংরেজি পড়াতেন। তিনি তাজউদ্দীনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। জ্ঞান-বুদ্ধি আচার-আচরণে তিনি তাজউদ্দীনকে এতটাই পছন্দ করতেন যে মাঝে মাঝে তাঁকে ইংরেজি সিনেমা দেখার জন্য অনুমতি দিতেন। ভাল ছবি এলে তিনি নিজেই তাজউদ্দীনকে ছবি দেখতে পাঠিয়ে দিতেন । ক্লাস নাইন থেকে তাজউদ্দীন সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৪২- ৪৩-এর দিকে কলতা বাজারে মুসলিম লীগের অফিস ছিল। সে সেই অফিসে যেত। আমার আজও ভাবতে অবাক লাগে সে যখন মাত্র ক্লাস নাইনের ছাত্র, তখনই সে আমাদেরকে বলত, “জিন্নাহ্ সাহেব পাকিস্তানের কথা বলছেন, কিন্তু এই পাকিস্তান কোনদিনই ভায়াল হবে না । কিছুতেই টিকবে না এই পাকিস্তান ।' তাজউদ্দীনের আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, সে প্রায়ই জজ কোর্টে যেত। সেখানে বসে দুই পক্ষের আরগুমেন্ট শুনত। এটা ১৯৪২ সালের কথা ।

জজ সাহেব যে দিন ডেপোজিশন পড়ে শোনাতেন সেই দিন ফিরে এসে কখনও কখনও বিষয়টি আমাকে বলে বিশেষ কোন শব্দ বলত যে, জজ সাহেব যদি এই শব্দটা না ব্যবহার করে ওই শব্দটা ব্যবহার করতেন তবে ভাল হত ।

আমি তার এই কোর্টে যাওয়া-আসা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে যেতাম। একবার তাকে বললাম, ‘যা, তুই ল'ইয়ার হয়ে যা।' সে বলেছিল, ‘হ্যাঁ, আমি ল’ইয়ারই হব ।'

আমি আগেই বলেছি, তাজউদ্দীনের এই বাইরে যাওয়া-আসায় স্কুল কোন সময়ই বাধা দেয়নি ।

আমরা যারা হোস্টেলে ছিলাম তাদের অনেকেরই আত্মীয়স্বজন হোস্টেলে আসত দেখা করতে । তার মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ-এমএ-র ছাত্র। এই সমস্ত ছাত্রদের সাথে এই স্কুলছাত্র তাজউদ্দীন কথা বলত। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। আমি কিন্তু কাউকেই তার যুক্তির কাছে পেরে উঠতে দেখিনি।

আমাদের স্কুল জীবনের এই সময়টাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এই সময় তাজউদ্দীন সিভিল ডিফেন্সের ট্রেনিং নেয় । আমার আর এক বন্ধু বজলুল হাসান, সেও ট্রেনিং নিয়েছিল। পোশাক পরে সারা রাত ডিউটি দিতে হত । সকালে ওরা ফিরত। তাজউদ্দীনদেরকে সম্ভবত হোম গার্ড বলা হত । ওরা পারিশ্রমিক পেত । এছাড়াও তাজউদ্দীন বয়স্কাউট হিসেবে স্কাউট আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল ।

তাজউদ্দীন ছিল ভীষণ স্ট্রেটফরোয়ার্ড। ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ভাল। কথাবার্তা যা বলবে সামনাসামনি । কিন্তু উচিত কথায় কাউকে সে ছাড়ত না। ১৯৪২ সালের শেষের দিকের একটি ঘটনার কথা বলি । তাজউদ্দীনসহ আমরা সবাই একসাথে ফুটবল-ভলিবল খেলতাম নিয়মিত। আমাদের হোস্টেলের একটা টিম ছিল। স্কুলেরও একটা টিম ছিল। একবার আমরা নিজেরা চাঁদা তুলে হোস্টেলের টিমে খেললাম। স্কুলের টিমে ওই দিন আর খেলতে পারিনি, স্কুল টীম হেরে যায়। আমি ছিলাম টীম লিডার, আমার হাতে চ্যাম্পিয়নশিপ কাপ। আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার আবদুর রহমান সাহেব অঙ্ক শিক্ষকের পরামর্শে আমাকে খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি যে স্কুলের টিমে খেল নাই, আমরা তো বদদোয়া করব। শিক্ষকের কথা না শুনলে পরীক্ষায় কি ভাল হবে! এখনই তোমাদের চ্যাম্পিয়নশিপ কাপ সারেন্ডার করতে হবে।' আমার সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা, বদদোয়ার কথা শুনে আমি হেড স্যারের কাছে আমাদের কাপটা ফিরিয়ে দিলাম ।

পরে তাজউদ্দীন আমার কাছ থেকে সব শুনে বলল, ‘এসব শিক্ষকের অনর্থক বদদোয়া কোন কাজে আসে না। এতে আরো ভাল হবে।' পর দিন তাজউদ্দীনকে অঙ্ক ক্লাসে অঙ্ক শিক্ষক শাহাবুদ্দিন সাহেব আমার প্রসঙ্গ তুলে অনেক কিছু বললেন। তাজউদ্দীন স্যারকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, হোস্টেলে আগে থেকেই একটা খেলার টিম ছিলই, কিন্তু স্কুল থেকেও তো বলা হয়নি তোমরা এই চ্যাম্পিয়নশিপে স্কুলের পক্ষে খেলবে। তাই হোস্টেল টিমের তো এখানে অন্যায় হয়নি। তাজউদ্দীন এমনও বলেছিল, 'স্যার, হোস্টেলে তো মাত্র ত্রিশ-চল্লিশটা ছেলে, ওদেরকে দেখার কেউ নেই, কিন্তু স্কুলের তো অনেক লোকজন আছে এবং কাপ নিয়ে নেয়া সঠিক হয়নি।' এই পর্যায়ে স্যার বললেন, ‘আমি প্রধান শিক্ষক হলে তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করতাম।' তাজউদ্দীন আর সহ্য না করতে পেরে বলে ফেলে, ‘এই জন্যই তো আপনার মত লোক হেডমাস্টার হয়নি।' এরপর ভীষণ তর্কাতর্কি হল । তাজউদ্দীন

ক্লাস টেনের শুরুতে স্কুল ছেড়ে দিল। হোস্টেল ছেড়ে কলতা বাজারে একটা মেসে উঠল। এই মেসের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন কলেজিয়েট স্কুলের একজন শিক্ষক ।

আমাদের হোস্টেল সুপার অম্বর আলি সাহেব কিন্তু তাজউদ্দীনকে বলেছিলেন এই হোস্টেলেই থাকতে, কারণ সেন্ট গ্রেগরীর আর একটি ছেলেও এই হোস্টেলে ছিল। কিন্তু তাজউদ্দীন আর রাজি হয়নি। বলেছিল, 'স্যার, আমি আর এখানে থাকবই না ।'

তাজউদ্দীনের সাথে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়। সে আমাকে কলতা বাজারের মেসে নিয়ে যায়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী খবর তোর, কোথায় পড়ছিস ?' সে বলল, 'আমি সেন্ট গ্রেগরীজ হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। সেখানে ব্রাদারের সাথে কথা বলেছিলাম, তিনি আমাকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে বললেন। আমি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম।' সেই সময় সেন্ট গ্রেগরীজের ইংরেজির বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন এস. দাসগুপ্ত। তিনি অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে খাতা দেখতেন। সেখানেও তাজউদ্দীন ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ৮০ নম্বর পেয়েছিল ।

ওর কলতা বাজার মেসে আমি দু'চারবার গিয়েছি। তখনও দেখেছি তার সেই একই চিন্তা, দেশ কেমন করে আরো উন্নত হবে, মানুষের কীভাবে আরো ভাল হবে, রাত-দিন শুধু এই সমস্ত পরিকল্পনা। তাজউদ্দীন সব সময় তার এই সমস্ত চিন্তাভাবনা নিয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলত। একবার আমি তাকে বলেছিলাম, 'এইসব চিন্তা কম করে ভাল করে লেখাপড়া কর, পরীক্ষায় তো ভাল করতে হবে।' সে বলেছিল, 'পরীক্ষায় ভাল করার আমার দরকার নেই । পড়া যা বুঝি তাতেই হবে, কিন্তু দেশের জন্য কাজ আমাকে করতেই হবে।'

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর তাজউদ্দীনের সাথে আমার দীর্ঘদিন যোগাযোগ ছিল না। তাজউদ্দীন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বোর্ডে ১২তম স্থান লাভ করে ।

১৯৫০ সালে ফজলুল হক হলে তার সাথে আমার আবার দেখা হয়। সেই সময় ইতিহাসের একজন প্রভাষক ছিলেন এম. এস. চৌধুরী, (যিনি পরবর্তীতে সিএসপি অফিসার এবং সচিব ছিলেন)। আমি তাঁর রুমে থাকতাম। তিনি ম্যাট্রিকের খাতা দেখতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন একজন লোক

ঠিক করে দিতে যে ওই খাতা দেখে দিতে পারবে। আমি তাজউদ্দীনের কাছে খাতাগুলো নিয়ে গেলাম। তাজউদ্দীনের সাবসিডিয়ারি ছিল ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান । এম. এস. চৌধুরী তাঁর সাবসিডিয়ারির শিক্ষক ছিলেন। যাই হোক, তাজউদ্দীন খাতাগুলো দেখে ফিরিয়ে দিলে এম. এস. চৌধুরী অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর খাতা দেখার ধরন, মার্কিং, সমস্তই অত্যন্ত চমৎকার। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলেটি কে ?' আমি তাজউদ্দীনের কথা বললাম । তখন তিনি বললেন, 'হেড এগজামিনারও বলেছেন এই খাতা দেখেছে কে, চমৎকার দেখা হয়েছে। কোন একটা নম্বর এদিক-সেদিক হয়নি।'

স্কুলে তাজউদ্দীন যেমন দেখেছি সারাক্ষণ মানুষ আর রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকত, বিশ্ববিদ্যালয়েও তার একই অবস্থা। হয়ত দেখা গেল ছাত্ররা কোন একটা কিছু নিয়ে আন্দোলন করছে, ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে দরখাস্ত, লিখতে হবে, এখন দরখাস্তটা কে লিখে দেবে ? লিখে দিচ্ছে তাজউদ্দীন। কী চমৎকার তার ভাষা, আর কী সুন্দর যুক্তি দিয়ে সে লিখত, সত্যিই তা ছিল অনন্য। তাছাড়াও ছাত্র আন্দোলনের লিফলেট এবং অন্যান্য সমস্ত লেখা সে লিখে দিত। হল প্রোভস্টের কাছে কোন দাবি নিয়ে যাওয়া, সেখানেও মূল ভূমিকা ছিল তাজউদ্দীনের। তাজউদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ক্লাসের ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এমএলও নির্বাচিত হয়। আমি তখন সরকারি চাকুরি করি। আমার চাকুরিস্থল নেত্রকোনা। আমি নেত্রকোনায় কাজে যোগ দেয়ার মাত্র ছয় মাসের মাথায় আমার নর্থ বেঙ্গলে বদলির আদেশ হল । আর সেই সময় আমি প্রচণ্ড অসুস্থ, মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে অপারেশন হবে আমার । আমি অনেক চেষ্টা করলাম, দরখাস্ত লিখলাম, কিন্তু আমার বদলির আদেশ বহাল রইল। আমি শেষে তাজউদ্দীনের কাছে গেলাম। তাজউদ্দীনের একটা ব্যাপার ছিল, কেউ কোন অন্যায় আবদার নিয়ে তার কাছে যেতে পারত না, সে যত আপন লোকই হোক না কেন । আবার যদি কোন কিছু যৌক্তিক হত, ন্যায্য হত, তবে একেবারে অপরিচিত হলেও সে চেষ্টা করত কাজটি করে দিতে । আমার শারীরিক অবস্থা দেখে তাজউদ্দীন বলল, "ঠিক আছে, আমি দেখছি । আতাউর রহমান সাহেব তখন চীফ মিনিস্টার। তাঁর রাজনৈতিক সচিব যিনি ছিলেন তিনি আমার বিষয়টি একটু শুনেই বলে দিলেন, কিছুই করা যাবে না । তাজউদ্দীন আতাউর রহমান সাহেবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল । আতাউর রহমান সাহেব অ্যাসেম্বলিতে ঢোকার সময় তাজউদ্দীন তাঁকে বলল, 'আপনার

সাথে আমার কথা আছে। এবং আপনি আমার কথা অর্ধেক শুনবেন, না পুরো শুনবেন সেটা আগে বলে নিন ।' আতাউর রহমান সাহেব তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "বলো তোমার কথা।' তাজউদ্দীন আমার বদলির বিষয়টি বলল এবং আমার বদলির আদেশ ওই দিনই বাতিল হয়ে গেল । তাজউদ্দীনের ব্যক্তিত্ব ছিল আকাশছোঁয়া ।

এরপর তাজউদ্দীনের সাথে আমার আবার দেখা ১৯৬২ সালে। আমি তখন বরিশালে। তাজউদ্দীন সেই সময় সম্ভবত কোন একটা লঞ্চ কোম্পানিতে কিছু দিন কাজ করেছিল। সেই কাজের সূত্রেই ঢাকা থেকে বরিশালে গিয়ে আমার বাসায় তিন-চার দিন ছিল। পরে শুনলাম স্পেশাল ব্রাঞ্চ তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে যে, তাজউদ্দীন বরিশাল গিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছে ।

তাজউদ্দীন যখন অর্থমন্ত্রী আমি তখন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে, সচিবালয়ে বসি। একদিন আমার সাথে তাজউদ্দীনের দেখা হলে সে আমাকে বলল, 'আমার কাছে আসিস না কেন ?' আমি বললাম, 'কেউ যদি একবার বোঝে তোর সাথে আমার সম্পর্ক তাহলেই বলবে এটা করে দাও, ওটা করে দাও, তাই যাই না ।' তাজউদ্দীন সাংঘাতিক কড়া এবং সুশৃঙ্খল মানুষ ছিল। অফিসের কাজের সময় তার নির্দেশ ছিল কেউ যেন তার কাজের সময় দেখা করতে না আসে। তার কাজের এবং দেখা-সাক্ষাতের সময় ভাগ করা ছিল ।

একবার আমি তাজউদ্দীনের সাথে দেখা করতে তার অফিসে গিয়েছি । তার রুমে তখন টাঙ্গাইলের একজন এমপি ছিলেন, তাই আমি পাশের রুমে বসা। ভেতর থেকে জোরে জোরে কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছিল । আমি শুনলাম তাজউদ্দীন বলছে, 'যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা সবাইকে দেয়া হয় তার চাইতে বেশি আপনাকে কেন দেয়া হবে ?' একটু পরে দেখলাম সেই এমপি ভদ্রলোক চলে গেলেন । আমি ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার ?' তাজউদ্দীন বলল, 'দেখ, ভারত ভ্রমণের জন্য যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেবার নিয়ম আছে তিনি এমপি বলে আরো বেশি দাবি করছেন, কিন্তু নিয়মের বাইরে কাজ তো আমি করতে পারব না। যদি তাঁর বিশেষ জরুরী প্রয়োজন থাকত তবে তা ভিন্ন কথা ছিল ।'

অন্যায় আবদার বা নিয়মবহির্ভূত কোন কাজের কথা কেউ বললে তাজউদ্দীন ভীষণ রাগ করত । সত্যি বলতে আমি কাজেকর্মে তার মত অসাধারণ চরিত্রের এবং শক্ত নীতি-আদর্শ অনুসরণকারী মানুষ জীবনে আর দ্বিতীয়জন

দেখিনি। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারি চাকুরিতে আমরা যারা তৎকালীন পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের অধীনে ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলাম তাদের সবার অনুরোধে আমাদের বেতন বৈষ্যম্যের বিষয় নিয়ে আমি তাজউদ্দীনের সাথে দেখা করি। বিষয়টি ছিল, আমরা যারা পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম তাদের বেতন ছিল দুই শ পঞ্চাশ টাকা, আর যারা ডেপুটেশনে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল তারা স্পেশাল পে হিসাবে পেত চার শ চল্লিশ টাকা। সেই একই বেতন কাঠামো বহাল থাকায় আমাদের দাবি ছিল, টাকার পরিমাণ কমিয়ে আমাদের সবার বেতন এক করে দেয়া হোক, না হয় আমাদের বেতন বাড়িয়ে দেয়া হোক, অথবা আমাদের পদোন্নতি দেয়া হোক—কারণ আমাদের জুনিয়র যারা তারা বেশি বেতন পাচ্ছে, এটা এক ধরনের বৈষম্য । তাজউদ্দীন সব শুনে বলল, 'এটা ওই সময় থেকে হয়ে এসেছে তাই চলছে, আমি বিষয়টি দেখছি।' আমি কথা বলে আসার দিন কয়েকের মধ্যে অর্ডার হয়ে গেল, আমাদের বেতন বেড়ে সমতা হল । তাজউদ্দীন সবসময় উচিত কাজকে যে কোনভাবে ন্যায়ের পক্ষে থেকে করে দিত। এর একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি আমি সব সময় যে, টেকনিক্যাল কোন বিষয় বুঝতে তার এক মুহূর্ত লাগত। অর্থাৎ, চট্ করে যে কোন বিষয়কে সে বুঝে ধরে ফেলতে পারত ।

বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি সৈয়দ হোসেন সাহেব সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র এবং ভাল লেখাপড়া জানা লোক। তাঁর সাথে আমার ভাল একটা সম্পর্ক ছিল । তিনি তাজউদ্দীনকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। আমাকে বলতেন, 'মন্ত্রী যতগুলো আছে সবাই শোনাউল্লাহ, শুনে শুনে কাজ করে। একমাত্র লোক হল তাজউদ্দীন সাহেব যে নিজে কাজ করে। তাজউদ্দীন সাহেব, শুনবে, বলবে, লিখে দেবে। তাকে সবাই ভয় করে। কারণ সে সাংঘাতিক নীতিবান মানুষ। নীতির বাইরে কোন কাজ সে করবে না।'

তাঁর ফাইল দেখার ধরন ছিল চমৎকার । সাধারণত একটা ফাইলে নিচ থেকে শুরু করে সচিব পর্যন্ত অফিসাররা যা লিখে দেয় মন্ত্রী তাতে সই দিয়ে দেয়। কিন্তু দ্বিমত পোষণের জন্য যে নলেজের প্রয়োজন তা তো অনেকেরই নেই, এমনকি বোঝেও না ভাল । এদিক দিয়ে তাজউদ্দীন চমৎকার ছিল। দ্বিমত পোষণ করলে সে নোটে আগাগোড়া বিষয়টি সম্পর্কে লিখত। আবার সম্মতি দিলেও তার নিজের মতামত দু'একটি সেখানে লেখা থাকবেই। এই কাজে যথেষ্ট নলেজ দরকার যা তার ছিল পরিপূর্ণ মাত্রায় ।

সরকারি চাকুরিতে দেশের সমস্ত জেলার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার যে জেলা কোটা ব্যবস্থা শুরু করেছিল, দেখা যাচ্ছিল বিভিন্ন মন্ত্রীরা নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিজ নিজ এলাকার লোককে ঢাকা জেলার লোক দেখিয়ে চাকুরি দেয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছিলেন । তাজউদ্দীনের সাথে এই সব বিষয় নিয়ে কথা প্রসঙ্গে একবার আমি তাকে বলেছিলাম, 'তুই সব সময় বলিস তুই ঢাকা জেলার মন্ত্রী না, সমস্ত বাংলাদেশের মন্ত্রী, কিন্তু সবাই তো আর এই মনোভাব নিয়ে কাজ করে না। সবাই পক্ষপাত করে। তোর মত মনোভাব যদি থাকত সবার তবে কথা ছিল না, এখন ঢাকা জেলার লোকেরা চাকুরি ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে।' চট্টগ্রাম পোর্টের একটা চাকুরির জন্য এক মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ঢাকা জেলা কোটায় অন্য এলাকার এক লোকের চাকুরির বিষয়টি তার কাছে তুলে ধরেছিলাম ।

আমার সাথে এই কথাবার্তার দুই-আড়াই মাস পর একদিন তাজউদ্দীন নিজেই আমাকে বলল, কোর্টের একটা চাকুরির জন্য ঢাকা জেলা থেকে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও সেই প্রার্থী বা প্রার্থীদের পরিবর্তে এক মন্ত্রী ঢাকা জেলা কোটার ৪/৫টি চাকুরির সব তাঁর নিজ এলাকার লোককে ঢাকার লোক দেখিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তাজউদ্দীন এই কাগজ নিজে দেখেছে এবং এই বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে কথা বলেছে। বঙ্গবন্ধুর সাথে তার কথা হয়েছিল যে, ঢাকা মেট্রোপলিটনের জন্য আলাদা একটা কোটা থাকবে। কিন্তু এটি বাস্তবায়নের সুযোগ আর হয়নি। তাজউদ্দীন ছিল খুব বড় মানের মানুষ। ক্ষুদ্র চিন্তার বশবর্তী হয়ে আলাদা করে শুধু নিজের কিছু মানুষের জন্য কাজ করার মত মনোভাব তার কখনই ছিল না। অবিচার-অনিয়মকে সে কখনই প্রশ্রয় দিত না। সে ছিল অন্যায়ের অনেক ঊর্ধ্বের একজন মানুষ।

তাজউদ্দীন মন্ত্রীর পদ থেকে সরে যাবার পর আমি কয়েকবার তার বাসায় গিয়েছি । সেই সময় রক্ষী বাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন আমার ছোট ভাই নূরুজ্জামান। একদিন তাজউদ্দীন বলেছিল, 'আমাকে রক্ষী বাহিনী দিয়ে মেরে ফেলতে পারে।' আমি বলেছিলাম, 'অসম্ভব! আমি বেঁচে থাকতে এটা হবে না । আমি আজকেই নূরুজ্জামানকে বলব তার সমস্ত লোককে বলে দিতে তোর যেন কোন অসুবিধা না হয় ।'

তাজউদ্দীন বলেছিল, 'খন্দকার মোশতাক বঙ্গবন্ধুকে মিথ্যা বলতে বলতে এমন

পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যে এখন সে এও বলছে, তাজউদ্দীন আপনাকে ধাক্কা দিয়ে নিজে পদ দখল করতে চায়।'

সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থান দেখে আমরা যারা রাজনীতির বাইরের মানুষ তারা সহজেই বুঝতাম, বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীনের প্রতি খুশি নন। অথচ এই দেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদান যেমন বিশাল তেমনি বাংলাদেশের জন্মের সময় মূল যে মানুষ তাজউদ্দীন, সেই তাকেই বাদ দিয়ে দেয়া হল ।

তাজউদ্দীনের স্মৃতি আমার জীবনের পবিত্র সঞ্চয় । মানুষ হিসেবে তাজউদ্দীন ছিল তুলনাহীন। সে রাজনীতি করত মানুষের জন্য। তার রাজনীতি ছিল অন্য সবার চাইতে আলাদা। ছাত্রজীবন থেকেই সে ছিল আগাগোড়া প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ ।

অধিকারের জন্য, ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার মনোভাব তার তরুণ বয়স থেকেই ছিল, নয়ত স্কুলছাত্র তাজউদ্দীন কেন আমার প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে দ্বন্দ্বে জড়াতে গেল ? তার চরিত্রের আর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল, সে কিন্তু কোনদিনও বাহাদুরি বা বড়াই করত না, নিজ কৃতিত্ব জাহির করত না। তার কাজেকর্মেই আসল জিনিসটি বের হয়ে আসত । কিন্তু সে খুব সাবধানে নিজের প্রচারটা এড়িয়ে চলত। কোন কাজকে গুছিয়ে দেয়া, পরিকল্পনা করা, সব সে-ই করত, কিন্তু প্রচারের ক্ষেত্রে সব সময় নিজেকে আড়াল করে রাখত। স্কুলজীবন থেকে পরিচয় হয়ে তার জীবনের শেষ পর্যন্ত দেখেছি, কেউ তাকে কোনদিনও খারাপ বলেনি। তাজউদ্দীন ছিল সত্যের প্রতীক ।

কাউকে সে কখনই ঘুরাত না। সাধারণত রাজনীতিবিদরা যেমন লোকজনকে বলেন, করে দেব, বলে দেব, ফোন করে দিয়েছি, হয়ে যাবে তোমার কাজ— এই জাতীয় কথাবার্তা তাজউদ্দীন বলত না। যে কাজ হবার নয় সে সরাসরি বলত, হবে না । কেন হবে না সেটাও বলে দিত । ফলে কেউ প্রথম মনঃক্ষুণ্ণ হলেও পরে বুঝতে পারত বিষয়টি।

আমি আগেও বলেছি, আমার এই জীবনে তাজউদ্দীনের মত মানুষ আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।

[০৩.০৪.১৯৯১]

ম. ওয়াহিদুজ্জামান : অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা।

মীর শওকত আলী

আমি তখন সিলেট সেক্টরে যুদ্ধ করছি। সিলেটের ছাতক এলাকায়। আমি সাধারণত বেশির ভাগ সময়ই বাংলাদেশের ভেতরে থাকতাম । সে দিনও আমরা বেশ ভেতরে, আমার সমস্ত শরীরে মাটি, পরনে হাফ প্যান্ট, সাথে আট-দশটা ছেলে। আর ওদিকে সীমান্ত অতিক্রম করে প্রায় ত্রিশ মাইল পথ ভেতরে পাড়ি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সেক্টর কমান্ডারের সাথে দেখা করতে এসেছেন। তাজউদ্দীন সাহেব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। একেবারে কর্দমাক্ত অবস্থা তাঁর। আমি তাঁকে চিনি না, তিনিও আমাকে চেনেন না ।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেক্টর কমান্ডার মীর শওকত কোথায় ?'

আমি বললাম, ''আমিই মীর শওকত । আপনি কে ?'

তিনি বললেন, 'আমি তাজউদ্দীন আহমদ।'

আমি সাথে সাথে তাঁকে অভিবাদন জানালাম। এই আমার প্রথম দেখা তাঁর সাথে। আর একবার দেখা হয়েছিল কলকাতায়, সেখানে তিনি একটি সম্মেলন ডেকেছিলেন । তারপর স্বাধীনতার পর দেখা ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই মানুষটির কর্মদক্ষতা, দেশপ্রেম এবং বিচক্ষণতা দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সাফল্যের লক্ষ্যে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রয়োজন ছিল, তাজউদ্দীন সাহেব প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সেই নেতৃত্বই দিয়েছেন। এটা স্বীকার করতেই হবে ।

[৩১.৩.১৯৯১]

মীর শওকত আলী : বীর উত্তম, সাবেক সেনা কর্মকর্তা, রাজনীতিক।

মুজাফ্ফর আলী

১৯৫০ সালে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ফজলুল হক হলে আমার রুম বরাদ্দ হল। সীট পেয়ে দেখি তাজউদ্দীন সাহেবও সেই রুমে সীট পেয়েছেন। এখানেই আমাদের প্রথম পরিচয়। কুশল বিনিময়ে জানা গেল আমরা দু'জনেই প্রথম বর্ষ অর্থনীতিতে ভর্তি হয়েছি। তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা । মানুষ হিসেবে তাঁকে আমার খুব বেশি ভাল লাগত ।

তিনি রাজনীতি নিয়ে ভীষণ রকম ব্যস্ত থাকতেন। প্রায় দিনই ডাইনিং হলের খাওয়া-দাওয়া যখন শেষের পথে তখন এসে তিনি রাতের খাবার খেতেন। আমিও অনেক সময় তাঁর জন্য বসে থাকতাম, তাজউদ্দীন ভাই এলে একসঙ্গে খাব। আমি আবার টিউশনি করতাম। অত্যন্ত সংগ্রাম করে আমি লেখাপড়া করছি এটা তিনি জানতেন এবং সে কারণেই আমাকে পছন্দ করতেন। ডাইনিং হলে খেয়ে আমি রুমে ফিরে আসতাম আর তিনি হলের ভেতরে লনের মধ্যে বসে বন্ধুদের সঙ্গে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা করতেন। রাজনীতি এবং মানুষের জন্য তাঁর কিছু করার চেষ্টা, এটাই যেন ছিল তাঁর জীবনের ধ্যানধারণা ।

১৯৫৪ সালে এমএ ফাইনাল পড়ছি দু'জনেই। হঠাৎ একদিন রাতে তাজউদ্দীন ভাই এসে বললেন, 'মুজাফফর ভাই, আমার তো আর পড়াশোনা হচ্ছে না । সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমাকে মনোনয়ন দিয়েছেন। কাপাসিয়া থেকে নির্বাচনে ফকির আব্দুল মান্নান সাহেবের বিরুদ্ধে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে । ফকির আব্দুল মান্নান তখন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। তারপর তিনি নির্বাচনের প্রচারণায় নেমে গেলেন । সেই সময়ে আমি মাঝে মাঝে বলতাম, 'আপনার এলাকায় যাব।' তিনি বলতেন, 'অবশ্যই যাবেন। কিন্তু লেখাপড়া ঠিক রাখবেন, নোট করবেন। এখন যদিও আমি নির্বাচনে নেমে গেছি, নির্বাচনের পর তো লেখাপড়া করতে হবে। তখন আপনার নোটিংগুলো আমার কাজে লাগবে।'

আমার মনে হয় অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার সময়টার কথা, কী তীক্ষ্ণ মেধা ছিল তাঁর। আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম। কারণ সারা দিন ঘুরেছেন বাইরে বাইরে, পরীক্ষার ঠিক আগে রাত ন'টার মধ্যে খাবার খেয়ে আমাকে বলতেন, 'কাল

যে পেপারের পরীক্ষা, সেই পেপারটা পড়া হোক।' আমরা দু'জনে আগে থেকে নোট তৈরি করে রাখতাম। আমি বলতাম, 'দু'জন একসাথে পড়ব কীভাবে?' তিনি বলতেন, 'চলেন পাশাপাশি বসি।' আমি পড়তাম, তিনি শুনতেন, মাঝে মাঝে দুই এক জায়গায় জিজ্ঞাসা করে দেখে নিতেন। এইভাবে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত আমাদের পড়াশোনা হত । আমি ভাবতাম পরীক্ষার আগের দিনের সামান্য এই পড়ায় তিনি কি পাস করবেন ? কিন্তু পরীক্ষার ফল যখন বের হল তখন আশ্চর্য হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় আমার ছিল না। তাজউদ্দীন সাহেব খুব সাধারণভাবে চলতেন। কিন্তু কাপড়চোপড় ভীষণ পরিষ্কার থাকত।

তিনি ধর্ম নিয়ে আলাপ করেছেন বিভিন্ন সময়ে, কিন্তু ধর্মীয় যে গোঁড়ামি সেটা তিনি পছন্দ করতেন না। ধর্ম নিয়ে মৌলভি-মোল্লারা যে ভণ্ডামি করে তিনি তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সচেতন মুসলমান হিসেবে ইসলাম ধর্মকে তিনি অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। কিন্তু এই ধর্মটাকে নিয়ে এদেশের মৌলভি-মোল্লারা মানুষকে নানাভাবে ধোঁকা দেয়, মিথ্যা কথা বলে । যেমন, কেউ যদি একবার হজ্বে যায়, তার সমস্ত জীবনের গুনাহ্ মাফ হয়ে গেল। এমনকি অনেকে হজ্ব থেকে এসে আবার নানারকম অন্যায় কাজে জড়িয়ে যায়। হয়ত তারা মনে করে সমস্ত পাপই ধুয়েমুছে এসেছি। এই ধরনের কথাবার্তা তিনি মাঝেমাঝে বলতেন।

তাঁর সাথে চার বছর থাকতে থাকতে আমার মন-মানসিকতায় অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। গরিবের জন্য তাজউদ্দীন সাহেবের খুব দরদ ছিল। তাঁর রাজনীতি করার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল যে, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই দুর্বল, কাজেই এদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য কাজ করতে হবে। এই যে অফুরন্ত লোকসংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য খুব চিন্তাভাবনা করতেন। আমাকে বলতেন, 'ভাই, অর্থনীতি নিয়েছি এই জন্য যে, অর্থনীতি না বুঝলে এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি করব কীভাবে! রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা করতে গেলে প্রথমে অর্থনীতিটা আমাকে বুঝতে হবে।' তাজউদ্দীন সাহেব জানতেন আমার সহায়সম্বলহীন জীবন-সংগ্রামের কথা। তাজউদ্দীন ভাই ছাড়া আর কারো কাছে বলতাম না এসব। ড. এম. এন. হুদা তখন আমাদের হলের প্রোভোস্ট। তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর কাছে গিয়ে আমার দুরবস্থার কথা বললেন এবং আমার জন্য কিছু সহযোগিতা করতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। তাজউদ্দীন ভাই আমাকে বললেন, 'আপনি

প্রোভোস্টের সাথে দেখা করেন।' আমি তাঁর কথামত প্রোভোস্টের কাছে গেলাম। তিনি আমার ডাইনিং হলের চার্জ মওকুফ করে দিলেন। তাজউদ্দীন সাহেবের চেষ্টায় আমার ডাইনিং চার্জ ফ্রি হয়ে গেল।

বি. করিম আমাদের হাউস টিউটর ছিলেন। বি. করিম সাহেব তাজউদ্দীন সাহেবকে খুব পছন্দ করতেন। আমি দেখতাম তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা করতেন। ড. এম. এন. হুদার সাথেও তাঁর সুন্দর সম্পর্ক ছিল। যেহেতু তাজউদ্দীন ভাই ছাত্রনেতাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাই তাঁকে ছাড়া বাইরে অথবা হলের ভেতরে কোন দলীয় সভা বা ঘরোয়া মিটিং হত না ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে এসে তাজউদ্দীন ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় । এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই আমি সব সময় তাঁর সহযোগী হিসেবে চলতে চেষ্টা করেছি। আমি '৭০ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচন করলাম। পাকিস্তানি সামরিক সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা, অনিশ্চিত পরিস্থিতি, তারপর শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন । এলাকায় এলাকায় গঠিত হল সংগ্রাম পরিষদ। আমি জিগাতলা, রায়েরবাজার, মোহাম্মদপুর এলাকা নিয়ে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলাম। সেক্রেটারি ছিল কৃষক লীগের বুলবুল। মার্চের ২৫ তারিখ সন্ধ্যার দিকে খবর পেলাম আজ রাতে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এর মধ্যে রাত ন'টায় আমি খন্দকার মোশতাকের বাসায় গেলাম, পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানার জন্য ।

এখানে একটি কথা বলা দরকার—আমি যখন রাজনীতি শুরু করি তখন খন্দকার মোশতাক ভেতরে ভেতরে কুমিল্লা জেলার নেতৃত্ব নিয়ে আমার প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি আমাকে সবসময় দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। সেই জন্য তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন যে, ‘আপনি আমার সাথে যত না সম্পর্ক রাখবেন, খন্দকার মোশতাকের সাথে আরো বেশি সম্পর্ক গড়বেন, যাতে আপনার সম্পর্কে খন্দকার মোশতাক শেখ সাহেবের কান ভারি না করে।' তখন আমি তাজউদ্দীন সাহেবের কথামত খন্দকার মোশতাকের বাসায় খুব বেশি যেতাম। এতে মনে হয় মোশতাক শেষের দিকে আমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছিলেন ।

যাই হোক, আলাপ-আলোচনা শেষে রাত সাড়ে ন'টার দিকে খন্দকার মোশতাক

বাসায় ফিরলেন। মীমাংসা কিছু হবে না, আলোচনা বোধহয় ভেঙে যাচ্ছে, কাল- পরশু কী হবে জানি না—এইসব কথা খন্দকার মোশতাক আমাকে বললেন। আমি তখন সেখান থেকে তাজউদ্দীন ভাইয়ের বাসায় গেলাম। যাবার পথে সংগ্রাম পরিষদের কর্মীদের বলে গেলাম পুলিশ ফাঁড়ির সামনে একটা লম্বা কড়ই গাছ ফেলে ব্যারিকেড সৃষ্টি করার জন্য ।

আমি তাজউদ্দীন ভাইয়ের বাড়িতে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী খবর ?' তিনি বললেন, 'বোধ হয় চলে যেতে হবে। মুজিব ভাইকে অনেক অনুরোধ, অনুনয়-বিনয় করলাম আমাদের সাথে যেতে, কিন্তু তিনি বললেন, যাবেন না। বললেন, আমি আছি, তোমরা তোমাদের পথ সামলাও।' আমি তাজউদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে তিনি কি কিছু বলেছেন?' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন কি করবেন না, এই সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। রাতটা দেখতে চান, কী হয়। আমি বলেছি, আপনাকে যদি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আপনি কী করবেন ?' তখন তিনি বললেন, আমাকে অ্যারেস্ট করতে আসবে না। চিন্তা ক'রো না তোমরা ।

আমি বললাম, আপনাকে অ্যারেস্ট করলে আমাদের আন্দোলন তো বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তিনি বললেন, আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারবে না। অ্যারেস্ট করার সময় হওয়ার আগেই আমি আমার পথে চলে যাব।' তাজউদ্দীন ভাই আমাকে বললেন, "আপনি একটু ৩২ নম্বরে যান, কথা বলে দেখেন ।

আমি তখন তাড়াতাড়ি ৩২ নম্বরে গেলাম। মুজিব ভাইকে বললাম সমস্ত কথা। মুজিব ভাই আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'মুজাফফর ভাই, আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি গোছগাছ মতই আছি । তাজউদ্দীন এবং অন্যান্যরা এসেছিল, চলে গেছে। আপনি যান, কী করবেন না করবেন, তাজউদ্দীনের সঙ্গে পরামর্শ করে করবেন।'

আমি তখন আবার তাজউদ্দীন সাহেবের বাসায় চলে এলাম । গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখি তাজউদ্দীন ভাই, ড. কামাল হোসেন এবং ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাজউদ্দীন সাহেবের হাতে একটা বন্দুক এবং গুলির বেল্ট। ওই মুহূর্তেই তিনজন একসাথে বের হয়ে যাবেন। আমার কানে এল ভাবীকে তিনি বলছেন, 'তুমি কী করবে কর, আমি চলে যাচ্ছি।' ভাবী গেটের দিকে গেলেন, আমিও গেটের কাছে দাঁড়ালাম। গাড়িতে

তিনজন উঠলেন এবং আবাহনী মাঠের ডানপাশের রাস্তা দিয়ে চলে গেলেন। রাত তখন প্রায় বারোটার কাছাকাছি । সেই রাতেই শুরু হল পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ। বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে থাকার পর আমি সীমান্ত অতিক্রমের সিদ্ধান্ত নেই। এপ্রিলের ১২ তারিখে আগরতলা গেলাম । গিয়ে শুনলাম তাজউদ্দীন ভাই ছিলেন এখানে । সরকার গঠন করা হয়েছে, এখন সবাই কলকাতায়। আমি তখন সেখানেই রইলাম ।

১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের শপথগ্রহণের কিছুদিন পর তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে কলকাতা থেকে খবর পাঠালেন তাঁর সাথে দেখা করতে। আমি সেখানে যাবার পর অনেক কথা বললেন । বললেন, 'আমাদেরকে অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। সবাই তো বোঝে না, ভাবে কালই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।' আমাকে দেশের ভেতরের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, খবরাখবরের জন্য আমাকে ভেতরে পাঠাতে চান ।

আমি বললাম, 'দেশের ভেতরে গিয়ে যদি মরে যাই তাহলে আপনি যদি আমার ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নেন তাহলে আমার কোন চিন্তা নেই।'

বললেন, 'আমার ছেলেমেয়েরা যদি বেঁচে থাকে তবে ওরাও বাঁচবে । আপনি যদি সাহস করতে পারেন তাহলে দেশের ভেতর থেকে একটু ঘুরে আসেন। চিন্তাভাবনা করেন, তারপর ভেতরের বাতাসটা কী জেনে আসেন। '

আমাকে সাত হাজার টাকা দেবার জন্য তাজউদ্দীন সাহেব মনসুর আলি সাহেবকে নোট লিখে দিলেন। আমি সেই টাকা নিয়ে বাংলাদেশে চলে এলাম। এরপর আমি ঘুরে এসে তাজউদ্দীন সাহেবকে জানালাম মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মানুষের বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল । আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলোরও বিবরণ দিলাম । মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা দেয়ার জন্য শেখ মণির নেতৃত্বে ছাত্র লীগের কিছু নেতা ও অন্যান্য কয়েকজন একতাবদ্ধ হল । তারা বলল যে, এমপি সাহেবরা যাঁরা ভারতে গেছেন তাঁদের সবাইকে আগরতলাতে জমায়েত করে তাঁদেরকে দিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা দেয়া হবে । সেই মিটিং যেদিন হল সেদিন মুজিবনগর থেকে ইউসুফ আলি সাহেবকে তাজউদ্দীন সাহেব এই মিটিংয়ের বক্তব্য শোনার জন্য আগরতলা পাঠালেন । সেখানে ছাত্রনেতারা তাজউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় বিষোদ্গার করে বলল যে, তাঁকে দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব হবে না । তাঁকে বাদ দিয়ে আপনারা অন্য কাউকে দিয়ে চেষ্টা করেন।

এইভাবে সকাল ন'টা থেকে শুরু করে বিকাল চারটা-পাঁচটা পর্যন্ত তারা একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে গেল ।

ওদের বক্তব্য শেষে উপস্থিত আমরা প্রায় সমস্ত এমপি-ই তাজউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থার কথা জানালাম । আমরা বললাম, আমরা এখন ভারতে আশ্রয় নিয়েছি । এখানে বসে যদি তাজউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা দেই, তা হলে ভারত সরকার মনে করবে যে, এদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি কোন দরদ নেই। দলাদলি, কোন্দল এবং ক্ষমতার জন্য এরা পাগল, তাই তাজউদ্দীন সাহেবকে বাদ দিয়ে আর একজনকে নেতৃত্বে বসাতে চায়। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমাদেরকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। তখন দেশের এবং আমাদের অবস্থাটা কি হবে! কাজেই দলাদলি করতে আমরা এখন রাজি নই। আমরা সব এমপিরা একমত হলাম যে, আমরা তাজউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে চলব। তখন তারা খুব মর্মাহত হল এবং তারপর তারা অন্য অবস্থান নিল ।

তাজউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্ব ছাড়া বাংলাদেশ হত কিনা আমার ১০০ ভাগ সন্দেহ আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাঁকে দেখেছি কী রকম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তিনি, কীভাবে তিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেছিলেন। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে—ঘুম নাই, খাওয়াদাওয়া নাই। নিজের হাতে বাথরুমে কাপড় ধুয়েছেন। তাঁর মত এইরকম নিবেদিতপ্রাণ আমি আর কাউকে দেখিনি। দেশকে স্বাধীন করবেন, এই নিয়ে বিভোরভাবে একদম নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে আরামকে হারাম করে কোন নেতা যে নেতৃত্ব দিতে পারেন, আমার বিশ্বাস করতে অবাক লাগে ।

'৭৩ সালের শুরু থেকে আমরা অনেকেই বুঝতে পারছিলাম বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজউদ্দীন সাহেবের একটা দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এই দূরত্ব তৈরির পরিকল্পনা শুধু একদিক থেকে আসেনি, এই চেষ্টা ছিল নানামুখী। মুক্তিযুদ্ধের সময় যাঁরা তাজউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছে, যুদ্ধবিরোধী ষড়যন্ত্র করেছে, তারাই তাঁর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুকে বলে বলে তাঁকে কোণঠাসা করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে।

মাঝে মাঝে তাজউদ্দীন সাহেব খুব দুঃখ করে বলতেন, 'মুজাফফর ভাই, কী করলাম আমরা! মুজিব ভাই আমাদের কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছেন বলে মনে হয় না। স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁদের সত্যিকার সক্রিয় কোন ভূমিকা ছিল না

তাঁদের নিয়েই তিনি চলছেন । আমাদের সঙ্গে আর আগের মত যেন মন খুলে কথা বলেন না।' তাজউদ্দীন সাহেব সমস্ত কিছু বুঝতেন এবং মনে কষ্ট পাওয়া ছাড়া এই নীতিবান মানুষটির আর করণীয় কিছু ছিল না। তোষামোদকারীদের কারণেই তাজউদ্দীন সাহেবকে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু দূরে ঠেলে দেন। এটি আমাদের ইতিহাসের অত্যন্ত দুঃখজনক এক ঘটনা।

পদত্যাগের পর তাজউদ্দীন সাহেব কোর্টে প্র্যাকটিস করবেন বলে ভাবছিলেন। একদিন তিনি কোর্ট থেকে ফিরেছেন, আর আমিও গিয়েছি দেখা করতে । আমাকে বললেন, "ভাই, আজকে চমৎকার একটা কাজ হয়েছে। আজকেই কোর্টে আমি একটা মামলা হাতে নিলাম আর মামলায় জিতেও গেলাম । অ্যাডভোকেট হিসেবে কোর্টে যে আমি এত ভাল করতে পারব এটা তো ভাবি নাই। এর ফলে আমার একটা আত্মবিশ্বাস এসে গেছে। আমি প্র্যাকটিস করব। আর প্র্যাকটিস না করলে সংসার চালাব কেমন করে ?'

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে পাল্টা কোন দল করার কোন চিন্তা তাঁর ছিল না। বাকশালের বিষয়ে তিনি শুধু এটুকুই বলতেন যে, 'মুজিব ভাইয়ের হাতে নেতৃত্ব, তিনি যা মনে করেন, করবেন। আমি যদি নিষেধ করি তাতে কোন ফল হবে না, এটা তাঁর একক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যে কোন কথাতেই বঙ্গবন্ধু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন । '

তাজউদ্দীন ভাই এই দেশকে এবং মানুষকে যেমন ভালবাসতেন, তেমনি তাঁর দল আওয়ামী লীগকেও ভালবাসতেন । এই সংগঠনকে তিলে তিলে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কোন অংশেই কম ছিল না। আমার মনে আছে, সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁকে পছন্দ করতেন এবং সাউন্ড ছেলে হিসাবে দাম দিতেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মৃতদেহ যে দিন ঢাকায় এসে পৌঁছে সে দিন তাজউদ্দীন সাহেব আমাকেও বিমানবন্দরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আবুল মনসুর সাহেব তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। আমি বেশ কয়েকবার আবুল মনসুর সাহেবের বাসায় তাজউদ্দীন ভাইয়ের সাথে গিয়েছি। তিনি বলতেন, 'তাজউদ্দীন, তুমি ভবিষ্যতে বড় নেতা হবে। তোমার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এটা আমার বিশ্বাস। তোমার যে প্রজ্ঞা, দলের প্রতি তোমার যে একাত্মতা, এটা অন্যদের মধ্যে কম আছে। কাজেই তুমি এগিয়ে যাও। আমি দোয়া করি তুমি ভাল করবে।' তাজউদ্দীন সাহেবও আবুল মনসুর সাহেবকে খুব শ্রদ্ধা করতেন । ছাত্রজীবনের কথা বলতে গেলেই আবুল হাশিম সাহেবের কথা খুব

বলতেন। কামরুদ্দিন সাহেবের কথাও বলতেন। তাঁর সাথে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

তাজউদ্দীন ভাই ছিলেন ভীষণ ভদ্র স্বভাবের মানুষ। রাজনীতি করতে গিয়ে দেখেছি কত রকম রাগারাগি করতে হয়, ধাক্কাধাক্কি করতে হয়, কিন্তু তিনি এসবের মধ্যে ছিলেন না । তিনি ছিলেন একজন উদার মনের মানুষ । হাসি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে সব কিছু বরণ করে নিতেন, মিটমাট করে নিতেন।

এ কারণেই মানুষ তাঁকে ভালবাসত। তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন না এমন লোক বোধ হয় আমি দেখিনি। যেই তাঁর সাথে মিশেছে, মুগ্ধ হয়েছে। আমাকে তো তিনি জাদুকরের মত মুগ্ধই করে ফেললেন। আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ।

[3.4.1991]

মুজাফফর আলী : রাজনীতিক, সাবেক সংসদ সদস্য, ব্যবসায়ী।

রফিকউদ্দিন ভূঞা

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৫১ সালে ঢাকার সদরঘাটের কাছে একটা কর্মী সম্মেলনে । আমরা যারা আওয়ামী লীগে ছিলাম তারা জানতাম তাজউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের মানুষ । তাজউদ্দীন সাহেব সুচারুভাবে, শৃঙ্খলার সাথে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালাতেন। তিনি দলের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচি নিতেন সেগুলো ছিল খুবই চমৎকার। কী কী কাজ করণীয় তা আমাদের চোখের সামনে একেবারে ছবির মত ভাসত। দলীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, খসড়া করা এগুলো তিনি নিজেই করতেন। সাহস ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারতেন। ফলে বঙ্গবন্ধুও তাজউদ্দীন সাহেবের ওপর নির্ভর করতেন।

২৫ মার্চের ঘটনার পর আমরা কোন নেতা পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ খবর পেলাম যে তাজউদ্দীন সাহেব দিল্লীতে আছেন। তখন আমি অয়্যারলেসের মাধ্যমে তাঁর সাথে কথা বলি এবং চিঠি লিখি। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আপনি ময়মনসিংহেই থাকেন । ওখানেই কাজ করেন । আমরা, ইনশাআল্লাহ, জয়ী হব।' এই কথা শোনার পর আমাদের ছেলেরা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করতে লাগল। আমি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে একটা চিঠি লিখে, টাইপ করিয়ে, এক কপি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে এবং আর এক কপি জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্টকে পাঠাই। তাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থনের আবেদন জানাই। এই চিঠির এক কপি তাজউদ্দীন সাহেবকেও দেই।

তাজউদ্দীন সাহেব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিপুণভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন । মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সংগঠিত করবার জন্য ইয়ুথ ক্যাম্প তৈরি করবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। '৭১-এর নভেম্বর মাসে কলকাতার সিআইটি রোডের সাততলা একটা বাড়ির ছাদে আমাদের দলীয় সভা হয়। সেখানে খুলনার শেখ আব্দুল আজিজ এবং আরো কয়েকজন সদস্য দাবি করেন যে মন্ত্রিসভা বড় করতে হবে। তখন ওই মিটিংয়ে আমি স্টেনগান হাতে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাই এবং বলি, ‘তোমরা যদি এই সব নিয়ে বাড়াবাড়ি কর তাহলে তোমাদের সবাইকে গুলি করে শেষ করে দেব।' তখন আর এই নিয়ে কেউ কোন কথা বলে নাই । আমরা যারা সীমান্তে সক্রিয় যুদ্ধ করতাম, আমাদের দাবি ছিল মন্ত্রিসভা বড় করবার কোন দরকার নেই। সরকার তো

ভালভাবেই চলছে ।

সম্ভবত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদকে খন্দকার মোশতাক যে গভীর ষড়যন্ত্র করছে সে কথা জানান। খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করছিল। সে ছিল বিশ্বাসঘাতক, নীচু মনের মানুষ। কর্মীদের কাছে সে নেতাদের বিরুদ্ধে কথা বলত । মোশতাক চেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংস করে তাজউদ্দীনকে সরিয়ে নিজে নেতা হবে । তাজউদ্দীন সাহেবকে ভারত সরকার খুব বিশ্বাস করত, ফলে মোশতাকের চক্রান্ত সফল হয়নি ।

তাজউদ্দীন সাহেব মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া দেশকে রক্ষা করা যাবে না। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব করা, ছোট ছোট শিল্প কারখানা গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কাজের উপযুক্ত যারা তাদেরকে কাজ দিতে হবে, না হলে দেশে শান্তি আসবে না। আমাদের জনশক্তি প্রচুর, এই শক্তিকে বাধ্যতামূলক উন্নয়ন কাজে লাগাতে হবে। সেই সাথে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনাও ছিল তাঁর। রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল গ্রামীণমুখী। মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে সংগঠনের ইউনিয়ন কমিটি, ওয়ার্ড কমিটিকে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত করবার পরিকল্পনা ছিল তাজউদ্দীন সাহেবের।

তাজউদ্দীন সাহেব গ্রুপিং পছন্দ করতেন না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কান-কথা শুনতেন। স্বাধীনতার পর থেকেই অতি গোপনীয়ভাবে বঙ্গবন্ধুর কাছে তাজউদ্দীন সম্পর্কে কান-কথা বলা হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুকে বোঝান হয় যে, তাজউদ্দীন একচ্ছত্র নেতা হয়ে যাচ্ছে। যেভাবে সে অগ্রসর হচ্ছে তাতে আপনার অসুবিধা হবে। সুতরাং এখন থেকেই তাঁর গুরুত্ব কমিয়ে দিন । এ কারণেই বঙ্গবন্ধু তাঁকে সামনে এগিয়ে আসতে দিতেন না। কিছু আত্মীয় এবং দলের কিছু লোক যারা স্বার্থের কারণে তাজউদ্দীনের নেতৃত্বকে পছন্দ করত না এই কাজে তাদের বিরাট ভূমিকা ছিল । বঙ্গবন্ধু যে তাজউদ্দীন সাহেবকে ভুল বুঝছেন এটা কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব বুঝতেন । এবং তিনি কিন্তু কোনদিনই বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কিছু বলেননি । দুঃখ করে শুধু বলতেন, আমি এত করলাম অথচ তিনি আমাকে ভুল বোঝেন । তাছাড়া তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে কেউ দেখা করতে গেলে তা বঙ্গবন্ধুর কাছে রিপোর্ট হত। তবুও তিনি আশাবাদী ছিলেন

যে, বঙ্গবন্ধু একদিন তাঁর ভুল বুঝবেন । ধৈর্যের সাথে টিকে থাকতে পারলে একদিন না একদিন সুফল আসবেই ।

তাজউদ্দীন সাহেব মনেপ্রাণে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ব্যালটের মাধ্যমে নেতৃত্ব আসলে ভাল হবে, চাপিয়ে দেয়া নেতৃত্ব ঠিক না—দলীয় সভা, কাউন্সিল সভায় তিনি এসব বলতেন ।

মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দীন সাহেবের পদত্যাগ হঠাৎ হয়েছে। এ ব্যাপারে তাজউদ্দিন সাহেব বলতেন, নেতা চেয়েছেন তাই পদত্যাগ করেছি । এই বিষয়ে বঙ্গবন্ধুকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ‘রফিক, তাজউদ্দীন আর আগের তাজউদ্দীন নাই । তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না।' আমি তখন বললাম, ‘এটা আপনার ভুল সিদ্ধান্ত।' তখন তিনি বললেন, 'আমি খুব তুফানের মধ্যে আছি। আমার উপর দিয়ে ঝড়-ঝাপটা যাচ্ছে, দেখ না!'

আমরা অনেকেই বাকশালের পক্ষে ছিলাম না। বঙ্গবন্ধু চেয়েছেন তাই আমরা সমর্থন দিয়েছি। মনসুর আলি ভাই বলেছিলেন, 'বাঘের পিঠে সওয়ার দিলাম, পড়লে বাঘে খাবে।'

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমার সবচাইতে স্মরণীয় স্মৃতির কথা ভাবলে মনে হয়, সেই ২৫ মার্চ রাতের পর যখন আমরা কোন নেতা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তখন তিনি অয়্যারলেসে বলেছিলেন, ‘আমরা জয়ী হব। হতাশ হবেন না। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করুন।'

আসলে যে কোন পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করবার মত সাহস ছিল তাঁর। তিনি কখনও নিরাশ হতেন না ।

[১০.০৮.১৯৯১] রফিক উদ্দিন ভূঞা : রাজনীতিক, সাবেক সংসদ সদস্য।

শামসুর রহমান খান

তাজউদ্দীনের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি ১৯৪৮ সালে লেখাপড়া শেষ করি, কিন্তু ১৯৫১ পর্যন্ত প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত ছিল । তাজউদ্দীন তখন ছাত্র। আমি সক্রিয়ভাবে রাজনীতি না করলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মী এবং ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল । সেই সুবাদে তাজউদ্দীনের সাথে পরিচয়। কিন্তু সেই সময়ে আমাদের দেখাসাক্ষাৎটা খুব কম হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমি তাজউদ্দীনকে দেখেছি অত্যন্ত প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মঠ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অত্যন্ত আস্থাভাজন বন্ধু হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক হিসেবে । বিশ্বস্ততা এবং সততার এক মূর্ত প্রতীক ছিল তাজউদ্দীন। আমি তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। আমার এই শ্রদ্ধার কারণ শুধু যে তার সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে তাই নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষজনের কাছ থেকে তাজউদ্দীন সম্পর্কে আমি যা জেনেছি তা ছিল সত্যিই অতুলনীয় অভিজ্ঞতা ।

১৯৫০ সালে আমি সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাই। '৫২ সালে ছুটিতে ঢাকায় এসেছিলাম। সেই সময় একটি অনুষ্ঠানে আমি ও তাজউদ্দীন পাশাপাশি বসা। কথায় কথায় আমি তাজউদ্দীনকে বললাম, 'আমি তো পাকিস্তান সরকারের চাকরি নিয়েছি। তোমরা যারা জনতার রাজনীতি কর তারা তো নিশ্চয়ই আমাদেরকে পছন্দ কর না।' তাজউদ্দীন বলল, "না, ঠিক আছে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। দরকার আছে।' আমি বললাম, "কী ব্যাপারে প্রয়োজন ?' সে বলল, 'দেশ স্বাধীন হলে আপনারা তখন কাজে আসবেন।' আমি বললাম, 'দেশ তো স্বাধীন হয়েছে।' তাজউদ্দীন বলল, 'পাকিস্তান না । এই দেশ না।' আমি জানতে চাইলাম, 'পূর্ব পাকিস্তান আবার আলাদা হবার দরকার আছে নাকি ?' তাজউদ্দীন বলল, 'হ্যাঁ। আমরা পারব না এদের সঙ্গে থাকতে। এদের সঙ্গে থাকা যাবে না। আমাদের আলাদা দেশ করতেই হবে।'

তখনও বাংলাদেশ শব্দটা আসেনি এভাবে। কিন্তু এত আগেই তাজউদ্দীনের ধারণা হয়ে গেছে, আমাদের আলাদা একটা দেশ হবে । আমার মনে হয় না, এই চিন্তাটা তখনো অন্য কোন নেতার ভাবনায় এসেছে।

'৫৬ সালের নভেম্বরে আমি পূর্ব পাকিস্তানে বদলি হয়ে আসি । পরবর্তীতে

আমি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলাম। পাকিস্তান সরকার যদিও মামলাটি উইথড্র করলেন, কিন্তু আমাদেরকে চাকরি থেকে অবসর দেয়া হয়।

এর পরপরই শেখ সাহেব বললেন, 'একটা খসড়া সংবিধান তৈরি করতে হবে।' তিনি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে বললেন, 'তোমরা একসাথে বসে এটি তৈরি কর।' আমি তখন বলেছিলাম যে, 'তোমার দল থেকে একজন থাকা দরকার । আমরা তো আওয়ামী লীগের সদস্য নই । তোমার দলের চিন্তাধারা কী এসব যারা বলতে পারে এমন নেতৃস্থানীয় একজনকে দাও। তোমাকে যে বোঝে বা জানে, তোমার চিন্তার সাথে পরিচয় আছে এমন একজন লাগবে।' তিনি বললেন, "ঠিক আছে, তাজউদ্দীনকে নাও, কিন্তু তাকে সারাক্ষণ পাবে না। দলের সাধারণ সম্পাদক সে, তাই অন্য অনেক কাজ আছে তার, তবে আসবে মাঝে মাঝে ।'

আমরা তখন বসতাম ড. কামাল হোসেনের বাসায় । তাজউদ্দীন প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে বা রাতের দিকে আসত। শেখ সাহেবও মাঝে মাঝে আসতেন। এমনও হত, হয়ত অন্য কোন কাজে কাছাকাছি কোথাও গেছেন, তারপর সোজা এখানে চলে এসেছেন ।

একদিন রাতে তিনি এলেন। এর কয়েকদিন আগেই শেখ সাহেব গোল টেবিল বৈঠক থেকে ফিরেছেন । সেখানে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন নেতা সম্পর্কে কিছুটা কটু কথা বলেছেন। আমাকে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বললেন, তাঁর রাজনীতি থেকে অবসর নেয়া উচিত।

আমি বললাম, 'তুমি এইসব বল কেন ? তুমি একজন বড় নেতা, তোমার এইসব সাজে না।' গ্রামদেশে যেমন ঘটনা আছে যে, দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া, একজন তার ছেলেকে শিখিয়ে দিল চাচার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলতে, কিন্তু প্রকাশ্যে সে কাজ করবে উল্টো। ছেলে চাচাকে বলে, আপনি কেন বাবার সাথে এমন আচরণ করলেন ? তখন আবার ওই ছেলের বাবাই ছেলেকে থাপ্পড় দিয়ে বলে, বেয়াদব, মুরুব্বীর সঙ্গে এইরকম কথা বলে নাকি! এই গল্পটা বলে আমি শেখ সাহেবকে বললাম, 'তুমি কেন এমন কাজ কর না ? কেউ বলল, তুমি এসে থামাও। এ জাতীয় কথা তোমার সরাসরি বলা ঠিক না ।'

শেখ সাহেব বললেন, 'আমি এসব কথা মানি না।' তিনি চলে গেলেন ।

পরদিন দুপুর দেড়টার দিকে আমরা কামাল হোসেনের বাসায় বসে আছি, এমন সময় তাজউদ্দীন এল। আমাকে বলল, ‘একটা আশঙ্কার ব্যাপার আছে, মুজিব ভাই আজ আদমজী যাচ্ছেন, সেখানে কর্মী সভা হবে। আদমজীতে মওলানা ভাসানী সাহেবের অনেক সমর্থক আছে। মুজিব ভাই যদি মওলানা সাহেব সম্পর্কে কিছু বলেন তাহলে গণ্ডগোল বাধবে, এতে আমরা তাদের পিটিয়ে সরিয়ে দেব, না তারা আমাদের মারধর করবে এটা বড় কথা নয়। কিন্তু এতে পাকিস্তান সরকার তো সুযোগ পাবে বলতে যে, বাঙালিদের মতবিরোধ রয়েছে। এটা থামানো দরকার। আপনি চলেন, মিটিংয়ের সময় দুটোয়, একটু পরেই তিনি রওনা দেবেন।'

আমরা দু'জন ৩২ নম্বরে গেলাম । লোকজনে বাড়ি ভর্তি । বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাদা করে কথা বলা অসম্ভব। আমরা ঠিক করলাম যে, শেখ সাহেবের সাথে এত লোকের মধ্যে কথা বলা বা তর্কে যাওয়া যাবে না, তাই উপরে উঠতে গিয়েই দেখি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছেন। আমি কিছু না বলে, দেরি না করে হাত ধরে টেনে তাঁকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলাম । রান্নাঘরে কোন তর্কবিতর্কে না গিয়ে বললাম, ‘তুমি মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে কিছু বলবে না এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধেও না।' খুব জোরেই বললাম ।

আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'ঠিকই তো, আমি কেন বলব, আমার বলার দরকার কী! তুমি ঠিকই বলেছ, কারো সম্পর্কে আমি কিছু বলব না।' তারপর বললেন, 'তাজউদ্দীন তো কিছু খায়নি।' তখন রান্নাঘরেই আমাদের খাবার দিল, শেখ সাহেব বললেন, 'তাজউদ্দীন, পাঁচ মিনিটে খেয়ে নাও।' তারপর তাজউদ্দীনের খাওয়া শেষ হলে দু'জনে বেরিয়ে গেলেন ।

রাতে টেলিফোনে তাজউদ্দীনকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। সে বলল, “ভাই, আজ খুব ভাল কাজ হয়েছে। মুজিব ভাই মওলানা সাহেব বা অন্য কোন দল সম্পর্কে কিছু বলেননি।'

এই ঘটনা থেকে এটাই বোঝা যায়, তাজউদ্দীন সমস্ত বিষয়ে কত বেশি সচেতন ছিল । সে বুঝেছে, ওখানে যদি কোন ঝামেলা বা গণ্ডগোল হয় তাহলে আমাদের আন্দোলন পিছিয়ে যাবে। পাকিস্তান সরকার সুযোগ পেয়ে যাবে যে, দেখ, পূর্ব পাকিস্তানে সবাই শেখ মুজিবকে সমর্থন করে না। মওলানা ভাসানীর সমর্থকরা ভাত-কাপড়ের সংগ্রামে তাঁকে সমর্থন করেছে,

কিন্তু বৃহত্তর রাজনীতিতে অধিকাংশ মানুষেরই স্থির বিশ্বাস যে, শেখ মুজিবই একমাত্র মানুষ যিনি স্বাধিকার দিতে পারবেন। এই যে ঘটনাকে পরিষ্কার বুঝে ফেলা, চোখের সামনে ভাসিয়ে তোলা, আমি জানি না তাজউদ্দীনের মত অন্য কেউ বুঝেছে কিনা—আমাকে কেউ অন্তত বলেননি। তাজউদ্দীন এসে আমাকে নিয়ে গেছে। শেখ সাহেবের সাথে আমার সম্পর্কের কারণেই আমি বললে শেখ সাহেব জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করবেন এই ধারণাকেই কাজে পরিণত করেছিল তাজউদ্দিন।

দেশ স্বাধীন হবার পর আমাকে সভিয়েট ইউনিয়নে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানো হয়। একবার মস্কো থেকে ঢাকায় ফেরার পথে আমাদের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব এনায়েত করিমের (প্রয়াত) সাথে দেখা । তিনি আমাকে বলেছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যে সমস্ত ফাইলপত্র আসে সেখানে মন্ত্রীদের লেখা এবং নোটিং প্রসঙ্গে—তিনি বললেন, 'এঁদের মধ্যে তাজউদ্দীন সাহেবের লেখা পড়তে ভাল লাগে দুটো কারণে। প্রথমত, তাঁর ভাষাটা ভাল ও স্বচ্ছ। দ্বিতীয়ত, তিনি যা লেখেন তার মধ্যে পদার্থ আছে। অন্য বেশির ভাগের লেখাই পড়তে ইচ্ছা করে না।'

মস্কো থেকে ঢাকায় মাঝেমধ্যেই কাজ উপলক্ষে আমাকে আসা-যাওয়া করতে হত । তখন একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম, শেখ সাহেবের সাথে তাজউদ্দীনের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না । শেখ সাহেবের সাথে এই বিষয়ে আমার যখন কথা হয়েছে তখন আমি বুঝতে পেরেছি তিনি নিজেও তাজউদ্দীনের প্রতি সন্তুষ্ট নন ।

একবার দু'দিনের জন্য আমি ঢাকায় এসেছিলাম '৭২-এর সেপ্টেম্বরের দিকে। তখন তাজউদ্দীনের হেয়ার রোডের বাসায় গেলাম। সেখানে কথায় কথায় তাজউদ্দীন বলল, 'আপনি যে মস্কোতে চলে গেলেন, ঠিক আছে, মর্যাদা অনুযায়ী কাজ করছেন, কিন্তু আপনি তো জানেন আপনাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিছু লোক আছে যারা মনে করছে, আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন তাহলে আপনি বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন রকম পরামর্শ দেবেন, যেগুলো আবার তাদের মনঃপূত হবে না। সেইজন্যই আপনাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আমাকে ভাল চোখে দেখছেন না। অথচ আমি তো তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী না। পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। এখন যাঁরা বঙ্গবন্ধুর ভক্ত সেজে সামনে আছেন তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশেষ করে আমার সম্পর্কে

নানা রকম কথা বলছেন।'

আমি তাজউদ্দীনের এই কথার সাথে কিছুটা একমত হলাম। কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর শেখ সাহেব আমাদের মাঝে ফিরে এলেন, তখন তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখেছি বেশ কিছু লোকজন এসে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার সম্পর্কে আক্রোশমূলক কথাবার্তা বলছে। তখন যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন, বিশেষ করে তাজউদ্দীন সম্পর্কে তাঁদের যেন অনেক কিছু বলার আছে । এই আক্রোশমূলক কথাবার্তার ধরন শুনেই মনে হয়েছে, এই আক্রোশের কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ।

যেমন আমার মনে আছে, একজন এলেন, এসেই খুব কান্নাকাটির ভাব দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন। শেখ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রে, কেমন আছিস ?'

ওই ব্যক্তিটি বললেন, ‘আমাদের কথা বলার কী আছে, আপনি আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন এটাই তো বড় পাওনা। আর কিছু চাই না।' ওই ব্যক্তি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন যে, ‘যারা ক্ষমতা দখল করে বসেছিল তারা তো মনে করেছিল আপনি আর কোন দিনই ফিরবেন না, তারাই রাজত্ব চালিয়ে যাবে।' এই ধরনের তির্যক কথাবার্তা ।

এখন শেখ সাহেব যত বড় নেতাই হোন না কেন, যত ক্ষমাশীল, উদারই হোন না কেন, তিনি তো মানুষ! এই যে কথাবার্তা, প্রচারণা, তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, মনের মধ্যে তো জমা হয়ে থাকে। কিছু লোক একের পর এক তাজউদ্দীনের ব্যাপারে তাঁর মনটা বিষিয়ে দেয়ার জন্য এইসব কথা বলা শুরু করেছিল ।

অথচ আমি তো জানি শেখ সাহেবের কতটা স্নেহ ছিল তাজউদ্দীনের প্রতি এবং কতটা নির্ভর করতেন তিনি তাঁর ওপর। এরই একটা উদাহরণ দেই। ১০ জানুয়ারি '৭২-এ ফিরে এসে শেখ সাহেব ১৮ নম্বর রোডের বাড়িতে উঠলেন । সমস্ত বাড়িতে লোক গিগিজ্ করছে। দেশী-বিদেশী সাংবাদিক চারিদিকে। ভেতরে বড় বসবার ঘরটায় আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতারাই আছেন। পুরো ওয়ার্কিং কমিটিই আছে সেখানে । শেখ সাহেব ভেতরের রুম থেকে বসবার ঘরে এলেন, একজন বিদেশী সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করল । শেখ সাহেব ইংরেজিতে বললেন, ‘ওয়েল, আই ওয়াজ টেক্

অ্যাওয়ে, বাট বিফোর দ্যাট, হিয়ার ইজ তাজউদ্দীন,আই টোল্ড হিম দ্যাট আই উইল বি পিক্‌ড্‌ আপ বাই পাকিস্তানিজ, বাট ইউ মাস্ট কনটিনিউ দা স্ট্রাগ্‌–ইন পারটিক্যুলার আই টোল্ড তাজউদ্দীন।'

শেখ সাহেবের এই কথা থেকেই বোঝা যায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাজউদ্দীনের উপর নির্ভর করা যায়। এই কথাটি তিনি প্রকাশ্যেও বললেন । কিন্তু পরে দেখলাম প্রত্যেক দিন তাঁর কানের কাছে কিছু লোক বলে বলে তাজউদ্দীনের প্রতি তাঁর মনটা সম্পূর্ণ বিষিয়ে দিয়েছে। যার ফলে অসুবিধা শুরু হয়ে গেল ।

আমার মনে আছে, ড. কামাল হোসেন তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক এবং আমাকে তাঁর বাড়িতে খেতে বলেছিলেন। সেখানে কথায় কথায় ড. কামাল আমাকে বললেন, 'আপনি ঢাকায় এসেছেন, আপনি বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলে যান। আমার মনে হয়, বেশ কিছু ব্যাপারেই তিনি ঠিক করছেন না। আপনি একটু বুঝিয়ে যান, আপনি কথাটা বললে ভাল হবে।'

প্রফেসর রাজ্জাক শুনে বললেন, ‘মিয়ারা, আপনারা কি করছেন, আপনি বলতে পারেন না ? শামসুর রহমান খান আছেন মস্কোতে, দু'দিন থাকবেন তারপর চলে যাবেন। আপনি তো ক্যাবিনেটে আছেন, সবসময় দেখা হচ্ছে, আপনারা বলতে পারেন না ?'

কামাল বললেন, ‘দেখেন, অসুবিধা হচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধুকে যাঁরা কিছু বলতে বা বোঝাতে চান বা তাঁর মতের বিরুদ্ধে কিছু যদি বলেন তবে তিনি খুশি থাকেন না। আমাকে তো ছেলেমানুষ মনে করেন। আমার বয়স অল্প, সবেমাত্র রাজনীতিতে যোগ দিয়েছি । সুতরাং মুখে আমাকে কিছু না বললেও চোখের ভাবে বোঝা যায় । তাই এটা আমার দ্বারা হচ্ছে না । কিন্তু অন্য মন্ত্রী যাঁরা আছেন তাঁরাও বর্তমানে কিছু বলতে চাচ্ছেন না এই জন্য যে, আমাদের মধ্যে একমাত্র তাজউদ্দীন সাহেব মাঝে মাঝে কথা বলতেন, তিনি বলতেন যে, বঙ্গবন্ধু আপনি এটা বলছেন, বোধ হয় এটা ঠিক হবে না, বা এই জাতীয় কথা। কিন্তু এইসব কথা বলার ফলে তাজউদ্দীন সাহেবকে বঙ্গবন্ধু আর ভাল চোখে দেখেন না, এটা সবাই দেখছেন এবং বুঝতে পারছেন। সুতরাং অযথা তাঁর বিরাগভাজন হবার দরকার কী!'

'৭২-এর শেষভাগে তাজউদ্দীনের সাথে আমার কথা হয়েছিল। আমাকে বলল, 'বঙ্গবন্ধু আমাকে পছন্দ করছেন না। সেটা আমি কিছুটা বুঝতে পারছি।' আমি বললাম, ‘কোন অন্যায় করেছ ?' তাজউদ্দীন বলল, ‘না। আমার মনে হয় তিনি আমার প্রতি ঈর্ষা বোধ করেন।' আমি তাজউদ্দীনকে বললাম, ‘ঈর্ষা হবে কেন? ঈর্ষার কোন কারণ তো নেই ।'

তবে কিছুদিন আগে বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন, 'তাজউদ্দীন উচ্চাকাঙ্ক্ষী।' তখন আমি বলেছিলাম, ‘সে তো ভাল কথা। অ্যামবিশান প্রত্যেকের মনে থাকা উচিত । তবে তাজউদ্দীনকে নিয়ে তোমার আশঙ্কার তো কোন কারণ নেই । তার যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে তবে দুই নম্বর আসনটির জন্য, এক নম্বরের জন্য নয়। কারণ প্রত্যেক আওয়ামী লীগার জানে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরেই তাদের থাকতে হবে। শেখ মুজিব সরে গেলে তাদের কোন লাভ নেই। সমাজে তাদের কোন দাম নেই। কাজেই সে এক নম্বর হচ্ছে না। বাকি যারা আছে কাছাকাছি, যাদেরকে ধরে নেয়া হয় যে প্রথম সারিতে আছে, বঙ্গবন্ধুর ঠিক পরেই, তাদের মধ্যে কিছু রেষারেষি তো থাকবেই। আর এদের মধ্যে সে তাজউদ্দীন যদি এমন দাবি করে যে তার স্থান উঁচুতে থাকবে তাতে তোমার আপত্তি কী? তোমার আসন নিয়ে তো সে কিছু করছে না।' সব কথা শুনে শেখ সাহেব বললেন, “না, সে অ্যামবিশাস্ ।'

এই কথাগুলো বলে তাজউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলাম, “ঈর্ষার অন্য কোন কারণ আছে নাকি ?' ‘তাজউদ্দিন বলল, 'মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে আছে। এই যে মুক্তিযুদ্ধ হল, বঙ্গবন্ধুও জানেন, সবাই জানে এবং অন্য অনেকেই মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে জানেন যে, পুরো মুক্তিযুদ্ধ আমি চালিয়েছি। সেই জন্যই ঈর্ষা করেন আমাকে।'

আমি তখন বললাম, ‘শেখ সাহেবের তো ঈর্ষা করার কোন কারণ নেই। এই স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলন হোক বা ভাষা আন্দোলন বা অন্য যে কোন আন্দোলন—সেখানে তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন না। বেশির ভাগ সময় তিনি ছিলেন কারাগারে। কিন্তু সবকিছুর কৃতিত্ব তিনি একাই পেয়েছেন। অন্য কারো নামে তো কৃতিত্ব দেয়া হয় না, সব শেখ সাহেবের নামে দেয়া হয়। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের লোকজন বেশি করে বলতেন যে তাঁর নেতৃত্বে, তাঁর নির্দেশনায় আমরা সব করেছি। সব কৃতিত্ব তাঁকে দেয়া হচ্ছে। তিনি তো জানেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শারীরিকভাবে হাজির ছিলেন না, কিন্তু সম্পূর্ণ

কৃতিত্ব তো তিনি পেয়েছেন। এই ক্ষেত্রেও তো সবাই এক কথা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হল। সুতরাং তাঁর কৃতিত্ব তিনি পেয়েই যাচ্ছেন, কে আসলে কাজটি করেছিল সেটা নিয়ে তো তাঁর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই ।'

তাজউদ্দীন বলল, 'দেখুন, অন্য আন্দোলনের সঙ্গে এখানে একটা বড় গুণগত পার্থক্য রয়ে গেছে । মুক্তিযুদ্ধ তো শুধু আন্দোলন নয়, একটা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে গেল। একটা দেশ স্বাধীন হয়ে গেল, সংগ্রাম করে স্বাধীন হল এবং তিনি সেখানে উপস্থিত নেই । এটা বোধ হয় একটু গায়ে বাধছে, খারাপ লাগছে । তিনি জানেন আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দিয়েছি, সেইজন্যই হয়ত তিনি আমার উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছেন।'

একদিকে তাজউদ্দিন যেটা বলল, শেখ সাহেব তাঁর সম্পর্কে কী মনে করছেন, অন্য দিকে বিশেষ কিছু লোকজন এবং শেখ সাহেবের কিছু আত্মীয়স্বজনও প্রীত ছিলেন না তাজউদ্দীনের প্রতি। এই সব কিছু মিলিয়েই হয়ত তিনি ঝড়ের পূর্বাভাস হিসেবে আমাকে শুনিয়ে রেখেছিলেন যে, তাজউদ্দীন অ্যামবিশাস্ । কারণ তাজউদ্দীন যেমন জানত শেখ সাহেবের সাথে আমার সুন্দর সম্পর্কের কথা, তেমনি শেখ সাহেবও জানতেন আমার সাথে তাজউদ্দীনের সম্পর্ক ভাল। তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভা থেকে চলে যাবার বেশ কিছুদিন পর আমি ঢাকায় এসেছিলাম । তখনও শেখ সাহেবের সাথে কথা হয়েছে। তিনি নাম উচ্চারণ না করে বললেন, ''দেখ, যার উপর এত নির্ভর করতাম, বন্ধু, সে-ই এখন বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল, আমি কি বুঝি না!' আমি বললাম, 'কার কথা বলছ ?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কেন, তাজউদ্দীন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''কী শত্রুতা করল তোমার সাথে ?' তিনি জবাব দিলেন না। তখন বললাম, 'তোমার কাছে না বলে তো সে মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নেয়নি ?' তখন শেখ সাহেব বললেন, 'না এটা তো অনেক পরে, কিন্তু আগে থেকে তো সে শত্রুতা শুরু করেছে।'

মনে হল কেউ কোন কথা লাগিয়েছে। একথা হয়ত কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে বঙ্গবন্ধু কান-কথা শুনতেন খুব বেশি। আমার মনে হয়েছে যে কোন ব্যাপারে শেখ সাহেব তাজউদ্দীনের উপর নির্ভর করতে পারতেন। যেখানেই কোন অসুবিধা হচ্ছে দলের বা আন্দোলনের, তখন তাজউদ্দীনকে দেখেছি এসে সামলে নিতে পারত । আমি অনুভব করেছি তাজউদ্দীন

মন্ত্রিসভায় না থাকার ফলে বাংলাদেশ সরকারের অনেক অসুবিধা হবে।

তারপর '৭৫-এর ৭ অগাস্ট আমি বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে দিল্লীতে গেলাম । দিল্লীর বাংলাদেশ দূতাবাসে ডিফেন্স অ্যাডভাইজার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল এবং '৮১ সালে নিহত)। ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধু মুজিবকে সপরিবারে হত্যার পর মঞ্জুর বললেন, 'আমি তো রাজনীতি করি না, সৈনিক হিসেবে বাইরে থেকেই যতটা দেখেছি, তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে যখন শেখ সাহেবের মনোমালিন্য শুরু হল এবং তাজউদ্দীন সাহেব মন্ত্রিসভা থেকে চলে গেলেন তখনই বুঝলাম শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের ডেজ আর নাম্বারড়, তিনি আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারবেন না, এখন তাঁর উপর যদি কোন আক্রমণ আসে তবে তাঁকে বাঁচাবার আর কেউ থাকবে না। একজনই তাঁকে বাঁচাতে পারতেন তিনি তাজউদ্দীন, কিন্তু তিনি চলে গেলেন।' আমি মঞ্জুরের মতো ততোটা ভাবিনি । বুঝেছিলাম তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভায় না থাকাতে বেশ কিছু সমস্যা হবে।

মঞ্জুর তাজউদ্দীন সাহেব সম্পর্কে আর একটি কথা বলেছিলেন যে, '৭১-এ মুক্তিযোদ্ধা অনেকেই ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধও করেছেন অনেকেই। আমাদের বিভিন্ন নেতা যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধানত কাজ তো করেছেন তাজউদ্দীন সাহেব। তাজউদ্দীন সাহেবকে আমি দেখেছি, তিনি একটা বুশ শার্ট পরে সারাদিন কাজ করতেন, রাতে সবাই চলে যাবার পর সেটি নিজের হাতে কেচে শুকাতে দিতেন। পরদিন সকালে আবার সেই বুশ শার্ট গায়ে দিয়ে বিভিন্ন লোকজন, কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছেন, নানা রকম কাজকর্ম করছেন। এরকমভাবে কাজ তো আর কেউ করেননি। বাংলাদেশের প্রতি তাজউদ্দীন সাহেবের যে আনুগত্য এবং যে আগ্রহ ছিল তা প্রশ্নাতীত ।

[27.3.1991]

শামসুর রহমান খান : শামসুর রহমান খান জনসন। সরকারি কর্মকর্তা, সাবেক রাষ্ট্রদূত। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী এবং রাজনীতিক আতাউর রহমান খানের ছোট ভাই।

পরিশিষ্ট

তাজউদ্দীন আহমদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

তাজউদ্দীন আহমদ-এর জন্ম ২৩ জুলাই ১৯২৫ সালে ঢাকা থেকে সড়ক পথে ৮২ কিলোমিটার দূরবর্তী কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে। তাঁর বাবা মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াসিন খান এবং মা মেহেরুন্নেসা খানম । তাঁরা ছিলেন চার ভাই ও ছয় বোন। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদের শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁর বাবার কাছে আরবি শিক্ষার মাধ্যমে । একই সময় তিনি ভর্তি হন বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরবর্তী ভুলেশ্বর প্রাইমারি স্কুলে। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন প্রথম হয়ে। এই জন্য স্কুল থেকে জীবনের প্রথম পুরস্কার লাভ করেন ১০ পয়সা মূল্যমানের, দেড় পয়সার কালির দোয়াত এবং সাড়ে আট পয়সার একটি কলম। তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে তিনি ভর্তি হন দরদরিয়া থেকে পাঁচ মাইল দূরের কাপাসিয়া মাইনর ইংরেজি স্কুলে । কাপাসিয়া এম. ই. স্কুলে থাকার সময় তিন জন প্রবীণ বিপ্লবী নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাজউদ্দীন আহমদ এবং তাঁরা শিক্ষকদের কাছে এই ছাত্রকে আরো ভালো স্কুলে পাঠানোর সুপারিশ করেন। সেই সুবাদে তিনি কালিগঞ্জের সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন । এই স্কুলেও তাঁর মেধা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে তিনি ভর্তি হন ঢাকার মুসলিম বয়েজ হাইস্কুলে। তারপর সেন্ট গ্রেগরীজ হাইস্কুলে ।

স্কুলে তাজউদ্দীন বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছেন। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীর এম. ই. স্কলারশীপ পরীক্ষায় ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে তিনি প্রথম বিভাগে দ্বাদশ স্থানের অধিকারী হন। ১৯৪৮ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষাতে তিনি প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ পবিত্র কোরআন-এ হাফেজ ছিলেন। যা তিনি নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবার কাছ থেকে আয়ত্ত করেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ সালে তিনি সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং নেন এবং স্কুল ছাত্র থাকা অবস্থাতেই কয়েক মাস নিয়মিত ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় রাতের বেলায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। এই কাজের জন্য তিনি প্রতি রাতের জন্য সম্মানী পেতেন ৮ আনা । তিনি আজীবন বয়স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ।

তাজউদ্দীন আহমদ স্কুল জীবন থেকেই রাজনীতি তথা প্রগতিশীল আন্দোলন

এবং সমাজ সেবার সাথে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এ কারণেই তাঁর শিক্ষা জীবন মাঝে মাঝেই ছেদ পড়েছে এবং নিয়মিত ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দেয়া তাঁর ভাগ্যে বড় একটা জোটেনি । কিন্তু তবুও রাজনীতি ও শিক্ষা তাঁর হাতে হাত ধরে চলেছে । তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে অংশ নেয়ার কারণে তাঁর এম. এ. পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। এম. এল. এ. নির্বাচিত হয়ে তিনি আইন বিভাগের ছাত্র হিসেবে নিয়মিত ক্লাস করেছেন এবং পরবর্তীতে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে তিনি আইন শাস্ত্রেও স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

বাংলা ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষে অগণিত মানুষের খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ তাজউদ্দীনের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়ে তিনি উপলব্ধি করেন, খাদ্যভাবে আর যাতে কেউ মারা না যায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । এই চিন্তা থেকে তিনি গ্রামের লোকজনকে সংগঠিত করে স্থাপন করেন 'ধর্মগোলা', যা ছিল গ্রাম পর্যায়ে অশ্রুত এক প্রতিষ্ঠান। ফসল ওঠার মওসুমে ধনীদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য এনে ওই গোলায় জমা করা হতো, যাতে আপৎকালে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেয়া সম্ভব হয় ।

আর্তের সেবায় তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। ১৯৫৪ সালে তিনি যখন এম. এল. এ. তখন তাঁর গ্রামের সাইফুদ্দীন দফাদারের পুত্র আবদুল আজিজ (১৫) বন্দুকের গুলিতে আহত হয়। জনৈক হাসান ও অন্যদের মাধ্যমে তাকে ঢাকায় তাজউদ্দীনের কাছে আনা হলে তিনি অ্যাম্বুলেন্সে করে ওই বালককে হাসপাতালে নেন। তার জন্য তিনি নিজে ১০ আউন্স রক্ত দেন। পরে ওই বালকের মৃত্যুর সংবাদ শুনে তাজউদ্দীন আহমদ উদভ্রান্তের মত হাসপাতালে যান এবং পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থাদি করেন । এই মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছিল । তাজউদ্দীন আহমদ নিজ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার করেন। সেখানে তিনি একাডেমিক শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতেন।

ছাত্র জীবন থেকেই বাংলার মানুষের মুক্তির রাজনীতির সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের সম্পৃক্ততা ঘটে। ১৯৪৩ সাল থেকে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই পূর্ব- বাংলার মানুষের মুক্তির পথানুসন্ধান শুরু করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি

বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন । কাউন্সিলার হিসেবে তিনি ১৯৪৫ এবং ১৯৪৭ সালে দিল্লী কনভেনশনে যোগ দেন । স্বাধীনতা আন্দোলনে দলীয় কর্মসূচি প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সেই সময় অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচারাভিযান চালান ।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্বপাকিস্তানে ভাষার অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যত আন্দোলন হয়েছে তাজউদ্দীন তার প্রতিটিতেই নিজ চিন্তা ও কর্মের সাক্ষর রাখেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পুর্বপাকিস্তান ছাত্র লীগ (বর্তমান বাংলাদেশ ছাত্র লীগ) গঠিত হয়; তিনি ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ।

তাজউদ্দীন আহমদ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষার প্রশ্নে যে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে তিনি ছিলেন তার সক্রিয় অংশী ।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। তাজউদ্দীন ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তাদের অন্যতম। ১৯৫৩-৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে তরুণ তাজউদ্দীন সেই সময়ের পূর্বপাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকির আবদুল মান্নানকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে এম. এল. এ. নির্বাচিত হন। নির্বাচনে তাজউদ্দীন আহমদ ১৯০৩৯ এবং ফকির আবদুল মান্নান ৫৯৭২ ভোট পান ।

১৯৫৫ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে তাজউদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন । এই সময় তিনি যুক্তরাজ্যও সফর করেন। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ নেন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন ।

এর পরের বছরগুলি তাজউদ্দীন আহমদ এবং আওয়ামী লীগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলীয় সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা ঘোষণা করেন। উল্লেখযোগ্য, ৬ দফার অন্যতম রূপকার

ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ । আপন সাংগঠনিক দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার গুণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী । এই বছরই তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ৬-দফার প্রচারাভিযানের সময় ১৯৬৬ সালের ৮ মে তিনি গ্রেফতার হন এবং গণ-অভ্যুত্থানের ফলে ১৯৬৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ করেন। এরপর ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে এবং পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তাজউদ্দীন আহমদ ঐ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন ।

নির্বাচনের পর গণরায় অস্বীকার করে বাঙালিদের অধিকার অর্জনের দাবি নস্যাৎ- এ নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং ১ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্বপাকিস্তানে শুরু হয় অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন ।

এই অসহযোগ আন্দোলনে সাংগঠনিক দিকসমূহ পরিচালনা ও জনগণের কর্তৃত্বের পরিপ্রকাশক নির্দেশাবলী প্রণয়নে তাজউদ্দীন আহমদ অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা প্রদর্শন করেন । অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেই পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের সঙ্গে ঢাকায় আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়। ১৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই আলোচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থাভাজন সহযোগী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় দেন ।

২৪ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য চূড়ান্ত বৈঠক হবার কথা ছিল। কিন্তু সে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং ২৫ মার্চ সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর আলোচক ও সহযোগীরা কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকেই ঢাকাসহ বিভিন্নস্থানে শান্তিপ্রিয় জনগণের উপর পরিচালনা করা হয় গণহত্যার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি। ইয়াহিয়ার নির্দেশে সামরিক বাহিনী শুরু করে গণহত্যাযজ্ঞ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এমন বিশ্বাসঘাতকতার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বে মূল দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দীন আহমদের

ওপর। ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তিনি সর্বসম্মতভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে এই সরকার স্থানীয় জনগণ এবং শত শত দেশী বিদেশী সাংবাদিক ও প্রচার মাধ্যম প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। শুরু হয় বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক সশস্ত্র স্বাধীনতার যুদ্ধ। বাংলাদেশের ইতিহাসের ঐতিহাসিক এই সন্ধিক্ষণে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। চরম প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সামরিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বিষয়াদিসহ সকল দিক সংগঠিত করে তোলেন। তাঁর সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসেই মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও স্বদেশ প্রেম সকলকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দান তাজউদ্দীন আহমদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে নির্দ্বিধায় অভিহিত করা চলে ।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা সঠিত হয় সেই মন্ত্রিসভায় অর্থ-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । মন্ত্রী হিসেবে আত্মনির্ভর বিকাশমান অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি মন্ত্রিত্বের পদ থেকে সরে দাঁড়ান ।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট ক্ষমতা দখলকারী ঘাতকদের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একই দিন সকালে তাজউদ্দীন আহমদকে গৃহবন্দি করা হয় এবং পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় করাগারে নিয়ে যাওয়া হয় । বন্দি অবস্থায় ৩ নভেম্বর ১৯৭৫, কারাগারের সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে বর্বরতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় তাজউদ্দীন আহমদ এবং অপরাপর তিন জাতীয় নেতা-সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম. মনসুর আলী এবং এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে ।

যিনি ছিলেন এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, যিনি আজীবন জনগণের কল্যাণ নিয়ে ভেবেছেন, যে মানুষটি বাঙালি জাতির জন্য সুখী স্বাধীন জীবন গড়ার সংগ্রামে পরমভাবে নিবেদিত ছিলেন, সেই প্রচারবিমুখ, ত্যাগী ও কৃতি দেশপ্রেমিক মানুষটিকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকের দল।

মৃত্যু তাজউদ্দীন আহমদকে মহিমান্বিত করে। নতুন রূপে উদ্ভাসিত হন তিনি। তাঁর রেখে যাওয়া কর্ম, ভাবনা আলোকদ্যুতি ছড়ায় এ দেশের আকাশে বাতাসে। বাঙালি জাতি তথা বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে চির অক্ষয় হয়ে লেখা রয় তাঁর অবদান ।

এক. ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যে বক্তৃতা প্রদান করেন তার বিবরণ

এপ্রিল ১৭, ১৯৭১

আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে, তারা আমাদের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি দেখে যাবার জন্য বহু কষ্ট করে, বহু দূর-দূরান্ত থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন ।

আমি কিছু বলবার আগে প্রথমেই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সংবাদপত্রসেবী এবং নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধিদেরকে যে, তারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আগাগোড়া সমর্থন দিয়ে গিয়েছেন এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন । যদিও ইয়াহিয়া সরকার তাদেরকে এবং তার সেই দস্যু বাহিনী বিদেশী সাংবাদিকদেরকে ভেতরে আসতে দেয়নি, যারা ভেতরে ছিলেন তাদেরকেও জবরদস্তি করে ২৫ তারিখ রাতেই বেরে করে দিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে আরো ধন্যবাদ দিচ্ছি, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই জন্য যে, আমার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম কোন অবস্থাতেই যাতে ব্যাহত না হয় এবং কোন অবস্থাতেই সে সংগ্রামকে ভুল ব্যাখা না দেয়া হয় সে জন্য আপনারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, সঠিক পথ দেখিয়েছেন ।

আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে আবেদন জানাবো ভবিষ্যতেও আপনারা দয়া করে চেষ্টা করবেন যাতে সঠিক সংবাদ পরিবেশিত হয়, যাতে কোন দৃষ্কৃতকারি বা কোন শত্রু বা এজেন্ট ভুল ব্যাখা দিয়ে আমাদের আন্দোলনের কোন রকম ভুল ব্যাখ্যা করতে না পারে, ভুল বোঝাতে না পারে । সেই সাথে আমি আপনাদেরকে আরো অনুরোধ জানাব, আমাদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যে হ্যান্ড আউট যাবে সেটাকেই বাংলাদেশ

সরকারের সঠিক ভাষ্য বলে ধরে নেবেন, সেটাকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে নেবেন । আর আমি আপনাদেরকে আরো একটি অনুরোধ জানাব, জানি না কিভাবে সেটা সম্ভব হবে, আমাদের বাংলাদেশের মাটি থেকে আপনারা কিভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেন, কিভাবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে লিয়াজোঁ করতে পারেন সেই ব্যাপার আপনারা চিন্তা করে দেখবেন এবং সেই ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ আমরা অত্যন্ত সাদরে, আনন্দের সাথে গ্রহণ করব।

এখন আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমার ভাষ্য তুলে ধরব । বাংলাদেশ এখন যুদ্ধে লিপ্ত। পাকিস্তানের ঔপনিবেশবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনও বিকল্প নেই ।

বাংলাদেশে গণহত্যার আসল ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারের অপপ্রচারের মুখে বিশ্ববাসীকে অবশ্যই জানাতে হবে কিভাবে বাংলার শান্তিকামী মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতিকেই বেছে নিয়েছিল । তবেই তারা বাংলাদেশর ন্যায়সঙ্গত আশা আকাঙ্খাকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন ।

পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে আওয়ামী লীগ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ৬-দফার আলোকে বাংলাদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগ এই ৬-দফা নির্বাচনী ইশতেহারের ভিত্তিতেই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে মোট ১৬৭টি আসন লাভ করেছিল । নির্বাচনী বিজয় এতই চূড়ান্ত ছিল যে, আওয়ামী লীগ মোট শতকরা আশিটি ভোট পেয়েছিল । এই বিজয়ের চূড়ান্ত রায়েই আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ।

স্বভাবতঃই নির্বাচন পরবর্তী সময়টি ছিল আমাদের জন্য এক আশাময় দিন। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের এমনি চূড়ান্ত রায় ছিল অভূতপূর্ব। দুই প্রদেশের জনগণই বিশ্বাস করেছিলেন যে, এবার ৬-দফার ভিত্তিতে উভয় প্রদেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব হবে। তবে সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপল্স্ পার্টি তাদের নির্বাচন অভিযানে ৬-দফাকে এড়িয়ে গিয়েছিল। কাজেই ৬-দফাকে গ্রহণ

বা প্রত্যাখান করার জন্য জনগণের কাছে এই দলের জবাবদিহি ছিল না। বেলুচিস্তানের নেতৃস্থানীয় দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছিল ৬-দফার পূর্ণ সমর্থক। উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রভাবশালী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও ৬-দফার আলোকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী ছিল । কাজেই প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজয় সূচনাকারী ৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান গণতন্ত্রের আশাপ্রদ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করেছিল ।

আশা করা গিয়েছিল যে, জাতীয় পরিষদ আহ্বানের প্রস্তুতি হিসেবে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি আলোচনায় বসবে। এমনি আলোচনার প্রস্তাব এবং পাল্টা প্রস্তাবের ওপর গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য আওয়ামী লীগ সব সময়ই সম্মত ছিল। তবে এই দল বিশ্বাস করেছে যে, যথার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখার জন্য গোপনীয় সম্মেলনের পরিবর্তে জাতীয় পরিষদেই গঠনতন্ত্রের ওপর বিতর্ক হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল যথাসত্ত্বর জাতীয় পরিষদ আহ্বানের জন্য। আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে একটি খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নেরর কাজে লেগে গেল এবং এ ধরনের একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সব আইনগত এবং বাস্তব দিকও তারা পরীক্ষা করে দেখল ।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ওপর আলোচনার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে । এই বৈঠকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের ৬-দফা ভিত্তিক কর্মসূচিকে বিশ্লেষণ করলেন এবং ফল কি হতে পারে তারও নিশ্চিত ভরসা নিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান তার নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকলেন । তিনি এমন এক ভাব দেখালেন যে, ৬-দফায় সাংঘাতিক আপত্তিজনক কিছুই তিনি খুঁজে পাননি । তবে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির সাথে একটি সমঝোতায় আসার ওপর তিনি জোর দিলেন ।

পরবর্তী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি এবং আওয়ামী লীগের সাথে ঢাকায় ২৭ জানুয়ারি '৭১। জনাব ভুট্টো এবং তার দল আওয়ামী লীগের সাথে গণতন্ত্রের ওপর আলোচনার জন্য এ সময়ে কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হন। ইয়াহিয়ার ন্যায় ভুট্টোও গঠনতন্ত্রের অবকাঠামো সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনয়ন করেননি । বরং তিনি এবং তার দল ৬-দফার বাস্তব ফল কি

হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনার প্রতিই অধিক ইচ্ছুক ছিলেন। যেহেতু এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল না সূচক, এবং যেহেতু এ নিয়ে তাদের কোনও তৈরি বক্তব্যও ছিল না, সেহেতু, এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপোস ফরমূলায় আসা ও সম্ভব ছিল না । অথচ দুই দলের মধ্যে মতানৈক্য দূর করার জন্য প্রচেষ্টার দুয়ার সব সময়ই খোলা ছিল । এই আলোচনা বৈঠক থেকেও এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন্ পর্যায় থেকে আপোস ফরমূলায় আসা সম্ভব সে সম্পর্কেও জনাব ভুট্টোর নিজস্ব কোনও বক্তব্য ছিল না ।

এখানে একটি কথা আরো পরিষ্কারভাবে বলে রাখা দরকার যে, আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এ ধরনের কোনও আভাসও পাকিস্তান পিপল্স্ পার্টি প্রধান ঢাকা ত্যাগের আগে দিয়ে যাননি। উপরন্তু তারা নিশ্চয়তা দিয়ে গেলেন যে, আলোচনার জন্য সব দরজাই খোলা রয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনার পর পাকিস্তান পিপল্স্ পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিতীয় দফায় আরো অধিক ফলপ্রসূ আলোচনায় বসবেন, অথবা জাতীয় পরিষদেও তারা ভিন্নভাবে আলোচনার বসার জন্য অনেক সুয়োগ পাবেন ।

পরবর্তী পর্যায়ে জনাব ভুট্টোর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত সবাইকে বিস্মিত ও হতবাক করে । তার এই সিদ্ধান্ত এ জন্যই সবাইকে আরো বেশি বিস্মিত করে যে, শেখ মুজিবের দাবি মোতাবেক ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথামতই ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেছিলেন। পরিষদ বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য সমস্ত দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনের অভিযান শুরু করেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রাখা। এ কাজে ভুট্টোর হস্তকে শক্তিশালী করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহচর লে. জেনারেল ওমর ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের ওপর পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। জনাব ভুট্টো ও লে. জেনারেল ওমরের চাপ সত্ত্বেও পি.পি.পি. ও কাইয়ুম লীগের সদস্যগণ ব্যতীত অপরাপর দলের সমস্ত সদস্যই ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিমানে পূর্ব-বাংলায় গমনের টিকিট বুক করেন । এমনও আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছিল যে, পি.পি.পি.-র বহু সদস্য দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঢাকায় আসতে

পারেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেও যখন কোন কুলকিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন ১ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা করেন জেনারেল ইয়াহিয়া তার দোস্ত ভুট্টোকে খুশি করার জন্য । শুধু তাই নয়, জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব-বাংলার গভর্নর আহসানকেও বরখাস্ত করলেন। গভর্নর আহসান ইয়াহিয়া প্রশাসনে মধ্যপন্থি বলে পরিচিত ছিলেন। বাঙালিদের সংমিশ্রণে কেন্দ্রে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তাও বাতিল করে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারি জান্তার হাতে তুলে দেয়া হল ।

এমতাবস্থায় ইয়াহিয়ার সমস্ত কার্যক্রমকে কোনক্রমেই ভুট্টোর সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে বাংলাদেশের গণ রায় বানচাল করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না । জাতীয় পরিষদই ছিল একমাত্র স্থান যেখানে বাংলাদেশ তার বক্তব্য কার্যকরি করতে পারত এবং রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারত। এটাকে বানচাল করার চেষ্টা চলতে থাকে। চলতে থাকে জাতীয় পরিষদকে সত্যিকার ক্ষমতার উৎস না করে একটা ঠুটো জগন্নাথে' পরিণত করার ।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের প্রতিক্রিয়া যা হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই হয়েছে । ইয়াহিয়ার এই স্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সারা বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। কেননা বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন ইচ্ছাই ইয়াহিয়া খানের নেই এবং তিনি পার্লামেন্টারি রাজনীতির নামে তামাশা করছেন। বাংলাদেশের জনগণ এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এক পাকিস্তানের কাঠামোতে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের কোন সম্ভাবনা নেই । ইয়াহিয়া নিজেই আহ্বান করে আবার নিজেই যেভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন তা থেকেই বাঙালি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তাই তারা এক বাক্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর চাপ দিতে থাকেন ।

শেখ মুজিব এতদ্সত্ত্বেও সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ৩ মার্চ অসহযোগ কর্মসূচির আহ্বান জানাতে গিয়ে তিনি দখলদার বাহিনীকে মোকাবেলার জন্য শান্তির অস্ত্রই বেছে নিয়েছিলেন। তখনো তিনি আশা করছিলেন যে, সামরিক চক্র তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে পাবে। গত ২ ও ৩ মার্চ ঠাণ্ডা মাথায় সামরিক চক্র কর্তৃক হাজার হাজার নিরস্ত্র

ও নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করার মুখে বঙ্গবন্ধুর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ।

শেখ সাহেবের অসহযোগ আন্দোলন আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টি করলেন এক নতুন ইতিহাস । বাংলাদেশে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন যেভাবে এগিয়ে গেছে মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তার নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। এত কার্যকরি অসহযোগ আন্দোলন কোথাও সাফল্য লাভ করেনি। পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলেছে দেশের সর্বত্র। নতুন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য পাওয়া গেল না হাইকোর্টের কোন বিচারপতি । পুলিশ এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসসহ গণ-প্রশাসন বিভাগের কর্মচারিগণ কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। জনগণ সেনাবাহিনীর সরবারাহ বন্ধ করে দিল। এমনকি সামরিক দপ্তরের অসামরিক কর্মচারিগণ তাদের অফিস বয়কট করলেন। কেবল কাজে যোগদান থেকে বিরত থেকে তারা ক্ষান্ত হলেন না, অসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের লোকেরাও সক্রিয় সমর্থন ও নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করলেন শেখ সাহেবের প্রতি। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়া তারা অন্য কারো নির্দেশ মেনে চলবেন না ।

এ অবস্থার মুখোমুখি হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাসীন না হয়েও অসহযোগের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণে আওয়ামী লীগ বাধ্য হল। এ ব্যাপারে শুধু আপামর জনগণই নয়, বাংলাদেশের প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন লাভ তারা করেছিলেন। তারা আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী সর্বান্তকরণে মাথা পেতে মেনে নিলেন এবং সমস্যাবলীর সমাধানে আওয়ামী লীগকে একমাত্র কর্তৃপক্ষ বলে গ্রহণ করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ফাটল ধরলে দেখা দেয় নানাবিধ দুরূহ সমস্যা। কিন্তু এসব সমস্যাবলীর মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দপ্তরের কাজ যথারীতি এগিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকগণ আইন শৃংখলা রক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা স্বাভাবিক সময়েও অন্যদের অনুকরণীয় হওয়া উচিত। আওয়ামী লীগ ও ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি জনগণের সর্বাধিক সমর্থন দৃষ্টে জেনারেল ইয়াহিয়া তার কৌশল পাল্টালেন।

৬ মার্চ ইয়াহিয়াকে একটা কনফ্রন্টেশনের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে মনে হল। কেননা তার ঐ দিনের প্ররোচনামূলক বেতার বক্তৃতায় সঙ্কটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপালেন আওয়ামী লীগের ওপর। অথচ যিনি ছিলেন সঙ্কটের স্থপতি সেই ভুট্টো সম্পর্কে তিনি একটি কথাও বললেন না। মনে হয় তিনি ধারণা করেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তা নির্মূল করার জন্য ঢাকার সেনাবাহিনীকে করা হয় পূর্ণ সতর্কীকরণ। লে. জেনারেল ইয়াকুব খানের স্থলে পাঠানো হল লে. জেনারেল টিক্কা খানকে। এই রদবদল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সামরিক জান্তার ঘৃণ্য মনোভাবের পরিচয়।

কিন্তু ইতোমধ্যে মুক্তিপাগল মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। এ সত্ত্বেও শেখ মুজিব রাজনৈতিক সমাধানের পথে অটল থাকেন। জাতীয় পরিষদের যোগদানের ব্যাপারে তিনি যে ৪-দফা প্রস্তাব পেশ করেন তাতে যেমন একদিকে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের ইচ্ছা, অপরদিকে শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌছানোর জন্য ইয়াহিয়াকে দেয়া হয় তার শেষ সুযোগ ।

তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ইয়াহিয়া এবং তার জেনারেলদের ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে সামরিক শক্তিকে জোরদার করার জন্য কালক্ষেপণ করা। ইয়াহিয়ার ঢাকা সফর ছিল আসলে বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এটা আজ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, অনুরূপ একটি সঙ্কট সৃষ্টির পরিকল্পনা বেশ আগেভাগেই নেয়া হয়েছিল ।

১ মার্চের ঘটনার সামান্য কিছু আগে রংপুর থেকে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত ট্যাঙ্কগুলো ফেরত আনা হয়। ১ মার্চ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানি কোটিপতি ব্যবসায়ী পরিবারসমূহের সাথে সেনাবাহিনীর লোকদের পরিবার পরিজনদেরকেও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতে থাকে।

১ মার্চের পর থেকে বাংলাদেশে সামরিক শক্তি গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করা হয় এবং তা ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে। সিংহলের পথে পিআইয়ের কমার্শিয়াল ফ্লাইটে সাদা পোশাকে সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের বাংলাদেশে আনা হল । সি ১৩০ পরিবহন বিমানগুলোর সাহায্যে অস্ত্র এবং রসদ এনে বাংলাদেশে স্তূপিকৃত করা হয় ।

হিসাব নিয়ে জানা গেছে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামসহ অতিরিক্ত এক ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে আমদানি করা হয় । ব্যাপারটা নিরাপদ করার জন্য ঢাকা বিমান বন্দরকে বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আনা হয় । সমগ্র বিমান বন্দর এলাকায় আর্টিলারি ও মেশিন গানের জাল বিস্তার করা হয়। যাত্রীদের আগমন-নির্গমনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যাকান্ড সংগঠনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত একদল এস. জি. কমান্ডো গ্রুপ বাংলাদেশের বিভিন্ন গরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ছেড়ে দেয়া হয় । ২৫ মার্চের পূর্ববর্তী দুই দিনে ঢাকা ও সৈয়দপুরে যেসব কুকান্ড ঘটে এরাই সেগুলো সংঘটন করেছিল । সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে একটা উত্তেজনার পরিবেশ খাড়া করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য ।

প্রতারণা বা ভন্ডামির এই স্ট্রাটেজি গোপন করার অংশ হিসেবেই ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে তার আলোচনায় আপোসমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৬ মার্চ আলোচনা শুরু হলে ইয়াহিয়া তৎপূর্বে যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন । শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ইয়াহিয়ার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগের ক্ষমতা হস্তান্তরের ৪-দফা শর্তের প্রতি সামরিক জান্তার মনোভাব কি ? জবাবে ইয়াহিয়া জানান যে, এ ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আপত্তি নেই। তিনি আশা করেন যে, ৪-দফা শর্ত পূরণের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের উপদেষ্টাগণ একটা অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম হবেন ।

আলোচনাকালে যে সব মৌলিক প্রশ্নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলি হল :

১। মার্শাল ল বা সামরিক আইন প্রত্যাহার করে প্রেসিডেন্টের একটি ঘোষণার মাধ্যমে একটি বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ।

২। প্রদেশগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ।

৩। ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করবেন।

৪। জাতীয় পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যগণ পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে মিলিত হবেন ।

আজ ইয়াহিয়া ও ভুট্টো জাতীয় পরিষদের পৃথক পৃথক অধিবেশনের প্রস্তাবের বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। অথচ ইয়াহিয়া নিজেই ভুট্টোর মনোনয়নের জন্য এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ প্রস্তাবের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইয়াহিয়া সেদিন নিজেই বলেছিলেন যে, ৬-দফা হল বাংলাদেশের এবং কেন্দ্রের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের এক নির্ভরযোগ্য নীল নক্সা । পক্ষান্তরে এটার প্রয়োগ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সৃষ্টি করবে নানারূপ অসুবিধা। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানি এম. এন. এ. দের পৃথকভাবে বসে ৬-দফার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্র এবং এক ইউনিট ব্যবস্থা বিলোপের আলোকে একটা নতুন ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে ।

শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার মধ্যকার এই নীতিগত মতৈক্যের পর একটি মাত্র প্রশ্ন থেকে যায় এবং তা হল অন্তর্বর্তী পর্যায়ে কেন্দ্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন। এ ক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ এই মর্মে একমত হয়েছিলেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতে অদূর ভবিষ্যতে যে শাসনতন্ত্র রচিত হতে যাচ্ছে মোটামুটি তার আলোকেই কেন্দ্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন হবে ।

অন্তর্বর্তীকালীন মীমাংসার এই সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম. এম. আহমদকে বিমানে করে ঢাকা আনা হয় । আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের সাথে আলাপ-আলোচনায় তিনি স্পষ্টভাবে এ কথা বলেন যে, রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৬-দফা কার্যকরি করার প্রশ্নে দুর্লভ কোন সমস্যা দেখা দেবে না। এমনকি অন্তর্বর্তী পর্যায়েও না ।

আওয়ামী লীগের খসড়ার ওপর তিনি যে তিনটি সংশোধনী পেশ করেছিলেন তাতে একই কথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, সরকার এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে তখন যে ব্যবধানটুকু ছিল তা নীতিগত নয়, বরং কোথায় শব্দ বসবে সে নিয়ে । ২৪ মার্চের বৈঠকে ভাষার সামান্য রদবদলসহ সংশোধনীগুলি আওয়ামী লীগ গ্রহণ করে। অত:পর অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র চুড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের শেষ দফা বৈঠকে মিলিত হওয়ার পথে আর কোন বাধাই ছিল না ।

এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে হয়, কোন পর্যায়েই আলোচনা অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়নি । অথচ ইয়াহিয়া বা তার উপদেষ্টারা আভাস-ইঙ্গিতেও এমন কোন কথা বলেননি যে, তাদের এমন একটা বক্তব্য আছে যা

থেকে তারা নড়চড় করতে পারেন না ।

গণহত্যাকে ধামা-চাপা দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে আইনগত ছত্রছায়ার প্রশ্নেও আজ জোচ্চুরির আশ্রয় নিয়েছেন । আলোচনায় তিনি এবং তার দলবল একমত হয়েছিলেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল তিনিও সেভাবে একটা ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের আইনগত ছত্রছায়ার ব্যাপারে ভুট্টো পরবর্তীকালে যে ফ্যাকড়া তুলেছেন ইয়াহিয়া তাই অনুমোদন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ইয়াহিয়া ঘুণাক্ষরেও মুজিবকে এ সম্পর্কে কিছু জানাননি। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতীয় পরিষদের একটা অধিবেশন বসা দরকার ইয়াহিয়া যদি আভাস ইঙ্গিতেও এ কথা বলতেন তাহলে আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই তাতে আপত্তি করত না। কেননা এমন একটা সামান্য ব্যাপারকে উপেক্ষা করে আলোচনা বানচাল করতে দেয়া যায় না। তাছাড়া জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগুরু দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভয় করার কিছুই ছিল না। দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদের সদস্যদের পৃথক পৃথক বৈঠকের যে প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সম্মতি দিয়েছিল, তা শুধু ভুট্টোকে খুশি করার জন্যই করা হয়েছিল । এটা কোন সময়ই আওয়ামী লীগের মৌলিক নীতি ছিল না।

২৪ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের মধ্যে চূড়ান্ত বৈঠকে জনাব এম. এম. আহমদ তার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন । এই খসড়া প্রস্তাবের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেনারেল পীরজাদার আহ্বানে একটা চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। দুঃখের বিষয় কোন চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং জনাব এম. এম. আহমদ আওয়ামী লীগকে না জানিয়ে ২৫ মার্চ করাচী চলে গেলেন।

২৫ মার্চ রাত ১১টা নাগাদ সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় এবং সেনাবাহিনী শহরে 'পজিশন' গ্রহণ করতে থাকে । মধ্যরাত্রি নাগাদ ঢাকা শহরের শান্তিপ্রিয় জনগণের ওপর পরিচালনা করা হল গণহত্যার এক পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মসূচি। অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতার নজির সমসাময়িক ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে দেননি কোন চরমপত্র । অথবা মেশিন গান, আর্টিলারি সুসজ্জিত ট্যাঙ্কসমূহ যখন মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও ধ্বংসলীলা শুরু করে দিল তার আগে জারি করা হয়নি কোন কারফিউ অর্ডার। পরদিন সকালে লে. জেনারেল টিক্কা খান তার প্রথম সামরিক নির্দেশ

জারি করলেন বেতার মারফত। কিন্তু ৫০ হাজার লোক তার আগেই প্রাণ হারিয়েছেন বিনা প্রতিরোধে। এদের অধিকাংশই ছিল নারী ও শিশু। ঢাকা শহর পরিণত হয় নরককুণ্ডে, প্রতিটি অলিগলি ও আনাচেকানাচে চলতে লাগল নির্বিচারে গুলি। সামরিক বাহিনীর লোকদের নির্বিচারে অগ্নিসংযোগের মুখে অন্ধকারে বিছানা ছেড়ে যে-সব মানুষ বের হওয়ার চেষ্টা করল তাদেরকেও নির্বিচারে হত্যা করা হয় মেশিন গানের গুলিতে ।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণের মুখেও পুলিশ ও ই.পি.আর. বীরের মত লড়ে গেল । কিন্তু দুর্বল, নিরীহ মানুষ কোন প্রতিরোধ দিতে পারল না। তারা মারা গেল হাজারে হাজারে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সেনাবাহিনী যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে আমরা তার একটা নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রস্তুত করছি এবং শীঘ্রই তা প্রকাশ করব। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে সব বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী আমরা শুনেছি, এদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা তার সবকিছুকে ম্লান করে দিয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে তিনি তাদেরকে দিয়ে গেলেন বাঙালি হত্যার এক অবাধ লাইসেন্স। কেন তিনি এই বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, পরদিন রাত ৮টার সময় বিশ্ববাসীকে জানান হল এর কৈফিয়ত। এই বিবৃতিতে তিনি নরমেধযজ্ঞ সংঘঠনের একটা ব্যাখ্যা বিশ্ববাসীকে জানালেন। তার বক্তব্য একদিকে ছিল পরস্পর বিরোধী এবং অন্যদিকে ছিল মিথ্যার বেসাতিতে ভরা। মাত্র ৪৮ ঘন্টা আগেও যে দলের সাথে তিনি শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন সে দলের লোকদের দেশদ্রোহী ও দলটিকে অবৈধ ঘোষণার সাথে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বা আলাপ-আলোচনায় কোন সংগতি খুঁজে পেল না বিশ্ববাসী। বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল এবং জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগুরু আসনের অধিকারী আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করে গণ-প্রতিনিধিদের হাতে তার ক্ষমতা হস্তান্তরের ওয়াদাকে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অবাধ মত প্রকাশের প্রতি তামাশা ছাড়া মানুষ আর কিছু ভাবতে পারল না। তার বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল যে, ইয়াহিয়া আর যুক্তি বা নৈতিকতার ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে চান না এবং বাংলাদেশের মানুষ নির্মূল করার জন্য জঙ্গি আইনের আশ্রয় নিতে বদ্ধপরিকর। পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে যে শত সহস্র মানুষের মৃত্যু হয়েছে তা

পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হিসেবে বিরাজ করছে। পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যায় মত্ত হয়ে ওঠার আগে ইয়াহিয়ার ভাবা উচিত ছিল তিনি নিজেই পাকিস্তানের কবর রচনা করছেন। তারই নির্দেশে তার লাইসেন্সধারী কসাইরা জনগণের ওপর যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তা কোনমতেই একটা জাতীয় ঐক্যের অনুকূল ছিল না। বর্ণগত বিদ্বেষ এবং একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়াই ছিল এর লক্ষ্য। মানবতার লেশমাত্রও এদের মধ্যে নেই। উপরওয়ালাদের নির্দেশে পেশাদার সৈনিকরা লংঘন করেছে তাদের সামরিক নীতিমালা এবং ব্যবহার করেছে শিকারী পশুর মত। তারা চালিয়েছে হত্যাযজ্ঞ, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নির্বিচারে ধ্বংসলীলা। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এর নজীর নেই। এ সব কার্যকলাপ থেকে এ কথারই আভাস মেলে যে, ইয়াহিয়া খান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মনে দুই পাকিস্তানের ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। যদি না হত তাহলে তারা একই দেশের মানুষের ওপর এমন নির্মম বর্বরতা চালাতে পারত না। ইয়াহিয়ার এই নির্বিচারে গণহত্যা আমাদের জন্য রাজনৈতিক দিক থেকে অর্থহীন নয়। তার এ কাজ পাকিস্তানের বিয়োগান্ত এই মর্মান্তিক ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, যা ইয়াহিয়া রচনা করেছেন বাঙালির রক্ত দিয়ে। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া বা নির্মূল হওয়ার আগে তারা গণহত্যা ও পোড়া মাটি নীতির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে শেষ করে দিয়ে যেতে চায়। ইত্যবসরে ইয়াহিয়ার লক্ষ্য হল আমাদের রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী মহল ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্মূল করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শহরগুলোকে ধূলিস্যাৎ করা, যাতে একটি জাতি হিসেবে কোনদিনই আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি ।

ইতোমধ্যে এ লক্ষ্য পথে সেনাবাহিনী অনেকদূর এগিয়ে গেছে। যে বাংলাদেশকে তারা দীর্ঘ ২৩ বছর নিজেদের স্বার্থে লাগিয়েছে, শোষণ করেছে, তাদেরই বিদায়ী লাথির উপহার হিসেবে সেই বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তান থেকে ৫০ বছর পিছিয়ে পড়ল ।

অসউইজের পর গণহত্যার এমন জঘন্যতম ঘটনা আর ঘটেনি। অথচ বৃহৎ শক্তিবর্গ বাংলাদেশের ঘটনার ব্যাপারে উট পাখির নীতি অনুসরণ করে চলেছেন । তারা যদি মনে করে থাকেন যে, এতদ্বারা তারা পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে সহায়তা করেছেন, তা হলে তারা ভুল করেছেন। কেননা, পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান নিজেও মোহমুক্ত ।

তাদের বোঝা উচিত যে, পাকিস্তান আজ মৃত এবং ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের হত্যাকারী। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একটা বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি সন্তান রক্ত দিয়ে এই নতুন শিশু রাষ্ট্রকে লালিত পালিত করছেন। দুনিয়ার কোন জাতি এ নতুন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক দুনিয়ার ছোট বড় প্রতিটি রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে এ নতুন জাতিকে । স্থান দিতে হবে বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জে।

সুতরাং রাজনীতি এবং মানবতার স্বার্থেই আজ বৃহৎ শক্তিবর্গের উচিত ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা, তার লাইসেন্সধারী হত্যাকারীদের খাঁচায় আবদ্ধ করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা। আমাদের সংগ্রামকে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ যে সমর্থন দিয়েছেন তা আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করব। গণচীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন ও অন্যান্য দেশের কাছ থেকেও আমরা অনুরূপ সমর্থন আশা করি এবং তা পেলে সে জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাব । প্রত্যেকাটি রাষ্ট্রের উচিত তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং তারা যদি তা করেন তাহলে ইয়াহিয়ার পক্ষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর একদিনও হামলা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর সৃষ্ট ভস্ম ও ধ্বংসস্তুপের ওপর একটা নতুন দেশ গড়ে তোলা । এ একটা দুরূহ ও বিরাট দায়িত্ব । কেননা আগে থেকেই আমরা বিশ্বের দরিদ্রতম জাতিসমূহের অন্যতম। এছাড়া একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মানুষ এক ঐতিহসাকি সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণপণে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে । তারা প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে । সুতরাং তাদের আশা আমরা ব্যর্থ করতে পারি না। তাদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করতেই হবে।

আমার বিশ্বাস, যে জাতি নিজে প্রাণ ও রক্ত দিতে পারে, এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, সে জাতি তার দায়িত্ব সম্পাদনে বিফল হবে না। এ জাতির অটুট ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে কোন বাধা বিপত্তি টিকতে পারে না ।

আমাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমরা কামনা করি বিশ্বের প্রতিটি ছোট বড় জাতির বন্ধুত্ব। আমরা কোন শক্তি, ব্লক বা সামরিক জোটভুক্ত হতে চাই না-আমরা আশা করি শুধুমাত্র শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে সবাই নিঃসংকোচে

আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কারো তাবেদারে পরিণত হওয়ার জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের মানুষ এত রক্ত দেয়নি, এত ত্যাগ স্বীকার করছে না। আমাদের এই জাতীয় সংগ্রামে তাই আমরা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থনের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে প্রতিটি দিনের বিলম্ব ডেকে আনছে সহস্র মানুষের অকাল মৃত্যু এবং বাংলাদেশের মূল সম্পদের বিরাট ধ্বংস। তাই বিশ্ববাসীর প্রতি আমাদের আবেদন, আর কালবিলম্ব করবেন না, এই মুহূর্তে এগিয়ে আসুন এবং এতদ্বারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের চিরন্তন বন্ধুত্ব অর্জন করুন ।

বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম, বিশ্বের আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশি দাবিদার হতে পারে না। কেননা, আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি, অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি। জয়বাংলা ।

সূত্র ঃ তাজউদ্দীন আহমদ: ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃষ্ঠা ১০৯-১২১

দুই. ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আয়োজিত আলোচনা সভায় তাজউদ্দীন আহমদ যে বক্তৃতা দেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

জানুয়ারি ১৬, ১৯৭৪ বুধবার : দৈনিক ইত্তেফাক

সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হইলে ইতিহাসের কলংকিত অধ্যায়ে আমাদের নাম লেখা হইবে : (জাতীয় দিবস উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)।

মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে তারা অমর, তারা চিরদিন বাংলার মাটিতে বেঁচে থাকবেন । কারণ তাদের কথা রক্ত দিয়ে লেখা হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অধ্যায়ে। তারা মরে প্রমাণ করে গেছেন, বিশ্বাস ও আদর্শের জন্য, ভবিষ্যৎ বাংলার মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য, সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, কল্যাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য তারা অকাতরে হাসিমুখে বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করেছেন, তারা চিরঞ্জয়ী।

বাংলার মানুষের মৌলিক সমস্যা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থার দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত। আমরা যদি এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই, তবে ইতিহাসের কলংকিত অধ্যায়ে আমাদের নাম থাকবে।

দেশ গড়ার নামে জনতাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে দেশ গড়তে উপদেশ দিলে কিছুই হবে না । কি করতে হবে তা আমাদের জানতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং যে যেখানে আছেন, সেখানে তার কর্তব্য পুরোপুরি পালন করতে হবে।

সবাইকে নিজ নিজ ঘর থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ অভিযান শুরু করতে হবে । ব্যক্তি জীবনে পুর্বাপর সংহতি বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় দুর্নীতর উচ্ছেদ হবে না এবং বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি কখনো যাবে না। উপর থেকে আদর্শ-অনুশাসন করে দেখাতে হবে । তাহলে কর্মীরা উৎসাহ ও প্রেরণা পাবে। উপরে বসে দুর্নীতি করে আদর্শবান নাগরিক হবার উপদেশ প্রদান করা

উপহাসমাত্র। এতে জাতির দুর্ভোগ বাড়বে বই কমবে না ।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে এমন সব মৌলিক অধিকার রহিত করা প্রয়োজন। সংবিধানে এর ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ভবিষ্যৎ সংসদে আইন প্রণয়নকারীদের ওপর এ ব্যাপারটি নির্ভর করবে। যার পয়সা আছে, সে উচ্চ আদালতে মামলা করে মৌলিক অধিকার ক্রয় করতে পারে। যার পয়সা নেই, তার সেই অধিকারও নেই ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। ধরুন, ৫টি পাট কল স্থাপন করতে হবে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এবং পাঁচসালা সফল করার জন্য। কিন্তু পাট কলের জমি সংগ্রহ করতে গিয়ে পয়সাওয়ালা এবং প্রভাবশালী লোকদের নিকট থেকে বাধা আসবে। সে বাধা সম্পত্তি রাখার মৌলিক অধিকারের প্রতিবন্ধকতা, তারা মামলা করবে। ধরুন, সরকার যদিও জিতে যাবে, পরিণামে তবুও পাঁচসালার দু'বছর অতীত হয়ে যাবে ইতোমধ্যেই, অতএব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে যাবে।

তাই ব্যক্তি মালিকানায় সম্পত্তি রাখার মৌলিক অধিকার দেশের বৃহত্তর অগ্রগতির স্বার্থে রহিত হওয়া প্রয়োজন। সংবিধানে তাই রয়েছে। মৌলিক অধিকার নিয়ে আজকে যারা বাক-বিতন্ডা করছেন তাদের আসল কথা বাক স্বাধীনতা নয়, তারা চান ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার অধিকার । যার ফলে আপনার সম্পত্তি কিভাবে হল, কিভাবে বৃদ্ধি পেল, এটা কি হাইজ্যাক করে হল, না ডাকাতি করে হল, লুটপাট করে হল তার কোন হিসাব-নিকাশ করা বা প্রশ্ন করা যাবে না।

শিক্ষা প্রসঙ্গ : গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা আমি চাই না । জনকল্যাণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চাই। যে শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের অগ্রগতির প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক অনুশীলনপ্রাপ্ত কর্মীর যোগান দেবে সে ব্যবস্থাই আমার কাম্য। পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা চাই। যেখানে দেশের অগ্রগতির সর্বস্তরের সবরকম কর্মী পাওয়া যাবে । কোনও দিক শূন্য থাকবে না ।

সংস্কৃতি ঃ সংস্কৃতির আবেদন বিশ্বজনীন। এর সীমা রেখা টানা ঠিক হবে না। সংস্কৃতি চির প্রবাহমান । সত্য ও সুন্দরের সাধনাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কোনকালে কোন অবস্থায়ই বর্জনীয় নয়, সবকালেই গ্রহণীয় ।

প্রমাণ করতে পারলে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে প্রস্তুত : আমি চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি,

যদি কেউ কোন দিন প্রমাণ করতে পারেন যে, আমার প্রধানমন্ত্রিত্বকালীন সময়ে ভারতের সঙ্গে কোন প্রকার গোপনীয় বা প্রকাশ্যে চুক্তি করেছি তবে আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে প্রস্তুত রয়েছি। ২৩ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১০ দিনের মধ্যে ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য প্রদান বন্ধ না করে তবে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করবে। এই ঘোষণার পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ববাসীর নিকট আবেদন জানান এই হামলা বন্ধ করার জন্য । কিন্তু কিছুই হয়নি এবং ঠিকই দশ দিন পর ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে। ফলে ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন হয় এবং আমরাও তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত । তাই উভয়ের স্বাধীনতার চরম শত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যৌথভাবে কি করে মোকাবেলা করা যায়, তাই নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি এবং একদিন রাতে সবার অলক্ষ্যে মুজিবনগর থেকে আমি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব উধাও হয়ে যাই। মিসেস গান্ধীর সঙ্গে রাতে দীর্ঘ আলোচনার পর আমাদের সিদ্ধান্ত ভারতকে জানিয়ে দেই যে, আমরা স্বাধীনতার সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত, তবে তা হবে আমাদের শর্তানুযায়ী । শর্তগুলো হল ঃ ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করবে, ভারতীয় সৈন্য বাহিনী বাংলাদেশের সম্মিলিত সৈন্য বাহিনীর সাথে (গণফৌজ ও ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, তৎকালীন ই.পি.আর., আনসার, মুজাহিদ যার সম্মিলিত নাম ছিল মুক্তিবাহিনী) Supporting force বা সহায়ক বাহিনী হিসেবে আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এটাই ছিল ভারতের সাথে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সেই রাতের বৈঠকের কার্যবিবরণী । এটাকে আপনারা যে কোন নামে অভিহিত করতে পারেন । আমাদের আপত্তি নেই । এই প্রস্তাবের মূলকপি এখনও বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা রয়েছে।

বিপ্লবের নিম্নচাপ থেকে সময় থাকতে সাবধান হতে হবে : জলভাগে বায়ুর গতি ও চাপ পরিবর্তনের ফলে যে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বায়ুর গতি ও চাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না এলে যে ঘূর্ণিঝড় ও গর্কীর সৃষ্টি হয়, তাতে প্রলয়ংকারী জলোচ্ছ্বাস এবং হারিকেন মানব ও প্রাকৃতিক জীবনে ডেকে আনে এক চরম বিপর্যয় । যার ফলে সব স্বাভাবিক অবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে রূপ নেয় এক প্রলয়ংকরি ধ্বংসলীলার। তেমনি আমরা যদি দেশের মানুষকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করতে ব্যর্থ হই বা

তাদের প্রয়োজন মেটাতে না পারি, তবে আমাদের দেশেও বিপ্লবের নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে এবং যদি সময় থাকতে মানুষের কল্যাণ প্রচেষ্টায় আমরা ব্রতী না হই, তাহলে নিম্নচাপের ফলে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের গতিধারায় আমরা শুধু ভেসেই যাব না, ইতিহাসের কলংকজনক অধ্যায়েও নিক্ষিপ্ত হব। অতএব সময় থাকতে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত ।

অতি-বিপ্লবীরা সমাজের কোন উপকারে আসে না। তারা শুধু জনসাধারণকে নির্যাতন করতেই সক্ষম। পশ্চিম বাংলায় অতি-বিপ্লবীরা বহু মানুষ হত্যা করেছে। কিন্তু সার্বিক জনগণের কোন উপকার হয়নি ।

বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গ : বুদ্ধিজীবীরা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন এবং আমি বিশ্বাস করি তাদেরকে নতুন করে দায়িত্ব দেয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ জাতীয় প্রয়োজন এবং ক্রান্তিলগ্নে বুদ্ধিজীবীরা সর্বদাই সঠিক দায়িত্ব অতীতেও পালন করে এসেছেন। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও করবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার রয়েছে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা দেশের সত্যিকার সমস্যা তুলে ধরবেন এবং সমাধানের ইঙ্গিত প্রদর্শন করবেন, এটাই কামনা করি । অন্ধভাবে আমাদের শুধু প্রশংসা করলেই চলবে না ।

বঙ্গবন্ধু যেন রেলগাড়ি লাইনের ওপর স্থাপন করতে পারেন : বঙ্গবন্ধুর কাছে খুব বেশি কিছু আশা করবেন না। শুধু এইটুকু দোয়া করবেন যে, বঙ্গবন্ধু যেন লাইনচ্যুত রেলগাড়িটি লাইনের ওপর সঠিকভাবে স্থাপন করে যেতে পারেন। কারণ অগ্রগতির প্রতীকস্বরূপ এই গাড়িটি লাইনে অবস্থান করলে যে কোন ইঞ্জিন বিলম্বে হলেও সেটি গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। অন্যথায় রেলগাড়িটি যদি লাইনচ্যুত থেকে যায়, তা হলে দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন দিয়েও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে না ।

সার্বভৌমত্ব ঃ দেশের সার্বভৌমত্ব নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর । এই জন্য আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে, সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং সবাইকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতেই হবে। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে শতকরা ১০০ ভাগ সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা অসুবিধা হবে । কারণ বিদেশ থেকে যখন সাহায্য হিসেবে গম আসে, তখন দলিলপত্রের কোথাও কোন শর্ত লেখা থাকে না। কিন্তু গমের সাথে সাথেই বিদেশী প্রভাবও দেশে প্রবেশ করে । পরনির্ভরশীল যে কোন দেশের সার্বভৌমত্ব এমনিভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সরকারী প্রশাসন যন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি কোনরূপ অস্ত্র রাখতে পারবেন না। সরকারী দলের কাছে অস্ত্র থাকলে আত্মরক্ষার জন্য বিরোধী দলও অস্ত্র রাখতে চাইবে । ফলে দেশে অশান্তি সৃষ্টি হবে । এমন কি ভয়াবহ পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হতে পারে । কোন আওয়ামী লীগারের হাতে বেআইনী অস্ত্র থাকলে তাকেও গ্রেফতার করতে হবে, নতুবা বক্তৃতা-বিবৃতিতে ভাল কথা শুনিয়ে শুনিয়ে দেশে শান্তি তথা- আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হবে না। পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে, জনগণের আস্থা অর্জনে সাহায্য করতে হবে।

তাই, আসুন প্রতিজ্ঞা করি, শহীদদের স্মৃতি স্মরণ করে, আমার পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে, যারা আমাদের জলন্ত দৃষ্টান্ত, চলুন, আজ আমরা শপথ গ্রহণ করি, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমাজবাদী বাংলাদেশ গড়ে তোলার। দেশের ৮০ জন ভুখা-নাংগা মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আমাদের সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে। তবেই আমরা সুখী সমৃদ্ধিশালী শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ এবং স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারব। আমরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করব এবং বিশ্ব শান্তিতে অবদান রাখব, বিশ্বের সব মুক্তি সংগ্রামীদের পাশে থাকব ও বিশ্ব শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের রুখে দাঁড়াব।

সূত্র ঃ তাজউদ্দীন আহমদ: ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃষ্ঠা ৩৮৫-৩৮৮

তিন. ১৯৭৪ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাজউদ্দীন আহমদ যে বক্তৃতা দেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এপ্রিল ১৮, ১৯৭৪ বৃহস্পতিবার ঃ দৈনিক বাংলা

হতাশা নয়, লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে; মুজিব নগরে বিপ্লবী সরকারের ৩য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্যাপিত : গতকাল ছিল ধ্রুব-নক্ষত্রের দীপ্তিতে জ্যোতিষ্মান একটি দিন ১৭ এপ্রিল, যেদিন বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্ত জেলা কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার এক অখ্যাত গ্রাম বৈদ্যনাথতলার নিভৃত আম্রকুঞ্জে শপথ নিয়েছিল জনাব তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকার। সেই আশ্চর্য ইতিহাসের দিনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করেছিল মৃত্যুর প্রহরগোণা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কানে স্বাধীনতার বরাভয়। ১৯৭১ সালের সেই আশ্চর্য ইতিহাসের দিনে বাঙালি জাতির সেই বিস্ময়কর অভ্যুদয়ের দিনে বিপ্লবী সরকারের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে বাংলার তরুণ সুর্যসেনা । গতকাল সেই একই আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে জাতিকে নতুন সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি বলেছেন, আর হতাশা নয়, আসুন স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই অগ্নিসম্ভব দিনগুলিতে যে দুর্জয় শপথ নিয়ে আমরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, আজ সেই একই শপথ নিয়ে আমরা আবার নতুন সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করি অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে, শোষণহীন একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্যে ।

গতকাল মুজিব নগরে এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, দেশ আজ যে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা সমাধানের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল সমাধানের জন্য সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বেছে নিয়ে সর্বশ্রেণীর জনগণের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পর্যায়ক্রমে সেগুলোর সমাধান করা । তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য প্রতিটি নাগরিককেই স্থির সংকল্প নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, রক্তাক্ত বিপ্লবের মাঝ দিয়ে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে সেই বাংলাদেশ আজ নানা সমস্যায় পরিবেষ্টিত, কিন্তু তাতে হতাশ হয়ে যাবার কোন কারণ নেই । স্বাধীনতা যুদ্ধে যে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড গুঁড়ো হয়ে গেছে, স্বাধীনতার মাত্র ২৪ মাস পরে সে দেশের রাতারাতি একটা বিরাট

পরিবর্তন আশা করা ঠিক সঙ্গত নয়। আসলে যেটা লক্ষ্য করা দরকার তা হল দেশ তার অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে কি-না। তিনি বলেন, দেশ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পথে এগিয়ে যেতে পারে—যদি সকল শ্রেণীর মানুষ, দেশের প্রতিটি নাগরিক নিঃস্বার্থভাবে তার দায়িত্ব পালন করে, যদি আমরা আমাদের শিল্প কারখানা আর খেত-খামারগুলোর উৎপাদন বাড়াতে পারি তবেই। জনাব তাজউদ্দীন আহমদ দেশের কৃষক শ্রেণীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, গত দু'বছরে দেশের কৃষকরা খাদ্য ঘাটতি বারো লাখ টন কমিয়ে এনেছে। তিনি জনগণকে দেশের কৃষক সমাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণের আহ্বান জানান ।

সূত্র ঃ তাজউদ্দীন আহমদ : ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃষ্ঠা ৪৩৮-৪৩৯

৩৬১